সোনা রূপা নয়

জ্যোতির্ময়ী দেবী

২০৬ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সোনা নয় রূপা নয়—ঐশ্বর্য সম্পদ—
ধনজন-গৃহ যশ-খ্যাতি মানপদ—
কিছু নয়, কিছু নাই। ছোট বড় কুচি
কাগজ এ শুধু। শুধু লিখি ছিঁড়ি মুছি
সাগর বুদ্বুদ সম ঢেউ ভেঙে উঠি
হৃদয় বেলায় তারা করে লুটোপুটি।
তার মাঝে ফিরে মন কি কথার খোঁজে
লিখিয়া লইতে চায় কালিতে কাগজে।

কোথা সে কাগজ হায় কোথা বা সে কালি
সে কালির রঙ যেন সোনালি রূপালি
ক্ষুদ্র খণ্ড কাগজের মহাকাশে মোর
ফুটাবে তপন চাঁদ তারার অক্ষর।
যদি লেখে দু'-একটি সোনার লিপিকা
জীবনের সত্য মিথ্যা মায়া মরীচিকা।

হায় এ যে ইন্দ্রধনু চাঁদ তারা নয়
নিমেষে মিলায় রঙ লীলা পরিচয়
সেই রঙে ডুবালাম আমার রঞ্জিকা
শূন্যে শূন্যে আঁকা মোর এরা নিমেষিকা।

সূচিপত্র

সোনা রূপা নয়

সেই ছেলেটা

দিল্লীর বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র। কুইন্‌স্‌ পার্কের মাঝে জায়গাটা।

চারদিকে লোক যাওয়া আসা করছে, বসেও আছে। তিনটি মেয়ে শিক্ষাকেন্দ্রের বাড়ীটার কাছে দাঁড়িয়ে কথা কইছিল। শীতের সকাল, রোদ্দুরটা ভালই লাগছিলো।

তাদের আলোচ্য বিষয়টি হলো দু'একটা চাকুরি খালি হয়েছে, বয়স্কা মেয়েদের শিক্ষা বিভাগে। মেয়ে চাই। মাহিনা এখন ৫০্‌ টাকা ক'রে। পরে পাকা চাকুরি হলে ৮০্‌ টাকা হবে। কোয়ার্টার পাবে। উন্নতির আশাও থাকবে। গুণপনা বা বিদ্যাবুদ্ধি ম্যাট্রিক হলেই চলবে আপাততঃ। স্কুল বা পাঠশালা বসে দুপুরে তিন ঘন্টা করে—সেলিমগড়ে, বিল্লিমারমে, খাড়িবাউড়ীতে, কারোলবাগে, বাল্মীকি মন্দিরের হরিজন কলোনীতে বা অন্যত্র যেখানে হোক পড়াতে হবে। ছাত্রীদের ১৪ বছরের ওপর থেকে ৬০।৭০।৮০ বছর বয়স অবধি চলতে পারে। ১৪ বছরের নিচে বয়স চলবে না।

দাঁড়িয়েছিলো বরুণা গুপ্ত, সুজাতা মিত্র আর রাজকুমারী (ক্ষেত্রী) মেহেরা—তিনজনেই ম্যাট্রিক পাস করে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের, সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী।

চাকরিটার ভারী সুবিধা। সকালে কলেজ ক'রে দুপুরে একটার পর বয়স্কদের স্কুলে—'পহেলী কিতাব' আর 'দুসরী কিতাব' আর পহাড়া পড়ানো—(প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ আর নামতা)। ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রীর কাছে ত এ পড়ানো 'ডাল ভাতের' চেয়েও সোজা। এতেই মাস গেলে পঞ্চাশটি টাকা। এরা তিনজনেই দরখাস্ত দিয়েছে। আরও কতজন দিয়েছে তা ওরা জানে না। তবে মনে হয় ওরাই ক'জন দিয়েছে। সকলে ত খবরও জানে না আর সকলের ত সময়-সুযোগও হয় না।

এরা তিনজনেই ইন্দ্রপ্রস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। চেনাশোনা আছে।

বরুণা জিজ্ঞেস করলে রাজকে আর সুজাতাকে—'তোরাও কি এখানে দরখাস্ত দিয়েছিস?'

সুজাতা বললে, 'হ্যাঁ, গুপ্তর অপিসে।'

রাজকুমারীরই বয়স সব চেয়ে কম। সে বললে, 'আমিও ত এখানেই দিলাম। সেদিন আমার কাকা দিয়ে গেছেন। কিন্তু গুপ্তজী কি বাঙালী? তোমাদের কেউ আপনার লোক হন কি? বরুণা বিবিজীও ত গুপ্ত? তা হলে তোমাদের চাকরি হবে। তাতে এবারে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছো তোমরা।'

সুজাতা হাসলে, বললে, 'না, গুপ্তজী বাঙালী নন। ইউ. পি'র লোক বোধ হয়। লোকটিকে কেমন যেন লাগলো। টেবিলের ওপর পা তুলে বসে দাঁত খুঁটছিলেন। আমরা ক'জন মেয়ে ঘরে ঢুকলাম নানা কাজে। আমার হাতে দরখাস্ত ছিল, দিলাম। তা যেমন বসেছিলেন, তেমনই বসে রইলেন। দরখাস্ত দেখে বললেন, আপ বাঙালী? কোন্‌ দেশে থাকেন? বললাম, হ্যাঁ, আমি বাঙালী। বহুদিন দিল্লীতে আছি। পড়াশুনা দিল্লীতেই করেছি। হিন্দীও জানি। ভদ্রলোক বললেন, 'আপকি হিন্দী জোবান অচ্ছি নেহি।' (আপনার হিন্দী উচ্চারণ ভাল নয়) সবিনয়ে বললাম—'হাঁ, আমি ত বাঙালী, কাজেই তা হ'তে পারে। কিন্তু হিন্দী পড়াতে পারব। হিন্দীতেই পাস করেছি, এখানেই ইন্দ্রপ্রস্থ স্কুল থেকে।'

সুজাতা হাসতে লাগল। বললে, 'আমাদের কাজ পাবার ভরসা নেই। রাজ পাঞ্জাবী, তাতে উদ্বাস্তু। তুমি পেলেও পেতে পার।'

রাজ অন্যমনে ফুলের কেয়ারীর দিকে চেয়ে ছিল। চোখে যেন জল। একটু ম্লানভাবে বন্ধুদের দিকে চেয়ে বললে, 'এই চাকরিটা পেলে আমার কলেজে পড়া হবে, নইলে কাকা আর পড়াতে পারবেন না। কোনও রকমে ভর্তি হয়েছি বটে— কিন্তু বই, কলেজের মাহিনা, নানা খরচের জন্য বাড়ীর কারুর মত নেই পড়ার। আমাদের ত সব ফেলে পালিয়ে আসতে হয়েছে। এখন খুবই অসুবিধা।'

বরুণা বললে, 'তোমার মা কি বলেন? ঐ অসুবিধার জন্যেই ত আরও দরকার।'

রাজ আরও ম্লান হয়ে গেল। বললে, 'মা নেই—মা থাকলে...।'

বন্ধুরা বললে, 'আহা। তা হলে বাড়ীতে কে আছে?'

'অনেক লোক। বাবা, ঠাকুমা, কাকারা, কাকীরা, তাদের ছেলেমেয়ে, আমার ভাই-বোনেরা, সবাই আছে।'

ওরা কেন্দ্রের অপিসে ঢুকল। সেখানকার প্রধানার কাছে শুনল, দু'তিনদিনের মধ্যে খবর পাবে। দরখাস্তের জবাব। দু'টো কাজ খালি আছে।

২

এবং জানুয়ারীর গোড়াতেই রাজকুমারী আর অন্য একটি মেয়ে কাজ পেয়ে গেলো।

সুজাতা ও বরুণা রাজের হাসিমুখ দেখে খুব খুশী হ'ল। রাজ পেল বিল্লিমারম গলিতে একটি ছোট্ট কেন্দ্রে কাজ। সকলেই নানা জায়গার অধিবাসিনী হলেও কুইন্‌স্ পার্কে কর্মসূত্রে আসা-যাওয়া করে।

কাজের শেষে পার্কের ওদিকের গেটে বাস্ স্ট্যাণ্ডে যায়। একসঙ্গে বাড়ীর দিকের বাসে ওঠে। বাগানে বেড়ায়। চিনেবাদাম কিনে খায়। চাঁদনীচকের ঘন্টাওয়ালার দোকানের প্রসিদ্ধ 'ডালমোট্‌ও' খায়। দইবড়া খায়। ভালমন্দ যা খুশি খায়।

বাস্ স্ট্যাণ্ডের আশেপাশে বাগানের ঝোপঝাড়ের পাশে অসংখ্য ভিখিরী থাকে নানা রকম ধরনের।

সেদিন ওরা বাগানে রোদ্দুরে ব'সে বাদাম খেয়ে বাসের দিকের গেটে এল।

সহসা একটা ভিখিরী মেয়ে একটি ছেলের হাত ধ'রে এসে এদের সামনে দাঁড়াল, 'বিবি, কুছ দে।' ছেলেটা হাত পাতল না, মার ওড়না ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

মা হাত পাতল।

বরুণা বললে সুজাতাকে, তোর কাছে খুচরো আছে? তা হ'লে দু'টো পয়সা দিয়ে দে। আমার খুচরো নেই।

রাজ বাদাম ছাড়াতে ছাড়াতে আসছিল একটু পিছনে।

সুজাতা থলে থেকে ব্যাগ বের করল।

বরুণার হাতে পয়সা দিল, নিজেও দু'টো নিল।

ভিখিরী মেয়েটি পয়সা নিল। এবারে রাজ এসে পৌছেছে। তাকে দেখে বললে, 'বিবি, তুঁহু দে কুছ।' (তুইও কিছু দে।) 'সেলাওয়ার কামিজ' দেখে স্বদেশিনী বলে একটু হেসে বললে, 'কুছ ওড়নে-কা দে বিবি (গায়ের কাপড়)।'

রাজও পয়সা বের করছিল, 'ওড়নে-কা কুছ' শুনে একটু হাসল। 'শোনো কথা! তোর জন্য যেন ওড়না নিয়ে আমরা এখানে এসেছি।'

তারপর ছেলেটিকে দেখে বললে, 'মুঙ্‌ফলি (চিনেবাদাম) খাবি? এই নে।' নিজের ওড়নার আঁচল থেকে ছেলেটির হাতে দিতে গেল।

সুজাতা হাসল, 'ও চাইছে 'চুননী' (ওড়না) আর রাজ দিচ্ছে মুঙ্‌ফলি (বাদাম)!'

ভিখারিণী চিনেবাদাম নিতে এগিয়ে এল। তারপর হঠাৎ বললে, 'বিবি, তোর ঘর কোথা?'

রাজ আবার হাসল—'আমার ঘর দিল্লীর সেলিমগড়, তুই যাবি সেখানে? ওড়না নিতে?' ঠাট্টার সুরে বলল।

ভিখারিণী বললে, 'না তোর পিণ্ড্‌ (দেশ) কোথায় জিজ্ঞেস করছি।'

রাজ বললে, 'আমার দেশ লাহোর। তোরও কি লাহোরে দেশ?'

বরুণা আর সুজাতা এবারে একসঙ্গে হেসে বলে উঠল, 'ওরে রাজ, তুই ওর দেশের লোক কিনা জানতে চায়, কি মুশকিল। আমরা বাঙালী, তাই পয়সা দিয়েই খালাস পেয়েছি।'

ভিখারিণী একটু থমকে গিয়ে যেন নিজের মনেই বললে, 'আ রাজ? তোর নাম রাজ? লাহোর তোর দেশ?'

রাজকুমারী হেসে উঠলো, 'হ্যাঁ, রাজকুমারী। লাহোর আনারকলি বাগের কাছে, তা তোর কি হ'ল? নে পয়সা, আয়—'

ভিখারিণী ওড়না পেতে চিনেবাদাম নিতে বা পয়সা নিতে আর এগিয়ে এল না। আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেল ছেলের হাত ধ'রে। একবার যেন বললে, 'আ মেরি রাজ।'

ওদিকে বাস্‌ এসে দাঁড়িয়েছে, গন্তব্য পথের নম্বর মাথায়। রাজ বললে, 'কি হ'ল? নে পয়সা?'

সুজাতা বরুণা ডাকলে, বললে, 'রাজ, আয় আমাদের বাস্‌ এল।'

কিন্তু ভিখারিণী কোথায়? সহসা কোন্‌ ঝোপের আড়ালে চ'লে গেছে। আর দেখা গেল না। পয়সা নিতে এল না আর। রাজ আবার ডাকল, 'কই রে, পয়সা নে।' কোথাও নেই। ওরা অবাক হয়ে গেল তিনজনেই।

বরুণা বললে, 'ও তোকে চেনে না কি? রাজ বললে যেন?'

সুজাতা বললে, 'হ্যাঁ শুনলাম 'রাজ' 'রাজ' বললে যেন।'

পয়সা হাতে একটু চুপ করে থেকে রাজ স্তম্ভিতভাবে বললে, 'কি জানি তোরা নাম ধরে ডাকলি, তাই হয়ত শুনে ও রাজ বললে।'

আর দাঁড়াবার সময় নেই। সকলে বাসে উঠে পড়ল।

৩

রাজের বাড়ী কারোলবাগে উদ্বাস্তু কলোনীতে। সেলিমগড়ে নয়।

বাড়ী ফিরে অনেক কাজ তার। আটা মাখতে হবে। তুন্দুরে রুটি হবে। উঠানের কোণে মুখভাঙা জালার মত প্রকাণ্ড তুন্দুরে ঘুঁটের আগুন জ্বেলে দিয়ে সে ওড়না কামিজ

বদলে রান্নাঘরে আটা মাখতে এল। সন্ধেবেলাতেই সব খাওয়া হয়ে যায়, ওদের পাঞ্জাবীদের। এক্ষুনি ভাইরা, বোনেরা, ঠাকুমা খাবে। তারপর বাবা কাকারাও খেতে আসবে। দেখলে, মেজখুড়ীমা 'মাই কী দাল' (মাষকলাই) রান্না করে রেখেছিল, আটাও মেখেছে।

ওকে দেখে সে নিজের অন্য কাজে গেল ছেলেমেয়ে দেখতে।

রাজ আটার থালা নিয়ে উঠানে তুন্দুরের পাশে দাঁড়াল। তারপর এক-একটা মোটা মোটা রুটির তাল হাতে করে তুন্দুরের গায়ে চেপটে লাগিয়ে দিতে লাগলো। সেগুলি উনানের গরম গায়ে সেঁকা হয়ে আগুনে পড়ে যায়। আর সে চিমটেতে নয়ত হাতে নেকড়া জড়িয়ে তুলে নেয়।

আড়াই সের আটার রুটি সেঁকা হল। থালার মধ্যে নেকড়া জড়িয়ে সেগুলি গরম রাখল, পরে ঘি মাখাবে। পাঞ্জাবে ঘিয়ে বা মাখনে ডুবিয়ে তুলত। এখানে আর সেদিন নেই।

ভাই-বোনেরা খেতে এল। রুটি ডাল আচার আর দুধ দিয়ে খাওয়া হ'ল। দাদী বাবা কাকারা খেয়ে নিল।

দেখতে দেখতে শীতের রাত ঘনিয়ে অন্ধকার হয়ে গেছে। পাঞ্জাবী পাড়ার লোকেদের খাওয়া সেরে বেড়ানোর বা জিরোনোর সময় তখন।

সবারই খাওয়া শেষ হয়েছে। রাজ আর কাকীরা দু'জনে খেতে বসল। মেজকাকী বললে, 'তোর মুখটা আজ ভারী শুকনো লাগছে। আর রুটিও ত কম নিয়েছিস দেখছি। কেন অসুখ করেছে কী?'

রাজ একখানা রুটীই নিয়ে বসেছিল। ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললে, 'না, অসুখ করেনি। তবে ভাল লাগছে না যেন।'

ছোটখুড়ী বললে, 'আজ তাহলে শুয়ে পড়গে শীগ্‌গীর করে। আমি বাসনগুলো মেজে রাখবো।'

পালা ক'রে ভাগে ভাগে কাজ করে সবাই। তবে ওরই ভাই-বোন নিয়ে কাজ বেশী পড়ে।

শীতের রাত। সকলেরই ছোট ছোট খাটিয়াতে বিছানা। দিল্লীর শীত। লেপ কম্বল নিয়ে সব ভাই বোন ঠাকুমা বাবা এক ঘরেই শুয়েছে।

'সেলাওয়ার' কামিজ-ওড়না ছেড়ে রেখে ছোট জামা আর 'কাছেড়া' বা পাজামা পরে রাজও নিজের খাটিয়াতে শুয়ে পড়ল।

নিরালোক নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ঘর, কোনোদিকের একটা জানালার ফাঁক থেকে রাস্তার একটু আলোর চিল্‌তে এসে পড়েছে।

রাজ সেদিকে চেয়ে রইল।

এতক্ষণে ওর হাতের কর্মচক্র থেমেছে। মন যেন স্থির হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে এক জায়গায়। সেটা কোন্ জায়গা? মন জানে সেটা কোথায়। রাজও জানে কোথায়। কিন্তু রাজের গলা থেকে ঠোঁট দু'খানা অবধি যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল হঠাৎ। ভাবতে ইচ্ছে করছে না সেই জায়গাটির কথা।

তা হলে কি উঠে জল খাবে? যদি ভাবনাটা নড়ে যায়? উঠল, জল খেল। ঘুমের মাঝে ঠাকুমা বললে, 'কে, রাজ?'

এবারে শুয়ে পড়ল আবার। আজ আর শীত করছে না। ঘরটা যেন সব গরম হয়ে গেছে।

গরম হোক, শীত হোক, তেষ্টা পাক, গলা শুকোক, কিন্তু সেই জায়গাটা আর রাজের মনের চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায় না।

রাজ বালিশে শুকনো মুখ গুঁজে যেন কাঁদতে চাইলে। কিন্তু কান্না এল না।

অশ্রুহীন মুদিত চোখের সামনে ভেসে এল কুইন্‌স্ পার্কের সেই জায়গা ও সেই ভিখারিণী...। ছেঁড়া বিবর্ণ ওড়না, ময়লা জামা সেলাওয়ার পরা বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে 'আ রাজ?' 'মেরি রাজ' বলে পিছন দিকে সরে যাওয়া সেই ভিখারিণী।

হ্যাঁ, রাজ চিনেছে তাকে। তার নাম বলতেই যেন মনে হয় চিনতে পেরেছিল সে কে। প্রথমটা বুঝতে পারেনি।

এবারে চোখে জল এল। রাজ নিঃশব্দে নিঃশ্বাসের মত শব্দহীন গলায় বললে, 'মা'। হ্যাঁ, মা-ই তো যেন।

এবারে ঝর্‌ঝর্ ক'রে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

৪

আর চোখের জলের সাগরে প্রতিবিম্বের মত ফুটে উঠতে লাগল সেই '৪৬ সালের লাহোরের দুর্যোগের দুর্দিনের ছবি।

অনেক রাত্রি তখন। কত রাত্রি কে জানে? সব ঘুমিয়েছে ঘরে ঘরে কাকারা ঠাকুমা। মা-র ঘরে মা বাবা ভাই বোন ওরা সব।

সহসা এক কাকা ডাকলেন ত্রস্ত শঙ্কিত স্বরে—ঘরে ধাক্কা দিয়ে, 'ওঠ ওঠ সব, শীগ্‌গীর ওঠ। মুসলমানরা এদিকে আসছে।'

বাবা-মা উঠলেন। ঠাকুমা কাকীরা বাড়ীসুদ্ধ সব যে যেখানে ছিল, মস্ত বাড়ী বাগান কত দাসদাসী লোকজন সব একে একে জেগে উঠে নিঃশব্দে সভয়ে বাইরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াল একত্র হয়ে।

খবর দিতে পুলিসের লোক এসেছে। তিন-চারখানা ট্রাকও এসেছে। এই রাত্রেই লাহোরের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারলে বাঁচতে পারে। না হ'লে তাদের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। 'যার যা দরকারী জিনিস, টাকা-কড়ি-গহনা নিতে পার নিয়ে যাও।' আরও বললে, 'বেশীক্ষণ সময় নেই। বাইরে আলো জ্বেলো না, কথা বলো না, দেরি করো না। জানানাদের ইজ্জৎ, প্রাণ বাঁচাতে তারা পারবে তাড়াতাড়ি করলে। নইলে খোদা জানেন কি হবে।'

আতঙ্কে অভিভূত ঠাকুমা থর্‌থর্ করে কাঁপ্‌তে লাগল। তাকে বাবা আর কাকারা ধ'রে ধ'রে নিয়ে এসে খোলা ট্রাকের উপর বসিয়ে দিলেন। সেখানেও রাস্তার অসংখ্য লোক জমেছে, সকলেই গাড়ীতে উঠবার জন্যে ব্যাকুল। ঠাণ্ডা কন্‌কনে শীতের রাত্রি। পৌষের না মাঘের রাত্রি। পথের সবাই ভূতের ছায়ার মত নিঃশব্দে মিনতি-ভরা মুখে চেয়ে আছে পুলিসদের দিকে। যদি তাদেরও নেয়।

পুলিসরা বললে, 'আমরা সারারাত ধরে সকলকে যত পারব অমৃতসরের সীমান্তে পৌঁছে দিয়ে আসব। কিন্তু আগে কিছু বুড়ো মানুষ আর বাচ্চাদের, মেয়েদের দলদের দিয়ে আসি। পরে অন্য সবাইকে নেব। তাই হুকুম আছে।'

'ওঠ ওঠ' করতে করতে কাকারা কে ওকে গাড়ীতে তুলে দিলেন। কাকীরাও উঠে বসেছে। ছোট ছোট ভাই-বোনেরা ভয়ে শীতে কাঁদতেও যেন ভুলে গেছে। ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ চোখে চেয়ে ব'সে আছে।

বাবা কাকারা সব উঠলেন।

পুলিস বললে, 'গাড়ি ছাড়ছি।'

সহসা বুড়ী ঠাকুমা বললে, 'সবাই এসেছে? বিবি? বড়ি বিবি কোথায় ন্যু?' (অর্থাৎ বড়বৌ।)

বাবা বললেন, 'উঠেছে সব। ওঠেনি? ভিড় আর অন্ধকারে দেখা যায় না মানুষ।'

সহসা এক কাকা বললেন, 'না, আসেননি বিবিজী। দেখছি না ত।'

অন্ধকারে এক খুড়ীও বললে, 'হ্যাঁ, তিনি ওপরের ঘরে কি আনতে গিয়েছিলেন।' অন্য এক কাকা ডাকলেন, বিবিজী? সাড়া নেই।

বাবা পুলিসকে বললেন, 'দাঁড়াও একটুখানি, তাকে ডেকে আনি।'

সহসা দূরের মোড়ের কাছে মশালের জোর আলো দেখা গেল। আর 'আল্লা হো আকবর' শোনা গেল।

পুলিস হাত ধ'রে নিলে। বললে, 'আর নাবা হবে না। তিনি পরের গাড়ীতে আসবেন। হয়ত বা অন্য গাড়ীতে উঠেছেন। শীঘ্র গাড়ী ছাড়। ওরা এক্ষুণি এসে পড়লে আমি কারুকে বাঁচাতে পারব না। তুমিও মরে যাবে নামলেই।'

বাবা অস্থিরভাবে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে লাফিয়ে পড়তে গেলেন।

কিন্তু পুলিসরা তাঁকে জোর করে ধরে রেখে ড্রাইভারকে জোরে গাড়ী চালিয়ে দিতে বললে। বললে, 'আপনার জন্য এত লোক বিপদে পড়বে! বর্ডারে গিয়ে খুঁজে নেবেন।'

যে সব রাস্তার আলো সব জায়গায় নেই, গলি-ঘুঁজি দিয়ে অন্ধকার সেই সব রাস্তায় আতঙ্কে প্রাণভয়ে ভীত নিঃশব্দ মানুষদের নিয়ে তিন-চারখানা ট্রাক অন্ধকার নরকের পথের ভূতুড়ে গাড়ীর মত চলতে লাগল। সারি সারি পায়ে চলা অসংখ্য নিঃশব্দ মানুষও চলেছে সেই সব পথে। কারুর মুখে কথা নেই, কেউ কারুকে দেখতে পাচ্ছে না। কারুর মনে আর কোন ভাবনা চিন্তাই নেই, কোনক্রমে অমৃতসরের সীমানায় খাসা গ্রামে পৌছানো ছাড়া। অনন্তকালের পিতৃলোকের বাস করা দেশ, কত নিদ্রিত সুপ্ত স্বজন বন্ধু, যারা এখনও পথে বেরিয়ে আসেনি, ঠিক জানে না ব্যাপারটা ; তারা ছাড়া ধন-ধান্য ঘরবাড়ী ঐশ্বর্য সম্পদ্‌ চিরকালের বাস-নিবাস স্বদেশ ছেড়ে সকলেই পথে বেরিয়ে পড়েছে—দীন দরিদ্র ভিখারী থেকে ধনী শেঠ প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার অবধি। এত কথা তখন রাজ ভাবতে জানত না। পরে ভেবেছে, পরে দেখেছে তাদের। পরে জেনেছে। নরক কেমন কেউ জানে না, রাজও জানে না। কিন্তু যমযন্ত্রণার ভয়ই যদি নরকের ভয় হয়, সেই আতঙ্কময় অন্ধকারময় নরকের পথের সহসা শেষ হ'ল। দম বন্ধ ক'রে ছোট ট্রাকগুলি একেবারে সীমান্তে এসে খাসা গ্রামে দম ফেলল যেন।

কে কি ভাবছিল কেউই জানে না। রাজের কোলের উপর ছোট দুটি ভাইবোন নেতিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মা-র কথা কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। কাঁদেনি। তাকে ডাকেনি। তারাও কি ভয় পেয়েছিল? কিসের ভয়? রাজও কিছুই ভাবেনি। অস্পষ্ট ভাবনা—আজকে স্পষ্ট হয়েছে। সেদিন কিছু ছিল না। দশ-এগার মাত্র বয়স তখন।

শুধু দাদী কাঁদছিল ফোঁসফোঁস ক'রে। কাকীদের সঙ্গে দু-একটা কথাও বলছিল। শুনতে পেয়েছিল রাজ—'কি আনতে ন্যু' (বৌ) ওপরে গিয়েছিল? 'জেওর জেওরাত' (গহনাপত্র) 'সোনা মতি'?...হায় হায়!...কি হবে সে সব—যদি ''জান'' আর 'ইজ্জৎ'' চলে যায়? এমন বেহিসাব আক্কেল কেমন করে হ'ল!'

কাকা ধমক দিলেন, 'চুপ কর। পরের গাড়ীতে হয়ত আসছেন।'

বাবা পাগলের মত বসেছিলেন। পুলিসটা বাবার কাছ ছাড়েনি।

দু'ঘন্টার জায়গায় এক ঘন্টায় গাড়ী এসে পৌঁছেছিল। একে একে সব গাড়ী থামল। প্রাইভেট গাড়ীও ছিল সামনে পিছনে ক'খানা। লোকেরা ক্লান্ত অবসন্ন দেহে নাবল—ঘুমন্ত শিশু বালক-বালিকাদের হাত ধ'রে—কোলে নিয়ে। জিনিসপত্র প্রায় কিছুই নেই। একবস্ত্রে অর্থাৎ যা পরেছিল তাই জড়িয়েই সব চ'লে এসেছে।

বাবা নাবলেন সবারি আগে। ওদের কারুর দিকে তাকালেন না। কিছু বললেন না। শুধু অন্য গাড়ীগুলোর কাছে গিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর ডাকতে লাগলেন, 'বিবি, বিবি, বিবি তুমি কি এসেছ এখানে?'

কেউ সাড়া দিল না। কাকারা নেবেছেন, কাকীদেরও নাবিয়েছেন। ট্রাকগুলো এখনই ফিরে যাবে আরও বিপন্ন পলাতক যাত্রী আনতে। তখনও তারাভরা আকাশ। রাত্রি শেষ হয়নি। গাড়ীগুলো যাত্রী নাবিয়ে পথে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বাবা কাকারা যাত্রীদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ডাকতে লাগলেন ''বিবিজী'' ''বিবিজী'' বলে। ঘোমটা দেওয়া, মাথায় ওড়না দেওয়া, শাল জড়ানো চেহারা মেয়েদের যাকেই দেখেন বাবা তারই সামনে গিয়ে দেখেন। যেন মনে করেন সেই বুঝি বিবিজী, ওদের মা। তারা অচেনা মুখে পিছন ফিরে তাঁর দিকে চায়।

তিনি অপ্রস্তুত হয়ে মাপ চেয়ে আবার অন্য মেয়েদের দিকে যান। ঠাকুমাও ভাঙা গলায় ''বৌটি'' (বউ) বলে ডাকেন। কাকীরা 'জিঠানীজী' (জ্যেষ্ঠানী) 'হো জিঠানীজী' বলে ডাকেন। কেউ 'আ হো' (হ্যাঁ) 'এই যে' এখানে বলে সাড়া দেয় না।

যাত্রীরা একে একে সবাই যে যেখানে পারল গ্রামের মাঝে শহরের পথে চ'লে গেল। ভোর হয়ে এল। ওরা ছোটরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে লাগল। কাকারা জোরে জোরে 'বিবিজী' 'বিবিজী' বলে ডাকতে ডাকতে গ্রামের বাইরে জঙ্গল ক্ষেত সব দিকে ঘুরতে লাগলেন। ভাবেন যদি অন্ধকারে এসে থাকেন—পথ আর মানুষ চিনতে না পেরে গ্রামে কি অন্যদিকে চ'লে গিয়ে থাকেন।

যদিও মনে জানছিলেন সবাই যে, তিনি আসেননি। আসতে পারেননি। মা-র গাড়ীতে ওঠা হয়নি। এখানে পথ ভোলেননি। চিরকালের মত লাহোরেই রয়ে গেছেন। হারিয়ে গেছেন। সেই বাড়ী থেকে বেরুতে পারেননি আর। বিপদে পড়েছেন।

কিন্তু মনকে মন মিথ্যা আশাময় সান্ত্বনা দেয়। আছে, সে আছে। আসবে। হয়ত আসবে সে পরের গাড়ীতে।

পরের গাড়ী এল। আরও কত গাড়ী, হাঁটা লোক এল। সারা সকাল সারাদিন ধ'রে কত লোক এল, চেনা-অচেনা। বাবা উদ্‌ভ্রান্ত মুখে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, পথে মা-র মত দেখতে সুন্দর চেহারা দামী জামা-কাপড় পরা কারুকে দেখেছ কিনা? কেউ কি হেঁটে আসছে সেরকম?

কাকারাও সারাদিন খুঁজে খুঁজে বেড়ালেন....। ক্রমে আর যাত্রী আসা কমে এল।

লোকমুখে শোনা গেল সেখানে মহল্লায় মহল্লায়, পাড়ায় পাড়ায় আগুন লাগানো লুটপাট শুরু হয়ে গেছে। মেয়েরা অপমানের ভয়ে কেউ কেউ কুয়োয় পড়েছে। নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। বিষ খেয়েছে। অন্যরকমে মরেছে। আর যারা তা পারেনি, তাদের 'লুঠেরা'রা ধরে নিয়ে গিয়েছে....।

রাজের চোখ এখন শুকনো। আর জল নেই। চুপি চুপি যেন নিজের মনকে ও না জানিয়ে ভাবে, তা হ'লে কি মা-ও পালাতে পারেনি, মরতে পারেনি? বেঁচে রয়েছে?

আবার চকিতভাবে ভাবে, না, তার হয়ত ভুল হয়েছে। ও মা নয়, অন্য কেউ। এমন ত একরকম দেখতে হয়। আর এত রোগা, মা-র মত ফরসাও নয়, মোটাসোটা সুন্দর দেখতেও নয়। আর ঐ ছেলেটি?...মা-র সঙ্গে ছেলেটি কেন? কার ছেলে? নাঃ, নিশ্চয়ই ও মা নয় তা হ'লে।

মনটায় যেন একটু ভাল লাগল, 'তাকে' মা নয় ভাবতে। কি ক'রে মা হতে পারে যখন ঐ ছেলেটা রয়েছে। এবারে রাজ ঘুমিয়ে পড়ল।

সহসা যেন দেখলে, লাহোরের সেই বাড়ী, সব ভাইবোন সকালে খেতে বসেছে। ইস্কুলের তাড়া সকলেরই। মা রুটি পরোটা আচার দুধ নিয়ে সকলকে ভাগ করে দিচ্ছেন। আর হাসছেন, গল্প করছেন। সাদা সেলাওয়ার, রঙীন রেশমের জামা, হালকা ফিকে নীল রঙের 'চুন্‌নী' (ওড়না) পরা।

ওরা সকলেই খাচ্ছে। কিন্তু...কিন্তু মা-র কাছে মা-র হাঁটু জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে কে একটা ছেলে। সে ত ওর ছোটভাই নয়? কে ওটা? সেই ছেলে কি? সেইটেই তো যেন!

কি রকম গলা শুকিয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখল অনেক বেলা হয়েছে, কেউ ঘরে নেই।

কাকী ডাকছে, 'রাজ, ওঠ্, বেলা হয়েছে।'

৫

কারোলবাগের বাস্ এসে থামল চাঁদনীচকের দিকে। রাজ 'বিল্লিমারম্'-এর স্কুলের দিকে তখনই গেল না। এখনও বাকী ছাত্রী সবাই আসেনি জানে। সংসারের কাজ সেরে তারা আসে।

সে কুইন্‌স্ পার্কের ভিতরে ঢুকল। শীতের রৌদ্রে অনেক লোক বেঞ্চিতে ব'সে, ঘাসে ব'সে রোদ পোয়াচ্ছে। ঝোপ-ঝাড়ের দিকে ভিখারী-ভিখারিণীরা ও ছেলেমেয়েরা ছেঁড়া নেকড়া জড়িয়ে নোংরা থালা ঘটি বাটিতে ভিক্ষালব্ধ রুটি মুড়ি অন্য খাবার নিয়ে—কেউ বা গেলাসে চা নিয়ে খাচ্ছে। কারুর খাওয়া হয়ে গেছে, ছেলেমেয়ের মাথা নিয়ে বসেছে উকুন বাছতে। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরিপূর্ণ স্তব্ধ দুপুর।

রাজ চেয়ে চেয়ে দেখে তা'দের। স্বপ্নটাও মনে আছে। ভিখারিণীকে সে আজ খুঁজে বার করবে। কাল বন্ধুরাও ছিল, আর ঠিক বুঝতেও প্রথমটা পারেনি বটে। তা আজও মনে সন্দেহ আছে, মা-না হ'তেও ত পারে? আর হয় যদি? নাঃ, সে কথা ভাবতে মন চায় না। তবু ভাল ক'রে আজ দেখে বাড়ী ফিরবে, স্কুলে যাবে।

না! সে ভিখারিণী আর কোথাও নেই। আবার সেই ছেলেটাও ত নেই! তা হ'লে

আর কোথাও ভিক্ষা করতে গেছে। বোধহয় আসবে সন্ধ্যার দিকে। যেমন সেদিন দেখেছিল। ফেরার সময়ে দেখতে পাবে নিশ্চয়।

তবে আজ আর অন্য সঙ্গিনীদের সঙ্গে সে আসবে না। তা হ'লে কথা কইতে পারবে তার সঙ্গে।

সকাল সকাল স্কুলের পড়ানো সেরে সে আবার ফিরল। তখনও বরুণা সুজাতাদের দলের কেউ বাগানের দিকে এসে পৌছয়নি। বোধহয় কেন্দ্রের ক্লাস হয়নি। কলেজ সেরে তারা বয়স্ক কেন্দ্রে আসে সেলাইয়ের, বোনার কাজে।

বিকাল শেষ হয়ে এল। ভিখারীর দলও ভিক্ষা চেয়ে বেড়াল। ঠাণ্ডা পড়বার আগেই অনেকে ফিরে গেল প্রতিদিনের মত।

কিন্তু সেই ভিখারিণী মেয়েটি নেই, আসেনি। তা হ'লে কোন দূর জায়গায় ভিক্ষা করতে গেছে।

সহসা পিছন থেকে বন্ধুরা এসে ডাকল, 'এই রাজ, কি করছিস ওই নোংরা ঝোপের কাছে? আয় একটু "জলজিরা" ফুচ্‌কা খাই।'

রাজ চমকে পিছন ফিরে তাকাল হঠাৎ তাদের ডাকায়।

তারা হেসেই আকুল, 'কি রে, ভয় পেয়েছিস? ভূত দেখলি?'

সেও হাসল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে "জলজিরা" কচুরি (ফুচ্‌কা) খেল। গল্প করল শুক্‌নো শুক্‌নো মুখে, অন্যমনস্কভাবে।

তারপর বাসে উঠল। সেদিন গেল, তার পরদিনও গেল। তার পরের দিনও গেল। তার পরের দিনও ওইভাবেই সে খুঁজল। কিন্তু সেই ভিখারিণী আর তার সেই ছেলেটাকে কোথাও দেখা গেল না।

তাহ'লে কি দরিয়াগঞ্জের মন্দিরগুলোর কাছে ভিক্ষা করতে গেছে? অথবা কেল্লার কাছে প্যারেড ময়দানের সামনে 'দাউজী' 'গোপালজী'র মন্দিরের কাছে যায় ভিক্ষা করতে? সেখানে সন্ধেবেলা কথকতা হয়, অনেক মেয়ে আসে। মিষ্টির দোকানীরাও বেশ ভিক্ষা দেয়, রুটি, পয়সা ইত্যাদি।

ঘুরে ঘুরে রাজের মুখ শুকিয়ে সরু লম্বা হয়ে যায়। ক্ষেত্রী মেয়ের অত উজ্জ্বল রঙ, সে রঙ রোদ-পোড়া রাঙা হয়ে উঠেছে।

কাকীরা ভাবে, চাকরি আর পড়া দু'য়ের খাটুনি। আর বাড়ীর কাজও তো কম নয়। যেদিন রুটি না করে, সাবান কাচে, ইস্ত্রি করে, চরকায় সুতোও কাটতে হয় মাঝে মাঝে। পুরনো তুলা জমেছে অনেক, সেগুলোর সূতো থেকে "খেস" বা সুজনী তৈরী হবে। রাজের কাজের শেষ নেই।

কিন্তু রাত্রেও ঐ ভাবনা যেন ঘুমের আড়ালেও মনে জেগে থাকে। তবে এখন যেন ওর মনে আর একটা সন্দেহ উঁকি মারে। তা হলে নিশ্চয় সে মা। তাই আর ওপথে আসে না, আর সেজন্যেই সেদিন ভিক্ষে না নিয়েই চলে গিয়েছিল।

এখন রাজের নিজেকে যেন অপরাধিনী মনে হয় ভিখারিণীটার পরিচয় না নেওয়ার জন্যে। কেন সেদিন তার 'রাজ' বলা শুনেও ও এগিয়ে যায়নি? সঙ্গিনীদের জেনে ফেলার ভয়ে অথবা কিসের সঙ্কোচে? ওই ছেলেটার জন্যে? না মা মরে গেছে বলেছিল বন্ধুদের, সেই জন্যে? অন্য কিছু সম্পর্কও তো বলতে পারতো?

রাজ বিনিদ্র চোখে শুয়ে শুয়ে ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় পরা ভিখারিণীর মুখটা স্পষ্ট

করে মনে করবার চেষ্টা করে। চোখে জল আসে। আবার কখন ঘুমিয়ে প'ড়ে সহসা আচম্‌কা জেগে ওঠে। মনে হয়, কি অন্যায় ক'রে ফেলেছে যেন। কখনও আর সে ভুল শুধরানো যাবে না। কিন্তু...।

৬

সেদিন একটা শনিবারের বিকাল। রাজ তেমনি আগে এসেছে, এদিক-ওদিক ঘুরছে।

সহসা পিছন থেকে তার কাঁধে হাত রাখল কে। ফিরে চেয়ে দেখলো, বরুণা।

বরুণা বললে, 'তোর কি হয়েছে রাজ,—কেবলই ঘুরে ঘুরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াস্ আজকাল। বাড়ীতে কিছু হয়েছে? না কোন দরকার পড়েছে! চল, একটু ওই ঘাসে বসি।'

রাজ শুকনো মুখে ঘাসে বসে। বরুণা বলে, 'খাবি কিছু?'

সে বললে, 'না, এবারে বাড়ী যাই।'

বরুণা বললে, 'একটু পরে যাব। সুজাতা আসুক। তার আগে তুই বল্ তো, কেন একলা যেন ভিখারী পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস। সেদিন দরিয়াগঞ্জে দেখলাম মন্দিরের সামনে। তার আগে কেল্লার ময়দানের সামনেও দেখেছি। কি হয়েছে বল্ তুই। কারুকে খুঁজছিস্ কি?'

এবারে রাজের চোখে জল এসে পড়ল। আত্মীয় নয় আপনজন কেউ নয় বটে, কিন্তু ওরা ওকে ভালবাসে, ইস্কুল থেকে চেনা-জানা। এক ক্লাসে পড়া বন্ধু। হয়ত ওকে একথা বলা যায়। ওরা তো আপনার লোক নয়, তাই বলা যায়। কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। শুধু দু'ফোঁটা জল এসে পড়ল চোখে।

বরুণা তার পিঠের ওপর হাত রেখে বললে, 'কি হয়েছে বল্ তুই। আমি কারুকে বলব না। বাড়ীতে গোলমাল হয়েছে?'

রাজ চোখ মুছে বললে, 'না, আজ নয় পরে বলব।'

বরুণা বললে, 'কারুকে খুঁজছিস্?'

রাজ ঘাড় নাড়লে।

'কাল থেকে আমিও তোর সঙ্গে যাব, একলা একলা ভিখিরী পাড়ায় ঘুরে বেড়াস-নি।'

এবারও রাজ শুধু ঘাড় নাড়লে।

সুজাতা এসে পড়ল, দু'জনেই চুপ করল।

পরদিন আবার বরুণা এসে রাজকে ধরল।

বললে, 'আজ কোথায় যাবি?'

রাজ একটু ভেবে বললে, 'চল, বিড়লা মন্দিরের দিকে যাই। তারপর তোদের কালীবাড়ির কাছে যাব।'

তার পরদিন যমুনার তীর, তার পরদিন হনুমানজীর মন্দির, যেখানে মনে হয় সেখানেই যায়, ছোট ছেলে সঙ্গে ভিখিরী মেয়ে দেখলে চকিত হয়ে এগিয়ে যায়, তারপর বিমনা-ভাবে ফিরে আসে।

দিল্লীর মন্দির-পাড়া, ভিখারি-পল্লী যেন আর বাকী রইল না।

সন্ধ্যাবেলা দু'জন ফিরে এসে কোনদিন কুইন্‌স্ পার্কের কোনখানে, কোনদিন আজমল খাঁ বাজারের দিকের প্রকাণ্ড পার্কে বসে পড়ে ক্লান্তভাবে।

ক'দিন গেল। এবারে সহসা বরুণা জিজ্ঞাসা করলে একদিন, 'রাজ, তুই কি সেই ভিখিরী মেয়েটাকে খুঁজছিস? যে তোকে 'রাজ' বলে ডাকল—আর ভিক্ষে নিল না?'

রাজ হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে নিল। কিছু বলতে পারল না।

বরুণা তার একটা হাত নিজের হাতে জড়িয়ে নিয়ে বললে, 'সেই মেয়েটাই ত? সে কি কেউ হয় তোর, রাজ? এক মাস হয়ে গেল, তাকেই খুঁজছিস্ ত? তাই না?'

রাজ মুখ গুঁজেই ঘাড় নাড়লে।

বরুণা বললে, 'কে সে? আমাকে বল, আমি কারুকে বলব না।'

রাজ তেমনিভাবেই মুখ না তুলে খুব আস্তে মৃদুস্বরে অনেকক্ষণ পরে বললে, 'মা।'

যে কথা কোন আপনার জনকে আজ অবধি বলেনি। বাপকেও নয়। কাকাদের ভাইবোনদেরও নয়—আজ বিদেশিনী বান্ধবীকে না ব'লে আর পারল না।

বরুণা স্তম্ভিত হয়ে গেল। 'মা?' একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'মা ত তোর নেই বলেছিলি?'

সে তেমনিভাবেই মুখ নীচু ক'রে বললে, 'ঠিক কথা বলিনি। ও আমার মা। সেদিন প্রথম ও দূরে ছিল আর আমিও তোদের অনেক পিছনে আসছিলাম, চিনতে পারিনি। পরে যখন ভিক্ষা নিতে এগিয়ে এসে বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করলে, তখনো অত বুঝতে পারিনি। খুব রোগা আর কালো হয়ে গেছে। খুব ভাল দেখতে ছিল আগে। তারপর যখন তোরা রাজ ব'লে ডাকলি, আর ও অবাক হয়ে যেন খুব আস্তে বললে, "আ মেরি রাজ। মেরি বিবি", বলতে বলতে পিছিয়ে গেল, আর ভিক্ষে নিল না, তখন একটু সন্দেহ হ'ল যেন। তখন আমাদের বাস্ এসে গেছে। আর আমরা দাঁড়ালাম না, সেও ত এগিয়ে এল না। রাত্রে বাড়িতে গিয়ে যেন সব স্পষ্ট মনে পড়ল।'

বরুণা বললে, 'কিন্তু মা কি লাহোর থেকে তখন তোদের সঙ্গে আসেনি?'

রাজ মুখ তুলল। বললে, 'মা কি গহনাপত্র আনতে বাড়ির ভিতর গিয়েছিলেন, আর আসতে পারেননি। লোকেরা ভয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল, তারপর আমরা ধরে নিয়েছিলাম, মা মারাই গেছেন দাঙ্গার সময়ে।'

'তা সেদিন কেন তখুনি বললি নে? তা'হলে ত বাড়ি নিয়ে যেতে পারতিস?'

রাজ চুপ করে রইল।

সহসা বরুণা যেন সন্দিগ্ধভাবে কি ভাবে। বললে, 'আর ঐ ছেলেটা? ওটা কে তোর? তোর ভাই?'

রাজ মাথা নাড়ল। শুধু বললে, 'আমার ভাই নয়।'

এবারে যেন কি একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল বরুণার কাছে। বরুণা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, 'তুই বোধহয় ঠিক চিনতে পারিসনি রাজ। তোর মা ও নয়।'

রাজ সে কথার জবাব দিল না। আর মনে মনে বরুণাও যেন জানে তার কথা ঠিক নয়।...

কিন্তু বরুণা আবার বলল, 'তুই তখন কত ছোট ছিলি—তোর কি আর মনে আছে মাকে? তোর নিশ্চয় ভুল হয়েছে। আর মা হ'লে ত চিনতে পেরে এগিয়ে আসত...।'

এবারে রাজ বললে, 'চিনতে পেরেছিল ব'লেই বোধ হয় আর এগিয়ে এল না।'

দু'জনেই যেন মনে মনে বুঝতে পারল কেন এগিয়ে এল না।

শীতের সন্ধ্যা। বাগান খালি হয়ে এসেছে। অন্ধকারও ঘনিয়ে এসেছে। গেটের ওপারে বাস্ এসে দাঁড়িয়েছে কয়েকটা। ওরাও বাগান থেকে বেরুল, নিজেদের বাস্ দেখে উঠে পড়ল।

নাববার সময় বরুণা বললে, 'আচ্ছা, কাল আবার খুঁজব।' তারপর সান্ত্বনার ভাবে বললে, 'কিন্তু ও তোর মা নিশ্চয়ই নয়।'

রাজ শীর্ণমুখে হাসল একটু। তার মন জানে, সে তার মা। আর জানে, তার খোঁজ আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না...। কেন যে পাওয়া যাবে না তাও যেন মন জানে।

রাজ বাড়ী ফিরল। কাজকর্ম সেরে শুতে কত রাত্রি হ'ল। তারপর নিঃশব্দে নিজের খাটিয়াতে শুয়ে পড়ল। নিষুতি ঘর। পাড়া শহরও ঘুমিয়ে পড়েছে যেন।

তার ঘুম আসে না। চোখের সামনে ভেসে আসে জীর্ণ মলিন সেলাওয়ার কামিজ পরা ছেঁড়া চুন্নী (ওড়না) মাথায়, দীন মিনতিভরা মুখ, ভিখারীর মতই শীর্ণ একটি ছোট ছেলের হাত ধরা সেই ভিখারিণীর। কতদিন ভিক্ষা করছে সে? কতদিন ভিক্ষা ক'রে তার মুখের হাসি-কথা এমন ভিখারীর মত হয়েছে?

কেনই বা ভিক্ষা করতে আরম্ভ করল? তার বাপের বাড়ী, রাজের মামার বাড়ীর সবাই ত কত বড়লোক! এখনও মা-র বাবা মা আছে। ভাইবোনও আছে কতজন। শ্বশুরবাড়ীর এদিকেও ত ওরা ছিল! কেন খোঁজ করে আসেনি? নিজের বাপের বাড়ীর ঠিকানা ত জানে সে। লুধিয়ানায় তাদের বাড়ী—খুব বড় বংশ।

'কেন'র কথা!—আর সে ভাবতে পারে না। সমস্ত ভাবনা যেন জটিল হয়ে ওঠে তার তরুণ মনের পক্ষে। মনে হয় বাবাকে বা কাকাদের কারুকে বলে এই কথা। কিন্তু তাঁরা যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন আগে বলনি?

কি বলবে সে? চিনতে পারেনি ঠিক! না...কি?

মনে পড়ে যায় সেই ছেলেটাকে। কি বলত ছেলেটার কথা? ছেলেটা কার? মা-র কি? মা কি আসতে পারত? তা হলে লুকিয়ে পড়ল কেন?

তা হ'লে ও কি মা নয়?....তাই হবে, তাই হবে বোধহয়। রাজ বেশ আশ্বস্ত হয় যেন মনে মনে।

কিন্তু তার মনের কোন্ অতলে শীর্ণ মলিন মুখ, জীর্ণ বিবর্ণ বেশবাস, দীন করুণ নেত্র একটি ভিখারিণী নারী একটি ছোট ছেলের হাত ধ'রে স্থির হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে কুইন্স্ পার্কের ঝোপের সামনে।

যে তার মা। আর যে ছেলেটা তার ভাই নয়।

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৬৮

আমি এম. পি.

পার্লামেণ্ট থেকে সবে ফিরেছি। দারোয়ান কুশল সিং একটা 'তার' নিয়ে এসে দাঁড়াল।
ছোট্ট খবর, 'মার অসুখ বাড়াবাড়ি।' ছোটভাই তার করেছে কলকাতা থেকে। যাওয়া দরকার কি এসো কিছুই বলেনি। ভাবতে বসি যাওয়া উচিত কিনা? যেতে হবে কিনা? মা'র আমি একমাত্র ছেলেও নই, আমার আরো চার ভাই আছে। আর আমি ছোটবেলা থেকেই মার কাছছাড়া বা বাড়িছাড়া। মাসীমার কাছে মানুষ হয়েছি। মেসোমশাই দিল্লীতে খুব বড় কাজ করতেন। বেশ বড়লোকই বলা যায়। আর আমার বাবা সামান্য কি কাজ করতেন কলকাতায় কোন্ আপিসে। আর বেশ বড় গেরস্ত। আমরা পাঁচ ভাই, তিন বোন। ঠাকুমা পিসিমাও ছিলেন বাড়িতে। বেজায় সেকেলে ধরনের বিব্রত পরিবার। দু-তিনখানা ঘরে কোনরকমে বস্তির মত একগাদা লোক নিয়ে থাকা। তারি মাঝে বোন-ভগ্নিপতিদের আসা যাওয়া। যেমন নোংরাভাবে থাকা তেমনি অভাবের সংসার ছিল।
সেই কবে? আমার দশ বছর বয়সে মাসীমা একবার কলকাতায় যান, আর আমাকে নিয়ে আসেন সেই সময়ে। তাঁর দুটি ছেলেমেয়ে ছিল। তবু মার ঝামেলার সংসার, আর আমাকে একটু ভালও বাসতেন। দেখতেও ভাল ছিলাম। লোকে বুদ্ধিমানও বলত। মাসীমা বলতেন, ছেলেটাকে আমায় দে, ভাল জায়গায় গেলে পড়াশোনা স্বাস্থ্য সব ভাল হবে। তোর তো আর পাঁচটি আছে...।
আজকের এই 'মানুষ' হওয়া 'এম্-পি' হওয়া সবই ওই মাসীমা মেসোমশাইয়ের দৌলতে। নইলে...।
সেই ছেলে বয়স থেকে হিন্দী পড়েছিলাম, শিখেছিলাম বলেই তো আজ এত সুযোগ-সুবিধা পেয়েছি বড় কাজ পাবার।
দিল্লীওয়ালাদের মত শেরওয়ানী চুড়ীদার (পাজামা) পরি। গান্ধী-টুপী পরি কপাল অবধি নামিয়ে। আর চোস্ত হিন্দী-উর্দূ বলি। বাঙালী বলে এখন লোকে বুঝতে পারে না। অবশ্য হয়ত ওসব ভেক। তা ভেক না হ'লে তো ভিখও মেলে না। তাছাড়া 'ভেকই' বা কেন বলি! সত্যি বলতে কি, ঐ নোংরা হুজুগে কলকাতা শহরটায় বাংলা দেশটায় সর্বক্ষণই হৈ-হুল্লোড়, সভা-সমিতি লেগেই আছে। মনে করতেও ভাল লাগে না।
মনে হল ভাগ্যিস্ মা মায়া করে আটকে রাখেননি। আর বাবাও অমত করেননি। করবেনই বা কি করে? আর করে হ'তই বা কি? অখাদ্য কুখাদ্য কুমড়োর ঘ্যাঁট, ঝিঙে কাঁচকলা কুচোচিংড়ীর 'উরসুন্নী' ঝোল দিয়ে ভাত খাইয়ে একটা ক্ষীণজীবী ভেতো বাঙালী করে মানুষ করে একটা চাকুরিতে ঢুকিয়ে দিতেন। আর আজ এক বোনের আঁতুড়ের, কাল ও-বোনের অসুখের, নয়ত ভাইদের পড়ার দায়দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হত। জানি তো বাংলাদেশের সেকেলে বাবা-মাদের।
মা-বাবা অবিশ্যি মনে মনে যেন একটু আশা করেছিলেন, মানুষ হয়ে একটু দেখাশোনা করব। তাঁরা আমার কাছে আসা-যাওয়া করবেন এক-আধবার। তা করিনি কি কিছু? বাবাকে মাসে ৩০/৪০ করে টাকা পাঠিয়েছি, যতদিন ছিলেন। মাকেও মাঝে মাঝে কখনো দিই। তা মার আর খরচটা কি? ওরাও তো চারজনে রোজগার করে। আমার

মত এত বেশী না হলেও। তা আমার স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং-এর জন্যে খরচের দায় অনেক...

তবে এই, আমাদের মধ্যে ওদের আনতে আর কখনো পারিনি। রেণু আমার স্ত্রী—আমার মত ঝামেলা গেঁয়ো সেকেলে ধরনের ঝঞ্ঝাট সইতে পারেন না। বড়লোকের মেয়ে। ওরকম কলকাতাই লৌকিকতা কখনও দেখেননি।

আবার 'তার'টার দিকে চোখ পড়ল। মার কথাতে মনে পড়ে গেল, চল্লিশ বছর আগে সেই আসবার দিন কুচোচিংড়ীর ঝোল দিয়ে মার কাছে গরম ভাত খেয়ে চলে এসেছিলাম। মার মুখে হাসি আর চোখটা যেন জলে ভেজা। হয়তো মন কেমন করছিল।

মনে পড়ল,—হ্যাঁ, ওরকম চিংড়ী কাঁচকলার ঝোল আর কিন্তু কোথাও খাইনি। মার মতন রান্না...।

কিন্তু আমার মন কেমন করেনি। নতুন জায়গায় আসব। রেল- গাড়িতে কতদূরে যাব। মাসীমার আদর যত্ন।

এসে মেসোমশাইয়ের ঐশ্বর্য দেখে অবাক হয়ে গেলাম। জীবনে ওসব দেখিনি। প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি, মোটর, দারোয়ান, মালী, চাকর, ঝি, ফ্রিজিডেয়ার, রেডিও, পাখা ঘরে ঘরে, ড্রয়িংরুম। লোকজন আসাযাওয়া।...

রেণু এসে দাঁড়ালেন, 'চা দিক! 'তার' কার?'

বললাম, 'মার অসুখ, নরু তার করেছে।'

'তা অসুখ বেশী?' রেণু বললেন।

বললাম, 'তার যখন করেছে অসুখ বেশীই।'

রেণু : 'তা কি করবে তাহলে?' বললাম, 'সেই তো ভাবছি কোথাও ট্রাঙ্ক কল করি, না কি করি! দেখ না, আর কারুর কাছে যদি খবর পাওয়া যায়। অসুখ বললেই ঠিক খবর কি হয়েছে না দিলে যাবেই কি করে?'

চিন্তিত ও বেজারভাবে বললাম, 'হ্যাঁ, দেখি নরেনের কি দাদার অফিসে 'তার'ই করি—কিংবা 'ট্রাঙ্ক কল'ই করে খবর নিই। দিনের বেলা ট্রাঙ্ক কল করাও মুস্কিলের ব্যাপার।'

২

জানি ওরা—ভাইরা আছে সবাই। ছিলও সবাই। তবু মনটাই কেমন হল, না লজ্জাই হল, কি কর্তব্যই মনে হল—কে জানে।

গিয়ে পড়লাম ঐ নোংরা হুজুগে শহরটায়। কলকাতা! লোকে যে কেন 'বাংলা দেশ' কলকাতা বলে মরে!

ট্রেনে নয়—প্লেনেই গেলাম। আবার সময়ের একটা দাম আছে তো। খরচ একটু হয় বেশী। তা ফার্স্ট ক্লাসেও তো কম যায় না।

এখন মুস্কিল। কোথায় উঠব। বাড়ীতে যাব, না হোটেলে উঠব। হোটেলে—সেটা কি ভাল দেখাবে? কিন্তু বাড়ীতে ঐ রোগের ঝামেলা আর ভিড়ের মাঝে। ছোট বাড়ী। নাওয়ার জায়গা নেই। হড়হড়ে পেছল শেওলাধরা উঠানে কলতলা। মনে পড়লে গা শিরশির করে।

যাক। ভেবেচিন্তে চৌরঙ্গীর এক হোটেলে জিনিসপত্র রেখে ট্যাক্সি করে বাড়ী গেলাম।

বাড়ীতে এক বাড়ী লোক। ছোট ছোট কালো কালো রোগা রোগা ময়লা জামা-কাপড়-পরা ছেলেমেয়েরা যেন চারদিকে কিলবিল করছে। কার যে এত ছেলেমেয়ে জানিও না। বোনেদের হবে। ভাইদেরও আছে বোধহয়।

সবাই আমাকে দেখে চকিত হয়ে উঠল। খুশীও হল। বোধহয় ভাবেনি আমি আসব। সেই বাবার কাজের সময় এসেছিলাম দু'দিনের জন্যে।

মা'র ঘরে ঢুকলাম। মা বাবার চৌকিটার ওপর শুয়ে আছেন। যতটা সম্ভব ঘরটা পরিষ্কার করে রেখেছে। তাকের ওপর অনেক ওষুধের শিশি। চৌকির তলায় একটা সেকেলে পিতলের পিকদানী 'কলঙ্কধরা' ময়লা। ছোটভাই একটা আধ-ময়লা গেরুয়া লুঙ্গী পরে মার টেম্পারেচার নিচ্ছিল। বড়দা দাঁড়িয়েছিলেন মা'র বিছানার পাশে। একটু নিচু হলাম নমস্কারের ভাবে।

বড়দা বললেন, 'আসতে পেরেছিস তাহলে। ছুটি পেলি? বোস্।'

চুপ করে রইলাম। হাজার হোক (কেন হাজার হোক ভাবলাম জানিনে) আমারও মা তো। আমার কি একটা কোনো কর্তব্যবুদ্ধি নেই? ছোটভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'জ্বর কত? কেমন আছেন?'

সে মৃদুস্বরে বললে, 'জ্বর রয়েছে।'

মা চোখ খুললেন। খুব ছোট্ট রোগা হয়ে গেছেন। কোটরে ঢোকা দুটি নিষ্প্রভ চোখ, আমাকে দেখে চিনতে পারলেন না। দশ-বারো বছর দেখেননি। ভাইদের দিকে চেয়ে বললেন, 'কে? ডাক্তার?' আমার চেহারা বদলেছে, মোটা ভারি ধরন হয়েছি বেশ।

সে বললে, 'না, মেজদা।'

মনে হল বিবর্ণ মুখ পাঙাস শুকনো সাদা ঠোঁটে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন। কণ্ঠার হাড় উঁচু হয়ে দেখা যাচ্ছে। চুলও সব পেকেছে।

একটা হাত একটু উঁচু করবার চেষ্টা করলেন। খুব আস্তে আস্তে বললেন, 'দীনু।' (আমার নাম দীনেন্দ্র।)

সেই যাবার দিনের ছোটবেলার চল্লিশ বছর আগের কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন মা এত বুড়ো হননি। কিন্তু সেদিনেও মার মুখে হাসি আর চোখে যেন জল ছিল।

মার হাতটা ধরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছ?'

মা হাতটা আমার মাথার কাছে আনবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। ভাই বুঝল, সে আমার মাথায় মার হাতটা ঠেকিয়ে দিল।

মার কত গর্বের কৃতী সন্তান আমি। কত সম্মানিত, বংশের মুখ উজ্জ্বল করা ছেলে— লোকে বলে। কত আনন্দ তাঁর—আমার সাফল্যে। মার নিষ্প্রভ চোখদু'টি একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল যেন।

এদিকে ওরা সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, কোথায় থাকব, খাওয়া-দাওয়া কিরকম হবে....।

মা-ও জিজ্ঞেস করলেন, 'খেয়েছিস?'

বললুম, 'হ্যাঁ চা-টা খেয়েছি।' কোথায় খেয়েছি তা আর বললাম না। বাইরে এসে ভাইদের বললুম, 'এখানে তো জায়গা নেই। সবাই এসেছে জানি। আমি হোটেলে উঠেছি তাই।'

ওরা নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু দুঃখিত হল কি? জানিনে। চুপ করে রইল সব।

৩

মাকে দেখতে যাই রোজ একবার করে। অফিসেরও কিছু কাজ করি। ক'দিন গেল। ভাবছি ফিরে যাই। বুড়োমানুষের অসুখ, একভাবেই আছেন।

হঠাৎ সেইদিন রাত্রেই ফোন এলো। মেজদা আসতে পারবে? মার অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়েছে।

গেলাম। মা মারা গেছেন আমি পৌঁছবার কয়েক মিনিট আগেই। চারদিকে একবার চেয়েছিলেন। জ্ঞান ছিল? ওরা বললে, ছিল মনে হয়। যা কিছু করবার দাদাই করলেন। করবেনও, তিনি বড় তো।

মেজদের নাকি কোনো নিয়ম নেই কাজকর্ম করার। বাড়ীতেই ওদের সঙ্গে হবিষ্যি করলাম।

দু'দিন গেল। বললাম, তাহলে আমি চলে যাই? ছুটিও তো সাতদিনের নিয়েছিলাম।

ভাইরা চুপ করে রইলেন। ক্রিয়াকাজ কি ভাবের হবে, আমি নিয়ম করব কিছুই তারা জিজ্ঞাসা করল না।

শুধু বড়দা বললেন, 'শ্রাদ্ধের সময় আসতে পারবি?'

আমি বললাম, 'কদিনে করবে? একমাস না দশদিনে?'

দাদা বললেন, 'একমাসেই হোক। বাবারও তাই করেছিলাম।' দশদিনে তো সবাই করেন না। খরচপত্র কিরকম করবেন ওঁরাও বললেন না, আমিও জিজ্ঞাসা করলাম না।

কেন জিজ্ঞাসা করলাম না? পাছে খরচের দায় ঘাড়ে নিতে হয়। বোন ভগ্নিপতিরা চলে গেছে। তারা কুটুম।

একবার মনে হল, আমিও চলে যাচ্ছি। আমি তো কুটুম নই? মনকে বললুম। তা কেন? আমার চাকরি কাজ, পার্লামেণ্ট আছে। সে দায়িত্বও তো আমার আছে একটা...।

দিল্লী এলাম। বাড়ীতে খবর দিয়েছিলাম।

রেণু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এক মাস ধরে নিয়ম পালন করতে হবে নাকি? তুমি সেখানে কি করলে?'

'সেখানে দু'দিন হবিষ্যি করেছিলাম ওদের সঙ্গে।'

সভ্য বন্ধু-বান্ধবরা এসেছিলেন দু-একজন।

বললেন, এখনকার দিনে অত কড়া করে নিয়ম আর কেউ মানে না। তুমি নিরামিষ খাও। হবিষ্যি-টবিষ্যি এসব সেকেলে লোকেরা করে। আর যস্মিন দেশে যদাচার। এদেশে ক্ষেত্রী বৈশ্যদের ঘরে আপনার লোকেরা সব রেঁধে খাবারদাবার পাঠায়। তাই সব খায়, এই নিয়ম। রেঁধেও দিয়ে যায় বাড়ী এসে, বল ত, আমরা না হয় পাঠাই দু-চারদিন। আর দশ দিনেই অশৌচ পালন করার কথা বললে না কেন? এখন তো প্রায় সকলেই দশ দিন করে নিয়েছে। তোমাদের বাড়ীর বড্ড গোঁড়ামী দেখছি। যা হোক, অত কঠোর নিয়ম করতে পারবে না এখানে। হবিষ্যি, কম্বলে শোয়া...।

রেণু খুশী হলেন। আমিও খুশী হলাম বোধহয়। রেণু মাকে বিয়ের সময় দেখেছিলেন মাত্র। আর সকলকেও তাই। কিন্তু আমি কেন খুশী হলাম?

কিন্তু ঝঞ্ঝাট তো আরো আছে। কামানো হবে না। দাড়ি গোঁফ চুলসুদ্ধ একটা বুনমানুষের চেহারা হবে এক মাসে। জুতা না হয় রবারের কি কাপড়ের পরব। কাছা গলায় দেওয়া আছে।

রেণু বললেন, আমি খালি গায়ে শাড়ী পরতে পারব না। মিসেস বোস বলছিলেন তিনি জামা সেমিজ পরতেন। আর সব নিয়ম তিনদিনই করেছিলেন ওঁর শ্বশুর মারা গেলে।

ভাবলাম বিদেশ তো। যা হোক, নিজেদের মত একটা ব্যবস্থা করে নেওয়াই সুবিধে।

কিন্তু মনে হল, এরা এদেশীরা কি করে নিজেদের দেশের মত নিয়ম মেনে চলে?...না, মানে না?...

৪

শ্রাদ্ধের দিন এসে পড়ল।

ঠিক করেছিলাম যাব না, গেলে তো খরচ আছে। তার চেয়ে টাকা পাঠিয়ে দেবো। যেতে যে খরচ হবে সেই টাকাটা শ'তিনেক দিলেই বেশ দেওয়া হবে। ওদের সাহায্যও হবে! ওদের?...

কিন্তু মনটায় কুরকুর করে—কোথায় যেন কুরুণী দিয়ে কোরানর মত। আমারো তো মা!

তা টাকা পাঠাচ্ছি তো। গেলে তো টাকাও দিতে হবে। ভাড়াও লাগবে।

কিন্তু পারলাম না থাকতে, মনটা যেন কেমন হল। মার সঙ্গে সম্পর্কটা এইবার একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাই? না লোকে কি বলবে? অথবা কর্তব্য?

শ্রাদ্ধের দিন সকালেই পৌঁছলাম। ওরা জানত না আসব। অবাক হয়ে গেল। টাকাও আগে পাঠাইনি। ওরাও তো চায়নি। আশাও করেনি টাকা পাবার কি আমার যাওয়ার। ওদের মনে অভিমান হয়েছিল? মারও কি মনে কোনো দুঃখ ছিল? আমাকে নিয়ে ওদের গর্বের অহঙ্কারের সীমা নেই....। কিন্তু মনে হয় ওরা আমাকে আপনার ভাবল না, না আমিই ওদের আপনার করলাম না? কি জন্যে? বড়লোক নয় বলে কি?...

কাছা গলায় দিয়ে গিয়েছিলাম হোটেল থেকে। পায়ে রবারের জুতো ছিল।

গিয়ে দেখলাম ওরা তিলকাঞ্চন করছে। বৃষোৎসর্গ কি করে আর করবে! খরচ বেশী হবে তো। বাবারও তো হয়নি। কিন্তু আমি তো তখন এতবড় কাজ করতাম না।

ভাইরা সব খালি গায়ে খালি পায়ে ঘুরছে। কম দামের শয্যা দিয়েছে। খাট-পালঙ্ক দিতে পারেনি। ষোড়শ করেছে একটাই। কমদামী বাসনের। তবে ব্রাহ্মণভোজন আত্মীয়-বন্ধুদের খাওয়াবার একটু ব্যবস্থা করেছে—মন্দ নয়। আমার দেওয়া তিন-শো'তে হয়তো আর একটু ভাল করে করতে পারতো ; আগে দিলে, কিন্তু ওরা তো ভাবেনি সে কথা। তা ওদের আটকায়নি দেখছি।

দাদার কাজ হলে—হঠাৎ দাদা ডাকলেন, 'দীনু, মাকে অন্নজলবস্ত্র দিবি আয়। বোস, উৎসর্গ কর।'

মাকে অন্নজলবস্ত্র? মা—মাকে আমি তো কিছুই বিশেষ করে কখনো দিইনি। আজ দোব? কি দোব? শ্রাদ্ধের আসরে কুশাসনে বসলাম। কুশের আংটি পরলাম। মন্ত্র বলতে

লাগলাম। বারবার বললেন পুরুতমশাই, এই অন্ন দিলাম, বস্ত্র দিলাম, জল দিলাম, শয্যা দিলাম—সব দিলাম। কত কি দিলাম।

মার কোটরে ঢোকা ঝাপসা চোখ, পাণ্ডাস মুখটা চোখের সামনে ভেসে এল যেন...। আমার চোখটা হঠাৎ ঝাপসা হয়ে গেল।

চোখটা মুছে ফেললাম। আবারো "যে জীবা অনলদগ্ধা" শুনতে শুনতে চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। এবারে দু'ফোঁটা জল চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো। হাত জোড়া থাকায় মুছতে পারলাম না।

আমার রোগা রোগা শ্যামবর্ণ ভায়েরা এদিকে ওদিকে ঘুরছিল—দাঁড়িয়েছিল। হয়তো তারা দেখতে পেল। অন্য লোকেও দেখতে পেল হয়ত।

আমার পরে তারাও একে একে অন্নজল দিলে মাকে। কিন্তু তাদের চোখ দিয়ে তো জল পড়ল না!

৫

দিল্লী ফিরলাম। আর দেশে যাওয়া হয়নি।

আরো কয়েক বছর কাটল। আমার খুব পদোন্নতি হয়েছে।

ঐশ্বর্যের—সুখের সীমা নেই। লোকজনের ভিড়ে এক মুহূর্ত অবকাশ নেই রেণুর আর আমার। লবীতে গুজব, এবারে নাকি আমার একটা উপমন্ত্রিত্ব পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। বড় মেয়ে বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছিলাম মা বেঁচে থাকতেই। ছোট ছেলেকে বিলেত পাঠালাম এবারে। মেয়েদুটিরই খুব ভাল বিয়ে দিয়েছি। কুটুম্ব সবাই এদিকের, জামাই বৌ সব।

নাঃ, মা কি ভাইদের তখন আনতে পারিনি। খরচও বটে আর ঐ সেকেলে ধরনের বাংলাদেশের মানুষ নিয়ে রেণুর বড্ড ঝঞ্ঝাট বাড়ত। আমার এদিকের বন্ধু ও ছেলেমেয়ে, রেণুদের বন্ধুও তো ছিল অনেক। তাই রেণুর বাবা মা (তাঁরা দিল্লীরই লোক, মেসোমশাইয়েরই ভাইঝি রেণু) বলেছিলেন, 'তাঁদের 'নমস্কারী' পাঠিও। মাকে না হয় গরদ দিও একটা।'

আমার জামাই মেয়ে ছেলের বৌকে মা আর ওঁরা কেউই দেখেননি।

ক'দিন ধরে শরীরটা খারাপ যাচ্ছে। কেউ বলছে প্রেসার। কেউ বলছে বেশী খাটুনি, ও কিছু নয়। বিশ্রাম নাও, ছুটি নাও বলছে সবাই।

বড় মেয়ে এসেছে দেখতে। জামাই দিল্লীতেই বড় কাজ করে। মেয়ের একটিমাত্র ছেলে। ছুটে এলো, বললো, 'দাদাজী নমস্তে। আব্ তবিয়ৎ কৈসী হ্যায়?'

হিন্দী শুনে হেসে তার হাত ধরে বললাম, 'ভালো। ঠিক হ্যায়। কিন্তু হিন্দীতে কেন বলছ?'

মেয়ে বললে, 'আমি আর ওকে বাংলা শেখাইনি। শিখে তো কোনো লাভ হবে না। ইংরেজী আর হিন্দীই শেখাচ্ছি ভাল করে। যাতে পরে কাজকর্মের চাকরি-বাকরির সুবিধা হয়। একেবারেই বাংলা জানে না। বাড়ীতেও হিন্দী কথাই কয়।'

রেণু ছিলেন। বললেন, 'শুধু শুধু বাংলা শিখে আর কি হবে? দরকারে তো লাগবে না। আর এইদিকেই থাকা হবে। ওদেশে আর যাচ্ছে কে?'

মেয়ে বললে, 'হ্যাঁ, যা তোমাদের বাংলা দেশ আর বাঙালী!'

ডাক্তারের মতে এখনো বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে। পারলে একটু বাইরে কোথাও যাওয়া ভালো। আগামী নির্বাচনের আগে চাঙ্গা হয়ে নিতে হবে। কোথায় যাব ভাবতে বসে সবাই। কেউ বলে বম্বে। কেউ বলে জব্বলপুর বা নাগপুর। কেউ বলে পাহাড়ে। আমি চুপ করে থাকি।

হঠাৎ মনে হল, দেশে যাই না? কতদিন যাইনি।

ছোটবেলার কথা, ভাই-বোন মা-বাবার কথা মনে পড়তে লাগল। নানারকম কথা, বন্ধুদের কথা, সেকালের গান মনে পড়তে লাগল। তখন স্বদেশীর যুগ। আমি তখন মোটেই বড় হইনি। কিন্তু সব যেন কেমন করে ছবির মত চোখের সামনে ভেসে এলো। সুরের গুঞ্জন কানের মাঝে ভেসে আসতে লাগল। "সুজলাং সুফলাং....ধরণীং ভরণীং মাতরম্।" আমার 'সোনার বাংলা' 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি'...। আমরা শুনেছি। বেসুরো বেতাল গলায় গেয়েছি। দিল্লীতেই কতকাল পরে শুনেছি, হ্যাঁ 'আ মরি বাংলা ভাষা।' তখন 'আ মরি' মনে হয়নি মোটেই বাংলা ভাষাকে। হঠাৎ মনে হল মেয়ের কথা—ওরা ছেলেমেয়েদের আর বাংলা শেখাবে না।

তা আমি? নিজের কথা কেন যেন ভাবতে ইচ্ছে হল না।

রেণু আর ছেলেমেয়েরা সব সন্ধেবেলা এসে বসলেন।

বললাম, 'ভাবছি কতদিন তো দেশের দিকে যাইনি, সেই মার অসুখে গিয়েছিলাম। দেশে গেলে কেমন হয়। জায়গাও বদল হয়, দেশে যাওয়াও হয়। ভাইদের সঙ্গেও দেখা হয়।'

দেশ? বাংলা দেশ! রেণু অবাক হয়ে গেলেন। ছেলেও আশ্চর্য হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে ছেলে বললে, 'ঐ পচা নোংরা বাংলা দেশে কোনখানে যাবেন? কলকাতা? ঐ ভিড় হৈ-হৈ হুজুগ! আর কোনখানে বা যাবার মত সেখানে জায়গা আছে? যেখানে আপনার শরীর সারবে—বিশ্রাম হবে?'

রেণু অবাক হয়ে খানিকক্ষণ আর কথা বলতে পারেননি। এবারে বললেন, 'দেশে— তা ইচ্ছে হয় তো তুমি যাবে বৈকি! ওখানে হ'লে আমি কিন্তু যাব না। কার কাছে উঠবে? হোটেলেই উঠবে তো? আর সেখানকার খাওয়া-দাওয়ার যেমন ছিরি, তেমনি জলবাতাসও!'

'তোমার এত নিয়মের এতদিনের পশ্চিমে থাকা শরীর...সইবে কি?'

বললাম, 'আমার ছোটবেলার দেশ তো—সইবে না কেন? রিটায়ার করে তো দেশেই ছোট বাড়ীঘর একটু করব ভাবছিলাম।'

এবারে দু'জনেই হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তারপর রেণু বললেন, 'আর এখানকার এতবড় বাড়ীঘর?'

'ছেলেরা থাকবে। ইচ্ছে হয় তুমিও থাকতে পারবে।'

রেণু : 'ওঃ! সব ঠিক করে রেখেছ। তা যা খুশী কর।' রেণু উঠে গেলেন। বুঝলাম বিরক্ত আর আশ্চর্য হয়েছে। হবারই কথা। কোনোদিন তো দেশের কথা বলতে শোনে-নি।

৬

চুপ করে শুয়ে ভাবি। উপমন্ত্রিত্ব পাবার খুব গুজব। ছেলেমেয়েরা, রেণু খুব খুশী ও ব্যস্ত।

আর দেশের কথা যাবার কথা তুলিনি। যখন রেণু যাবেন না।

একদিন বিকেলে এসে ছেলে বললে, 'বোম্বেতে যাওয়া ঠিক করেছি আমরা।'

মারও তাই ইচ্ছে। মার কে বন্ধুও আছেন মিসেস রায়। আর পার্শী গুজরাটী মারাঠী বন্ধুও তো আমাদের অনেক আছেন। তা ছাড়া ডাক্তারও চেনাজানা আছেন।

'দেশে যাওয়াতে মারও ইচ্ছে নেই, আমাদেরও মনে হয় ঠিক সুবিধা হবে না।' সহাস্য প্রসন্নভাবে রেণু বললেন, 'আর যেখানে এতকাল আছি সেই তো দেশ। দেশের কি আবার হাত পা মুখ আছে নাকি আলাদা করে!'

হাসিমুখে মেয়েও বললে, 'সব ভারতবর্ষটাই তো আমাদের দেশ এখন বাবা। সবাই বলেন।' ওরা বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে নানা জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল। রেণু প্রথমে যাবেন। আমি ভাল থাকলে রেণু ফিরে এসে বৌমাকে আর মেয়েদের পাঠাবেন। বৌমা বোম্বাই দেখেননি। কত জায়গা আছে দেখবার বেড়াবার—'ইণ্ডিয়া গেট' সমুদ্রতীরে 'জুহু', 'তাজমহল হোটেল....'। ছেলে মাঝে মাঝে যাবে। নোংরা বাঙালী পাড়া 'দাদার', তাও যাবে। তাহলে ওরাও মাঝে মাঝে বাঙালীকে মনে করে। আমার নিজেরই কথা মনে পড়ে গেল।

আমি সেরে-টেরে ফিরে এলে নির্বাচনের তোড়জোড়-এ নামবো। কিন্তু আমি তো নির্বাচিত নই। আমি তো 'মনোনীত' পদে আছি, তা তারও তো তদ্বির আছে। কথা সেরে ওরা চলে গেল খুশী মনে নিশ্চিন্ত হয়ে।

মেয়ের কথা মনে পড়ল। কথাটা মন্দ নয়। পণ্ডিতজীরই উক্তি বোধ হয়। হ্যাঁ, আসমুদ্র হিমাচল, (অখণ্ড নয়) খণ্ডিত ভারতবর্ষ সবটাই আমার দেশ! সবটাই! এবং আমি ভারতবাসী!

এবং সেই দেশেরই আমি এম. পি.।

তা অত বড় দেশে তো বাস করা যায় না। তাই ছোট দিল্লী শহরটিই এখন আমার স্বদেশ। সকলেরই 'কেন্দ্রীভূত দেশ'।

যেন ব্রহ্মক্ষেত্র। যে ব্রহ্মবিন্দু থেকেই সব উৎপত্তি ধারণ ও লয় হচ্ছে। কিন্তু আমিও সেই বিন্দুতে অধিষ্ঠিত।

হয়ত সেখানে মন্ত্রী হব। লাভ? লাভ রেণু মন্ত্রীর স্ত্রী হবেন। অনেক মালা অনেক সম্মান পাবেন। হয়ত ছোটখাটো দ্বারোদ্‌ঘাটন, ভিত্তিস্থাপনে আমার পাশে দাঁড়াবেন। ছেলেমেয়েরা মন্ত্রীর পুত্রকন্যা হ'বে। অনেক প্রতিষ্ঠা ক্ষমতা পাব। বর্তমান ভবিষ্যৎও আছে তো।

তারপর? তারপরে কি জানিনে। মনে পড়ে গেল হিন্দীতে তিনটি পরীক্ষা আছে রতনভূষণ, আরও একটা কি। তা পাস করেছিলাম।

হয়ত তারি মত একটা ভূষণ বা বিভূষণে ভূষিত হব। এমন অবস্থায় নিজের দেশকে দেশ ভাবা তো প্রাদেশিকতাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু ওঁরা? অন্য প্রদেশীয়রা? বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ, আসাম, উড়িষ্যা, বম্বে? ওঁরা কি ভাবেন?

নাঃ, সে কথায় আমার দরকার নেই। তবু...। এখনো বাংলা ভুলিনি তাই শুধু কথামালার একটা গল্প মনে হয়ে গেল। শেরওয়ানী আচকান (চুড়িদার) টুপিটা কি গায়ে ঠিক মানিয়েছে? ক'পুরুষ মানাবে কে জানে?

পঞ্চাশোর্ধ্বে

শাস্ত্রকাররা জানতেন, মানুষের কোন্ সময় কি লাগে, কি করা উচিত, কি উচিত নয়. তাই এক একটি শ্লোকের মাঝে সমস্ত মানুষের জীবনের কর্মপদ্ধতি ছকে দিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের নিজের বুদ্ধিকেই বড় আর বেশী মনে করার অভ্যাসও তো কম নয়, কাজেই সে বুদ্ধির খাল কেটে সে নিজের ঘরে কুমীর ডেকেই আনে। এও দেখা যায়।

তাই দেখা গেল, চাটুয্যেদের বাড়ির গিন্নি 'পঞ্চাশোর্ধ্বে' বনে মানে তীর্থে তীর্থে কিম্বা গ্রামের বাড়িতে যাবার নামটি করলেন না! অথবা হরিনামের মালা নিয়ে আরেকটু আগের কালের মতও ঘরের কোণে বসে রইলেন না! বরং যেমন সধবা অবস্থায় কর্তার রোজগারে কর্তৃত্বের আসনে (টাকার সুদ এখনো কর্তারই) প্রতাপান্বিতার ভূমিকায় সংসার পরিদর্শন করতেন, তাই করতে লাগলেন।

কেন না করবেন? লোকে বলে আহা, সতুর মা—রত্নগর্ভা! তিনটি ছেলে যেমন, মেয়েরা তেমনি, জামাইরাও তেমনি! বড় ছেলে কোন ব্যাঙ্কের বড় কর্তা, মেজ ডাক্তার, সেজ সরকারী বড় কাজ করে। জামাইরাও বড় বড় কাজ নিয়ে আছেন—ডাক্তার, উকিল, জমিদার একজন।

কিন্তু রত্নগর্ভা হলেন না হয়, সবই না হয় ভালোও, উত্তরকাল বলে একটা কথা আছে তো। উত্তর পুরুষ না হয় মাকে সহ্য করল, 'উত্তর নারী'রা বড়ই বিপদে পড়ল—গিন্নীকে বা বুড়িকে নিয়ে! শ্বশুর থাকতে তাঁর টাকা, তাঁর কর্তৃত্ব সহ্য করতে হয়েছে না হয়, কিন্তু এখনো শাকের ঘন্ট, মোচার ঘন্ট, কপি বেগুন পটলে খামকা কর্তৃত্ব সহ্য করা ভাল লাগে না। এখন আবার সব রান্নাঘর আলাদা হয়েছে।

সকালবেলাই বড়বৌমার তরকারীর ঝুড়ি নিয়ে বসে খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে সতু কবে কি ভালবাসত তাই কুটতে বসবেন। কুটি কুটি করে যা ইচ্ছে কুটে কেটে সব প্রায় জঞ্জাল বানিয়ে দেবেন। যদি তাও সহ্য হয়, বৌমার মাছ নিয়ে যা তা রাঁধতে বলে দেওয়া নিজের মতে, এ যেন আর পারা যায় না। কবে ওঁর সতু কি ভালবাসত তাকি আজো বাসে? না, রোজই তাই খাবে? বড়বৌমা তিক্ত-মুখে বিরস হাসি নিয়ে ঘুরে বেড়ান। কিছু বলাও তো যায় না।

মেজবৌমার ঘরেও ঢোকেন। সে আবার ডাক্তারের বৌ, তার ঘরে কিছুতে হাত দিলেই বলে, সাবান দিয়ে গরম জল দিয়ে তরকারী ফলগুলো ধুয়ে নিতে হবে। তারপর কোটা হবে।

ধোয়া হলে মা বলেন, 'কি কুটবো আরো? এই বেগুনের পুরেভাজা আর শুক্ত কুটলাম। সমর ভালবাসে। মাছে সর্ষে দিয়ে ঝাল করুক?'

মেজবৌমা চায়ের টেবিল থেকে উঠে এলেন, 'কি কাণ্ড মা? আর অত শুক্ত কে খাবে? আলুগুলো সব ছাড়িয়ে ফেললেন? আমার যে সব 'জ্যাকেট' সুদ্ধু আলুসেদ্ধর দরকার ছিল বিকেলের চপের জন্য। কি মুস্কিল এখন! সর্ষেবাটা ওঁর সহ্য হয় না, কেন দিলেন করতে!'

'জ্যাকেট' সুদ্ধু? জ্যাকেট সুদ্ধু আলু কি বাছা?' মা চোখ বড় করে জিজ্ঞাসা করলেন। ওঁদের কালে 'জ্যাকেট' মানে জামা জানতেন!

ঐ খোসাসুদ্ধ আলুকে মেজবৌমা 'জ্যাকেট' সুদ্ধ আলু বলেন। স্বামীর ভাষার অনুকরণে। খোসাসুদ্ধ বলেন না। যাকগে, আবার চাকরকে বাজার পাঠালেন আলুর জন্য।

'আর সর্ষেবাটা দেওয়া ইলিস মাছ সমর এত ভালবাসত। এই তো সেদিনও খেয়েছে। কবে থেকে আবার সহ্য হচ্ছে না?' মা চোখ কপালে তুলেই জিজ্ঞাসা করলেন।

ডাক্তার-গৃহিণী বৌমা বল্লেন, 'ঐ সব খাইয়েই তো হজমটা গেছে। আপনারা তো ওসব বোঝেন না। ছেলেদের শরীর!' মা অবাক, মা ছেলেদের শরীর বোঝেননি? উনি মা তো বটে!

ছোট বা সেজবৌমার ঘরে তরকারী কাটা হয়ে গেছে। রান্নাও চড়ে গেছে। সে আবার খুব চতুর, দিদিদের বা জায়েদের ঘরে নিত্য ও নৈমিত্তিক গোলমাল দেখে রাত্রেই তরকারী কুটে সব ব্যবস্থা করে রাখে। শাশুড়ীকে মিষ্টি হেসে বলে, 'এই হয়ে গেছে মা সব। আপিসের তাড়া কিনা।' মা বিরক্ত মুখে রান্নাঘরের মাঝে ঘুরে আসেন। মাছ দেখেন। 'এত মাছ আনিয়েছ তা সবই একরকম কেন করাচ্ছ? রোজই ঝোল কেন দাও? অন্য কিছুও তো করতে পার বাছা। কোন ছিরি-ছাঁদ নেই কাজের তোমাদের।'

ছেলে এসে পড়লেন খেতে, 'দাও দাও, খাবার দিতে বল।'

অবগুণ্ঠন আর আজকাল নেই, বৌও এসে দাঁড়ালেন। মা এসে দাঁড়ালেন খাবার জায়গায়। ইচ্ছা, বলেন বৌদের ব্যবস্থায় কত ত্রুটি, খরচ হয়, ব্যবস্থা হয় না ইত্যাদি...!

বল্লেন, 'অমন মাছ, রোজই একঘেয়ে রাঁধছে! আর তরকারীটা কি রাঁধাই রেঁধেছে! একটু দেখিয়ে দিতে পারেনি বৌমা? কাঁচকলার ঝোল কড়ায় রেঁধেছে, কালির মত কালো রং! এ খেতে পারে ওরা? না কখনো এমন খেয়েছে!'

ছেলে খুব ব্যস্ত। বল্লেন, 'বেশ হয়েছে মা। এতরকমের দরকার কি? ভালই তো ব্যবস্থা করছে। আমার এইরকমই ভালো লাগে। ঝোল তো ভালই হয়েছে।'

মা থ' হয়ে গেলেন। কোনদিন ছোটবেলায় বা বড় বেলায়ও নরেন রোজ একরকমের মাছ আর কালো ঝুল ঝোল দিয়ে ভাত খেত না। রাঁধুনির সঙ্গে নিত্য গোলমাল লেগেই থাকত। আর আজ বল্লে, 'আমার এইরকমই ভালো লাগে!'

তিনঘরেই সমান। মা আর 'হালে পানি' পান না। যেন সব গৃহিণীপনা কাজকর্ম আরেক রকম ধরণের হয়ে গেছে। এই একবছর মাত্তর কর্তা মারা গেছেন, তারি মাঝে। যখন উনি শোকার্ত ছিলেন, ভাবতেন ওদের কত অসুবিধা হচ্ছে—বৌমারা কি তেমন জানেন ওদের রুচিমত রান্না খাওয়া!

কিন্তু চূড়ান্ত আক্কেল হল যেদিন এক বৌমা বল্লেন, 'ওঁর জন্য কি রাঁধতে দিয়েছেন মা?'

মা একটু অবাক ও বিরক্ত হয়ে বল্লেন, 'যা ভালবাসে তাই তো কুটে দিয়েছি বাছা!'

বধূমাতা বল্লেন, 'বলছিলেন বড় একঘেয়ে রান্নার ব্যবস্থা হচ্ছে আজকাল...। তুমি একটু দেখেশুনে বলে দাও না কেন?'

যতই সন্তানের উপর জোর থাক্, তাকে জানা থাক্, সেই যখন এই কথা বলে, মা হতবুদ্ধি হয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু লজ্জিত হতেও বাধ্য।

এখন মা সকালে তরকারীর ঝুড়ি নিয়ে বসেন, কোটেন না। জিজ্ঞাসা করে কোটেন। যদিও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় না। যেন মনে হয় 'অনুমতি' নিয়ে কুটনো কুটতে

হবে! দেখ একবার! আমি জানি না আমার ছেলেরা কি খায়, কি ভালবাসে! কখনো মনে দুঃখ হয়, কখনো রেগে যান, তবু কাজ করতে যাওয়া, আদেশ উপদেশ দেওয়ার পুরানো অভ্যাস যায় না।

২

কাছাকাছি বাগবাজারে এক ননদ থাকেন। তিনিও বিধবা। মাঝে মাঝে আসেন, সুখ-দুঃখের নানা কথা হয়। তাঁর সংসারও পুত্র-পৌত্রাদি বেষ্টিত। বৌমারা এই ধরণেরই আধুনিক ; তবে তিনি বহুদিন পূর্বে নাবালক সন্তান নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন। এই প্রতাপান্বিতা ভ্রাতৃজায়ার কাছে (মায়ের আমলে) কিছুদিন ছিলেনও। সংসারযাত্রার রকম বেরকম তাঁর কিছু বেশী দেখা আছে এবং যাকে বলে 'মনরাখা' মন যুগিয়ে চলা তাও তাঁর কিছুটা অভ্যাস ছিল। সুতরাং বধূমাতাদের পরোক্ষভাবে কর্তৃত্ব তাঁর খুব অসহ্য হ'ত না।

ঠাকুরঝি এলেন একদিন দুপুরবেলা।

গল্প গুজব নানা কথায় সময় কাটে। ননদের চোখে পড়ে ভাজের বিমনা ধরণের ভাব, যেন সেই চারি-চৌপাটে স্বয়ংসিদ্ধা ভাবটি আর নেই।

বধূমাতারা ঘরে ঘরে ফ্যানের তলায় বিশ্রামরতা। নাতি-নাতনীরা স্কুল কলেজে, পুত্রগণ কর্মক্ষেত্রে, ডাক্তারজন বাদে।

মা নিজের ঘরে মাদুরে শুয়ে একখানি বই খুলে বসেছেন। খুব সেকেলে মতো ন'ন, ঠিক ভাগবত রামায়ণ মহাভারতের মত ধর্মগ্রন্থ নয়।

কিন্তু বইটিতে মন নেই। চোখটা দুপুরের আকাশের চিলের দিকে চেয়ে আছে। বইখানা আঙ্গুল দিয়ে চিহ্ন করা রয়েছে শুধু। অনেকগুলো চিল একসঙ্গে সাদা মেঘের পাশেই যেন উড়ে বেড়াচ্ছে। ননদ এসে বসলেন। ভাজ উঠে বসলেন, বললেন, 'এসো এসো। —মাদুরে উঠে বোসো, অনেকদিন আসনি এবারে। ভাল তো সব?'

ভাজের চোখের কোলে শুয়ে থেকে দু'ফোঁটা জল এসেছিল কি? তিনি চোখটা মুছে মাদুরে জায়গা করে দিলেন এবং এই কথাগুলি বললেন।

ঠাকুরঝির সুচতুর দৃষ্টি ভাজের বই নিয়ে শুয়ে আকাশের চিল-দর্শন এড়ায়নি। মুখের ভাবটা যেন বেশ বিমনা। বললেন, 'হ্যাঁ ভাই, সব ভালো তোমাদের কল্যাণে। তোমার মুখটা যেন দেখছি বড় শুকনো শুকনো। শরীর ভাল নেই?'

মন ভাল নেই চট্ করে জিজ্ঞাসা করা যায় না। কি জানি কি ভাববেন বৌদি। যদিও বেশ বোঝা যাচ্ছে বিমনা ভাবটা শরীরের নয়, মনেরই ব্যাপার।

ভাজও সুচতুরা। বললেন, 'শরীর ভালই ভাই। তবে আমাদের জীবনে ভালমন্দ নতুন আর কি বল। এই আছি মাত্র। বুড়ো বয়সে তোমার ভাই একেবারে সব শূন্য করে দিয়ে গেছেন।'

ননদ বললেন, 'সত্যিই তো। তা বেঁচে থাক ছেলেপিলে, ওরা তো 'মা' বলতে প্রাণ বের করে দিত। তোমার আবার ভাবনা কি? বৌমারা হাতে হাতে মুখে মুখে কাজ করতে এগিয়ে থাকতেন। নাতি-নাতনীতে জাজ্বল্যমান তোমার সংসার। আর একদিন তো একজন যাবেই, ভাই আমার কথা ভেবে দেখ না, সেই কবে বিধবা হয়েছি, আজো মরণ নেই, যেন চিরকালই বিধবা হয়েই কাটল।'

ননদ চোখ মুছলেন।

ভাজেরও চোখ সজল হয়ে এলো। ননদের যে দুঃখের কথা আগে কখনো অনুভব করেননি, সহসা তার সর্বশূন্যতার একটা রিক্ত রূপ আজ যেন দেখতে পেলেন। তারও সন্তানাদি আছে মানুষও হয়েছে, সাংসারিক কোনো দুঃখই আর নেই। তবে? এ কি দুঃখ? কেন এই রিক্ততা? শুধু কি স্বামীর অভাবে, না কি জন্য?

অবচেতন মনের ভিতরের কোন কারণেই হোক বা অকারণেই হোক দুজনেই খানিকটা চোখের জল ফেললেন। দু'চারটি কথা বললেন স্বর্গীয়দের সম্বন্ধে। ভগবানের কঠিন হৃদয়তা সম্বন্ধে। মোট কথা, তাঁদের বক্তব্য একটিই ছিল যে, নিজেরা আগে না মরে, কেন কর্তাদের এইভাবে মৃত্যু হয়? মেয়েরা কেন এতদিন বাঁচে! (মেয়েরা যে তাদের কর্তাদের চেয়ে স্বভাবতঃই বয়সে ছোট এবং ক্ষয়হীন নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করে তা জানা সত্ত্বেও এই দুঃখ আর তাঁদের যায় না।)

বিকাল হয়ে গেলো। ছেলেরা কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরলেন, পৌত্র-পৌত্রীরা স্কুল কলেজ থেকে।

ভাজ একটু নড়েচড়ে বসলেন। যেন উঠি-উঠি ভাব।

ননদ বল্লেন, 'উঠবে নাকি? ওদের খাবার দেবে তুমি? চল যাই দেখিগে, খাবার করা আছে তো?'

ভাজ বল্লেন, 'হ্যাঁ, খাবার সব করাই থাকে। এখন তো বৌমারা নিজেদের ঘরে-ঘরেই খাবার করেন কিনা। আমি আর খাবার-দাবার দিই না।'

ননদ মুখব্যাদান করে বল্লেন, 'ওঃ, ওরা ভেন্ন হয়েছে! অনেকদিন আসিনি কিনা। তা এখন আর ঠাকুর নেই? তা তোমার রান্না কে করে? তুমিই কর?'

'ঠাকুর আছে বড়বৌমার। মেজ'র ঘরে চাকর রান্না করে। সেজ আপনি করে নেয়। আর আমার কে আর করবে, নিজেই ওই ভাঁড়ারের এক কোণে দুটো সেদ্ধ করে নিই।'

'ওমা। তা ওরা তিনজনের একজনও পারে না? তা বড়বৌমার তো ঠাকুর রয়েছে, তবু পারে না?'

বড়বৌমা এসে দাঁড়ালেন। কথাটা কানে প্রবেশ করেছিল। মা অপ্রতিভ। ননদও চুপ করলেন।

বড়বৌমা ভক্তিভরে পিস-শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিলেন, বল্লেন, 'কখন এসেছেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, টের পাইনি।' তারপর পিসিমার কথার খেই ধরে বল্লেন, 'মার রান্নার কথা বলছেন বুঝি? ক'মাস তো করে দিলাম বাবা যাওয়ার পর, তারপর এমন মাথার অসুখ হল! সে তো মা জানেন। আর আগুন-তাত সইতে পারলাম না। তা মেজবৌ-সেজবৌও তো করতে পারে! ওদের আর কি কাজ! আমার তো শরীরে সহ্য হয় না তাই। নইলে...।'

মেজবৌমা, সেজবৌমাও রঙ্গমঞ্চে এসে পড়েছিলেন। বড়বৌমার মন্তব্য তাঁদের কানে প্রবেশ করেছিল।

মেজবৌমা বল্লেন, 'আমরাও তো ক'মাস রেঁধে দিয়েছিলাম। তারপর আমি ভাইয়ের বিয়েতে বাপের বাড়ি গেলাম, এসে দেখি মা-ই রান্না করছেন। দিদি রান্নাঘরে উঁকিও

মারেন না। সেজবৌ'র না হয় কচি ছেলে', মেজবৌ বড়জা'র দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দু'কথা শুনে থাকার পাত্রী তিনি ন'ন।

পরিস্থিতিটা এখন ঘোরালো হয়ে উঠল। জননী বল্লেন, 'ছেলেদের খাবার দিচ্ছি? কোথায় সব?'

পিসিমা বল্লেন, 'হ্যাঁ অনেকদিন ওদের দেখিনি—চল না যাই খাবার ঘরে।' উঠে দাঁড়ালেন।

'এখন তো ঘরে ঘরে নিজেদের টেবিলে খায়। আগের খাবার ঘরে কেউ খায় না।'

বৌমারা গম্ভীর মুখে প্রস্থান করলেন।

কথার হেরফেরে পড়ে গিয়ে ননদ-ভাজ খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে রইলেন।

দুজনেই বুঝতে পারলেন কথাটার জের অনেক দূর গড়াবে।

৩

পরদিন সকালে তিন বৌ স্নান করে শাশুড়ীর রান্নাঘরে এলেন। মেজবৌমা শিলনোড়া পেতে বসলেন। বড়বৌ ডাল চড়ালেন। সেজবৌ তরকারীর ঝুড়ি নিয়ে বসলেন।

শাশুড়ী তেতলার পূজার ঘর থেকে আহ্নিক সেরে এসে দেখে অবাক ও অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

অপরাধিনীর মত বল্লেন, 'তোমরা সকলে মিলে এখানে কেন? আমি তো অত তরকারী ডাল রাঁধি না। বাটনাও লাগে না আমার বেশী। কেন এসব করছ, ছেলেদের আপিস ইস্কুলের সময় একি উল্টো কাজ করতে এলে।'

বড়বৌমা তিক্তমুখে ফোঁস করে উঠলেন, 'ওঁদের তো আসবার দরকার ছিল না, ওঁরা এলেন কেন। কথা তো আমাকেই শুনতে হয়, আমিই কাজ করব। কাল পিসিমার কাছে সাত কথা শুনেছি—আবার কোন্‌দিন মাসীমা, জ্যেঠিমারা এসে দশকথা বলে যাবেন! কি জানি বাপু, আমরা ভাবি একটা মানুষের এই একমুঠো হবিষ্যি, তার জন্য এত কথাবার্তা কিসের! আমাদের বাড়িতেও তো ঠাকুমারা নিজেরাই করতেন দেখেছি।'

ছেলেরা খাবার ঘরে এসে টেবিলে বৌয়েদের না দেখে জননীর ঘরে এলেন।

বড় ছেলে বল্লেন, 'কি হচ্ছে তোমাদের এখানে? আমার যে আপিসের কাপড় বের করে দিতে হবে, এখনো ভাত দেয়নি ঠাকুর! সন্তুর কলেজের সময় হয়ে গেছে।'

মেজ ছেলে একটু উঁকি মেরে দেখে গেলেন, বল্লেন, 'আজ মার কপাল ফিরেছে, বড় বৌ রান্না করছেন!'

বড়বৌমা দুম করে হাঁড়ি-কড়া নামিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'সব সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না মেজ-ঠাকুরপো, আমরা কি কাজ করি না?'

তারপর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর ফিরে আসবেন কিনা কারুর জিজ্ঞাসা করার ভরসা হল না।

অপরাধিনী জননী তিন তাল হলুদ-লঙ্কা-ধনেবাটা এবং অর্ধসিদ্ধ ডাল, আধোয়া চাল, কাঁচা তরকারীর স্তূপের মাঝে নীরবে বসে রইলেন কিছুক্ষণ।

তারপর অন্য বধূদের বল্লেন, 'তোমরা নিজের কাজ করগে, আমি করে নিচ্ছি আমার রান্না।'

বিকেলবেলা ননদ এলেন। ভাজ আজ চিল দেখছিলেন না, চুপ করে বসেছিলেন।

ননদ বল্লেন, 'বৌ, কথা শুনতে যাবে?'

ভাজ বল্লেন, 'কোথায়––'

'এই অন্নপূর্ণার মন্দিরে। আমার বাড়ির কাছে। বড়বৌমার কি হয়েছে? মাথায় পটি বেঁধে শুয়ে আছে, খায়নি, বল্লে সেজবৌমা। বল্লে, মাথা ধরেছে জ্বর হয়েছে একটু!'

'খায়নি? তা তো জানি না, আজ তো আর এদিকে আসেনি। আমার রান্নাঘরে একবার এসেছিল। চল, দেখে আসি।'

অপ্রতিভ জননী ও পিসিমা বড়বৌমার ঘরে গেলেন। মেয়ে স্কুল থেকে এসে মাথায় জলপটি দিচ্ছে। দুই জা' কাছে বসে আছে। মৃদুস্বরে কথা কইছে।

পিতামহী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে মিতু?'

সুমিতা বল্লে, 'মার তো আগুন-তাত সহ্য হয় না। আজকে রান্না করতে মাথায় আঁচ লেগে খুব মাথা ধরে উঠেছে। কিছুই খেতে পারেননি। হাতে-ভাতে করেছিলেন মাত্র। আজ ভাল মাছ আনিয়েছিলেন, তাও খাওয়া হয়নি। তা ঠাকুর গুছিয়ে রেখে দিয়েছে। বল্লে, মা বিকেলবেলা উঠবেন, তখন তাড়াতাড়ি রেঁধে খাইয়ে দেবে।'

ঘর নিঃশব্দ। নিরপরাধ অপরাধিনী মা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেও পারছেন না, বসে থাকাও শক্ত। খামকা রান্নার কথায় একি বিপরীত কাণ্ড!

বড় ছেলে আপিস থেকে এলেন।

স্ত্রী শয্যায় চোখ বুজে পড়ে। জননী পিতৃষ্বসা দাঁড়িয়ে। কন্যা অডিকলোনের শিশি আর জলনেকড়া ভিজিয়ে মাথার কাছে বসে।

চক্ষের পলকে ব্যাপারটা বোধগম্য হল। নীরবে কাপড় বদলে চায়ের খাবারের ঘরে ঢুকলেন। কারুর সঙ্গে কথা না বলেই।

শুধু কন্যাকে বললেন, 'বাহাদুরি করে আগুনের তাতে যায় কেন? রাঁধতে তো অন্য সকলেও পারে!'

মা ও পিসিমার কানে কথাটা গেল পরোক্ষ হলেও।

কথা শুনতে যাবার অনুমতি বা গাড়ি চাইবার ভরসা আর হল না। ননদ এই দু'দিনেই বাড়ির আবহাওয়া বুঝে নিয়েছিলেন, সরে পড়লেন।

বল্লেন, 'আজ যাই ভাই। আর একদিন নিয়ে যাব।'

৪

কিন্তু দিন দিন ভয় বাড়ে বই কমে না। প্রতাপান্বিতা গৃহিণী এখন আশ্রিতা—জননীও যেন অবাঞ্ছিত আত্মীয়ার পর্যায়ে পড়েছেন।

অস্তিত্বটাই যেন অপরাধবিশেষ। অকারণ সমীহ সম্ভ্রম করার লোক বাড়িতে থাকা যেন সকলেরই যন্ত্রণাবিশেষ। উভয়তঃই।

জননী কোথায় লুকোবেন ভেবে পান না।

সেকাল নয় যে, একটা মৌখিক শিষ্টাচার পরিজনরা রাখবে। নাতি নাতনীরা গল্প শুনবে, ছেলেরা কথা কইবে, বৌমারা একটু কাছে বসবেন। একেবারে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যময় ধন-গর্বিত মানুষের অভদ্র একাল। যেখানে ধন সেখানেই মানসম্ভ্রম, নইলে কিছুই নেই।

অত যে বোঝেন জননী তা নয়, তবে এটা বোঝেন যে, যেন একটা অনাবশ্যক অতিরিক্ত বাড়তি মানুষ।

আবার একদিন সহসা ননদের আবির্ভাব হল। তীর্থে যাবেন।

এবার একেবারে সরাসরি প্রস্তাব ছেলেদের কাছে।

'আমাদের পাড়া থেকে কুণ্ডু কোম্পানীর রেলে সব তীর্থ করতে যাচ্ছে, আমি যাবার ঠিক করেছি—বৌকে নিয়ে যাই—কি বলিস তোরা?'

সকলের ঘর আলাদা—চা ও খাবার জায়গা পৃথক।

সকলকেই পৃথকভাবেই আবেদন করতে হল।

জ্যেষ্ঠ বল্লেন, 'তা যান। কত টাকা লাগবে, আমার হাতে এখন বেশী কিছু নেই।'

মধ্যম বল্লেন, 'কতদিন হবে তোমাদের? আর মাসে মাসে টাকা দিতে পারব—থোকে একেবারে দিতে পারব না।'

কনিষ্ঠ বা তৃতীয় বল্লেন, 'তা ঘুরে আসুন কিছুদিন। এখানে যা খরচ হয় তার ওপর রেল ভাড়াটা—সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখন।'

কেউ বল্লে না, 'মার কষ্ট হবে কিম্বা তাদের কোন অসুবিধা হবে অথবা খোঁজখবর দিয়ো।'

অবশ্য মা সেকথা ভাবেনওনি। তবুও পিসিমার মনে হল।

বহুসংখ্যক বুড়ো-বুড়ি—কিছুটা প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, ধনী-দরিদ্র-মধ্যবিত্ত নানা শ্রেণীর তীর্থাভিযানের মাঝে এই ননদ-ভাজও তাঁদের বন্ধু-বান্ধবী সমভিব্যাহারে যোগ দিলেন। হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, বণিক শেঠও প্রথম শ্রেণীর যাত্রী জুটল।

কাশী, গয়া, অযোধ্যা, প্রয়াগ—মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর—আগ্রা, দিল্লী, হরিদ্বার সেরে দ্বারকা শেষ করে ফেরা।

মাড়োয়ারী মেয়েরা—আকণ্ঠ অবগুণ্ঠনের মাঝে গান ধরে—যেখানে যেমন। গাড়িতে উঠে গায়,

> শুনো রেলকা বয়ান।
> শুনো রেলকা বয়ান
> কলকতামে আয়ো গাড়ি ঝন নন্ নন্।
> গাড়ি কলকতামে আয়ি
> দেখো নীচে গঙ্গা মাই।।

রেলের প্রথম স্তুতি-সঙ্গীত। প্রপিতামহীর আমলের।

তারপর সকল তীর্থের জয়ধ্বনি করতে করতে বলে, কাশীজী কী জয়, গয়াজী কা জয়, প্রয়াগ মহারাজের ভজনও গায়, সীতারামের ভজনই বেশী। অযোধ্যায় গাইল রাম নাম। কাশীতে গাইল, 'মহাদেব সতত ভজত দিব্য রাম নাম, কাশী মরত, মুক্ত করত, শুনায়ে রাম নাম।'

বৃন্দাবনে মথুরায় আবক্ষ ঘোমটা টেনে হাততালি দিয়ে তারস্বরে গায় মন্দির দুয়ারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে,—'উঠ্ নন্দরাণী খোল কেওয়াড়িয়া! লাল আয়োগায় চরায় কে!' (ওঠো নন্দ-রাণী, দুয়ার খোলো, তোমার দুলাল গরু চরিয়ে এলো)

কখনো গায়, 'হরিসে লাগি রহোরে ভাই,

তেরা বনত্ বনত্ বনি যাই।
অঙ্কা তারে, বঙ্কা তারে,
তারে সুজন কসাই।
শুগা পঢ়ায়কে গণিকা তারে
তারে মীরাবাঈ।'

আবার গাড়িতে উঠে গায়,—'উঠ চলো মুসাফির ভোর ভয়ো
অব রইন কাঁহা যো সোওত হ্যায়।'

পথে নেমে তৃতীয়, দ্বিতীয়, মধ্যম শ্রেণী সকলেই এক গান গায়, একভাবে পথ চলে।

সমরের মা পিসিমারাও তাদের দলে একপাশে বসে থাকেন। স্টেশনে স্টেশনে নামেন, রান্নাবাড়া করেন, দর্শন করে ফেরেন, পথে চলেন।

শুধু তাদের মত ঐ আনন্দময় তীর্থ-সঙ্গীত বা ভজনের গান এঁদের দলের কেউ গায়ও না জানেও না।

কদাচ কখনো যদিবা কোন বৈরাগী গায়, তাহলে গায়—

'আমার আশার আসা ভবে আসা
আশা মাত্র সার হোলো।
চিত্রিত পদ্মেতে যেন ভ্রমর ভুলে র'ল।
চিনি বলে নিম খাওয়ালি মা ক'রে কত ছল,
আমার মিঠার লোভে সারাটি দিন (মাগো)
তেতো মুখে গেল।'

আর বাঙালী যাত্রিনী-যাত্রীদের চোখ জলে ভেসে যায়।

কোথায় কবে কে যেন চিনি বলে নিম খেয়েছে! চিত্রিত পদ্মকে সত্যি মনে করেছে। সে কে? কারা? সকলেই? কিন্তু ওরা তো ওই অন্য প্রদেশীয়ারা তো নয়। পিসিমা ও সমরের জননী ভাবেন যেন কত গান, আধুনিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত কত শুনেছেন, তবু আজকের মত এমন করে গান কি মনে দাগ কেটেছিল?

গান শেষ হয়—

'প্রসাদ বলে, ভবের খেলায় মাগো, যা হবার তা হোলো
এবার সন্ধে হোলো কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে তোলো।'

কোথায় সে ঘর? সহসা সকলের মনে হয় যায় যেন আরেক জনমের কথা।....

যাই হোক কুণ্ডুমশাইয়ের তীর্থযাত্রার তো শেষ আছে, মাস তিনের মধ্যেই সে-যাত্রা শেষ হল।

তারপর? এবার আর তো তীর্থপথ নেই।

ননদ ভাজ দু'জনেই চুপ করে বসে ভাবেন। এবার কোথায় যাবেন? বাড়ি? বাড়ির কথায় আনন্দ হয়, কিন্তু মমত্ববোধের সুখ হয় না। যেন ভয়ে সঙ্কোচে ভরা কি ভাবনা জাগে।

যেদিন স্বামীর মৃত্যুর পর আবার সংসারের দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন, সেদিন যেমন সব কিছু ঠিক থাকা সত্ত্বেও একটা আমূল পরিবর্তন কোনখানে হয়েছে, বুঝতে না পারলেও অনুভব করেছিলেন, বাড়ি ফিরে এসে আজ তাঁর মনে হল, সহসা তিনি যেন

আর কাদের বাড়ি এসেছেন। যাঁরা তাঁর আত্মীয় নন, কুটুম্ব—যাদের তিনি স্বজন নন, অতিথি।

৫

রান্না করা এবং খাওয়ার শেষ আছে। আহ্নিক পূজা জপেরও শেষ আছে।

কথা কার সঙ্গে কইবেন? ছেলেরা কাজে ব্যস্ত—বৌমারা বিলাস-ব্যসনে ব্যস্ত, নাতি-নাতনীরাও পড়াশুনায় ব্যস্ত।

শীত শেষ হয়ে গেল।

ননদ মাঝে মাঝে আসেন, একদিন বল্লেন, 'চল ভাই, দোলগোবিন্দ দেখে আসি পুরীতে। আর-জন্মে আর বিধবা হতে হবে না।'

ভাজ হাসলেন, 'আবার জন্ম? আবার বিধবা? তাও এদেশে? কে জানে হয়ত অন্য দেশে জন্মাব।'

ননদও হাসেন, 'কি বলা যায়? যাবে তো ঠিক করি। গিয়ে কিছুদিন থাকা যাবে। ছেলেরা যাচ্ছে, তারা মাসখানেক থেকে ফিরবে। আমরা ছোটখাটো বাড়ি দেখে নিয়ে রথ অবধি থেকে আসব।'

প্রস্তাবটি লোভনীয় মার কাছেও। পুত্র ও বধূদের কাছেও অপছন্দ নয়...।

সঙ্গে পৌত্র পৌত্রী বধূরা দু'একজন জুটে গেলেন। যাঁরা বাকি রইবেন, পরে যাবেন। পুত্ররাও যাবেন।

অকস্মাৎ দুই জননী আবার পুরাতন কর্ত্রীত্বের ও সংসারের মোহের খেই খুঁজে পেলেন এই তীর্থযাত্রায়।

যেন মথুরাধামের দ্বারকাধীশের দর্শনের লীলায় একবার দেবতা-দর্শন একবার পর্দা ফেলার মত, আবার তাঁরা সবসুদ্ধ পুরীতে এক অস্থায়ী সংসার পেতে বসলেন।

ভারি আনন্দে কাজ করেন, দর্শন করেন, সমুদ্রস্নান করেন, মন্দিরে মন্দিরে কথা শোনেন। লক্ষ্মীমন্দিরের, ষড়ভুজের মন্দিরে—মন্দিরের প্রাঙ্গণে এদিকে ওদিকে কথকতা যেন লেগেই আছে। উড়িয়া ভাষায় মিষ্ট সুরে গান গেয়ে যায় অন্ধ যুবক— 'জগড়নাথ তুম্হে বড় দারুণ (নিদারুণ অতি)।'

কি তাঁর নিদারুণতা তা আর সে খুলে বলে না, শুধু গায় অতি অকরুণ তিনি।

দিন কেটে যায়। নাতিরা বৌমারা ফিরে যান, আবার আসেন। ননদ-ভাজ থাকেন। মন্দিরের ফুলের মালা গেঁথে দেন। কেয়াপাতার মালা রচনা করতে শেখেন। রচনা করে দেন দেবতাকে। কথা-পাঠ, কীর্তন শোনেন, আর রাত্রে শুয়ে ভাবেন সংসারের কথা। কোন্ ছেলে কে কোন্ কথা কবে বলেছে, কে কি খেতে ভালবাসে...।

বছর কাটে।

বধূরা পুত্রেরা বেড়িয়ে যায়। ছেলেরা কেউ হেসে হেসে বলে, 'মা আর যাবে না, দেখছি জগন্নাথেই আটকে গেলে?'

বলে না, 'মা চলো। আমাদের ভাল লাগছে না।' জননী যে কথাটি শুনতে উৎকর্ণ হয়ে থাকেন।

বধূরা বলেন, 'মা, বেশ মায়া কাটালেন। আর কি কলকাতা ভাল লাগবে?' তারাও বলে না, 'মা চলুন'। যদি মা সত্যই তাদের সঙ্গে যান।

ফিরে গিয়ে চিঠি একজন লেখে, 'মা, কি রকম নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, কতদিন হল বাড়ি ছেড়ে আছেন।'

অন্যজন লেখে খুব মুন্সীয়ানা করে, 'বড় চমৎকার জায়গা, গেলে আর আমাদেরই আসতে ইচ্ছা করে না। তা আপনারা আর কি করে আসবেন ইত্যাদি।'

তৃতীয়া লেখে, 'এবার গিয়ে আপনাকে আমরা নিয়ে আসব আপনার নাতিরা বলেছে'...

ননদের তারি মাঝে ডাক পড়ে, ছোটছেলের বৌর আঁতুড় তুলতে। মেয়ের ছেলে হবে, আসা দরকার—তাদের গৃহস্থঘর, লোকের দরকার।

ভাজের ছেলেদের টাকা আছে, লোকজন আছে—তাদের ঘরে আত্মীয় মানুষের প্রয়োজন নেই। থাকলে অসুবিধা, সঙ্কোচ।

জননী সকলের চিঠি পড়েন, মনে হয় ওরা সত্যিই যেতে লিখেছে। একবার বলেন, 'যাব।' কি কি নেবেন মনে মনে ভাবেন।

হ্যাঁ, পুরীর জিনিসপত্র সরু চিঁড়ে, বড় মানকচু, সরভাজা, খেলনা পুতুল সব নিতে হবে। শাড়ি বৌমাদের নাতনীদের জন্য, কন্যাদের জন্য।

অনেকগুলি টাকাও সেজন্য দরকার...। বাড়িখানা রেখে যাবেন, না ছেড়ে যাবেন, তাও ভাবেন। ভাবেন ননদ ফিরে এলে পরামর্শ করে যাবেন। বধূমাতাদের চিঠি লেখেন, 'এবারে যাব, অনেকদিন রয়েছি...।'

শ্রীমন্দিরে কথা শুনতে যান, মহাভারতের স্ত্রীপর্ব শেষ হল। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী তখনো যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বাস করছেন...! তারপর ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী বিদুর সবাই বনে চলে গেলেন। কুন্তীও তাঁদের সঙ্গে গেলেন...। পুত্রদের রাজ্যপাটে রাজভোগে থাকতে চাইলেন না।

কয়েকদিন বাদে বধূমাতাদের কাছ থেকে চিঠির জবাব এলো।—'মা, আপনি আসবেন শুনে বড়ই আনন্দ হয়েছিল, কিন্তু আমরা সকলে কয়েকদিনের মধ্যেই একটু দেশ বেড়াতে যাচ্ছি—আগ্রা দিল্লী হরিদ্বার আর বম্বে মাদ্রাজ সব ঘোরা হবে। ফিরতে দেরি হবে। আপনি একলা এসে কষ্ট পাবেন—তাই আপনার ছেলেরা বল্লেন, মা যেন পুরীর বাড়ি ছেড়ে না দেন হঠাৎ।'

ছেলেরা বধূদের ওকালতনামা দিয়েছে সব বিষয়ের। তারা নিজেরা আর চিঠি দেয় না। সন্ধ্যাবেলা মহাভারত খুলে বসলেন। অনুশাসনপর্ব চলছিল, সহসা চোখে পড়ল, 'অপত্যের অপত্য হইলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা আর সংসারে বাস করিবেন না...।'

কল্পনা, ১৩৬৩

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা

অন্ধকার রাত্রি। জঙ্গলের হাঁটাপথ ও বিপথ। ভাল পথের দিক তারা জানে, কিন্তু তার দরকার নেই। সে পথে আতঙ্কের ভয় বেশী।

তারা চলেছে। ছোটদল, বড়দল, ভাঙ্গাদল হয়েও একমুখেই একই সঙ্গেই চলেছে।

না, তীর্থযাত্রী নয়। সাগর মেলা বা কেদার বদরিকাশ্রম যাত্রী নয়। মেলা বা অন্য কোনো দুর্গম পথের যাত্রীও নয়।

যদিও গন্তব্য তাদের দুর্গম। কোনরকমে যদি একবার গন্তব্যস্থলে পৌছয়! তাহলে? তাহলে মেয়েদের মান পুরুষের প্রাণ আর চিরকালের ধর্ম বাঁচবে। ধনরত্ন নয়। সে তাদের নেই। ধনধান্য ছিল বটে।

পুরুষদের হাতে লাঠি টাঙ্গি। পিঠে কাপড়চোপড় বা চালচিঁড়ের পুঁটুলি। খালি গা, পরিধানে আঁটসাট ধুতি মালকোঁচা দিয়ে পরা। নানারকমের পুরুষ বৃদ্ধ যুবক প্রৌঢ়।

আর মেয়েদের কোলে শিশু! হাতেও শিশুর হাত ধরা। কারুর হাতে তার সঙ্গে চাল মুড়ি চিঁড়ে গুড়ের পোঁটলা। মাথায় ঘোমটা।

নানারকমের নারী, কমবয়সীরা একেবারে ভিড়ের মাঝখানে। গুরুজনের বন্ধুজনের বেষ্টনীতে।

নীরব যাত্রা। যাত্রীও আতঙ্কাভিভূত।

সহসা কোন্ বনজঙ্গলের একদিকে রেলের তীক্ষ্ণ বাঁশীর 'কু' শব্দ শোনা গেল। তারপর আকাশে কালো ধোঁয়া। গাড়ীচলার সুদূরবর্তী শব্দ।

আনন্দে মেয়েরা উলুধ্বনি দিল। আর পুরুষ কয়েকজন হরিবোল দিল।

আঃ, কি হুজ্জুত লাগাইছস্, চুপ কর! ওরা শুনবার পাব বুঝছস্ না? একজন প্রৌঢ় পুরুষ ধমক দিলেন।

যাত্রীরা নীরব হয়ে গেল। কিন্তু মনে আনন্দের সীমা নেই। ক'রাত্রি হেঁটে চলে জঙ্গল ভেঙে নদী পার হয়ে আজ বুঝি কূল পাওয়া গেল। একবার টিকিট কিনে গাড়ীতে বসলেই হয়। জানে দেশ গেছে। স্বজন নেই। মাটি নেই। ধন নেই। অর্থ নেই। নিঃসম্বল নিঃস্ব। তবু এক ধর্মের এক জাতের মানুষ তো আছে। শেয়াল কুকুরের মত তাড়িয়ে দেবে না। প্রাণ মান নিয়ে টানাটানি করবে না।

পঞ্চাশ-ষাটজনের জনতা এসে পৌছল। সীমান্তের স্টেশনের ধারে। পিছনে আরো আসছে।

এপার থেকে লোকেরা ঘিরে দাঁড়াল, 'কোত্থেকে আসছিস? পাসপোর্ট কই?'

বোকা নির্বোধ লোকগুলো পাসপোর্টের নাম জানে। শিখেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে এমনি এসে পড়তে পেরেছে তো অনেকজন। গতবছরের দুর্যোগের দিনে।

তারা বললে, 'পাসপোর্ট করতে পারিনি, মেয়াসাহেব, চলে যেতে দিন। আর তো আসুম না।'

মিঞাসাহেবরা চুপ করে থাকেন। বলেন 'ওদের ওপারে জিগাও।' এরা ওদিকে যায়।

তারা বললেন, 'না, হুকুম নেই, ফিরে যাও দেশে।'

'সেকি?' হতবুদ্ধি লোকগুলো হাতেপায়ে ধরে দুদিকের লোকের।

নাঃ, হাতপায়ে ধরার চেয়ে ক্রন্দনের চেয়ে আরো স্পষ্ট স্থূল কিছু চাই।

হ্যাঁ। দু'দিকেই চাই ; বড়-বড়রা পিছনে ফিরে আছেন। ছোটখাটোরা ইঙ্গিত ইশারায় বক্তব্য বুঝিয়ে দেয়। দু'পক্ষেরই দ্বিমত হয় না।

যারা পারল গেল, বাকিরা স্টেশনের প্রান্তে একপাশে বসে থাকে।

সহসা একজন এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোর নাম কি?'

জিজ্ঞাসিতেরা নীরবে বসেছিল একধারে। তাদের 'সেলামী' 'নজর' দেবার মত কিছুই নেই। ফিরে যাবার উপায়ও নেই। কিছু এগিয়ে যাবার মত উপায় নেই। হেঁটে হেঁটে সে যেতে পারত যদি যেতে দিত। তারা দু'জন স্বামী-স্ত্রী।

সে আশান্বিত হয়ে বল্লে, 'বাবু, আমার নাম সুদাম ঋষি।'

'ও কে তোর সঙ্গে?'

'আমার পরিবার। আর কেউ নাই, আমরা দু'জনই আছি। যেতে দেবেন বাবু?'

বেশ সুশ্রী বিশ-বাইশ বছরের মেয়ে। সেও নতমুখে মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসেছিল।

সকলের চোখ পড়ছে। কোথায় কোন্ ভাল মেয়ে আছে। কোথায় কার ট্যাকে টাকাপয়সা আছে। দু'পারের মানুষই এক নিমেষে বুঝতে পারে অভ্যস্ত চোখে কারা কেমন, কার কাছে কি পাওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করলে, 'কত দিতে পারবি দু'জনার জন্যে?'

সুদাম ব্যাকুলভাবে বললে, 'বাবুগো, পাঁচটি টাকা আছে, আর কিছু নাই।'

তারা হাসিতে ভেঙে পড়ল একসঙ্গে। 'যা বেটা, ফিরেই যা দেশে।'

তারা সুদামের স্ত্রীর দিকে চাইল।—'ওর নাম কি?'

'উয়ার নাম দুর্গা।'

'দুর্গা'ই বটে! তারা ভাবে। 'তোদের দুজনের জন্যে পঁচিশ টাকা লাগবে। তাহলে হাঁটাপথে যেতে দোব।'

'কোথায় পাব বাবু অত টাকা?'

সহসা দুর্গা ঘোমটা সরিয়ে স্বামীকে কি বললে। কি সুন্দর মুখখানি। বাঃ, রংও তো বেশ। কে বলবে মুচির মেয়ে!

সুদাম বললে, 'কলকাতায় ওর ভাই আছে, সেখানে গেলে টাকা আনতে পারি। কিন্তু ওকে পাঠিয়ে দিই একলা কার সাথে?'

যারা দুর্গাকে দেখছিল তাদের চোখ ফেরে না।

তারা বললে, 'তুই যা না। টাকা নিয়ে আয়। ও এখানে মাস্টারবাবুর বাড়িতে থাক্।' (স্টেশন মাস্টার)।

ওরা দুজনে কাঁটা হয়ে গেল। যেন এখনি কে ছাড়াছাড়ি করিয়ে দিচ্ছে।

সুদাম বললে, 'না, থাক্ বাবু। ফিরেই যাব।'

দিন শেষ হয়ে যায়। রাত্রি আসে। মুড়িসুড়ি দিয়ে দুর্গা স্বামীর কাপড়ের সঙ্গে নিজের আঁচল বেঁধে শুয়ে থাকে। একটু ঘুম আসে। আর ভয়ে ভাবনায় আতঙ্কে ভেঙে যায়।

দেখতে দেখতে এ দলের সব লোকেই যে ভাবেই হোক এদিকে ওদিকে চলে গেল। যারা রইল তারা অচেনা ভিন্ গাঁয়ের লোক। তবু হিন্দুই।

আবার দিন গিয়ে রাত্রি আসে। সেই দালালরাও আসে। বলে, 'তুমি চলে যাও সুদাম। টাকা নিয়ে এসো, আমরা তোমার বৌকে দেখব।'

দুর্গা ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে। ওরা দেখবে? ওরা কারা?

আবার দিনরাত যায়। অবশেষে দুর্গাই বলে, 'তা তুমি আমাকে মাস্টারসাহেবের বাড়ি নিয়ে রেখে এসো। যদি তিনি রাখেন তো থাকব। তাঁর তো বিবি আছে।'

স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টার কাছেই। তাঁর বিবি আছেন। দু'তিনটি ছেলেমেয়ে আছে।

দুর্গা একগলা ঘোমটা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। আর সুদাম বাড়িতে মাস্টারসাহেবের পায়ের কাছে বসে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললে, 'আপনি আমার বাপের মতন। আপনি ওরে রাখুন। আমি ওর ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা এনে আপনাকে দেবো।'

মানুষ পাথরও হয়, আবার মানুষও হয়।

লোকের দুঃখ-দুর্দশা দেখে দেখে স্টেশন মাস্টারেরও সবই যেন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তবু সহসা সুদাম আর দুর্গার অসহায়তা দেখে কেমন দয়া হল।—'আচ্ছা তুই রেখে যা আমার বিবির কাছে। কিন্তু ক'দিন হবে? এখানে তো নানারকম গুণ্ডা আছে, আমি একা সামলাতে পারব কি? আর খাবে কি? তোরা তো আমাদের কাছে খাবি না— হিঁদু তো।'

সুদাম খুশী হয়ে উঠে বসল।

'আমি যাব আর আসব। ওকে আপনার পোলাপান মনে করবেন। ও যা হয় করে একটু ফুটিয়ে নেবে ওর 'মায়ের' কাছে, আপনার বিবিসাহেবের কাছে। চিঁড়েমুড়ি খাবে। সঙ্গে আছে। দু'তিনদিন বই তো নয়। মা-জানের কাছে থাকবে।'

তন্বী সুন্দরী তরুণী দুর্গা দিন গোনে। হ্যাঁ, আজ তিনদিন। আজ এসে পড়বেই সুদাম। দাদারা কলকাতায় আছে। ওর মাসী আছে। সুদামেরও পিসি আছে। সকলে মিলে কি আর পঁচিশটা টাকা দেবে না?

নাঃ, পাঁচদিন গেল। দেখতে দেখতে দশদিনও কেটে গেল। সে ভয়ে ভাবনায় এবারে অভিভূত হয়ে যায়। কি হল সুদামের? কি হল? আর আসবে না? বিপদ হল কিছু? সেখানকার লোকেরা ছেড়ে দেয়নি? মিঞা-বাড়ির কাছাকাছি স্টেশনের ফাজিল ছোঁড়াগুলো বিবিসাহেবের কাছে এসে দাঁড়ায়। নানা গল্পের মাঝে বলে, 'বিবিসাহেব, ওকে কেন ঘরে পুষে ধরে রেখেছ! বিদেয় করে দাও। যেখানে ইচ্ছে যাক চলে।' স্টেশনের কুলীগুলো হি হি করে হেসে বলে, 'সে আবার আসবে টাকা নিয়ে! ঘাড় থেকে নাবিয়ে বেঁচেছে বলে! এবার ছুঁড়ীই কত টাকা রোজগার করে নেবে। দাও না ছেড়ে। আমরাই খদ্দের দেখে দোব!' দুর্গা ছোট্ট ভাঁড়ারঘরের এক কোণ থেকে সব শুনতে পায়। বুক টিপটিপ করে। চোখ জলে ভরে যায়। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়।

তারা চলে গেলে সে বিবিসাহেবের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদে। বলে, 'তুমি আমার মা। মা-জান বলেছি তোমায়, তুমি আমায় ওদের কাছে দিও না।'

বিবি বলেন, 'না রে না, ভাবিস্‌নি। থাক্ না তুই।'

কিন্তু রাত্রে অবসর হলে স্বামীকে বলেন, 'সে লোকটা আইল না ক্যান্? ফেইল্যা পালাইল নাকি?'

মিঞা বলেন, 'খোদায় মালুম সেকথা। তবে আসবে। জোয়ান পরিবার, অত রূপ! যাবার সময় আমার পায়ে ধরে কাঁদল। তবে কলকাতা শহর। কি হয়ত বিপদ হল। নয়ত টাকা পায়নি। মোরা ছেড়ে দিতে পারতাম। তা 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'! দুদিকেই তো টাকা দিতে লাগব। সবাই তো সমান সাধু! জানই তো।'

বিবি বললেন, 'আহা জোয়ান মেয়েটা। কি হবে কে জানে। সে যদি না আসে। কতদিন তুমি রাখতে পারবা এই হাঙ্গামা-হুজ্জুতের দিনে।'

পাশের ঘরে বিনিদ্র দুর্গা সব শুনতে পায়। তা হলে?

তাহলে কি করবে সে? ওই রাক্ষস দলের হাতেই এরা ছেড়ে দেবে ওকে? আর? আর? যেমন গাঁয়ে দেখেশুনে এলো! পথেও যেমন ক'বার হল! মেয়েরা কাঁদল। পুরুষরা মরল। পালাল। তাহলে? দুর্গা কাঠ। দুর্গা পাথর।

ভাবে, পালিয়ে যাবে? কোথায় পালাবে! বাইরেও তো ওরাই আছে। গলায় দড়ি দেবে? ডুবে মরবে? নদী আছে কোথায়? পুকুর আছে কি? আছে যেন। আবার ভাবে, আসবে। সুদাম আসবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু আরো কদিন গেল।

স্টেশন মাস্টার সাহেব আর বিবি সবাই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছেন ক্রমশ। সুদাম পালিয়েছে। দুর্গা আর রাঁধে না। খায় না। শুকনো দুটি চিঁড়ে মুড়ি জলে ভিজিয়ে চিবিয়ে নেয়। বিবি বেশী বেশী বললে।

একুশ দিনের দিন সুদাম এলো। চোখ মুখ বসে গেছে ভাবনায়—কিন্তু এল।

অতি কষ্টে নানারকমের লোকের হাত থেকে টাকা ক'টি বাঁচিয়ে আনতে পেরেছে কেঁদে-ককিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে।

এসে আভূমি নত সেলাম করে স্টেশন মাস্টারের সামনে দাঁড়াল। ডাকল, 'সাহেব।'

সাহেব যেন চমকে ভূত দেখলেন। 'এত দেরি করলি? তিনদিন বলে! কি হয়েছিল?'

'টাকার যোগাড় করতে দেরি হল সাহেব। তা আজকেই তো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারুম? ভালো আছে তো সে?'

হাতের নোটগুলো সাহেবের সামনে ধরে দেয়।

তিনি নিলেন না। শুধু শুষ্ক মুখে বললেন, 'তুই কিছু খেয়ে নে। তারপর কথা বলব।'

সুদাম ভয় পেয়ে গেল। ভাবলে, বুঝি আরো টাকা চাইবেন। কোথায় পাবে? কোথায় পাবে টাকা?

সে সাহেবের সঙ্গে তাঁর কোয়ার্টারে গেল।

বিবিসাহেবকেও পেন্নাম করল। তিনিও শুকনো মুখে বললেন, 'ভাল আছ তো? তা এত দেরি কেন করলে?'

'সে কোথায় মা-জান?' সুদাম উৎসুক হয়ে এদিক ওদিক চায়।

বিবি বললেন, 'কিছু খাওয়াদাওয়া কর। তারপর বলছি।'

'সেকি রাঁধে নাই? ওই দু'গা 'খাব'খন। দিতে বলুন।'

এবারে বিবির চোখে জল এলো।

শুকনো কাঠ মুখে সুদাম বললে, 'সে কি নেই? ধরে নিয়ে গেছে তায়?'

মিঞা পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, 'না, ধরে নেই। সে বেঁচে নেই। জলে ডুবে গেছে।' সুদাম স্তম্ভিতের মত উঠোনে বসে পড়ল।

অনেকক্ষণ—তারপর উঠে বাইরে গেল।

অকস্মাৎ তার মনে হল সবাই ওরা মিথ্যে বলছে। ওরা আরো টাকা চায়। তাহলেই ছেড়ে দেবে। সে বেঁচে আছে। সে আছে এইখানে কারুর কাছে।

সে স্টেশনে এলো। একটু কাজের নিরিবিলি হলে সে মিঞাসাহেবের পা জড়িয়ে ধরে মাথা কুটতে লাগল মাটিতে জুতার ওপরে। কপাল মাথা ফুলে ঢিবি হয়ে ওঠে।

লোক জমে গেল এদিকে ওদিকে।

সে কাঁদে আর বলে, 'সাহেব গো, ওরে দিয়া দেন। আমার আর কেউ নাই গো।'

গোলমালে ওপারের অফিসার, এপারের কর্মচারী ভাগ্যনিয়ন্তারা সকলে এসে দাঁড়ালেন।

সকলেই বলে, 'সে একটা পচা পুকুরে গলায় ইঁট বেঁধে ডুবে মরেছে। সবাই জানে। বেঁচে নেই রে। তোর দেরি দেখে এই করেছে।'

সুদাম ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। কিছু বলে না। তার বিশ্বাস হয় না।

হিন্দু অফিসার বলেন, 'তুই আমার সঙ্গে ওপারে চল্। এখানে থেকে কি করবি? পাঠিয়ে দোব।'

মুসলমান অফিসার বলেন, 'সত্যি বেঁচে নেই রে সে। আমরা দেখেছি, পুলিস জানে।' সে জন্তুর মত বসে থাকে। কারুর কাছে যায় না। কোনো কথাও কানে যায় না তার।

এক একবার বনের দিকে, যাওয়া আসার পথে লোকের বিরাম নেই। সেইদিকে তাকিয়ে থেকে থেকে দুর্গাকে খোঁজে। ওই মেয়েটি? ওই যে ফরসামত রং, লালপাড় শাড়িপড়া, পায়ে আলতা? ঠিক যেন দুর্গা। কিন্তু নাঃ, সহসা কি মনে হয়। ফিরে আসে স্টেশন মাস্টারের বাড়ি।

সাহেব খানা খেয়ে বসেছিলেন।

'সাহেব গো, আপনি জানো, সে কোথায় আছে মোরে বল। আমি তারে কলকাতায় নিয়ে গঙ্গাচান করিয়ে পঞ্চগব্যি খাইয়ে শুদ্ধ করে নিমু। তারে জাতে তুলে নিমু। বড় কেঁদেছিল সে। যবার দিনে।'

দুঃখিতভাবে বিবি বললেন, 'ওরে, সে নেইরে, নেই।'

তার পরদিন আবার আসে। এবারে বলে, 'মা-জান, আমি মোছলমান হব। তাহলেই তো ওরা আমাকে তারে ফিরে দিবে। তুমি তাদের তাই বলো গো। মোছলমানরা তো

মোছলমানের বৌরে ঘরে রাখবে না। ফিরিয়ে দেবে। মা-জান, তুমি আমার মা, সাহেবেরে বুঝায়ে বল। সে মরেনি। সে আমারে শীগগীর আসবার জন্যি বলেছিল।'

বিবিসাহেব হতবুদ্ধি। কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

শুধু বললেন, 'তুই পাগল! সে যে বেঁচে নেই রে।'

সুদাম ফিরে গেল। পথে-বিপথে বনে-বাদাড়ে ঘোরে। রাত নেই দিন নেই ঘোরার শেষ নেই। যেদিক থেকে এসেছে সেদিকেই হয়ত দুর্গা গেছে। লোকেরা নিয়ে গেছে। সেদিকে যায়। প্রতিদিনই লোক আসছে। জমছে। ভিড় করছে।

কতরকমের মেয়ে। পাতলা চেহারা তন্বী জোয়ান মেয়ে। ফর্সা রং। পায়ে আলতা, মাথায় সিঁদুর, মুখে পান। দূর থেকে দেখে মনে হয় ওই তো দুর্গা! চেঁচিয়ে ডাকে, 'দুর্গা রে, দুগ্‌গা!'

এগিয়ে যায়। না। দুর্গা নয় তারা কেউ।

অনেক রাত্রে ক্লান্ত হয়ে স্টেশনে পড়ে ঘুমোয়। আবার সকাল হবার আগেই চম্‌কে ঘুম ভাঙে।

নিষুতি অন্ধকারেই উঠে পড়ে। আজ হয়ত পাওয়া যাবে দুর্গাকে।

যাচ্ঞা

প্রেম জিনিসটা এমনই বটে! রেবার মনে মনে হাসি এলো। দাদা যতদিন চুপচাপ ছিল ততদিন কেউ জানত না যে ওর মনে এত উচ্ছ্বাস আছে।

তা যাক্, ভালই তো। কিন্তু তার যে ভারি বিপদ হল! নীরা আর তার দাদার এই উচ্ছ্বাসে মিলনে তার শুধু যোগাড় দিলেই হবে না, সাংসারিক ও সামাজিক উদ্যোগ করলেই হবে না, যোগ দিতে হবে! অর্থাৎ যোগ শুধু উলু দেওয়া বা শাঁখ বাজানো নয়, আর একখানি আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে 'কনে' সেজে বসতে হবে!

কবে একখানি সেকেলে বইয়ে পড়েছিল রেবা, যাতে শেষ অবধি পিসিমার জয় মঙ্গলবার ব্রতের কাহিনীর মত জলেডোবা, সাপে কাটা, নিরুদ্দেশ হওয়া সবাই ফিরে এলো, ঘড়া ঘড়া মোহর পেল নায়ক মাটি খুঁড়ে এবং পরম সুখে দেশের ঘরের যাবতীয় নটেগাছগুলি মুড়িয়ে (ভক্ষণ করে? কি দুর্লভ ও উপাদেয় বস্তু! সেকালকার পিতামহীরা কি সরলই ছিলেন!) দিনাতিপাত করতে লাগলেন।

অনেকে হাসে। অর্থাৎ কু-সমালোচকে হাসে। রেবা ভাবে হাসবে কেন? ওঁদের ওই-সব সেকালের লেখকদের হৃদয় এত বড় যে ওঁরা কাউকে শেষ অবধি অসুখী রাখতে পারেন না। বিধাতার চেয়ে দাতা ওঁরা, বিধাতার দেওয়া সুখের শান্তির ফুলে দুঃখের কীট থাকে, মিষ্টিতে বালি থাকে। এঁরা সৃষ্টি করতে বসে নিজের সৃষ্ট প্রাণীর সে কষ্ট সইতে পারেন না। উদার মনে যা দরকার দিয়ে দেন।

রেবার দাদার মতলবটা এক জাতের। দাদাও চায় তাদের এই সুখের মাঝে তারো একটু সুখ হোক। উদ্দেশ্য ভালো, কিন্তু সুখের যে প্রকারভেদ আছে, তা ওরা ভুলে গেছে। ওদের সুখকে তর্জমা করে রেবার মনে বসিয়ে দিলেই যে সেটা রেবার হয়ে যাবে, রেবার তা মনে হয় না।

ওদের কিন্তু ধারণা তাই হবে। ওদের এখন ধারণা বিয়ে আর প্রেম না হলে কি সুখ আছে আর?

নীরা অনেক ভেবে বলে, (সে ভাবী ভাজও বটে) 'আচ্ছা ভাই, শঙ্করবাবুকে যদি বিয়ে না করিস তো আর কারুকে পছন্দ কর্ না?'

আর দাদা বলে, 'হ্যাঁ একি! তুই থাকবি সন্ন্যাসীর মত বসে....? আমার ছোট বোন তো বটে!'

রেবা হাসে, বলে, 'মানে? আমি খাচ্ছিদাচ্ছি, সাজসজ্জা যথোচিত করছি, হাসি গল্প গানেও আছি, এতে সন্ন্যাসটা কোনখানে? যে সহজ সুখের বন্ধনের লোভে লোকে বিয়ে করে, সেই সহজ মুক্তির লোভেই আমি বিয়ে করছিনে। তোমার বিয়ে করে সুখ, আমার সেটা না করে সুখ। সুখের প্রকারভেদ মাত্র। এইমাত্র তফাত। আর ছোট বোন বিয়ে না করাটায় দোষই বা কি!'

নীরা মেয়ে কিনা—বুদ্ধিটি কিছু অদূরদর্শী অর্থাৎ সন্নিকটদর্শী (বিলাতী পণ্ডিতদের মত এটা, আমার নয়)। সে বললে, 'আচ্ছা, সীতেশবাবুকে তোর কেমন লাগে?' (ওদের কলেজের একজন প্রফেসার ওর হাতের কাছের যোগ্য পাত্র!)

রেবা হাসবে না কাঁদবে, ভেবে পেলে না। অবশ্য হাসলই খুব। বললে, 'অর্থাৎ ছেলেরা যেমন মেয়ে দেখে বলে আর একটু ফরসা, আর একটু রোগা বা মোটা কি লম্বা হলে বিয়ে করা যায়। আমি কি এইজন্যে বিয়ে করছিনে? তাই তুই রাম না হলে শ্যাম, না হলে যদু মতি চুনীবাবু ইত্যাদিদের নাম করতে থাকবি, আর আমি সেকালের স্বয়ম্বর সভার রাজকন্যের মত তোর (সখির) মুখে সকলের পরিচয় শুনে বরমাল্য হাতে এগিয়ে যেতে থাকব? না ভাই, তোরা তো বিয়ে কর্। আমার যেদিন মনে হবে সেদিন এসে বলব। তোরা যথারীতি ঘোর ঘটা করে বিয়ে দিয়ে দিস্।'

দাদা অট্টহাস্য করলেন। নীরাও অপ্রস্তুতভাবে হাসতে লাগল। আসলে একমাত্র বোন রেবাকে ফেলে ওদের বিয়ে করতে লজ্জা করছিল।

দাদা শুধু বললেন, 'শঙ্কর কিন্তু বড়ই দুঃখিত হবে।' শঙ্করবাবু বাড়ীর পুরাতন বন্ধু। পাত্রও ভালো।

রেবা ভাবে, শোনো একবার! মনে মনে বলে, বিধাতা যদি ঐ আগে বলা লেখকদের মত আমার হাতে তাঁর কলমটি দিতেন, তাহলে না হয় শঙ্করবাবুর ললাট-লিখনটি কেটে দিয়ে আবার নতুন করে লিখে দিতাম তিনি যাতে সুখী হন এমন কিছু। আর ভাবে, আমি তো দধীচি মুনি নই, যে পরোপকারের জন্যে শরীর দান করব! তাও আমার মৃতদেহ নয়, জ্যান্ত!

২

তারপর থেকে দাদা তর্ক না করে হতাশভাবে নীরার সঙ্গ খুঁজতে থাকে। আর নীরা রেবাকে নিঃসঙ্গতা থেকে রক্ষে করতে এ-বাড়িতে আরো যাওয়া আসা করে। ফলে যা হয়, রেবা আর্টস্কুলেই বেশীক্ষণ থাকে বাড়ি ছেড়ে, নয়ত নিজের ঘরে নিজের কাজ নিয়ে থাকে। ওরা পরম দুঃখে রেবার কথা আলোচনা করতে বসে ভুলে গিয়ে নিজেদের কথাই কয়।

এমন অবস্থায় আর পিসিমাকে না আনলে চলে না। সামনে বৈশাখেই যাতে শুভকাজ করা যায়। বিয়ের যে একটা বাইরের অনুষ্ঠান আছে, সেটা তো সোভিয়েট রাশিয়ার মত সংক্ষিপ্ততম নয়, সুতরাং ছিরি, বরণডালা, পিঁড়ি, আলপনা, শাঁখ, কলাতলা, আইবুড়ো-ভাত, গায়ে-হলুদ, অধিবাস, নান্দীমুখ এসব কে করে?

অবশ্য পিসিমা কাশী থেকে আসার আগেই রেবা পাঁজিতে শুভদিনের নির্ঘণ্ট দেখে বিয়ের দিন ঠিক করে নিয়েছিল। শাঁখ কলাগাছ পদ্মলতার বেড় দিয়ে লাল চিঠিও ছাপিয়েছিল সেই 'যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন' করে।

নতুন কিছু করতে বসেও মানুষ পুরনোর মোহ ছাড়ে না। পিসিমা এসে সব ঠিক দেখে খুব খুশী হলেন, কিন্তু রেবার শঙ্করের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না দেখে খুব রাগও করলেন। শঙ্করের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবটি বহুদিনের। উহ্যভাবে ছিল যদিও।

তারপর? তারপর পিসিমা পুরুতমশাই আর পুরবাসিনী এয়োদের নিয়ে ওদের বিয়ে হয়ে গেল। কেউ বর তুলে নিলে না, কেউ 'কনে' খারাপ বললে না, বরের বাড়ি থেকে তত্ত্বও কেউ ফেরত দিলে না। এবং খবরের কাগজে বেরুল,'স্বর্গীয় অমুকের পুত্রের সঙ্গে শ্রীযুক্ত অমুকের কন্যা কল্যাণীয়া অমুকের শুভ বিবাহ হয়েছে। বহু সম্পন্ন ব্যক্তি নিমন্ত্রিত ছিলেন ও বরপক্ষ যৌতুক গ্রহণ করেননি।'

এবং শঙ্করবাবুও প্রথমে করুণ মুখে রইলেন। তারপর একসময় সহসা হাসিমুখে নানারকম কাজ করতে লাগলেন। ফুলের মালা ও দই পরিবেশনের ভার নিলেন। গল্পের নায়কদের মত কিছুই করলেন না। শেষ অবধি প্রচুর খেলেনও।

অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারটা ফুলের মালা ও দইয়ের হাঁড়ির মত যেমন সুন্দর রঙিন তেমনি স্থূল ও বাস্তব।

রেবার নিজেরও ভারি মজা লাগছিল। কত লোক তাকে ভর্ৎসনা করে গেল বিয়ে করলে না বলে। করুণা করে গেল বিয়ে হল না বলে। জনান্তিকে কেউ কেউ দাদাকে নিন্দা করে গেল, মা বাপ নেই তাই বোনকে ফেলে নিজে বিয়ে করে নিলে বলে।

যাই হোক্, ওদের বিয়ের অষ্টমঙ্গলার পর রেবা পিসিমাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে কাশীতে তার নতুন চাকরিতে চলে গেল।

৩

রেবা ভাবে এবার মুক্ত। মুক্তি এবং মুক্তির নামে আর এক কর্মের বন্ধন।

বিয়ে আর প্রেমের একঘেয়ে ন্যাকামি শুনতে শুনতে তার যেন মনে হত মানুষের এদেশে বুঝি আর কোনো কাজ নেই, শুধু আছে বিয়ে হওয়া আর বিয়ে করা!

পিসিমার যতই দুঃখ হোক, রেবার কাজ যেন তাকে একটা আশ্রয় দিয়েছে। কিছুদিন অন্ততঃ সত্যমিথ্যাময় প্রেমের ছলনা আর বিয়ের কথা থেকে অব্যাহতি পেয়েছে।

তাই মনে হয় যা সহজ আর স্বাভাবিক তাকে শুভ নিগড়ে বেঁধে গণ্ডিতে ঘিরে গোলকধাঁধায় ফেলেছে এরা। মনে মনে ভাবে, প্রেম কোথায় আছে? মরে গেছে, না পচে গেছে?

যা প্রত্যেক মানুষের কাছে চিরনতুন অথচ সৃষ্টির পুরাতনতম আদিমতম বিষয়, তাকে কে জেনেছে শেষ করে, বলতে পেরেছে তার মর্মের চরম কথাটি? নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে?

অন্ততঃ রেবার মনে হয় কেউ পারে না এবং জানেও না। তার মনে হয়, এদের এই প্রেমের অভিজ্ঞতাকে বলা যায় এটা অনেকটা জামাজুতোর মত। সকলেই জামাজুতো পরে, তাতে এ বোঝায় না একজনের জিনিস অন্যের পরা চলবে, গায়ে হবে। তোমার পরা জামা আমার গায়ে হবে না, এ তুমি জানো, কিন্তু তোমার প্রেমের ভালবাসার নজির আমার বেলায় খাটবে না, এ বুঝতে পারো না?

সে ভাবে, তার চেয়ে ওরা একটা প্রেম প্রকরণ ('ফরমূলা') তৈরী করুক না?

অনুরাগ, পূর্বরাগ, সেবা-যত্ন, নেশা-মোহ, সহিষ্ণুতা ধৈর্য সব মিশিয়ে যেখানে যেমন যে দেশে যেমন দেশাচার, ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, তথ্য অনুসারে।

আধুনিকতম সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেম, বারট্রাণ্ড রাসেলের 'ম্যারেজ এণ্ড মরালস'-এর মতের প্রেম, নানা দেশের আদিম ও নব্যতম প্রেমের নানা সিদ্ধান্ত নিয়ে, সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘসূচী প্রেম, জৈব ও আধ্যাত্মিক প্রেম সব নিয়ে, তার পাচক ও জারক ক্ষমতা বিশ্লেষণ করে! (যার শেষ কথা মেয়েদের কতটা জারিয়ে জীর্ণ করতে পারা যায়। ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বটি সম্পূর্ণরূপে হজম করা আর কি!)

৪

নীরার চিঠি আসে প্রায়ই নিজেদের সুখের কথা নিয়ে, আর রেবার বিয়ে না হওয়ার দুঃখের বিলাপের কথা লিখে।

রেবা ভাবে, ভালো বিপদ এদের নিয়ে তো!

উপরে লেখা 'প্রেম প্রকরণে'র কথা সংক্ষেপে লিখে সে চিঠির জবাব দেয়।

ভাই নীরা, তোর চিঠিটার আর সব কথার জবাব তো দিলাম। এখন আমার নতুন চাকরি ও তার কর্তৃপক্ষের কথা বলি শোন্। এটির এরা 'আদর্শ হিন্দু আশ্রম' নাম দিয়েছে। সতীশবাবু সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের নিয়ে একটি স্কুল তৈরী করেছেন।

আমি তাদের একটু পড়াই, আঁকতে শেখাই, মাটির পুতুল গড়তে শেখাই। পড়ার আগে প্রথমে নানাবিধ জন্তু তারা আঁকতে শেখে, গড়তে শেখে। বেশ মজার ব্যাপার তাদের আঁকাটা! কারুর হাতিটা হয় ইঁদুরের মত, কারুর বা ইঁদুরটা হয় হাতীর মত। সাপটা ওরা সহজে আঁকতে পারে, পাখীটাও আঁকে, কিন্তু ব্যাঙ মোটেও আঁকতে পারে না। ওদের চিত্র-বিদ্যা ও ভাস্কর্য শেখাতে গিয়ে মনে হয়, নিজে না চিত্র-বিদ্যাটি ভুলে যাই।

কর্তৃপক্ষটি হচ্ছেন সেই ধরনের লোক, যাঁরা পৃথিবীকে একটা ইউটোপিয়া (রামরাজ্য) বানিয়ে দিতে চান। ইনি পৃথিবীকে নাগালে না পেয়ে কাশীটাকে ধরেছিলেন। এখন তাও সম্পূর্ণ অধিগত হল না, সুতরাং এই স্কুলটি আর তার পঁচিশটি ছাত্রছাত্রী নিয়ে তাঁর এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট বা গবেষণা চলছে। উদ্দেশ্য মহৎ, ওরা নৈতিক ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী থাকবে পঁচিশ বছর অবধি, তারপর খাঁটি বর্ণাশ্রম মতে সংসারী হবে।

শারদা বিলের জন্য গৌরী বা কন্যা মেয়ে দশ বছরের পাবে না, তাই বড় মেয়ে চলবে।

তা তারা যা ইচ্ছে করুক। আমার মতে এখন তারা যদি ছবি আঁকা শেখবার জন্য একটু ভাল করে ড্রয়িং শেখে তো কাজ হয়।

আমি সমস্ত দিন স্কুলে থাকি, সন্ধ্যায় বাড়ী আসি। তাদের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখা, দাঁত মাজা, স্নান করানোর তদ্বির করি।

চুপি চুপি বলি ভাই, আমার ইউটোপিয়ার আদর্শ কিন্তু কিছুটা অন্য, পরিচ্ছন্ন শরীর ও নির্মল মন, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যদি পাওয়া যায়, সকলে পাক।

সে যাক। যদি তোমরা একবার আস তো দেখে অবাক হয়ে যাবে আমার কি অসীম সহিষ্ণুতা। একেবারে বালখিল্য ব্রহ্মচারী দল পরিবেষ্টিত বিশ্বমাতা রূপ! (মানে স্কুল-মাতা।)

এখন অবধি বেশ শান্তিতেই তো ছিলাম।

কিন্তু হেনকালে হঠাৎ গঙ্গার ঘাটে পিসিমার সঙ্গে শঙ্করবাবুর মার দেখা।

তিনি কিঞ্চিৎ দুঃখ ও ক্রোধ প্রকাশ করেছেন আমার উপর। তাঁর ছেলের জন্য মেয়ের আবার ভাবনা কি? তবে কিনা ওঁরা একবার কথা পেড়েছিলেন, তাই সে এখনো ওই মেয়ের পানেই চেয়ে আছে.....এবং 'যাচা কনে'! ইত্যাদি—আর দাদার বিয়ে হয়ে গেলো, বোনের বিয়ে হল না। আশ্চর্য ও লজ্জার কথা নয় কি?

আর পিসিমাকে কে পায়! তাই তো, সত্যিই তো, রজনীরই বা কি আক্কেল! নিজে

বিয়ে করল আর বোন করছে চাকরি। গঙ্গার ঘাটে আমার মুখ দেখানো ভার! তোদের জন্য!

আমি পিসিমাকে বললাম বুঝিয়ে, দাদাও চাকরি করছে। এবং আমারও বিয়ে হতে পারবে ইচ্ছে করলেই। সেটা আমিই ইচ্ছে করিনি।

তারপর বললাম, 'তুমি এক কাজ কর, তুমি ওঁর নাইতে যাবার সময়টা কাটিয়ে দিয়ে গঙ্গায় যেয়ো। তা'হলে আর কথাও বাড়বে না, মুখ দেখানোর অসুবিধেও হবে না!'

পিসিমার ঐ এক যুক্তি ও বিলাপ ঐ প্রবচনটি, 'যাচা কনে', 'বাছা বর'। এবং এরপর আমার আর বিয়ে হবে না কোনোকালে!

বললুম, 'নাই হল।'

পিসিমা রাগে গরগর করতে করতে পুজোর ঘরে ঢুকলেন।

আমি ভাবতে লাগলাম, 'যাচা কনে' অর্থাৎ আমাকে যাচ্‌এ্রা করেছে তারা! কৃতার্থ হয়ে গেলাম! কেউ যাচ্‌এ্রা করেছে বলেই আমি তাকে যাচ্‌এ্রা করব!

মানুষের দেখি মজার স্বভাব, আমরা ছেড়ে দিলেই তারা আঁকড়ে ধরে। সত্যই তো, এই কন্যাদায়ের দেশে কি আর মেয়ে নেই?

পিসিমার বিলাপ আর শঙ্করবাবুর মার বিরাগ-সংবাদ শেষ করি এইখানেই।

হায়রে আমার শান্তি!...ইতি রেবা।

জলের মত দিন, মাস, বছর যে কত এলো গেলো রেবাকে, রেবার দাদাকে, বৌদিকে পরিক্রমা দিয়ে, সে আর কারো মনে নেই।

তার মাঝে আরো দু'চারবার রেবাকে যাচ্‌এ্রা করেছে দু'চারজন। রেবা ফিরেও চায়নি। পিসিমা বিরক্ত হয়েছেন। দাদা নীরা বলে বলে হাল ছেড়ে দিয়েছে। শেষ অবধি পিসিমারও কাশীপ্রাপ্তি হল। দাদা বৌদিও সংসারযাত্রায় ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়ল ছেলেমেয়ে আত্মীয়কুটুম্ব নিয়ে, লোক-লৌকিকতা নিয়ে।

বছরের হিসাব কে রাখে? আর রেবার বয়সের হিসাবই বা কে রেখেছে পিসিমার মৃত্যুর পর? কত বছর হল চাকরি? বয়সও কত হল? এক একবার ভাবে সে। বার বছর? চৌদ্দ বছর? সতীশবাবুর আদর্শ আশ্রম থেকে ছেলেমেয়েরা গেছে কয়েকটি।

তবে ভীষ্মদেব শুকদেবের মতও কেউ হয়নি। রাম লক্ষ্মণের মতও কেউ হয়নি। বর্ণাশ্রমের দ্বিতীয় আশ্রমটিতে ঢুকেছে, চাকরিবাকরি করছে। ম্লেচ্ছ স্কুলে পড়া লোকেদের মতই যতটা পারে সুখের স্বাচ্ছন্দ্যের লোভও করেছে। সন্নিকট আত্মীয়স্বজনকে বাদ দেবারও অভিসন্ধি রাখে আধুনিকতম ভাবেই।

রেবা মনে মনে হাসে। কিন্তু চাকরি ছাড়তে পারেনি। ছেড়ে করবেই বা কি? যেন অন্যমনেই জীবনটা তার কেটে যাচ্ছে।

গরমের ছুটি এলো। বহুদিন পরে রেবা কলকাতায় এলো।

নীরা বেশ গিন্নীবান্নি হয়েছে, দাদাও যেন খুব কর্তাব্যক্তি হয়েছে। নিজের বয়সের কথা রেবার মনে পড়ল না কিন্তু। আশ্চর্য!

এও তো সত্যি, বেশ ভারিসারি চেহারা ওর ছিলও না, হয়ওনি। পিসিমার মৃত্যুর

পর সে অনেক কাল আসেনি, প্রায় পাঁচ বছর। রেবার মনে হল, ওরা আপনার লোক বটে, কিন্তু যেন কত তফাত হয়ে গেছে। যেন ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক। কথাবার্তা কাজকর্ম সবই যেন শহুরে সমসাময়িক দ্রুত চিন্তায় আর আত্মকথায় ভরা। ওদের আশেপাশে যে অন্য কোন কাজ বা কথা অথবা মানুষ আছে, তাদের কথা ওদের মোটেই ভাববার সময় নেই। রেবার অস্তিত্বও যেন আর ওদের মনে থাকতে চাইছে না।

কলেজের জীবনের কথা মনে পড়ল রেবার। মাঝে মাঝে পুরানো কথা তোলে সে, কিন্তু নীরা বা দাদার মোটেই আর সে প্রসঙ্গে আগ্রহ নেই।

৫

রেবার ফেরবার সময় হল কর্মক্ষেত্রে।

রাত্রের গাড়ি। মধ্যম শ্রেণীর একটি কামরায় উঠে সে বসলো। ভিড় মন্দ নয়। কতজন এলো, জায়গা করে নিল বসবার শোবার। দাদা তুলে দিয়ে চলে গেছে।

সহসা শেষ মুহূর্তে একজন পুরুষ একটি মেয়েকে তার দুটি সন্তান নিয়ে গাড়ীতে তুলে দিতে এলেন।

বসবার জায়গা নেই তা নয়, কিন্তু রাত্রের যাত্রীরা বিছানা পেতেছে। বিছানা তুলে নিতে কেউ রাজী নয়। মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটিকে বাক্সের উপর বসিয়ে। বিছানাওয়ালাদের যুক্তি, আগে এসে জায়গা নিয়েছে তারা।

রেবারও বিছানা পাতা অর্ধেক বেঞ্চি। সে একটু ভেবে বললে, 'আমি ওপরে একটা বাঙ্কে উঠে যাচ্ছি, আপনি ওদের নিয়ে এখানে বসুন। বাচ্চাটিকে বিছানা পেতে শুইয়ে দিন।'

সে কৃতজ্ঞও হল। আবার 'না না, সে কি?' তাও বললে।

বেশ সুন্দর ছেলে দুটি। শ্যামবর্ণ দীপ্ত চোখ বুদ্ধিমান চেহারা বড়টির। রেবার মনে হতে লাগল, কার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে যেন ছেলেটির। কে সে? মনে করতে পারলে না। ছোটটি যেমন হৃষ্টপুষ্ট তেমনি সুন্দর ফর্শা।

বাঙ্কের উপর থেকে সে ছেলে দু'টিকে দেখে, তাদের জননীকে দেখে। বিছানা পাতা হল, বেঞ্চির মাঝখানে বাক্স দিয়ে জননী সেখানে বসল। পাছে শিশুটি পড়ে যায়। বড়টির কোনোক্রমে একটু ঠেস দিয়ে শোবার জায়গা করে দিল।

গাড়ি ছেড়ে গেল। যাত্রিনীরা এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে সকলে সকলের দিকে চাইল, নাম ও পরিচয় নিতে বসল। যাত্রাপথের ও গন্তব্যস্থানের কথা হ'তে লাগল।

আপনি কতদূর যাচ্ছেন? ও বাবা দিল্লী? আপনি? কাশী? আপনি? পাটনা? কাশীতে কেন? ছেলেদের মা জিজ্ঞাসা করে। কে আছেন সেখানে? আর একজন বলে।

রেবা হাসে, বলে, 'কেউ নেই, চাকরি করি।'

একজন বর্ষীয়সী বললেন, 'বিয়ে হয়নি বুঝি? মা বাপ নেই? দেখতে তো খাসা।'

রেবা হাসে, উত্তর দেয় না।

অন্য বাঙ্কের উপরের স্তূপাকার বাক্স, হোলড্ অল চোখে পড়ে। লেবেলগুলির নাম চোখে পড়ে, 'হাওড়া টু ডেল্‌হি, এন. কে. মিত্র'।

'হাওড়া টু পাটনা। এস. পি. দত্ত'। 'হাওড়া টু বেনারস' আরেকজনকার নাম!

রেবা শুয়ে পড়ে, ঘুম পায়। যাত্রিনীরাও আপনাদের কথা আলাপ শেষ করে শুয়ে পড়ে।

ভোর হয়ে এলো। বাংলাদেশের শ্যামল মাঠ ঘাট নদী বন আর নেই। গ্রামও আছে, শ্যামলতাও আছে। কিন্তু সেগুলি বাংলাদেশের 'ছায়া সুশীতল নদী কালোজল, ছোট ছোট গ্রামগুলির' মত নয়। রেবার বাঙ্ক থেকে সে দৃশ্য দেখা যায় না, নামতে ইচ্ছা করে। কিন্তু জিনিসপত্র নারী ও শিশুদের নিদ্রিত পুরীতে নামা শক্ত। সে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে যায়।

পাটনা-যাত্রিনী উঠে পড়েছে। ছোট ছেলেটি ঘুমোচ্ছে, মার মত মুখ। বড় ছেলেটিকে কিন্তু কেবলি চেনা-চেনা মনে হয় রেবার।

সহসা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পাটনা জংশন এসে পড়ল।

একটি পুরুষ এসে ডাকল, 'এসো, এসো, নেমে এসো। মমতা, খোকাকে আমার কোলে দাও, ঘুমুচ্ছে। জিনিসপত্র ঠিক আছে তো? এই কুলি, দো আদমী আও। রাত্রে ঘুমুতে পেরেছিলে?'

মেয়েটি বল্লে, 'হ্যাঁ, ভাগ্যিস ইনি ছিলেন, ওই যে বাঙ্কে রয়েছেন। উনি উঠলেন, তাই তো জায়গা পেলাম, নইলে কি আর....। উনিই নিজের জায়গাটুকু দিলেন।'

'ওঃ' বলে পুরুষটি ওপরে চেয়ে দেখলেন, বল্লেন, 'অনেক ধন্যবাদ।'

রেবা তখন উঠে বসেছে। সহসা পুরুষটি বল্লেন, 'রেবা?'

অস্ফুট স্বরে রেবাও বললে আশ্চর্য হয়ে, 'শঙ্করবাবু!'

কুলিরা এসে পড়েছে, জিনিসপত্র নামানো ও অন্য যাত্রী ওঠার ভিড়ের মাঝে মেয়েটি একবার একটু হেসে বললে, 'নামি ভাই। আপনাকে উনি চেনেন দেখছি।'

শঙ্কর নেমে গিয়ে জানলা দিয়ে বললে, 'আচ্ছা। খুব হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। কতকাল পরে।'

রেবা বাঙ্ক থেকে নেমে পড়ল। তাদের তখন প্লাটফরমে জিনিসপত্র কুলির মাথায় তোলা হচ্ছে। ছেলে দুটি মার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। জানলাপথে ওকে দেখতে পেয়ে মেয়েটি আর একবার হাসল, বেশ দাঁতগুলি, চেহারাটিও মন্দ নয়। ছেলেমানুষ দেখতে। একখানি ধানী রংয়ের শাড়ি পরা সাদা ব্লাউজের সঙ্গে। চুলটি সাদাসিধেভাবে বাঁধা। হাতে ক'গাছা চুড়ি, গলায় হার, মাথায় সিঁদুর। বেশ দেখাচ্ছে উস্‌কো-খুস্‌কো চুলে। কত বয়স?....

মাল ওঠানো হল কুলির মাথায়। শঙ্করও একবার কামরার মাঝে চাইল। তখন ভিড়ে ভরে গেছে গাড়ি নতুন যাত্রিনীদের। রেবাকে ভাল করে দেখা গেল না। রেবা অবশ্য দেখতে পেয়েছিল। তার মনে হল আর ভিতরে চাইবার কি দরকার?...কিন্তু।

গাড়ি ছাড়ল। কি ভেবে সে মুখটি একটু ঝুঁকিয়ে বাইরের দিকে চাইল। তারা চলে যাচ্ছে, বেরিয়ে গেল প্লাটফরম থেকে, মেয়েটির ধানী রংয়ের শাড়ী, শার্ট ও হাফপ্যাণ্টপরা ছেলেটি, বাপের কোলে ছোট ছেলে। মুখ হাত ধুয়ে সে ফিরে এসে একটা বেঞ্চির এক কোণে বসল। জানলা দিয়ে অন্যমনে বাইরে চেয়ে রইল।

এবার দানাপুর, তারপর? মনে পড়ে না।

মনে পড়ল মেয়েটির কথা কয়টি, 'উনিই আমায় জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন।' সহসা মনে হল কত নিগূঢ় অর্থ যেন কথাটার! 'জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন।' কোন্ জায়গা, কতটা জায়গা? তার ট্রেনের বসবার জায়গাটুকু শুধু?...

এবার মনে পড়ল পিসিমার কথা 'যাচা কনে'। হ্যাঁ, পিসিমার আট বছর মৃত্যু হয়েছে, তারপর আর তার কথা কেউ ভাবেনি। সে নিজেও ভাবেনি।

কেউ তাকে আর 'যাচ্ঞা'ও করেনি। আর 'যাচ্ঞা' করবার লোকও কেউ আসবে না বোধহয়।

এবারে সহসা মনে হয়, কোনো কারো দুটি বলিষ্ঠ বাহুর মাঝে সেই জায়গাটি ছিল। আর তারই একখানি ঘরে আর দু'একটি কচি হাতের বন্ধনে ঘেরা সে জায়গা। কে সে? শঙ্কর? আর কেউ কিন্তু সে সব জায়গাই ছেড়ে দিয়েছে অনেকদিন আগে। আর কোথাও জায়গা নেই!

উত্তরা, অঘ্রান ১৩৬৪

জবালা

পথে অসম্ভব ভিড় জমেছে। বাড়ির সামনে বসেছে একটি নহবতখানা—বসানো হয়েছে গেটের একদিকে একটি মঞ্চ করে। নিচে দুটো বেঞ্চিতে সানাইওয়ালার দল বসে সানাই বাজিয়ে চলেছে। একদল ব্যাণ্ডপার্টিও রাস্তার ধারে পাতা বেঞ্চিতে বসে আছে, উৎসব জমাট হলে হুকুম-মতো বাজাবার অপেক্ষায়।

সারা পথ এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত আলোয় ঝলমল করছে। নানা রঙের বিদ্যুতের আলোর বাল্‌ব, নানা রঙের পতাকায়, ফানুসের আলোয় উৎসব-বাড়িখানি যেন আলতা-সিঁদুর-চন্দন-মালা-বেনারসী-জরী-জড়োয়ার নানা অলঙ্কার বসনভূষণ পরা নতুন কনেটির মতো সেজে বসে আছে।

শহরে নতুন এসেছি। ভিড় ঠেলে যেতে যেতে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাদের বাড়ি? বিয়েবাড়ি বোধ হচ্ছে। খুব বড়লোক বুঝি?'

বন্ধু বললেন, 'জানো না বুঝি? শশী দত্তর ছেলের বিয়ে। লোহার কারবারী শশি দত্ত। লাল হয়ে গেছেন। এই সেদিন গুলজারবাগে মস্ত বাড়ি করেছেন। ছোট ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন নতুন বাড়িতে এসে।'

'ওঃ। না, আমি তো সবে এসেছি বদলি হয়ে। ওঁর নাম শুনিনি।'

অভ্যাগত নিমন্ত্রিতদের নানাবিধ যানবাহন আর পথিক দর্শকদের এবং ভিখারী যাচকদের ভিড় ঠেলে নানারকম ভোজ্যবস্তুর ঘ্রাণে আমোদিত পথ ছাড়িয়ে পথের অন্য প্রান্তে এসে পৌঁছলাম।

বাঙালী ব্যবসা করে এত বড়লোক হয়েছে, কৌতূহল হল। 'তা শশী দত্ত লোকটি কে? কোথাকার মেয়ে? কলকাতার?'

বন্ধু বললেন, 'নাঃ, কাশীর মেয়ে। ওঃ, তাই তো, তুমি তো কিছুই জানো না শশী দত্তর ইতিহাস।'

আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'এর আবার ইতিহাস কি।'

'বেশ একটু আছে। শুনবে?'

বললুম, 'বলো।'

বন্ধু বললেন : আমারো শোনা কথা। অনেকদিনের কথা হল। বহুদিন আগে একবার এক শীতের সন্ধ্যায় হঠাৎ বৃষ্টি নেমে এলো। পথের লোক যে যেখানে পারে আশ্রয় নিল। কেউ-বা কোনো দোকানঘরে, অনেকে কারুর বাড়ির রকে, কেউ-বা গাছতলায়। ভদ্রলোক, সাধারণ লোক সকলেই ঘেঁষা-ঘেঁষি করে একত্র জড়ো হয়ে দাঁড়াল। বর্ষাকালের বৃষ্টি হলে তো বেশী ভাবনা ছিল না, শীতের সন্ধ্যায় বৃষ্টিতে ভিজলে পরদিনই শুয়ে পড়তে হবে। তারপর পরিণামে হয়ত চারজনের কাঁধে চড়ে নৌকা করে দ্বারভাঙ্গাঘাটে পৌঁছতে হবে। কিন্তু অত ভিড়ের মাঝে মেয়ে একটিই ছিল। কি করে সে বৃষ্টির সময় সঙ্গিনীদের দলছাড়া হয়ে গিয়েছিল, তারা বা কোন্‌দিকে গেল তা বুঝতে পারল না। নিরুপায় হয়ে সে একটা বড় গাছের তলায় এসে দাঁড়াল। বাড়ির রকে অনেক পুরুষ দাঁড়িয়েছিল। সে আর উপরে ওঠেনি।

কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যেই খুব জোরে বৃষ্টি নামল আর মেয়েটি তার কপালের 'টিকুলী', গায়ের 'চোলী', 'ইমামী' রঙের (মহরমের উৎসবের রং) ঘনসবুজ শাড়ী সবসুদ্ধ ভিজে সপসপে হয়ে গেল। কপালের টিকুলী ভেসে গেল—শাড়ী, জামা গায়ে লেপটে গেল।

রকের ওপরের দু'একজন লোক বললে, মাইয়া (মেয়ে) উঠে আয় না? কিন্তু সিক্তবাসা প্রায়-ষোড়শী মেয়েটির এ অবস্থা দেখে রকের ওপরেই দু'একটা ইতরশ্রেণীর লোক গুনগুন করে অশ্লীল গ্রাম্য গান গাইতে শুরু করে দিলে ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে বন্ধুদের দিকে চেয়ে।

মেয়েটি বা রামপতিয়া গ্রামের মেয়ে। গ্রাম্য সঙ্গীত আর ঐ ধরনের ভাব-ভঙ্গী তার অজানা নয়। তার সঙ্গের লোকজনও হারিয়ে গেছে। তারা আপনজন না হলেও, এক জায়গার লোক তো বটে।

সে নিরুপায় ভয়ে ভাবনায় চুপ করে দাঁড়িয়েই ভিজতে লাগল। যারা উপরে উঠে দাঁড়াতে বললে, তাদের কথা শুনতেও ভরসা পেল না ঐ গায়ক দলের ভয়ে। কে জানে ওরা সকলে কেমন। বৃষ্টিও জোরে নামল। রামপতিয়ারও ভয়ে ভাবনায় ভীত চোখেও বৃষ্টির ধারা নেবে এলো। এদিকে গায়কদের গান আরো উত্তাল হয়ে উঠল।

এমন সময়ে একটা ঝড়ঝড়ে ঘোড়ার গাড়ি রকের সামনে এসে দাঁড়াল। আর একটি ভদ্রলোক গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে রকের ওপরে উঠলেন। একটি ভৃত্য এসে বাড়ির দরজা খুলে দিলে। বোঝা গেল তিনি বাড়ির লোক বা মালিক।

তিনি তীক্ষ্ণ চোখে রকের জনতাকে একবার চেয়ে দেখলেন, গাছের তলার মেয়েটির দিকেও চোখ পড়ল।

গানটা তখন সহসা থেমে গেছে। লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। খানিক পরে যখন তিনি আবার একবার বাড়ির রকে এসে দাঁড়ালেন, তখন রক একেবারে খালি—বৃষ্টি কমে এলেও পড়ছে। শুধু গাছতলার মেয়েটি রকের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে—তার সর্বাঙ্গ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে।

একটুখানি কী ভেবে তিনি মেয়েটিকে বললেন, 'তুমি ভিতরে এসে দাঁড়াবে? বৃষ্টি থামলে বাড়ি যেয়ো।'

মেয়েটি ভিতরে এলো। সদরের গলির মধ্যে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছিল। ভদ্রলোক তার দিকে চেয়ে ছিলেন। তারপর ভৃত্যকে বললেন, 'যা, আমার একটা ধুতি এনে ওকে দে। ও কাপড়টা ছাড়ুক রান্নাঘরে গিয়ে। তারপর ওকে একবাটি চা বানিয়ে দে।'

মেয়েটিকে বললেন, 'কাপড় ছাড়ো, চা খাও, তারপর বাড়ি যেয়ো।'

অত ভেজার ফলে মেয়েটি কাপড় ছেড়ে চা খেয়েও ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। এবারে বসবার ঘরের আলোতে দেখা গেল বছর পনের-ষোল বয়স হবে মেয়েটির। শ্যামগৌর রং। অত্যন্ত ভীত ত্রস্ত মুখখানা।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ঘর কোথায়?'

সে শহরের কাছাকাছি এক গ্রামের নাম করল।

'সেখান থেকে এতদূরে এসেছ কেন—কী কাজে?'

মেয়েটি বললে, 'আমার সঙ্গীরা সব মহরমের মেলা দেখতে এসেছিল এখানে, আমিও

সেই সঙ্গে ছিলাম। তারপর এই বৃষ্টিতে তারা হারিয়ে কোন্‌দিকে গেল আর দেখতে পাইনি। তাই এইখানেই দাঁড়িয়েছিলাম।'

এবারে সে বসে পড়ল গুটিয়ে-সুটিয়ে। বেশ বোঝা গেল সে কাঁপছে। একটা কম্বল এনে সদয়ভাবে ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি কাঁপছ। এই কম্বলটা নাও। মুড়ি দিয়ে একটু শুয়ে থাকো। শীত কমবে।'

শীত কমল কিনা, বৃষ্টি থামল কিনা, রাত্রি কত হল কিছুই আর রামপতিয়ার জ্ঞানগম্য হল না।

কোনো সময়ে তার যখন চেতনা ফিরে এলো, সে তখন হাসপাতালের একটা বিছানায় শুয়ে। যে-বাড়িতে সে ছিল, এটা সে বাড়ি নয়। সে আবার চোখ বুজে শুলো।

বিকালবেলা সেই ভদ্রলোক তাকে দেখতে এলেন। তার জ্ঞান ফিরেছে দেখে বললেন, 'আজ তাহলে চোখ খুলেছে। ভালো আছে?' মেয়েটিকে বললেন, 'ভালো আছ? তোমার জ্বর হয়ে গেল। সেই যে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুলে আর ওঠোনি। তখন আমি তোমাকে হাসপাতালে পাঠালাম আজ তিনদিন হল। তুমি একেবারে অঘোরে ছিলে।'

রামপতিয়া চুপ করে নির্বোধের মতো চেয়ে রইল। গ্রাম থেকে মেলায় আসা, হাসপাতাল, গাছতলা, লোকটির বাড়িতে আশ্রয় সব তার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল।

ভদ্রলোক বললেন, 'তাহলে ভালো হয়ে বাড়ি যাবে। তাদের নাম-ঠিকানা বলো। তারা আসতে পারবে খবর দিলে?'

রামপতিয়া ক্লান্তভাবে চোখ বুজলে।

লোকটি বললেন, 'আচ্ছা, আজ থাক।'

কয়েকদিন বাদে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার সময় এলো।

ভদ্রলোক এলেন। বললেন, 'আজ তোমায় ছাড়বে এরা। কোথায় যাবে?'

রামপতিয়া চাদর গায়ে দিয়ে মহরম-রঙা নিজের কাপড়খানি পরে চুপ করে খাটের ওপর বসেছিল।

ভদ্রলোকটির কথায় প্রথমে উত্তর দিলে না। তারপর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। একটি নার্স এসে দাঁড়িয়েছিল ; বললে, 'কাঁদছিস্ কেন? আজ তো বাড়ি যাবি।'

সে চোখ মুছলে, তারপর বললে, 'আমার তো বাড়ি নেই।'

'সেকি! তোর গ্রাম দেশ কোথায়?'

রামপতিয়া গ্রামের নাম বললে, বাপেরও নাম বললে। কিন্তু বললে, 'আমার মা-বাপ তো নেই, সবাই পিলেগে মারা গেছে অনেকদিন। আমাকে আমার এক গ্রামসুবাদে নানীর বাড়িতে গ্রামের লোকেরা রেখে দিয়েছিল। আমি তাদের বাড়ির সব কাজ করতাম, গরু-ছাগলের কাজ করতাম, নানীর পা টিপতাম, তেল মাখাতাম—তারা খেতে পরতে দিত। এতদিন পরে গেলে তারা তাড়িয়ে দেবে, মারবে।'

নার্স অবাক হয়ে চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'তবে ননীবাবু, কি করবেন? কোথায় যাবে ও? আজ তো ওকে যেতেই হবে। আপনিই নিয়ে যান।'

রামপতিয়া এবারে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বললে, 'বাবুজী, আমাকে আপনার বাড়ীতে "দাই" ঝি করে রেখে দিন—আমি সব কাজ করতে পারি। গ্রামে গেলে এতদিন পরে তারা আমাকে আর রাখবে না। জাত নষ্ট হয়ে গেছে বলবে।'

পনের-ষোল বছরের কোমল মুখখানি ক'দিনের রোগে একটু পাণ্ডুর হয়েছে। কিন্তু বিশ্রামের জন্য রঙটা একটু উজ্জ্বল হয়েছে। মুখটির চেহারা এতদিন স্পষ্ট ননীবাবুর চোখে পড়েনি, আজ মনে হল বড় ভীত শঙ্কিত অসহায় মেয়েটি।

কিন্তু নার্সকে বললেন, 'আমি কি করে নিয়ে যাব? আমারো তো বাড়িতে কেউ নেই। একটা চাকর মাত্র থাকে। আমি চাকরি করি, বাড়িতে থাকি না সারাদিন।'

নার্সটি বললে, 'আপনি কোনোখানে চাকরি করতে দিয়ে দেবেন ওকে। আপনি তো বাঙালী। কত জানাশোনা বাড়ী আছে, তারা ছেলেমেয়ের কাজে রেখে দেবে।'

রামপতিয়া চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল আশ্বস্তভাবে। আর ননী দত্ত বিব্রতভাবে একটা ঘোড়ার গাড়িতে তাকে নিয়ে উঠলেন।

নাঃ, রামপতিয়া বা পতিয়ার চাকরি কোথাও হল না।

কেউ বললেন, 'ঐটুকু মেয়ে কী কাজ করবে?'

বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞ কেউ-বা বললেন, 'নাঃ, ওরকম মেয়েকে আগলে বসে থাকবে...।'

কোনো রসিক বয়স্য বললেন, 'তুই-ই রাখ্—তোর ঘরে কেউ তো মেয়ে-মানুষ দেখাশোনা করবার নেই...।'

রামপতিয়া ঘর ঝাঁট দেয়। বাসন মাজে। কাপড় কাচে সাবান দিয়ে। আর ব্যাকুল উদাস মনে বসে থাকে আর মাঝে মাঝে কাঁদে। তাকে ননী দত্ত না পারেন তাড়াতে, আর সেও যেতে ভয় পায়, অথচ গ্রামের জন্যও মন কেমন করে। ননী দত্তর কোন কোন বন্ধুরা—আমার বাবাও একজন বন্ধু ছিলেন—বললেন, 'অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দাও হে—বাঙালী নয়, জানা নয়, চেনা নয়—তোমার এত দায় বা দায়িত্ব কিসের?'

সেকালে অনাথ আশ্রম তেমন কিছু এখানে ছিল না। হিন্দু অনাথ আশ্রম তো নয়ই। দানাপুরে একটা অনাথ আশ্রম ছিল যেন, কিন্তু সেটি খ্রীষ্টানদের।

ননীবাবুর বন্ধুরা বললেন, 'হোক ক্রিশ্চান। তুমি দিয়ে দাও ওখানেই। আর ওর কি জাত-টাত বজায় থাকবে? পথে পথে চাকরিই করবে তো।'

খ্রীষ্টান অনাথ আশ্রমের লোকেরা তাকে নিয়ে যাবে শুনে, রামপতিয়া আকুল অঝোরঝরে কাঁদতে আরম্ভ করলে। আর আহার-নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে কয়লার ঘরের কোণে আশ্রয় নিলে।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে ননী দত্ত ওকে সেখানে পাঠাবার চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। আর কিছু করার আশা বা হালও ছেড়ে দিলেন। তবু মাঝে মাঝে বন্ধুদের বাড়ি 'দাই' বা ঝি করে রাখতে পারা যায় কিনা চেষ্টা করতেন। যদি ভদ্রভাবে দায়মুক্ত হতে পারেন।

এমন সময় মার্চের শেষে সেকালের মতোই সমারোহ ক'রে বিহারের গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে প্লেগের সমাগম হল। প্রথমে দূর গ্রাম, তারপর শহরের নানা বস্তি, তারপরে ঘরে ঘরে—এর বাড়ির কোনো সঙ্কীর্ণ কোণে জলের জালার পাশে, তার বাড়ির ভাঁড়ারের চালের টিনের পাশে, কারুর বাড়ির বাক্সের পিছনে—গলাফুলো অর্ধমৃত ও মরা ইঁদুর দেখা দিতে লাগল। পোড়ো মাঠ বেয়ে, নর্দমার ধার বেয়ে সারি সারি নির্জীব ইঁদুরের পলায়ন অভিযানও দেখা যেতে লাগল।

মানুষও গলা ফুলে ওঠবার আগেই অর্ধমৃত হয়ে উঠল আতঙ্কে। দিনে রাত্রে যখন তখন বাড়ির পাশের বসতি বা বস্তি থেকে, কাছাকাছি পাড়াঘর থেকে কখনো মৃদু কান্নার

গুঞ্জন ওঠে। কখনো উত্তাল উদ্বেল কান্নায় আকাশ বাতাস ভেঙে পড়ে। আর তার পরে দেখা যায় ছোট-বড় বাক্স তোরঙ্গ পেঁটরা মাথায় অথবা জীর্ণ মলিন বিছানা আর কাপড়ের পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় হাতে নিয়ে সারি সারি আতঙ্ক-অভিভূত নরনারী—ছেলেমেয়ে শিশু কোলে নিয়ে, হাত ধরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলেছে পথে—মৃত্যুর করাল প্রসারিত বাহুর সীমানা ছাড়িয়ে যাবার প্রয়াসে ও আশায়। কোথায় যাবে তা তারাও জানে না, আমরাও জানতুম না।

আর বস্তির সঙ্গে প্রাসাদ-অট্টালিকা থেকে নিয়ে সবরকম ঘর-বাড়ির অধিবাসীরাও দেশ ছেড়ে পালাতে লাগলেন। শোন নদের উপরে জনবিরল গ্রামে, রাজগীরের কাছে বিহারের নানা স্থানে নানা পল্লীগ্রামে যেখানে প্লেগের বিস্তৃত আলিঙ্গন তখনো পৌঁছতে পারেনি, সেই সব জায়গায় ছোট-বড় ঘর-বাড়ি নিয়ে লোকেরা আশ্রয় নিলেন।

আর প্রায়-জনশূন্য রাজপথের দুধারে সরকারী 'ঝোপ্‌ড়ী' তৈরী করে প্লেগাক্রান্ত রোগীদের রাখা হতে লাগল। কুম্ভমেলায় সাগরমেলায় তীর্থ-ঝোপ্‌ড়ীর মতো।

ননী দত্ত আপিসের সামান্য কেরানী। বাড়িতে আর কে-বা আছে যে পাঠাবেন তাদের? নিজেরও ছুটি নেই।

বাবা আমাদের পাঠিয়ে দিলেন শোনের ধারের গ্রামে কৈলওয়ারে। পুরুষরা—উকিল ডাক্তার দোকানদার—নানা কর্মচারী—সকলেই নিজের নিজের পরিজন স্ত্রী-পুত্রদের পাঠালেন বটে, নিজেরা কিন্তু যেতে পারলেন না রুজি-রোজগারের দায়ে। চাকরির দায়ে। তাঁরা আসা-যাওয়াও করতেন। প্রাণ হাতে নিয়ে শহরেও বসে থাকতেন।

ননী দত্তও গেলেন না।

হঠাৎ একদিন তাঁর সর্বাঙ্গে ব্যথা হয়ে প্রবল জ্বর হল। চাকরটা বাবার কাছে খবর দিতে গেল মুখ শুকনো করে। বাবা ডাক্তার নিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই, তার শরীর খারাপ লাগছে তাই বাড়ি যাচ্ছে ব'লে চাকরটা পালালো।

বাড়িতে শুধু রামপতিয়া আর রোগী। বাবাও সভয়ে ডাক্তারকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন। সে প্লেগের যে কী ভীষণ আতঙ্ক তুমি বুঝতে পারবে না। দেখতে শুনতে সময় হত না। শরৎ চাটুয্যের 'শ্রীকান্ত'তে নিশ্চয় পড়েছ প্লেগের একটু-আধটু অথচ স্পষ্ট বর্ণনা।

যাই হোক, বাবাও শুকনো মুখে শঙ্কিতভাবে বন্ধুর ঘরে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার নিয়ে।

ডাক্তার নাড়ী টিপে, বগল আর সব গ্ল্যাণ্ডের জায়গা দেখে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত মুখে বাবাকে বললেন, 'না, প্লেগের আক্রমণ হয়নি। মনে হচ্ছে, বসন্ত হবে। গায়ের জ্বর-ব্যথা সেইজন্যেই।'

তারপর চারদিকের আবহাওয়ায়—প্লেগ, মাঝখানে একটি বসন্ত-রোগীকে নিয়ে রামপতিয়া সাবিত্রীর মতো বসে রইল ; এবং বাবা আর ডাক্তার নিয়মিত দেখাশুনা করতে লাগলেন।

তারপর ননী দত্তকে যমের মুখ থেকে একলাই ঐ মেয়েটাই টেনে নিয়ে এলো যেন। বুঝতেই পারছ, এরপর সে তার ঐ 'সাবিত্রী'-ব্রতের পূর্ণফলই পেল। ননী দত্ত তাকে আর কোন জায়গায় পাঠাবার বিশেষ চেষ্টা-চরিত্রও করলেন না। সেও রয়েই গেল।

এবং ক্রমে যেন সে তাঁর একজন আপনার লোকের মতো বা ঘরের লোকের মতো হয়ে উঠলো।

ধর্মরাজ যম তাকে কিছু 'বর' দিয়ে গিয়েছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু একসময়ে তারপরে সে শতপুত্র না হোক, ননী দত্তর এক পুত্রের জননী হয়ে বসল।

এই শশী দত্তই সেই ছেলে।

বিয়ে হল কিনা—হতে পারত কিনা এখনকার মতো মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে রেজিস্ট্রি করে—ননী দত্তর মনে সে-সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিছু হয়েছিল কিনা, ঠিকঠাক কিছুই আমরা শুনিনি। আর তখনকার এদেশের বাঙালী-সমাজে কতখানি তিনি পাঙ্‌ক্তেয় ছিলেন বা না-ছিলেন তাও জানি না। তবে দু'একজন তাঁর বন্ধু, যেমন আমার বাবা আর কেউ কেউ তাঁকে অপাঙ্‌ক্তেয় করেননি। এ ছাড়া তখন সেকালে এখানে সম্পন্ন লালা কায়েত (কায়স্থ), 'বাভন' (যাদের বলে জরাসন্ধের ব্রাহ্মণ)-ঘরে নৈতিক চরিত্র-নিষ্ঠাতে একটু এদিক-ওদিক হলে কিছু এসে যেত না। নিন্দেও হত না। অনেকেরই প্রকাশ্যভাবেই 'অবিদ্যা' থাকত। অবিদ্যাদের সন্তানাদিও থাকত। কমবয়সী রূপবতী দাসীদেরও পরিবারে একটা স্থান থাকত। আমাদের সেকালের বাংলাদেশের জমিদার ও ধনী মহিলাদের মতো এখানকার গৃহিণীরাও এ-সব গলাধঃকরণ করে নিতেন, সন্দেশের মতো না হোক, কুইনাইনের মতো করেই।

সুতরাং 'ননী দত্ত ও রামপতিয়া সংবাদটা'তেও মনে হয় সেকালের বাঙালী-সমাজ তেমন মাথা ঘামায়নি। বিদেশ-বিভূঁইতে একলা মানুষ অমন হয়েই থাকে এই ভেবে।

যাই হোক, ননী দত্ত যে কী ভেবেছিলেন সেটা বাবাও ঠিক জানতেন না। তবে তিনি যেমন অসহায় অনাথ মেয়েটিকে তাড়িয়ে বা সরিয়ে দিতে পারেননি, সে-ও তাঁর জীবন-সংশয়ের দিনে তাঁকে ফেলে যেতে পারেনি। যেন উভয়তঃ মনে একটা দাগ কেটেছিল ঘটনা দুটি।

কিন্তু তারপরে যখন ঘরণীর মতো হয়ে বসল, আর তার সন্তান হল—সে যেন বড়ই সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে সে ঝিয়ের (দাইয়ের) মতোই থাকত। হয়ত তার মনে হত সে ঐ বাঙালী ভদ্রলোকটিকে তার সমাজ থেকে নামিয়ে এনেছে। কোথায় যেন তার একটি ভদ্র মন ছিল, পরে সেটা আরো বোঝা গেল।

ননীবাবু ছেলেটিকে কিন্তু ভালো স্কুলে দিয়ে, পিতৃনাম পরিচয় দিয়ে পড়াতে লাগলেন। দাসীপুত্র বা অবিদ্যাপুত্রের মতো রাখলেন না।

ছেলে লেখাপড়া ভালোই শিখল। বি. এ. পাসও করল। তারপর কেমন ক'রে চোদ্দসালের যুদ্ধের সময়ে পিতাপুত্রে ব্যবসা করে একেবারে ফেঁপে উঠল। বি. এ. পাস, টাকাকড়িও হয়েছে, এবং ছেলেরও বিয়ের বয়স হল। পিতা পুত্রকে নিয়ে কলকাতায় গেলেন।

মা বা রামপতিয়া এখানেই রয়ে গেল। কী ভেবে ননী দত্ত নিয়ে যাননি কে জানে। আমার বাবা গিয়েছিলেন বরযাত্রী হিসেবে।

এই বিয়ের পরই ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠল। প্রায় অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার মতো মেয়ে এলো কলকাতার বেশ সম্পন্ন এক স্বজাতির ঘর থেকে। রূপ নিয়ে, অর্ধেক রাজত্ব না হোক, বেশ-কিছু যৌতুক-গহনা-আসবাব নিয়ে।

স্ত্রী-আচার-মতে বরণ-আচার-অনুষ্ঠান আদির আয়োজন ননী দত্ত বাড়িতে এখানকার

কিছু রাখেননি। রামপতিয়াও কিচ্ছু করেনি। কিন্তু সে গ্রাম্য সরল আনন্দে বিহারের মেয়েদের মতোই কপাল অবধি সিঁদুর প'রে, টিকুলী প'রে, হলদে রঙের একখানি ভালো শাড়ী প'রে দুটি ভরা ঘট দুয়ারের দু'পাশে রেখে নিজের মনের মতো মাঙ্গলিকের কিছু আয়োজন করে রেখেছিল। ঝি বা দাই শ্রেণীর কয়েকটি মেয়েও জড়ো হয়েছিল মঙ্গলগান গাইবার জন্য।

তারপর কয়েকখানা ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই করে যখন ছেলে-বউ নিয়ে ননী দত্ত বাড়িতে উঠলেন—বাবা দাঁড়িয়ে দত্তর পাশে। গ্রামকন্যা রামপতিয়া হাসিমুখে সামনে এসে রূপে-সাজে ঝলমল-করা বাঙালী কনে-বৌ দেখে এত অবাক হয়ে গেল যে এগিয়ে আর এলো না। আস্তে আস্তে পিছিয়ে রান্নাঘরের দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

শশী বৌ-সুদ্ধু এগিয়ে গেল মার কাছে। মাকে প্রণাম করবে বলে বোধহয়। করলও হয়ত। কিন্তু বৌ একেবারে হতবুদ্ধির মতো চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার সঙ্গের ঝি (সেকালে ঝি আসত বিয়ের কনের সঙ্গে) গালে হাত দিয়ে বললে, 'ও কে, জামাইবাবু? পেন্নাম করছ যে?'

অস্পষ্ট স্বরে, মাথা না নুইয়েই কনে-বৌও বলল, 'ও কে?'

বাড়িতে আশেপাশের সমবেত সামান্য লোক-কটির সঙ্গে শশীর বাবা, আমার বাবাও যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। যেন শশীর বাবা, শশী—তারাও বুঝতে পারেননি বা ভাবেন-নি এরকমটা হতে পারে রামপতিয়াকে নিয়ে—তার বেশভূষা নিয়ে।

ইতিমধ্যে রামপতিয়া কিন্তু চট করে কী ভেবে নিয়ে যেন সবদিক সামলে ভাঙা বাংলায় বললে, 'আমি শশীর দাই, ওকে মানুষ করেছি।'

বাবা আর ননী দত্ত বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাবা বললেন, ননী দত্তর মুখটা যেন লজ্জায় কিরকম হয়ে গিয়েছিল। আর শশী? তার বৌ, তার ঝি, তারা কি ভাবল কি করল পরে, সে আর আমরা জানি না। বাবাও বাড়ি ফিরে এলেন।

তারপর আরও কিছুদিন গেল। শশী আর মাকে 'মা' বলত কিনা বা রামপতিয়া কিভাবে থাকত কেউ জানি না। শশীদের কারবারের তখন পুরো মরশুম। অবস্থা বেশ সচ্ছল।

নতুন বউ মনে মনে কী ভেবেছিল তাও কেউ জানে না। কিন্তু তার অবজ্ঞাময় উদ্ধত উগ্র কর্ত্রীত্ব ও আচরণ রামপতিয়া থেকে ননী দত্ত, শশী—সবাইকেই যেন নিজেদের বাড়িতেই তটস্থ কোণঠাসা করে দিয়েছিল।

শুনেছি রামপতিয়া নিচে রান্নাঘর, কয়লার ঘর ছেড়ে আর ওপরে উঠতোই না সহজে। ননী দত্তও নিচের বৈঠকখানাতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। কদাচ ওপরে উঠতেন।

ভীরু ভালোমানুষ রামপতিয়া বেশীদিন আর বাঁচেনি। সামান্য কী অসুখে—বোধহয় ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা যায়।

অসুখ হলে শশীর বাবা একটু দেখাশোনা করতেন। বধূ নেপথ্যে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল, 'বুড়োমানুষের আবার ঝিয়ের জন্য অত দেখাশোনা কেন? আমরা কি দেখছিনে?'—আরো অনেক কথা। কথাগুলো খুবই ইঙ্গিতময় ও নোংরা।

কিন্তু ননী দত্ত তাতে আর ভয় পাননি।

আর রামপতিয়াও মারা গেল।

তারপর এলো শেষকৃত্য, শ্রাদ্ধশান্তির সমস্যা।

ননী দত্ত বিহ্বলভাবে বসে রইলেন। বাবা গেলেন তাঁর বাড়ি। তখন ওঁদের অবস্থা খুব ভালো। সেইটেই হল মুশকিল। ধনী হয়েছেন—লোকজন প্রতিষ্ঠা বেড়েছে। শশীই কি শেষ কাজ করবে? বৌমা তো চারজন ব্রাহ্মণ দিয়ে ঘাটেই ব্যবস্থা করতে চাইল।

লোকেরা যেন চারদিক থেকে চেয়ে দেখছে ওঁদের বাড়িকে। এতদিন পরে যেন ভাবছে, 'কে ঐ রামপতিয়া—শশী কি জানতো না রামপতিয়া—শশীর দাই না মা?—না, বাড়ীর ঝি?'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা শশী কি জানতো না রামপতিয়া ওর মা?'

'কি জানি, ছোটবেলা থেকে তো মা বলেই জানত। হঠাৎ বিয়ের পর দাই শুনে আর সে মা-ও বলেনি, চম্‌কে গিয়েছিল যেন। কিছু জিজ্ঞাসাও করেনি বাপকে। আসলে ওর বিয়ের পর বাড়িতে সহজভাবে আর কেউ ছিল না। বড়লোকের মেয়ে এনে কেমন একটু সংকোচ হয়েছিল। তা ছাড়া মেয়ের তো জাত কুল উঁচু ছিল। আসলে স্পষ্ট কথা শশীও জিজ্ঞাসা করেনি, ননী দত্তও বলেননি তখনো।'

তারপর—বাবা তো সব জানতেন। ননীবাবুকে বললেন, 'শশী যাক শ্মশানে, যা কর্তব্য মনে হয় করবে। তুমি আর কিছু বোলো না।' "গোলে হরিবোল" দেওয়ার মতো শেষ কাজ হল। শ্রাদ্ধও হল। ব্রাহ্মণ-ভোজনও হল। ওরা তখন বড়লোক। লোকে ধন্য-ধন্যও করলে দাইয়ের শ্রাদ্ধে সমারোহের জন্য।

তারপর বেশি কিছু আর নেই। ননীবাবু বুড়ো তো হয়েছিলেনই, আরো শীগ্‌গির বুড়ো হতে লাগলেন। কয়েক বছর বাদে মারা গেলেন। সেই সময়ে একসময় শশীকে ডেকে বাবার সামনে বলে গেলেন শশীর মার জীবনের সব কাহিনীটা। নিজের দুর্বিপাকে পড়া, দয়া করা—তারপর রামপতিয়ার তাঁর দুর্যোগের দিনে জীবন-সংশয়ের দিনে সেবা ও বাঁচিয়ে তোলা—।'

আমি বললাম, 'শশী কী বললে?'

'শশী কী বললে আমি কিছু শুনিনি। তবে তার উদ্ধত স্ত্রীকে সে প্রথম থেকেই ভয় করত। আর তার ছেলেমেয়েও তো হয়েছিল। শশী দত্ত বাপের কাছ থেকে সব স্পষ্টভাবে জেনে মার জন্য দুঃখ পেয়েছিল হয়ত। কেননা বাপের মরার পর সে স্ত্রীকে বড় কেয়ার বা সঙ্কোচ আর করত না। বোধহয় বলেছিল সব কথা। এখন লোকে কানাঘুষো করে—তাই নিজেই ছেলেমেয়েদের বিয়েতে সে আর কলকাতায় গিয়ে ভালো কুল-ঘর দেখে পাত্রপাত্রী খোঁজ করেনি। স্বামী-স্ত্রী কাশীতে গিয়ে কিছুদিন থেকে নিজেদের মতো খুঁতওয়ালা ঘর বংশ দেখে ছেলে আর মেয়ের বিয়ের পাত্র-পাত্রী ঠিক করেছে।'

'তাহলে সে এখন জাতে উঠেছে—না অপাঙ্‌ক্তেয়?'

'ঠিক এখনকার সমাজের জাতে ওঠেনি হয়ত। কিন্তু অগাধ টাকা, ছেলে-মেয়েরা সব শিক্ষিত বিদ্বান—বেশিদিন কুলদোষ থাকবে না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু মেয়েটা অত আশ্চর্য ভদ্রমেয়ের মতো বুদ্ধি কেমন করে পেল ভাবছি।'

বসুধারা, কার্তিক ১৩৬৬

মিছে কথা

পাশাপাশি বাড়ী। তেতলা বাড়ী যাঁদের—তাঁরা বেশ সমৃদ্ধ-ধনী বলা চলে। একটি মেয়ে, দুটি ছেলে, কর্তা-গৃহিণী, কিন্তু আর বড় কেউ নেই—কিন্তু ঝি-চাকর, গাড়ী-মোটর ইত্যাদিতে সমস্তক্ষণ বাড়ী মুখরিত। একতলা বাড়ীতে যাঁরা থাকেন, তাঁরা নিতান্ত গৃহস্থ। কোনক্রমে পৈতৃক জীর্ণ ভদ্রাসন-টুকুতে মাথা গোঁজা চলে, তাও বাইরের দিকের দু'খানি ঘর ভাড়া দেওয়া আছে। এ বাড়ীর কর্তা কোন আপিসে কাজ করেন। ষাটটি টাকা বেতন, স্ত্রী, পাঁচটি মেয়ে, দু'টি তার অবিবাহিতা, একটি ছেলে, একটি বৃদ্ধা বিধবা বোন কর্তার জ্যেষ্ঠা। একটি ঠিকে ঝি প্রচুর উপদেশ বর্ষণ করে, সশব্দে না ভেঙ্গেই বাসনগুলো মেজে দিয়ে যায়।

তেতলা বাড়ীর মেয়ে রেবা সকালে ঘরের গাড়ীতে স্কুলে যায়, ফিরে সন্ধ্যায় মাস্টারের কাছে পড়ে। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে এসেই কোনক্রমে বইখাতাগুলো রেখে মা'র কোলের কাছে ব'সে পড়ে। মা সস্নেহে কপালের চুল সরিয়ে দেন, মাঝে মাঝে বলেন, 'তুই যেন খুকি হচ্ছিস্, হাত মুখ ধো—'

মেয়ে হাসে। মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'খুকি নয় বুঝি—একটাই মেয়ে ত বাপু।'

ও বাড়ীর ছোট মেয়ে দুর্গা সমস্তদিন সংসারের কাজ করে; সকালে ঘরের বাসি পাট সারা—ধোয়া, মোছা, বাবার, ভাই-এর ছাড়া কাপড় কাচা, বাবাকে তামাক দেওয়া, পান সাজা ইত্যাদি, বিকালেও ঐরকম—সন্ধ্যায় পিসীমাকে মহাভারত শোনানো।

দুই বাড়ীর দুই মেয়েতে খুব ভাব। খাবার খেয়েই রেবা দোতলায় পড়বার ঘরের জানালায় দাঁড়ায়—সাথীর প্রতীক্ষায়—দুর্গা কাজের ফাঁকে একটু ছুটি নিয়ে একতলার ছাতে দাঁড়ায়। দুর্গা তার স্কুলের গল্প শোনে, রেবা ওদের বাড়ীর কথা শোনে। সময় বেশী পেলে কি অনুমতি পেলে এ যায় ওর পড়বার ঘরে—নয়ত ও আসে জীর্ণ বাড়ীর চিলের কুঠুরীতে। রেবা খুব কথা কয়, দুর্গা শুধু শোনে। যেখানে রেবা উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসে, দুর্গা ঈষৎ হাসে।

রেবার দাদা বিনয় বি. এস্-সি পড়ছে—দুর্গার দাদাও ওর সঙ্গে পড়ে ছোট থেকেই।

এমনি করে দুটি বাড়ীর দুটি মেয়েতে, দুই ছেলেতে খুব অন্তরঙ্গতা, কিন্তু দুই বাড়ীর কর্তা-গৃহিণী বিশেষ ক'রে তেতলা বাড়ীর ওঁরা, তাদের আনন্দ মিলনে বাধাও দেন না, যোগও দেন না।

ইতিমধ্যে রেবার পনের বছর পার হয়ে এল। দুর্গারও তাই। পিসীমার তাড়ায় দুর্গার দিদি তারার সম্বন্ধ খুঁজতে হল। বড় দুই মেয়েকে গৌরী নয়, কন্যাদান করা হয়েছিল— তৃতীয়ার সময়ে—'কন্যা', নয় তেরো বছরের মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশঃ এদের বেলা দক্ষিণান্তের অব্যবস্থা দেখে দান কেউ নিতে আগ্রহ দেখালে না—কাজেই ঢেউয়ের মতন বছরের স্রোত বয়ে আসতে লাগল। মা ভাবেন, তাই তো কি করে কি হবে—বাবা বলেন, থাক্ না কুলীনের ঘরের মেয়ে, আর এখন তো ওরকম থাকেও। শুধু পিসীমার নির্বন্ধ, তোদের কেমন কথা—ও আবার কেমন কথা—ও আবার কি হয়।—

রেবা এলো বেড়াতে, 'ভাই, আজ ছাতে উঠিস্‌নি?'

'নদিদিকে কা'রা দেখতে এসেছিলেন।'

পিসীমা বললেন, 'বোসো মা।'

'কারা দেখলেন পিসীমা? পছন্দ হল?'

'হ্যাঁ, পছন্দ ত করলে মা। কিন্তু দোজবরে, চার ছেলেমেয়ে—আমার তারার মতন মেয়ে—।'

রেবা চুপ করে রইল। বিবাহ সম্বন্ধে ওরকম পাত্র যে খুব বাঞ্ছনীয় নয়, সেটা বোঝবার বয়স তার হয়েছে।

'জানো দাদা—', রেবা এসে দাদার ঘরে ঢুকলো।

'কি? আজ স্কুলে মায়া কি বললে আর বেলার জামাটা কি বিশ্রী দেখতে?'

বই থেকে মুখ না তুলেই দাদা অনুমান-শাস্ত্রের ওপর নির্ভর করে বোনের কথাটাই বলবার চেষ্টা করলে।

'আঃ—না গো, তুমি এমন জ্বালাও! ওদের বাড়ীতে একজনরা আজ দেখতে এসেছিল।'

'কাদের? বেলাদের?'

'না, না—'

'বলেই ফেল না, এত গৌরচন্দ্রিকা করছিস কেন?'

'যাও—পড়ছেন তো—।'

বই থেকে মুখ তুলে দাদা বললেন, 'তুই বুঝি তবে পড়া জেনে নিতে এসেছিস? উত্তর ত সব কথারি দিলুম, বল কি বলবি বল।'

'নাঃ—আমার তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই—তোমার কাছে পড়ব তাই—', তারপর মুখটা যথাসম্ভব করুণ গম্ভীর ক'রে রেবা বললে, 'ঐ তারাদিদিকে দেখতে এসেছিল আজকে—একটা অনেক বুড়ো বর।'

দাদা হেসে ফেললে, 'তাতে তোর কি? তুই কেন মুখটা ওরকম পেঁচার মতন করছিস—তোর জন্যে ও'রকম সম্বন্ধ আমরা করব না আশ্বাস দিলাম।'

এবারে রেবাও হেসে বললে, 'তা কি বলছি তুমি এমন কর। কিন্তু তারাদিদির জন্যে আমার এমনি দুঃখ হচ্ছে।'

দাদা ওরকম খবরে কোনোরকম কিছুই ভাবান্তর বোধ করেনি...বোনকে ভেঙিয়ে 'আহা তাই তো' ব'লে বই-এর দিকে তাকালে।

'যাও—কি ছেলে তুমি...একটু মায়া-দয়াও নেই।' রেবা মার কাছে গেল। বাবা ইজিচেয়ারে শুয়ে কাগজ পড়ছেন,—মা খাটের কাছে বসে দৈনিক খরচের হিসেব নিচ্ছেন চাকরের কাছ থেকে।

'কি খিদে পেয়েছে?' মেয়ের অসাময়িক আগমনে মা জিগ্‌গেস করলেন।

'না' ব'লে মেয়ে মা'র কোলের ওপর ঝুঁকে খাতা দেখতে লাগল।

'জানো মা, আজ ওদের বাড়ীতে তারাদিদিকে দেখতে এসেছিল।'

'হুঁ শুনেছি। (চাকরকে) তারপর কি বললি? ঠাকুরঘরের মিষ্টি, ফল পৌনে পাঁচ আনা, (কন্যাকে) তা পছন্দ করেছে তো?'

মুখভঙ্গি ক'রে রেবা বললে, 'তা আর করবে না? তার তো চারটে ছেলেমেয়ে আছে।'

'দোজবরে? তা কি করবে—তিনটি মেয়ে পার ক'রে তারার বাপ বুড়োর মতন হয়ে গেছেন, দেনা ত হয়েছে কিছু শুনেছি।'

'আমার এমন দুঃখ হচ্ছে মা, ...বেশ মেয়ে ওরা না মা...?'

'কপাল আসল কথা...। বেশ আর নয় কে বলছে।'

কর্তা বললেন, 'কি রে খুকি, কে বেশ?'

রেবা পালাল। মা হাসলেন, 'ঐ ওদের মিত্তিরদের বাড়ীর মেয়েরা।'

'ওঃ!' কর্তা তামাকের নলটা মুখে তুলে নিলেন,...ওদের সঙ্গে এদের বাড়ীর কি সম্বন্ধ!

২

ওখানে তারার বিয়ে হল না। এদিক ওদিক খোঁজ করতে খবর নিতে নিতে হঠাৎ একদিন তারার বাবা আপিস থেকে অসুস্থ হয়ে ফিরলেন, তারপর সাতদিন মাত্র কাটল...দুটি অবিবাহিতা মেয়ে, স্ত্রী, বোন সবগুলিকে কুড়ি বছরের ছেলের ওপর দিয়ে তিনি চোখ বুজলেন।

তিন মেয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে এলো, মার লক্ষ্মীমূর্তিটিকে দীন নিরাভরণ দেখে তাদের আর একদিনও বাড়ীতে ভাল লাগছিল না।

দুর্গার দাদার পড়া আর হল না, বাবার আপিসে একটা ছোট কাজ নিতে হল।

তেতলাদের পয়সার অভাব নেই, রেবার বেশ ভাল ঘরে ততোধিক ভাল বরে বিয়ে হয়ে গেল।

দাদা এখন এম. এস-সি পড়ছে—। বাবা মা ছেলের বিয়ের কথা প্রকাশ্যে ভাবেন মাঝে মাঝে,...রেবার নেপথ্য উক্তিতে তা দাদার কর্ণগোচর হয়, বিনয় অন্যদিকে চেয়ে স্বগত বোনকে ভেঙায়, রেবা রাগ করে। দাদা বলে, 'তোকে কি বলিছি?' দুজনেই হাসে।

তেতলায় এমনিধারা আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। কিন্তু রেবার যাতায়াত একতলাতেও আছে।

শ্রাবণের সন্ধ্যে, প্রায় রাত্রি। বিনয় মাত্র তার টেনিস্ র‍্যাকেটটি বেশ ক'রে লাগিয়ে স্ক্রু দিয়ে এঁটে রাখছে। বাইরে মৃদু বর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে আবার।

'কি বিষ্টি—না দাদা? আচ্ছা কি ক'রে খেললে আজ? পিছলে পড়ে যায় না?' রেবার অজ্ঞ প্রশ্নে বিনয় হাসলে।

'সে কিনা আমাদের বাঙালী বাড়ীর শ্যাওলাপড়া উঠোন,...তাই তোর মত যেতে আসতে আছাড় খাব।...ঘাস যে রে—তা ছাড়া বিষ্টির দিনে খেলা হয় না। ভেবেছিলাম শুকিয়ে যাবে, তাই ওটা নিয়ে গিয়েছিলাম।'

রেবা চেয়ারখানি টেনে নিয়ে বেশ গুছিয়ে বসল। বিনয় শঙ্কিতভাবে বললে, 'বসলি যে, আমি পড়ব এখন, যা! পালা।'

রেবা বললে, 'আর মোটে তিনটি দিন আছি, তাও সইতে পারছ না, কি মানুষ বাবা! শোনো শোনো একটা কথা আছে। ...জানো, ওদের সেই তারার এখনও বিয়ে হয়নি। কত বয়স হল জানো? এই আমার চেয়ে চার বছরের বড়—মানে প্রায় একুশ বছর। ওর মা, পিসিমা কত দুঃখ করছিলেন আজ।'

'তা কি আমার জন্যে ঠিক করেছিস ওকে?'

'যাও, কি যে কথার ছিরি, ও যে প্রায় তোমারি বয়সী।' কিন্তু আবার একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল, সে বলতে এসেছিল, যদি তার দাদার কোন সদয় বন্ধু ওদের দয়া করে উদ্ধার করে, 'আচ্ছা দাদা, কর না তুমি বিয়ে,—তোমার তো এবার বিয়ে হবেই।'

'কাকে, ঐ তারাদিদিকে!' দাদা সকৌতুকে হাসলে।

'আঃ না গো, দুগিকে। বেশ মেয়েটা, না? তুমি দেখনি ভাল করে আজকাল?...ওরা তো আমাদের ঘর, না? দেখতে তো ভালই, আর গুণও খুব।' বিনয় ভাবছিল চুপ করে...দুর্গাকে সে অনেকবার দেখেছে ছোট্ট থেকে! রেবার কথায় সব যেন ফুটে ওঠে। আজ প্রথম দেখার মতন ভেসে উঠল...স্নিগ্ধ উজ্জ্বল মুখখানি বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত, রং কেমন, সে সম্বন্ধে ওর কোন ধারণাই নেই। মনে হল দুর্গাদের অবস্থা...সহিষ্ণুতা, দুঃখ...ইত্যাদি।

'তুই জ্বালাতন করিস এমনি, তুই শ্বশুরবাড়ী গেলে আমি বাঁচি।'

'হুঁ, তা বাঁচো বই কি। না দাদা, সত্যি তুমি দেখ না ওর বোনের জন্য কারুকে। আর আমি তোমার জন্য মাকে বলি দুগির কথা...বলি? তোমার মত আছে?'

'যাঃ, পাগল আর কি! আমি ছেলেদের বলব'খন। এখন যা দেখি।'

রেবা নাচার হয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বললে, 'আচ্ছা, ভুলো না কিন্তু।'

মা'র আদুরে মেয়ে হলে কি হয়—আদরের হলেই তো অভিমান কম হবে না,— কাজেই কিছু বলতে গেলে মনে হয় মা যদি বিরক্ত হন।

সকালে জল খেতে বসে কথাটা পাড়লে—'মেয়ে তো ভালোই...দাদাও অপছন্দ করবে না।'

মা একেবারে অগ্নিমূর্তি, 'তাই বলি, ঐ পিসি মাগী এই ফন্দি ক'রেছে... তোকে ভালমানুষ পেয়ে তোকে দিয়ে আবার ছেলেকে অবধি বলিয়েছে,... ওমা কি আস্পর্ধা? তাই কি ঘরের মতন ঘর...বলার একটা ছিরি আছে কি!'

'না মা,—ওরা কিচ্ছু জানে না, আমিই তোমাকে বলছিলাম।'

অনুনয়ের সুরে মাকে থামাতে চেষ্টা করতে করতে অভিমানিনী দুহিতার চোখে জল এলো।

'না রে তুই জানিসনি, আজকাল অমনি সব ধরন হয়েছে,—দেখ তো পাশাপাশি থাকা—পটল দুগিকে সর্বদা দেখছে—'

রেবা অভিমানে স্তব্ধ হয়ে কোনক্রমে খাওয়া সেরে উঠে পড়ল।

কথাটা কর্তার কানে উঠলো। একতলা বাড়ীতেও পৌঁছল কেমন ক'রে কে জানে। এ বিষয়ে গৃহিণীর সঙ্গে কর্তার মতভেদ হল না।... হঠাৎ তিন মাসের জন্য বরানগরের বাগানবাড়ীতে যাবার আয়োজনে বাড়ীর মাছি টিক্‌টিকিটি অবধি বিচলিত হয়ে উঠতে লাগল, গোছগাছ—বন্ধ, খোলার জ্বালায়।

একতলার লোকেরা শুনলেন যে ওঁরা নাকি ছেলেমানুষ রেবাকে দিয়ে এইসব অভিসন্ধি সিদ্ধ করবার চেষ্টা ক'রেছেন,...তা'ও যদি কর্তাকে বলেন, গৃহিণীকে মিনতি করেন তো দয়া হয়। না হয় জানাশোনা কোন ছেলের জন্য দেখেন, শোনেন—না একেবারে 'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস'! ওঁরই ছেলেকে ভোলাবার চেষ্টা ইত্যাদি।

দুর্গা মাটিতে মিশিয়ে গেল।—তারা স্তব্ধ হয়ে রইল। মা আর পিসিমা ঘৃণায় ধিক্কারে

প্রতিবাদও করতে পারলেন না—দারিদ্র্যের লজ্জা দুঃখই যথেষ্ট তাঁদের ঘিরে আছে—তার ওপর এ অপবাদ মর্মান্তিক...।

রেবা বেচারা এসব শোনবার আগেই চ'লে গিয়েছিল। সেখান থেকে খবর পেলে মা'র শরীর খারাপ তাই ওখানে যাওয়া হচ্ছে।

বিনয়ের বন্ধুরা উৎফুল্ল হয়ে প্রশ্ন করতে লাগল, 'হ্যাঁরে, ব্যাপার কি? চিরটাকাল তো খোকাই ছিলে, হঠাৎ একি সব?'

'কেমন মেয়েটি হে? লেখাপড়া জানে? তুমি তো শুনি গুড্‌বয়, এমন ডুবে ডুবে জল খেতে শিখলে কেমন ক'রে?'

মার বিরক্তি—বাপের উপেক্ষা,—রেবা অবধি নেই, বিনয় এত অভিভূত হয়ে উঠেছিল...একেবারে বলে বসল, 'না ভাই, সব বাজে মিছে কথা, কে জানে কেমন...।'

'কথা কানে হাঁটে' এবং সব কথাই যেখানে পৌছানো উচিত নয় সেখানে আগে পৌছয়।...এটাও যথাকালে যথাস্থানে পরিবেশিত হয়ে গেল।

অঘ্রাণ মাসের প্রথমে বাড়ি এসে যথোচিতের চেয়ে বেশী সমারোহে বিনয়ের বিয়ে হয়ে গেল। মেয়ে যাকে বলে বাঞ্ছনীয়,—তাই। বাপ হাইকোর্টের উকীল, ছোট মেয়ে, সুন্দরী বলা যায়,—স্কুলের পড়া শেষ করেছে ইত্যাদি। ইত্যাদি। এবং গৃহিণীর সাধ-আহ্লাদের সাধ পরিপূর্ণ হল।

পরিবর্তন সব জিনিসেরই আছে—ঘর-কন্নার ব্যাপারেও তা থাকে। একতলাতে কিন্তু এযাবৎ কোনোরকম পরিবর্তন আসেনি, যা উল্লেখ করা যায়। তারা-দুর্গাদের বিয়ে হয়নি, দাদাও বিয়ে করেনি। মা আর পিসিমা দ্রুতগতি বার্ধক্যের পথে চলেছেন। জীর্ণ বাড়িখানি, ততোধিক জীর্ণ মা, পিসিমা। অজানা ভয়ে-ভাবনায় ভারাতুর মন—তিনটি ভাইবোন। যেন অজ পাড়াগাঁর পোড়ো বাড়িতে জরাগ্রস্ত নিঃসন্তান দম্পতি। নিত্য কাজ সেরে স্তব্ধ মূক হয়ে পড়ে থাকে।

বোনেরা সকালে উঠে রান্না করে আপিসের;—মার সেবা, পিসিমার পরিচর্যা করে। ভাই আপিস যায়, এসে কোনোদিন বিনয়ের কাছে একটু বসে, কোনোদিন আপিসের বাড়তি কাজ নিয়ে পড়ে।

ভাইবোন সকলেরই যেন আপিসের কাজ, আকর্ষণ, আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা, উৎসব কিছুই নেই। মাঝে মাঝে দিদিরা আসে, তাদের ছেলেমেয়েগুলি মনে জাগিয়ে দেয় যে ওরা মানুষ, কলের কুলীমজুর নয়, সত্যি ঘরের মানুষ। মা সেদিন ভাবেন, আহা ওরাও কারুর ঘরের লক্ষ্মী হ'তে পারত—মিথ্যে মা-বাপ হওয়া।

রেবা আসে, তেমনি হাসি মুখ মধুর উজ্জ্বল মূর্তি। সেদিন দুর্গা হাসে, তারা কথা কয়,—পিসিমা উঠে আসেন, মা কুশল প্রশ্ন করেন। তেতলাদের কিন্তু বদল হয়েছিল—বিনয়ের বাপ মারা গেছেন। সব চেয়ে বেশী ওলোট-পালোট হয়ে গেছে হঠাৎ বিনয়ের স্ত্রী তৃতীয় সন্তানজন্মের সময় তার জীবনের সমস্ত সাধ-আশা অসমাপ্ত রেখে চ'লে যাওয়ায়।

অনেকদিন পর এবারে রেবা এ বাড়ীতে এসেছে। ঈষৎ বিমর্ষ। ভাইপোটিকে কোলে নিয়ে নিজের ছেলের হাত ধরে সে এলো।

'এটি বুঝি বিনুর খোকা?'

'হ্যাঁ, মাসিমা!'—রেবার চোখ ছল্‌ছল্‌ করতে লাগল।

মা জিগগেস করলেন; তারা, দুর্গা এসে ছেলেদের কোলে নিলে, আদর করতে লাগল।

সন্ধ্যের পর রেবা উঠলো।...কাল আসবি ভাই? উৎসুক দুর্গা প্রশ্ন করলে। রেবা ফিরে দাঁড়াল—একটু থেমে জিগগেস করলে, তুই যাবি না? দুর্গা স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর মিনতির সুরে বললে, ' না ভাই, তুই আসিস্।'

রেবা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। দুজনেরই পুরানো কথা মনে পড়েছিল।

রেবার মা বিনয়ের বড়ছেলেকে খাওয়াচ্ছিলেন।...'তুই এলি আজ তাই, তবু জেগে আছে, দুটো মুখে দেবে ওদের সঙ্গে ব'সে। আমার যে কি বিড়ম্বনা ক'রে গেছে,—কি আর বলব! আর কি শরীরে শক্তি আছে—না মনের বিলি-ব্যবস্থা আছে... আর এই এক বছরের ওপর হল সে গেছে। পটলই কি কিছু মুখে দেয় বিকেলে...ছেলে যেন বুড়ো হয়ে যাচ্ছে।'

'তা তুই বললি ও-বাড়ীর গিন্নীকে?'

'না মা, আমি পারলুম না।'

'তোদের সবই অনাছিষ্টি...জানা ঘর, মেয়েটি ভাল, তাই বলা, নইলে মেয়ের কি অভাব? কাল বলিস্।'—মা'র বৌয়ের সাধ মিটে গিয়েছিল। এখন দরকার জানা মেয়ে...মৃতার সন্তানদের স্নেহশীলা পালিকা, বিনয়ের সেবাপরায়ণা পরিচর্যাকারিণী স্ত্রী, তাঁর সেবিকা বধূ...। সে হিসেবে দুর্গার মত মেয়ে কোথায় তিনি আর পাবেন...গলার স্বরটি অবধি শুনতে পাওয়া যায় না,...কর্মপটুতাও কম নয়,—নিতান্ত ছোটও নয়। আর নিঃস্ব ছোট ঘর বলা মনে নেই (যা তাঁর প্রথমে আপত্তির হয়েছিল)। তা তাঁর তো আর সে সব সাধ নেই। বধূকে মনে পড়ে তাঁর চোখে জল এল, সত্যই ভালবাসতেন তাকে।

রেবা ভাবছিল, মা কি পূর্ব-প্রত্যাখ্যান একেবারে ভুলে গেছেন...গরীব ব'লে কি ও'রা দুঃখও পায় না—কি ভাববে! ছিঃ।

কিন্তু দুর্গার পিসিমা রেবাকে আশীর্বাদ ক'রে চিবুক স্পর্শ ক'রে চুম্বন ক'রে কথার ভাবে এতেই আনন্দ প্রকাশ করলেন যে রেবা ভাববার অবধি অবকাশ পেলো না যে, সে কিভাবে কথাটা ব'লেছিল। মা'ও চুপ ক'রে রইলেন, অমত তাঁরও ছিল না...শরীর মন ভেঙে পড়েছে, নিঃসহায়—ভেবেও প্রতীকার হয় না...করবারও উপায় নেই। এ তো আশার অতীত।

আর যে যার বরকনে—নইলে আগেই বা কথা হয়েছিল কেন? বৌটিই বা যাবে কেন? সবই ভবিতব্য...খণ্ডানো কি যায়...আশ্বস্তভাবে ভাজে ননদে দু'চারটি কথা হল।

সকালে দুর্গারা খেতে বসেছে, সেজদিদি এসেছিল,—তিন বোনে হাসিগল্পে খাওয়া হচ্ছে। মা সেজো মেয়েকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, 'রেবা এসেছে যে, আহা, ওদের বিপদের কথা জানিস তো...ছোট দু'টি ছেলে নিয়ে ও-বাড়ীর গিন্নী একেবারে অস্থির হয়ে যাচ্ছেন,...বিনুরও বড় কষ্ট হয়েছে...তা রেবাই কি আসতে পায়...এই এতদিনে আবার এসেছে। সেই তখন এসেছিল।'

সেজ মেয়ে মা'র দিকে চাইলে। তার রেবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা খুব বেশী ছিল না, সমবয়সীও নয়, তবে জানাশোনা আছে।...সহজভাবেই শুধু বললে, 'বিনুর বৌটির কথা বলছ মা? এবারের ছেলেটি বুঝি নেই?'

'হ্যাঁ। আহা, গিন্নী অনেকদিন ধরে ছেলেকে বলছেন, তা মত আর হয় না...।'

মেয়েরা যে যা'র খাওয়াতেই মনোযোগ দিয়েছিল...। সব চুপচাপ। মা আপন মনে কথা কইছিলেন, 'তা ওরা দুগ্‌গাকে চায়,...ভবিতব্যি কে খণ্ডাবে বল, ওর সঙ্গে একবার কথাও 'হয়েছিল। আর ওদের একটা হিল্লে না হলে তো আমি মরেও নিশ্চিন্ত হব না।'

'ওকি রে, উঠলি যে? অম্বল নে!'

'আমার খাওয়া হয়ে গেছে মা।' দুর্গার আঁচানো হল। 'সেজদিদির খোকা কাঁদছে যেন।'

'বৌ যেন কি— মেয়েটার খাওয়া অবধি হ'তে দিলে না। একি আর সেকাল আমাদের! ওরা সব বড় হয়েছে—', ননদ এদের দুজনকে অম্বল দিতে দিতে রাগ করলেন।

মা বললেন, 'তা আর কি ওঁরা পাবেন!' তাঁর অবসাদ-ক্লান্ত মন, ভাঙ্গা শরীর ভাবনার ভার আর বইতে পারে না।

দুর্গা ঘুমন্ত খোকাকে জাগিয়ে কোলে নিয়ে নানারকম ঘুমপাড়ানী ছড়া গেয়েও কিছুতে সামলাতে পারলে না। চোখটি মুছে মুছে লাল হয়ে উঠলো।

সেজদিদি এসে খোকাকে নিলে। তারা আর ঘরে ঢুকলো না।

স্তব্ধ দুপুর। মা, পিসিমা ঘুমুচ্ছেন। সেজদিদি তার খোকাকে বুকের কাছে নিয়ে ঘুমুচ্ছে। তারা বোনের মুখ দেখে সব বুঝতে পারছিল, সে-ও বই পড়ার ভান করে একখানা মাসিক হাতে নিয়ে শুয়েছিল। বাসনওয়ালা ঢং ঢং করে চলে গেল—দূরে কোন বাড়ীর ঝি এসে কড়া নাড়ছে। দুর্গা ভাঁড়ারঘরে আচার— আমসত্ব—বড়ির হাঁড়িকুঁড়ি শিশি হাতে নিয়ে ব্যস্ত, কতক ছাতে রৌদ্রে ছড়ানো, কতক ঘরে ছত্রাকার।...নির্মল নীল মুক্ত আকাশ...অনেক দূরে বোসেদের বাড়ির দুটি পেয়ারা গাছ—অসংখ্য বাড়ির ভিড় থেকে সবুজ হয়ে দেখা যাচ্ছে। ...পথে লোক নেই, দু'একটি পথিক এক-আধবার দেখা যাচ্ছে...ক্লান্ত শিথিল মন কখনো ক্ষিপ্রহাতে কখনো অলসভাবে সব নাড়াচাড়া করছে। তারা চুপি চুপি উঠে এলো, বোনের পিঠে হাত রাখলে—।

'দুগি।'

দুগি দিদির কাঁধে মুখটা লুকিয়ে ফেললে।

রেবা এলো রাত্রে। দাদার খোকা ও'কে ছাড়ে না, তাকে নিয়েই এলো। দুর্গা রান্নাঘরে রুটি বেলছে।

মা ইঙ্গিতে রেবাকে ডাকলেন, 'আমি তো কিছু বুঝলাম না মা। ওরা বড় হয়েছে... তবে আমার তো অমত নেই...আর চিরকালটা ভাবতে পারি না।' মার চোখ ভরে এল।

রেবা বুঝতে পারলে, একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'সে কোথায় মাসিমা?'

'এই তো রান্নাঘরে ছিলো, হয়ত ছাতে গেছে—'

দুর্গা ছাতের আলসের উপর হেঁট হয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়ে ছিল।

রেবা এসে তাকে জড়িয়ে ধরলে, তারপর কানের পাশে মুখ রেখে বললে, 'আমার ওপর রাগ করিছিস্ ভাই?'

দুর্গা চোখটা মুছে ফেলে বললে, 'না ভাই।'

'যাবিনি ভাই আমাদের ঘরে?'

দুর্গা অনেকক্ষণ সখীর কাঁধটা জড়িয়ে থেকে শেষে বললে, 'নদি'-কে হয় না?'

'কেন ভাই? তোকেই আমরা চাই।'

দুর্গা চুপ ক'রে রইল।

'মার বড় কষ্ট হচ্ছে, আর মাও তোকেই চান। দাদা আগে মত করেনি তো—এই ক'বছর কত বলেছেন। এবারে তোর কথায় আর অমত করেনি।'

রেবার হাতের ওপর টপ-টপ ক'রে ক'ফোঁটা জল ঝরে পড়ল। রেবা স্তব্ধ হয়ে রইল। সমস্ত কথা দুজনেরই দু'বাড়িরই মনে আছে—শুধু দুই বাড়ির মা ছাড়া—

'তুই আগের কথা ভাবছিস ভাই?...মার ভয়ে সে-সব কথা হয়েছিল। ও চিরকালই তোদের স্নেহ করে শ্রদ্ধা করে...থাক্ গে ভাই...তোর মার কথাও ভাব।'

খোকারা ঘুমিয়ে পড়েছে...মেয়েরা নেমে এলো।

সাধের কাজ তো নয়। এবারের সমারোহ উৎসবের কিছু উদ্যোগ নেই।

বিনয় বোনের কাছে সব শুনেছিল। চুপ করে রইল। তার মনের ভাব শুধু অন্তর্যামীই জানলেন। মার তো নির্বন্ধ, অথচ তার কোনো সঙ্কোচ লজ্জা কিছুই নেই। যেন উচিত মূল্যে বাজার করা।

রেবার স্বামী এলেন। জিগগেস করলেন, 'তা'হলে এতদিনে তুমি মত করালে।'

'যে ক'রে হয়েছে! সব কথাই তো জানো, ওরাও সব শুনেছিল।'

'আহা! মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী, না? তা দেখতে কেমন?'

'বেশ। আমার চেয়ে ঢের ভালো। দেখতে পাবে'খন।'

'বটে, তোমার চেয়ে যখন—।'

'হয়েছে, থাম তো। আচ্ছা দেখবে? এসো, ঐ যে।'—স্বামীর বাহু স্পর্শ ক'রে ইঙ্গিতে জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির একতলাতে দেখালে। একটি মেয়ে মাথা নীচু ক'রে রুটি বেলছে। রান্নাঘরের উনুনের আঁচ আর প্রদীপের আলো মুখে পড়েছে। রাঙাপাড় শাড়ীর আঁচলখানা গলাবেষ্টন ক'রে বুকের পাশে গুটি-তিন-চারি চুলসুদ্ধ পড়েছে। চুলগুলি অযত্নরচিত, যেন জড় করে জড়ানো, নত মুখখানি বিষণ্ণ মাধুর্যের আভাসে ভরা যেন। ঘন পল্লবনত চোখ, দূর থেকে মনে হচ্ছে ঘুমের দেশের প্রতিমা,—জেগে নেই।

'বাঃ, বেশ মেয়ে! তা তোমরা এঁকে পছন্দ করনি তখন? অবশ্য তোমাদের সে বৌ-ঠাকরুণও ভাল ছিলেন। তবে বাড়ির পাশে এমন মেয়ে—।'

মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে রেবা বললে, 'মার মত হয়নি।'

মিশ্র একটা মনোভাবের মাঝে শুভকাজের দিন এগিয়ে এলো। আনন্দ নিরানন্দ দুই বাড়ীতেই। সবচেয়ে বড় কথা, সেটা সকলেরই মনে ছিল, দুই মা এবং পাত্র পাত্রী দু'জনেরই,—শুধু নিশ্চিন্ত হওয়া।

বিনয় ভাবে একরকম, কত কি,—যেন যুগযুগান্তর, কত জীবন, কত জন্মান্তর...।

দুর্গা ভাবে, আকাশপাতাল, কি করে বাঁচবে ওখানে গিয়ে,—রেবা তো থাকবে না...। চোখে জলও আসে না। ওরা তো চায়নি কখনও। আবার হাসি পায়, কেউই তো কখনো চায়নি...।

'ও রেবা মা, তুমি আজকে সন্ধ্যেবেলা সব শুভকর্ম করিয়ে যাবে। থাকবে এখানে,'—দুর্গার মা ডাকলেন।

রেবা হাসলে, 'আচ্ছা মাসীমা।'

'কিহে, অমন মুখ করে রয়েছ কেন? খাসা মেয়ে!' ভগিনীপতি শ্যালকের পিঠ চাপড়ে দিলেন।

কনের চার বোন, বরের এক বোন, নিকট-সম্পর্কীয়া আত্মীয়া দু'চারজনই,—কিন্তু ছোট্ট বাড়ী, বরযাত্রী আর ঐ কটি লোকে ভরে উঠেছে।

স্ত্রী-আচার...শুভদৃষ্টি...চারদিকে মেয়েপুরুষের ভিড়। দুই পক্ষের ভগ্নীপতিরা পিঁড়ি নিয়ে,...মাথার ওপর কাপড় ঢেকে দিলে। নাপিত ছড়া বলতে লাগল...।

রেবা উঁকি মারলে, বিনয়ের চোখ নীচু।

'ওকি দাদা, মুখ তোলো? চোখ তোল্ ভাই, শুভদৃষ্টি করতে হয়...।'

বিনয় চাইলে, দেখলে হঠাৎ নাড়া-পাওয়া সকালবেলার শিশির-ভেজা গাছের মতন দুর্গার মুদিত চোখ থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ল। বিনয়ের দৃষ্টি আপনিই নীচু হয়ে গেল।

রেবা মৃদুস্বরে, 'ছিঃ ভাই' বলে সরে এল।

বরকনেকে সম্প্রদানের জায়গায় নিয়ে আসা হল।

বিজলী, ১ম বর্ষ, ১৩২৭

প্রতিলোম

অবশেষে সুনেত্রা রায়ের বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেল ব্রজেন্দ্র বোসের সঙ্গে।

সেই ব্রজেন্দ্র, যার শিক্ষিত মেয়েদের ওপর শ্রদ্ধা ও মোহের অন্ত ছিল না। মফস্বল শহর থেকে পাস-করা ছেলে কলকাতায় এসেছিল বি. এ-পড়ার সময়ে। পথেঘাটে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের ভিড়ে সে অবাক হয়ে গেল, মুগ্ধ হয়ে গেল।

কি করে আলাপ হবে, কেমন করে চেনা-পরিচয় হবে, ভাবতে ভাবতে অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এসে এম. এ-পড়বার সময়ে চেনা হল সুনেত্রা রায়, সাবিত্রী সেন, রমা মিত্র, আশা মুখার্জীদের সঙ্গে, আরো কত কে জানে।

কারো বা দরকার বই, কারো নোট, কারুর বা বোনার পশম, কারুর বা বিশেষ নম্বরের বোনার কাঁটা, কারুর কালোবাজার থেকে যোগাড় করা কিছু জিনিস—এমনি অধ্যবসায়ে ব্রজেন্দ্র প্রায় সকলের চেনা হয়ে গেল। যার যা দরকার হয় তারা হয় ব্রজেন্দ্রকে বলে, আর নয় তাদের বন্ধুরা বলে যে ব্রজেন্দ্রবাবুকে বল না, ঠিক খুঁজে এনে দেবেন।

সুনেত্রারও অমনি করে একদিন পরিচয় হয়েছিল কি একখানা বই কেনবার দরকারে। পড়ার বই নয়, গল্পের বই। যুদ্ধের বাজারে পেঙ্গুইনেরও অনেক নাম করা বই এসে পৌছতো না, সবই সৈন্যদের দিকে বেরিয়ে চলে যেত বোধ হয়।

সে বইখানা 'এথেল ম্যানিন'-এর। তারপর আরেকখানা আরো কোন এক খ্যাতনামা লেখকের। এমনি করে পরিচয় হয়ে গেল। ব্রজেন্দ্রের মুগ্ধ-ভক্ত দৃষ্টির সামনে সুনেত্রার নিজেকে খুব বড় মনে হয়েছিল পড়াশুনায় ও শিক্ষায়। আর একটু হাসিও এসেছিল ব্রজেন্দ্রের গ্রাম্য ধরনে, সরল মুগ্ধতায়। তিন চার বৎসরের কলকাতা বাসেও তার সেই প্রথম কলকাতা দেখার আশ্চর্য হওয়ার মোহ কাটেনি। নতুন সবই তার কাছে এখনো যেন নতুনভাবেই দেখা দেয়। সে কলকাতার সাধারণ ছেলের মত অনায়াসে কোনো কিছুকে অবজ্ঞা করতে পারে না বা নিরাসক্তভাবে দেখতে পারে না। তা মানুষই হোক, আর তার শিক্ষাই হোক আর কোন জিনিসই হোক আর বই-ই হোক।

সুনেত্রা অন্যমনস্ক হয়ে অবাক হয়ে ভাবে। তার সঙ্গিনী-সহপাঠিনীদের কথা মনে পড়ে। তারা বলে, 'ব্রজেন্দ্রবাবু কিন্তু আশ্চর্য মানুষ—সব দেখলেই অবাক হয়ে যান। সত্যি কি এত সরল?'

সাবিত্রী সেন বলেছিল, 'উপকারে খুব লাগেন বটে—কিন্তু যেন বড় পানসে লোকটি। যেন ওঁর নিজের কিছুই নেই।'

রমা মিত্র বলেছিল, 'এতদিন শহরে থেকেও যেন কোনখানে ওঁর একটা মফস্বল ভাব রয়ে গেছে, যেটা ওঁর একেবারে জন্মগত।'

আশা বললে, 'সেইটেই তো ওঁর সরলতা, যা দিয়ে উনি সর্বত্র এগিয়ে আসতে পারেন!'

সুনেত্রা শুধু হাসছিল। তার যে কোন মোহ জন্মেছিল ব্রজেন্দ্রের ওপর তা নয়,—অথবা—ভাল লাগতো তাও নয়। কিন্তু সব সময়ে দরকারী কাজ করিয়ে নেওয়া,—যখন তখন উপকার পাওয়া, তারও তো একটা ঋণ আছে! প্রকাশ্য না হোক—উহ্য ঋণও তো থাকে।

কিন্তু...কিছু কিন্তুর পর তার মনে হয়েছিল সত্যিই কি ছেলেটির কিছু ব্যক্তিত্ব নেই? উপকারে লাগেন বটে, কাজও করেন বটে, কিন্তু সেটাই কি সব? মোহ জাগাবার জন্য, ভাল লাগার জন্য উপকার বা কাজ পাওয়াই সব নয়। উপকার তো কৃতজ্ঞতাতেই শেষ হয়ে গেল।

এই তো নীরেন মিত্র আছে, কাজ কিছুই করে না কারুর, পড়াশুনাও ব্রজেন্দ্রের চেয়ে কম, তবু ওই গায়ে-পড়া ভাব তো নেই। সেও তো মফস্বল থেকে আসা ছেলে। দোষ তাহলে গ্রামের না কিসের? তার মনে হয় ব্রজেন্দ্র যেন ভাল মলাট দেওয়া খেলো বই। ভেতরে কিছুই নেই! কিন্তু ওপরেই বা কি আছে?

সে যাক। সুনেত্রা ভাবে ভাল তো ওকে কোনদিন লাগেনি, ভালোবাসেওনি। অথচ কেমন করে এই বিয়ের যে ঠিক হোল! কিন্তু আসলে তো বিয়ের ঠিকও নয়! হাসি পরিহাসের মাঝখান থেকে সহপাঠিনীরা কি করে রটিয়ে দিল এ বিয়ের কথা!

ব্রজেন্দ্রের যেন অধ্যবসায়ের শেষ ছিল না। শেষ অবধি মা আর বাবার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল, একদিন কি করে বাড়িতে। তারপর এবারে মার উপকার করা শুরু হয়ে গেল। বাবার জন্যে ওষুধ, ছোট বোনের জন্য মাথার পাঞ্জাবী "চুটলা"—রেশমের চুলবাঁধার ফিতের গোছা, খোকার জন্যে মার্বেল, লজেঞ্চুস, মেজভাই অসীমের পড়াশুনা দেখিয়ে দেওয়া। বিনা পয়সায় এম. এ. পড়া মাস্টার, মা বাবার কৃতজ্ঞতার শেষ থাকে না।

তারপর হঠাৎ তাঁরা আবিষ্কার করলেন, ব্রজেন্দ্র তাঁদেরই জাত এবং অন্য কোনো বাধাও নেই গোত্র বা পর্যায় নিয়ে।

কি অদ্ভুত সৌভাগ্য সুনেত্রার! তাঁরা ভাবেন আর সকলের কাছে বার বার প্রকাশ্যে বলেন, স্বগত বলেন, নেপথ্যে বলেন।

হলই বা মেয়ে এম. এ. পড়া, আর বড়, আর অর্জনক্ষম এবং এখনকার "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'—শাস্ত্রোল্লিখিত নিয়ম এবং অলিখিত চিরকালের নিয়ম সে এখনও আছে।

'চাকরি করবে? চাকরি? কেন? ব্রজেন্দ্র কিসে মন্দ পাত্র? ওকে বিয়ে করতে তোমার কি আপত্তিটা জানতে পারি?" বাবা বল্লেন অতর্কিতে সকালে চা খাবার সময়। টেবিলে নয়, এমনি রান্নাঘরে সকলে বসে চা খাওয়া হচ্ছিল,—একখানা করে পাঁউরুটির টুকরো আর একবাটি করে চা নিয়ে। মাঘ মাস। বাবা ঘরেই চা খেয়ে দাড়ি কামাবার জন্য গরম জল দিতে বলতে এসেছিলেন, হঠাৎ সুনেত্রাকে আর তার মাকে ওই কথা বলে চলে গেলেন। আর সকলে তখন খেয়ে চলে গেছেন।

আগের দিন রাত্রে সুনেত্রা মাকে বলেছিল, সে চাকরি করবে পাশ করে। আর... অনেক কষ্টে বলেছিল, ব্রজেন্দ্রবাবু বেশ লোক, কিন্তু এখন বিয়ে ও করবে না।

মা চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন, 'বয়স কত হোল মনে আছে? পঁচিশের পর আর বিয়ে কোনদিন হবে? সকলে তোমার চেয়ে বয়সে ছোটই রয়ে যাবে। আর ব্রজেন্দ্রের মত ছেলে পথেঘাটে পাওয়া যাবে? তুমি বিয়ে না করলেই ওর বিয়ে হবে না ভেবেছ? কালই শুনবে বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে!' মা রাগ হলে 'তুমি' বলেন। এবং অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে শেষে বল্লেন 'জন্মে আর বিয়ে হবে? ওই সেবা-রেবাদের হোল বিয়ে? দেখতে পাও না? চিরকাল বসে আছে আইবুড়ো হয়ে।'

সত্যি বিয়ে না হওয়া যে কতবড় পরাজয়, তা সেবা-রেবাদের দেখলে বোঝা যায়। পাসও করেছে, সম্মানিত মেয়েদের মত চাকরি-বাকরি করে না, সম্ভ্রমসহকারে ঘরেই বসে বাপভাইয়ের অন্ন খায়, দেখতে ভাল, কাজকর্মও জানে—কিন্তু তাদের যেন লজ্জার

সীমা নেই। জীবনযাত্রায় মা বাপ থাকতে বিয়ে হোল না, আর বছরের পর বছর দুনিয়ার আজেবাজে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, বোশেখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণে, অঘ্রাণ-মাঘ-ফাল্গুনে!

মা আবার বিরক্ত হয়েই বল্লেন, 'এমন কি সেবা-রেবাদের ছোটবোনেরও বিয়ে হয়ে গেল।'

সুনেত্রা অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করেই ছিল। তার মনে পড়লো ছোটবোনের বিয়ের দিনে সেবা-রেবাদের কি রকম অপ্রস্তুত মুখ থেকে কাজ করা। যেন কি একটা লজ্জার কারণ পরাজয়ের ভাব রয়েছে কোথায়, তাদের মনে, মুখে, গায়ে, বেঁচে থাকায়। আর কি বিজয়িনীর মত দীপ্ত মুখের ভাব তাদের সেই বোন শুভার। যেন জগতে বুঝি বিয়ে প্রথম তারই হল।

কেমন যেন সুনেত্রার ভয় হয়। আচ্ছা, একেবারে বিয়ে হবে নাই বা কেন? হতেও ত পারে একদিন। আবার সাহস করে ভাবে—আর নাই যদি হয়? তা হলেই বা কি? ওইরকমই লজ্জিত অপ্রতিভভাবে যে বেঁচে থাকতে হবে তারই বা কি মানে? তবে সত্যি বিয়ে হওয়া শক্ত। কেননা, জাতে যদি না হয় মা বাবা রাগ করবেন, মত দেবেন না। আর সেও হয়তো করতে পারবে না! কিন্তু অনেকের তো হচ্ছে! তবু...তাহলে? তাহলে কি এখনই ওইভাবেই বিয়ে করা উচিত।

সকাল কেটে যায়, সন্ধ্যে কেটে যায়, রাত্রি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সুনেত্রার ভাবনাও শেষ হয় না। আর কোন মীমাংসাও হয় না। স্পষ্ট করেও বলতে পারে না,—বিয়ে করবেই না। পালিয়ে গিয়ে চাকরি করবারও সাহস নেই,— লোকে কি বলবে মনে হয়। লোকে যেন সবাই তারই দিকে তাকিয়ে আছে। জানে, তা নয়, তবু লোককে ভয়ের তার শেষ নেই। পৃথিবীর যত মাসী পিসী খুড়ো জ্যাঠা স্বজন বন্ধু সকলের কথাকেই তার ভয়। নিরুপায় সুনেত্রা সময় নেই অসময় নেই, কেবলই ভাবে।

আর ব্রজেনকেও দেখতে ভালো লাগে না, যতই সে ঘনিষ্ঠভাবে তার সঙ্গে মেশার চেষ্টা করে, তার কাজে লাগার সাধনা করে।

আগে সে যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতো এখন তার চেয়ে সেজে পরিচ্ছন্ন হয়ে, হয়তো একটু দামী কাপড়-চোপড় পরে বা একটু সেন্ট মেখে আসে। আর যেন সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে সুনেত্রাকে আরাধনা করে। কিন্তু সুনেত্রা সেই যে চোখ নামিয়ে নেয় বই-এর ওপর, খাতার ওপর, আর ক্লাস শেষ হওয়া অবধি তোলে না।

কিন্তু ব্রজেন্দ্রের অধ্যবসায় একেবারে ছিদ্রহীন। সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুনেত্রাদের বাড়ি যায়, সেখানেও তার তো কম কাজ নেই। মা বাবা ভাই বোনেরা তার অমায়িকতায় একেবারে মুগ্ধ। অসীমের পড়া বলে দেওয়া হয়, চা খাওয়া হয়, সামান্য কোনো দরকার থাকলে তাও করে দেয়। তবু সুনেত্রা ফেরে না। মেয়েদের হস্টেলে বসে থাকে, নয়তো কোনো বন্ধুর বাড়ি যায়। কিন্তু কোনোক্রমেই কোনো ফাঁক মেলে না, যেখান থেকে দুর্বলপ্রকৃতি নিন্দাভীত সুনেত্রা ছুতো করে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে,—সকলের মত নিয়ে সকলের মন রেখে দুনিয়ার কাছে যথোচিত ভাল হয়ে।

মন মাঝে মাঝে অন্যদিক দিয়েও ভাববার চেষ্টা করে, কেন ব্রজেন্দ্র তো মন্দ নয় দেখতে বা লেখাপড়াতেও, কিংবা বংশগৌরবে, জাতে অথবা অন্য ছেলেদের সঙ্গে তুলনায়। কিন্তু কোনখান থেকে তার হাসি, না কথা, না তার অস্তিত্বই কে জানে কি সুনেত্রার কেমন গ্রাম্য লাগে। কিছুতেই ভাল লাগে না। যেন তার চেয়ে অনেক বিষয়ে সে ছোট, কম।

আবার ভাবে, মেয়েরা কেন এমন? শিক্ষিত পুরুষ তো তার চেয়ে ঢের বোকা, নির্বোধ, একেবারে নিরেট অশিক্ষিতও নিয়ে দিন কাটিয়ে দেয়, তার তো কোনো ক্ষোভ জাগে না। মেয়েদের এই হীনম্মন্যতা পুরুষকে নিজের চেয়ে বড় করে দেখবার আকাঙ্ক্ষা— কেন? কোনো মেয়েই কখনও তার চেয়ে নিকৃষ্টতর কারুকে ভালবাসতে পারলো না কেন? তা হলে কি মেয়েদের স্বভাবই এমনি, যে সে নিজেই ছোট হয়ে থাকতে চায়!

সুনেত্রার ভাল লাগে না আর ভাবতে, অত্যন্ত ক্লান্ত লাগে নিজেকে। তবু ভাবে, অসংলগ্নভাবে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে ভাবে, জেগে বসে ভাবে।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর বাড়ি এসে শুনলো মা বল্লেন,—কাল ব্রজেন্দ্রের বাবা ওকে আশীর্বাদ করতে আসবেন। মা খুব বুদ্ধিমতী, না বুঝেই তিনি জানতেন সুনেত্রার বড় ভয় নিন্দাকে, কথাকে, তাই তিনি সকলের সামনে সুনেত্রার বাবা ভগ্নীপতি আরও কার কার সামনে ও কথা বল্লেন। আর বল্লেন—তাঁদের ইচ্ছে এই শ্রাবণ মাসেই বিয়ে হয়, এই সতেরই শ্রাবণ।

সুনেত্রা অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো। বাবার মুখ গম্ভীর, মার মুখ স্মিত, ভগ্নীপতির মুখ হাস্যবিকশিত। তার মুখে কোনো কথাই এল না। কারুরই আসে না, প্রবল বাবা, বুদ্ধিমতী কৌশলী মা, আর ঠাট্টা করবে এমন ভগ্নীপতির সামনে। তারপর চোখ নামিয়ে নিল, শুধু জিভটা বিস্বাদ হয়ে গেল, মনটা অসাড় হয়ে গেল।

আলো সানাই ফুল লোকজনের ভোজ ও সুনেত্রার উপবাসের মাঝে সতেরই শ্রাবণ এসে পড়লো। ষোলই তাঁরা ওকে গায়ে হলুদ দিয়ে দিলেন, ব্রজেন্দ্রের বাড়ি থেকে আসা রূপার বাটি করে তার গায়ে-ছোঁয়ানো তেল-হলুদ-চন্দন দিয়ে। একখানা লালপাড় শাড়ি ঝি-নাপতিনীদের মত খালি গায়ে পরে সে একটা হলুদ-দেওয়া পাড়ের মাদুরে মাথা নীচু করে বসেছিল অসাড়ভাবে, যেন সেকালের ছোট মেয়ে কনের মত। উলু আর শাঁখের শব্দের মধ্যে তার গায়ে ঐ ব্রজেন্দ্রপ্রসাদী হলুদটা ছোঁয়ানো হয়ে গেল। তার একটা কি রকম অস্বস্তি হতে লাগলো, কিন্তু তার ভাববার মত কোনো কথা আর স্পষ্ট হয়ে মনে থাকছে না, সব ভাবনা কাজের আর লোকের মাঝখানে হারিয়ে যাচ্ছে।

তারপর তাকে চন্দন পরিয়ে নতুন দামী শাড়ি ও গহনা পরিয়ে প্রদীপ জ্বেলে, শাঁখ বাজিয়ে, সিন্দুকে তোলা প্রকাণ্ড সেকেলে থালায় করে আইবুড়ভাত খেতে বসান হোল।

মা জিজ্ঞাসা করলেন কাকে, 'আগে কি খাবে?'

বোধহয় কোনো ঠাকুমা হবেন, তিনি বল্লেন, 'আগে মাছ আর পরমান্ন খাবে।' তারপর হেসে বল্লেন, 'এই চব্বিশ বছরের আইবুড়ো থেকে ভাত খাওয়া আজ শেষ হোল।'

সুনেত্রা বিশুষ্ক বিবর্ণমুখে একবার তাঁর দিকে চাইলো। তারপর মনে হল—'আর কিছু করা যাবে না! সত্যি সত্যি সব শেষ হয়ে গেল।'

কে যেন বলে উঠলো, 'খেতে আরম্ভ কর্।' উলুধ্বনি আর শাঁখের শব্দের মাঝে সে থালায় হাত রাখলো।

পরদিন অধিবাস এলো। তাদের দেওয়া বারাণসী শাড়ি পরে সে তাদের পাঠানো মাছ বাঁ হাতে করে তুলে ধরলো। নান্দীমুখ হল। নানারকম ছোটখাটো কি সব বরণটরন হল।

তারপর রাত্রে বর এলো। আর ব্রজেন্দ্র নয়। আজ থেকে বর হয়ে গেল।

চণ্ডীর পুঁথি কোলে নিয়ে, "আভাঙা" জলে হাত ডুবিয়ে, আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে বসে রইলো কাঠের মত সুনেত্রা। তার শুধু মনে হতে লাগলো একই কথা—আর ব্রজেন্দ্র নয়,—'বর' এসেছে। বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

আচার অনুষ্ঠানের নিয়মের মাঝে বাসর হয়ে গেল। তার পরের দিন তাদের বাড়ি।

কিন্তু সে বাড়ি আর নতুন মনে হল না,—নিজের বাড়িতেও তার আর নিজের পুরানো কিছু মনে থাকছিল না। সে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। তাদের বাড়িতে 'কালরাত্রি' এল। সুনেত্রা অস্পষ্ট ভাবনার মাঝে ক্লান্তভাবে ঘুমোয় আর জেগে ওঠে। মনে হয় আজকের পর আর 'কালরাত্রি' নেই। 'চিরকাল' শুরু হয়ে যাবে!

ফুলশয্যার তত্ত্বর থালা মাথায় করা লোকজন নিয়ে উনিশে শ্রাবণ এল পরদিন।

আবার সুনেত্রা সাজে। এবারে মা বাবার তত্ত্বয়-দেওয়া দামী শাড়ি পরে, চন্দন পরান হয়, ফুলের গহনা পরতে হয়। অসংখ্য মেয়েদের ভিড়ের মাঝে, বাজে হালকা হাসি-রসিকতার মাঝে হাতের সুতো খোলা হয়, ছোট ছোট মেয়েলী আচার প্রথামত কি সব করায় তারা।

আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে ফুলের গহনা পরা সুনেত্রা নিস্তব্ধ বিবর্ণমুখে বসে থাকে ব্রজেন্দ্রের পাশে। ব্রজেন্দ্র খুশী মনে কথাবার্তা কয় মেয়েদের সঙ্গে।

রাত্রি গভীর হতে থাকে। ব্রজেন্দ্র হাই তোলে, আর মেয়েরা অসভ্যের মত হাসে। পিঁড়িতে বসে সুনেত্রা ভাবে অনাদিকাল থেকে চলে আসা এই বিয়ের কথা, কোটি কোটি মেয়ের কথা। হঠাৎ ছোট হয়ে যায়—সেই কোটি কোটি মেয়ের শ্রেণী,—মনে হয় মা, ঠাকুমা, তার মা, তারও মা, প্র-প্র-প্রপিতামহী, মাতামহী অন্যসব স্বজন জানা অজানা সকলেরই কথা, এমনি করেই যাদের বিয়ে হয়েছে। তাদের ভাল লেগেছিল? তাঁরা ভালবেসেছিল?

সহসা চমক ভেঙে যায়,—দেখে, ঘরে মেয়েরা আর নেই। আর, ব্রজেন্দ্র উঠে দাঁড়িয়েছে। দরজা বন্ধ করে সিল্কের পাঞ্জাবীটা সে ছেড়ে টাঙিয়ে দিল আলনায়। গেঞ্জির ওপর গলায় তার বাবার পাঠানো ফুলের মালাটা পরা, হাতে বিয়ের আংটিটা ঝকঝক করে উঠলো।

সুনেত্রা তার দিকে চেয়ে রইলো।

ব্রজেন্দ্র আলো নিভিয়ে দিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ালো, তার গায়ের সেন্টের আর গলার মালার গন্ধ সুনেত্রার নাকে এল। সে চকিত হয়ে সরে দাঁড়ালো।

ব্রজেন্দ্র একটু অবাক্ হয়ে গেল, তারপর বল্লে, 'শোবে না?'

যে সাহস অনেকদিন আগে করা উচিত ছিল, যা করতে পারেনি সে তখন, আজ একেবারে নিরর্থক বৃথা সেই সাহস তার মনে এল।

পথের দিকের একটি জান্‌লায় বসে পড়ে সে শুধু বল্লে, 'শুতে ইচ্ছা করছে না।' অন্ধকারে ব্রজেন্দ্র তার মুখের কিছুই দেখতে পেল না।

একবার মৃদুভাবে বল্লে, 'আমিও বসি?'

সুনেত্রা কিছুই বল্লে না। কলেজের বইতে মুখ ডুবিয়ে বসে থাকার মত পথের দিকে চেয়ে রইলো।

আধ-অন্ধকার ঘরে ধাতুমূর্তির মত কঠিন বিমুখ সুনেত্রার দিকে চেয়ে ব্রজেন্দ্র যেন সহসা বুঝতে পারলে, এতদিন পরে, সেই মাথা নীচু ক'রে পড়ার, বইখাতাতে মুখ নীচু করে বসে থাকা ওর লজ্জা নয়, সঙ্কোচ নয়! ও তাকে সহ্য করতে পারতো না,—পারে না।

সুনেত্রা শুষ্কভাবে ভাবতে থাকে, অনাদিকালের পূর্বপিতামহীদের কথা, যাঁরা এমনিভাবেই বিবাহিত হতেন...।

ব্রজেন্দ্র যে তার কাছে বসবার চেষ্টা করেছিল এবং উঠে গেছে কখন, কিছুই সে জানতে পারল না।

গল্পভারতী, ১৩৫৫

লেডিস ক্লাব

লেডিস ক্লাব, ওরফে মহিলামণ্ডল। সুভূষিতা দিশী, স্বল্পভূষিতা বিলিতী, চুড়িদার, পেশোয়াজ, কাবলীওয়ালার পাজামা পাঞ্জাবি, ঘাগরা ওড়না, শাড়ি ইত্যাদি পরিবৃতা সালঙ্কারা সর্বজাতি নারীমণ্ডল। উদ্দেশ্য মহৎ। কেউ বলেন আত্মোন্নতি; কেউ স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারিণী সভা, কেউ সম্মিলনী ব'লে থাকেন।

বীণার দিদি বললেন, কিছু নয় রে ভাই, খালি সময় কাটানো, চল না গিয়ে দেখবি।

স্ত্রীকে বাধা দিয়ে বীণার ভগ্নীপতি বললেন, না রে বীণা, এই গয়না-কাপড়গুলো প'রে সেজে-গুজে সভ্যভাবে পরচর্চা করা। ও তো মহিলামণ্ডল নয়, মহিলা-গণ্ডগোল।

দিদি রেগে গেলেন, থাম মশাই, নিজেদের যেন পরচর্চা করা হয় না! আর আপনাদের এক একটা সুটে এক একটা গয়নার ধাক্কা যায় না বুঝি? ওঁর কথা শুনিস তো শোন, নইলে যাবি তো চল।

বীণা অপ্রস্তুত হয়ে হাসে, জামাইবাবু, আপনি বড় জ্বালাতন করেন। কিন্তু আমি থাকি না ভাই।

আহা চল না। তোকে ফেলে আমি কি ক'রে যাই?

বীণা আরও অপ্রস্তুত হয়ে বললে, আমি যে কথাই কইতে পারি না, আর ছাই এ প'রে গেলে হবে তো?

জামাইবাবু ধমক খেয়ে ধূমপানে মন দিয়েছিলেন, এখন করুণ স্নেহে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তা হবে না কেন? তুই আমার শালখানা নে না, হবে'খন।

দিদি সমর্থন ক'রে বললেন, যা শিগগির তা হ'লে, আয়।

জামাইবাবু বললেন, চল, আমি বেরুবার সময় তোমাদের নাবিয়ে দিয়ে যাব'খন। নে তো বীণু শিগগির ক'রে, তোর দিদির এখন প্রসাধন করতেই দেখ না সাড়ে ছটা হয়ে যাবে। তুই এক কাজ কর, আমার রিস্টওয়াচটা আর তোর দিদির চটিটা প'রে নে।

যান, আবার আমার সঙ্গে লাগলেন!—বীণা হাসলে। দুদিনের জন্যে আসা, আঃ, দিদি আবার কি বিপদে ফেললে!

মস্ত বাগান। তমাল তালী নারিকেলের সার নেই, আছে শিমূল, পলাশ, নিম, বট, অশ্বত্থ, দেবদারু, শিশু, জাম, আম এমনই কত কি বনস্পতি-অবনস্পতির স্নিগ্ধ ছায়া; মাটিতে ঘাস, টবে মরশুমি ফুল।

স্ত্রীজাতীয়া মালী, ঘাস মাটি পরিষ্কার করতে, গাছে জল দিতে ব্যস্ত। শতরঞ্জি পাতা, বেঞ্চি পাতা, দেশী, বিলাতী দু'রকম ব্যবস্থা।

বীণার দিদি পৌঁছলেন স্মিত হাস্যে।

নমস্তে মাতাজী; নমস্তে বহিনজী। ওমা, কেমন আছিস? দিদি যে। সেদিন তো আসেন-নি! সেলাম, নমস্কার, প্রণাম ইত্যাকার নানাদেশী অভিবাদন সমাপ্ত হ'ল।

দিদি বসলেন বেঞ্চিতে, সুতরাং বীণুও তাই বসল। জনান্তিকে মৃদু ভাষণে দিদি বললেন, ওই যে পাজামা পরা, ও হচ্ছে ইসলাম—

নবাগতা গাছের আড়ালে পড়লেন।

পুরুষমানুষ? তুমি যে বললে মেয়েদের বাগান?

পুরুষ কেন? এখানকার ফয়েজ আলি খাঁ উকিলের মেয়ে। দেখালেন, মাথায় ওড়না পরা একটি সুশ্রী বালিকা। নবাগতা সমবেত সকলকেই আদাবরজ ক'রে স্মিত হাস্যে আসন গ্রহণ করলেন।

কি নাম ভাই?

দিদি খুব মৃদুস্বরে বললেন, কি জানি, বুঝি একটা উন্নেসা আছে। ওই দেখ, ওই কমলকুঁয়র সূরযকুঁয়র চন্দ্রকান্তা প্রকাশরা এল।

ভাই, এ কি সবাই এমনই ধারা নামের? সবিস্ময়ে বীণা দেখছিল। সুন্দর কোমল শ্রী-মতী সুন্দরী কয়েকটি বালিকা।

তিনজন মেম প্রবেশ করলেন।

হ্যালো মিসেস মুখার্জি; গুড ইভনিং মিসেস রামদয়াল; ইয়েস; কোয়াইট ওয়েল—ধন্যবাদ-জ্ঞাপন ও নানাবিধ শিষ্টাচার চলতে লাগল।

দিদি বললেন, উনি হচ্ছেন এখানকার মণ্ডলের সেক্রেটারি মিস ক্লেয়ার।

তিনি এসে পড়লেন দিদির কাছে; মধুর কৃত্রিম হাস্যে ইংরেজীতে দিদিকে বললেন; হ্যালো, তুমি আসিয়াছ।

দিদির ইংরেজী প্রায় না জানাই, মিস ক্লেয়ার শুধরে নিয়ে তারপর হিন্দীতে বললেন, টুম আয়া—বড়া খুশিকা বাট।

দিদি বললেন, আপকি বড়ি মেহেরবানি।

দিদি বাঁধা গৎ গুটিকতক ইংরেজীমিশ্র হিন্দীতে কোনক্রমে ব'লে দিতেন। ইংরেজীমিশ্র হিন্দী আর অবিশুদ্ধ হিন্দী, তাতেই 'সীতা নাড়ে হাত, আর নাড়ে মাথা' ক'রে আলাপ-আলোচনা চলে।

দিদি নিজের ভগিনীর সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলেন, মেরি বহিন।

ভারী আনন্দিত হলাম, বড় আনন্দের কথা তুমি এসেছ, বড়ি খুশিকি বাট।

দিদি টিপে দিলেন, বল না—আমিও খুব আনন্দিত হলাম।

বীণা গম্ভীর অপ্রস্তুত মুখে ঘেমে কনে-দেখার মতন অপ্রতিভ হয়ে রইল, ও হিন্দীও জানে না।

দিদি বললেন, ও ভেরী শাই মেমসাহেব, ওরও খুব ভাল লেগেছে।

মিস ক্লেয়ারের পঁচিশ বৎসর এদেশে কেটেছে, দিশী ধরন-ধারণ তাঁর আয়ত্ত হয়ে গেছে, এবারে তিনি অকৃত্রিম হাস্যে 'ইয়েস, ইয়েস' বলতে বলতে অন্যত্র গমন করলেন।

দিদি বললেন, মাগো, তুই কি সং, একটা কথাও কইবি না?

পাশের একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপকি বহিন?

দিদি বললেন, জী, হাঁ।

মিস মেরী ইন্দ্র, মিস মিনি লাল প্রবেশ করলেন—বালিকাবিদ্যালয়ের দেশী খ্রীস্টান শিক্ষয়িত্রী।

আগমনীর পালা সাঙ্গ হয়ে এল প্রায়, ওদিকে ব্যাডমিন্টন, ক্রোকে খেলা আরম্ভ হল।

বয়ঃকনিষ্ঠারা—পালকের বলের সঙ্গে যাঁরা উড্ডীয়মান হতে পারেন, তাঁরা গেলেন

সেই খেলায়; পরিণতবয়স্করা গেলেন কাঠের লম্বা হাতুড়ি দিয়ে ভারী ভারী কাঠের বল ঠেলতে ক্রোকের ক্ষেত্রে।

তার চেয়ে স্থবিররা আর অনিচ্ছুকরা ব'সে ব'সে গল্পই করতে লাগলেন।

মিস ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, মিসেস মুখার্জি, যদি কিছু মনে না করেন তো জিজ্ঞাসা করি, এই বালিকাটি কেন সাদা পরা?

সাভরণা দিদি এবং নিরাভরণা বীণা সমান রাঙা হয়ে উঠলেন, ব্যাকুলভাবে দিদি বললেন, উসকা পতি নেহি হ্যায়।

পার্শী, মুসলমানী, পেশোয়ারী সব উৎকর্ণ আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল।

মিস ইন্দ্র বললেন, তা ইনি সাদাই পরবেন?

দিদি বললেন, জী হাঁ, আমাদের এইসি রীত হ্যায়।

জনান্তিকে পার্শ্ববর্তিনী একজনকে পেশোয়ারী বললেন, ইয়ে ক্যা গজব! (একি অদ্ভুত!)

মুসলমানী বললেন, বাঃ, ইয়ে হিন্দুওঁকী রীতে এইসী ভাই। মেরে ঘরকে পাশ এক থি, পট্‌নেমে যব থে।

মিস মিনি লাল প্রকাশ্যেই বললেন, আরে, এইসি রেওয়াজ এ হ্যায়। আমি যখন বাল্যকালে হিন্দু ছিলাম, আমার মনে আছে, খানাপিনা তক সব বাতোঁ মে জুদা।— করুণ নেত্রে তিনি বীণার পানে চাইলেন।

মিস ক্রেয়ার এসে পড়লেন খেলার সঙ্গী সংগ্রহ করতে। কথার ব্যক্তিগত প্রবাহ সংযত হয়ে গেল।

বীণা বললে, চল ভাই।

দিদি উঠতে যান। মিস লাল বললেন, বহিনজী, কিছু মনে না করেন তো বলি, ঈশার আশ্রয় কত উদার!

মেম বললেন, কিসের কথা? সমাজের? সত্য কথা পুওর গার্ল! তা আপনারাও তো এখন আবার বিবাহ দেন?

বীণার অপ্রস্তুতের সীমা ছিল না, রাম, রাম, দিদি, চল না!

দিদি হিমসিম খেয়ে বললেন, নেহি, আমাদের জাতে ইয়ে রীত পছন্দ নেহি।

সেলাম, নমস্তে, আদাবরজ ক'রে বিদায় নেওয়া হ'ল।

মুসলমানী পেশোয়ারীকে বললেন, বিচারীকে ক্যা তক্‌লিফ।

মেম করুণ হাস্যে মিস ইন্দ্র আর মিস লালের দিকে চাইলেন, মিস লালরা খুব গর্বিত হয়ে উঠলেন।

হিন্দুরা কিছুই বললেন না।

কি রে, কেমন দেখলি?—জামাইবাবু প্রশ্ন করলেন।

রাম রাম! আবার বলে, এদের কি দুঃখ! ছাই জামাইবাবু। বীণার তখনও অস্বস্তি যায়নি।

জামাইবাবু জিজ্ঞাসুনেত্রে দিদির দিকে চাইলেন, তোমার বোন বলে কি?

দিদি কোলের খোকা আর নিজের অর্ধপরিত্যক্ত বেশভূষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, ব'ল না। যা হাড় জ্বালিয়েছে আজ সবাই মিলে। বীণুর কেন সাদা কাপড়—যা তা!

তাই বুঝি শুধু? আবার বলে, আমাদের ধর্ম কেমন ভাল!—বীণা অপ্রস্তুতভাবে বললে।

জামাইবাবু সবিস্ময়ে বললেন, কে রে, কে বললে, মিস ক্রেয়ার?

না গো, ওইসব মিস ঈশামুসা।—দিদি বললেন।

ওরা তো বলবেই। তাই বল। তা তোর ভাল লাগল না?

না, কি সব কথা কয়, না ছিরি না ছাঁদ, সুখী হলুম, সুখী হলুম, বড্ড ভাল, কি মিষ্টি—

জামাইবাবু পুলকিত হয়ে অট্টহাস্যে বললেন, ঠিক বলেছিস, ওইরকমই আরম্ভ। কিন্তু তোর দিদির—হ্যাঁগা, তোমার তো খুব ভাল লাগে, না?

তা মন্দ তো নয়, আজকেই কেমন বীণুকে ওই ওরা কটা পেয়ে বসেছিল, অন্যদিন তো কথাবার্তা মন্দ হয় না।

দেখলি, ওঁর ভাল লাগে। ওঁদের কিনা অন্যদিন গয়না-কাপড়ের চর্চা আর সব ভাল ভাল কথা হয় কিনা!

হ্যাঁ। আয় রে বীণা।—দিদি সভ্রূভঙ্গে খোকাকে নিয়ে পাশের ঘরে উঠে গেলেন।

আর এক সন্ধ্যা।

বেস্পতিবার।

দিদি বললেন, ওগো, আমাদের আজ মাসিক অধিবেশন, অন্য সপ্তাহে না গেলেও চলে, আজকে চাঁদা দিতে হবে, আবার সব কি নিয়ম আছে—উপস্থিত থাকতে হবে। নাবিয়ে দিয়ে যেও।

হরি হরি! তোমাদের নাবানো মানে ছটা থেকে কেবল ঘড়ি দেখা আর তাড়া দেওয়া।

অপ্রিয় সত্য শুনলে কার না রাগ হয়, সত্য হ'লেই বা! কোলে ছিল খোকা সায়াহ্ন-প্রসাধনের প্রয়োজনে। দিদি খোকার মুখখানা সজোরে মুছিয়ে দিলেন, কি অপরিষ্কার ক'রে যে রাখে! খোকা কিন্তু সেটা নীরবে সহ্য করলে না।

উপক্রমণিকাটা উপসংহারে কি দাঁড়াতে পারে ভেবে জামাইবাবু শঙ্কিতভাবে চুরুটটা নাবিয়ে বললেন, তা তোমাকে আগে দিয়ে আসুক না? এই কিষণ, হরদয়ালকো বোলো মোটর নিকালনে।

সেটা কি ভাগাড়, না স্টেশন যে আগে থাকতে গিয়ে প'ড়ে থাকব? দিদির ঘড়ির দিকে আপনিই দৃষ্টি পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে জামাইবাবুরও আপনিই সেদিকে নজর পড়ল। দেখলেন, সাড়ে পাঁচটা। কিন্তু ভাগাড়ের সঙ্গে স্টেশনের, আর দিদির সঙ্গে তাদের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে—মনে হ'ল, কিন্তু সেটা আলোচনার সময় নয়, সুতরাং—

তা হ'লে নয় আমাকে পৌঁছে এসে তোমায় নিয়ে যাবে? এই কিষণ, মানা করো, থোড়া পিছে।

অতখানি যাবে আসবে, তার চেয়ে নাবিয়ে দেওয়া বুঝি বড় কষ্ট? থাকগে, আর যাব না, এবারে বলে আসব।

দিদির মুখখানা উপক্রমণিকার আষাঢ়ের মত হয়ে এল।

ক্যালেণ্ডারে বৃহস্পতিবার চোখে পড়ল। ছাই ক্লাবও কি বেস্পতিবারেই বসে! ঝগড়া হবে না তো কি?

জামাইবাবু অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

ও বীণু, যাবি নাকি? তা হ'লে তৈরী হয়ে নে।—শ্যালিকাকে আহ্বান করে জামাইবাবু ব্যাপারটা সহজ ক'রে নিতে চাইলেন।

না বাবু, আবার? আমার ওসব ভয় করে। বীণা ঘরে ঢুকল, খোকাকে দেখে কোলে নিয়ে বললে, তার চেয়ে একে নিয়ে থাকা ঢের ভাল।

সকলেই উপস্থিত। বেশীরভাগই ব'সে আছেন। কেউ কেউ খেলছেন।

নতুন একজন সভ্য হলেন। পরিধানে খদ্দরের শাড়ি, মোটামুটি গহনা। মেম একজন বললেন অপরকে, দেখেছ, গান্ধি-ক্লথ না?

অপরাও দেখলেন, বললেন, হ্যাঁ।

কি বিশ্রী মোটা!

অন্যকে স্বীকার করতে হ'ল।

মিস লাল মিস ইন্দ্র সব ছিলেন।

শুনেছেন, মহাত্মাজীকে কি রকম ক'রে ধরে নিয়ে গেছে?—একজন হিন্দুস্থানী বললেন।

একটি শিখ মহিলা উত্তরে বললেন, বড়ি আফসোসকি বাত!

ঔর শোলাপুরকা হাল?—তিনিই জিজ্ঞাসা করলেন।

পেশোয়ারী বললেন, সব বাতেঁ বিগড়ী হুয়ি হর দেশমে, পেশোওয়ারমে ভি। দেখিয়ে তো, সব বালবচ্চে হুঁয়ে হ্যাঁয়—

মিস লাল শুনছিলেন, চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। পর হোনা ক্যা?

সকলের চোখ পড়ল তাঁর দিকে।

কিসের কি? সবাই চেয়ে রইল।

এই যে হল্লা মচানা আর দেশে দেশে আগুন জ্বালানো—মানুষ সব সুখে স্বচ্ছন্দে ধনেপ্রাণে বেঁচে বেড়িয়ে-চেড়িয়ে মৌজ ক'রে রয়েছে, তাদের ঐ নাচিয়ে দিয়ে কষ্ট পাওয়ানোটার ফায়দাটা কি? এই এরা—আংরেজরা তোমাদের জন্যে কি না করেছে, রেল স্টীমার ডাক টেলিগ্রাফ মোটর ইত্যাদি—মিস্ লালের বক্তব্যের বিষয় ছিল এই।

দিদি আর দু একটি বাঙালিনীর সঙ্গে 'ঘর-কোটালে' গল্পে মগ্ন ছিলেন, হঠাৎ শুনে চকিত হয়ে চাইলেন সেইদিকে। তাঁর মনে হ'ল, এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান।

উত্তর দিলেন শিখ মেয়েটি, কিন্তু এরা কিছু অন্যায় করছে না তো। মার পিটি কেন সরকার এদের করেন?

কিন্তু চিড়ায় কেন? ঐ দেখ না খদ্দর পরা—কি হবে? ও তো না হয় তোমাদের ছিল, এই যে মোটর, এরোপ্লেন, এর আরাম, এ কি পরদেশী আরাম নয়? আজ যদি এরা রাগ ক'রে সব নিয়ে যায়, কি হবে তোমাদের? ইয়ে লুন বনানা বেকায়দা?

দিদির মনে হ'ল, ছয় মাসে উত্তরিব ছ' দিনের পথ।

নেপালী মহিলাটি জনান্তিকে মুসলমান মহিলাকে বললেন, সব বালকরা মিলে এইসব করছে, এতে হিসাবী আদমী কেউ নেই।

মুসলমানী বললেন, বেশক, ঠিক আপকি বাত।

মিস ইন্দ্র চুপ ক'রেই ছিলেন এতক্ষণ সভার মধ্যে, এইবার তিনি বললেন, মগর শোচিয়েতো (ভেবেই দেখ), যদি এঁরা আজ তোমাদের কথামত চ'লেই যান, এঁদের আর কি—তোমাদের কি হবে?

কোই বাতকি ফিকর কিসিকো করনে পড়তা? এইসি হি শোর মচানা! বোধহয় মনে মনে সবাইকে বলতে হ'ল, না, দুশ্চিন্তা কারুর করতে হয় না।

মিস লাল বললেন, ঔর দেশ! দেশ! সওরাজ (স্বরাজ) লেকে হোগা ক্যা?

কিন্তু সাহেব-মেমের সামনে রাজনীতি! গা-ছমছম করতে থাকে।

একজন উঠলেন, চলিয়ে, উধর সভা হো রহি।

বিজলী, ১ম বর্ষ, ১৩২৭

মধুমালতী

পিতা খেতে এলেন। বামুনঠানদিদি ভাত বেড়ে তরকারী সাজিয়ে নিয়ে থালা হাতে এলেন। পিঁড়িতে কর্তা বসেছেন।

ঠানদিদি ডাকলেন, 'ও মধু আয়। দাদা খেতে বসলেন।'

একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে নরুনপাড় সাদা কাপড় পরা ভাঁড়ারঘর থেকে বেরিয়ে এলো, হাতে দইয়ের বাটি আর মিষ্টির রেকাবী নিয়ে।

মুখখানি সুন্দর, রং পরিষ্কার, পাতলা শরীর।

পিতা খেতে বসলেন।

এটাসেটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, 'তোমাদের রান্না হয়েছে কিনা।'

বাড়িতে আর কেউ নেই, পিতা আর কন্যা। কিছুদিন আগে কর্তার স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। বছর শেষ হয়ে গেছে।

কর্তার বয়স প্রায় চল্লিশ।

মেয়ে কাছে বসল।

পিতা বললেন, 'কেমন লাগল ননদের বাড়ি?'

মেয়ে একটু হাসল। বললে, 'ভালো । তুমি গেলে তোমারও ভালো লাগত। বেশ জায়গা। আর ওদের ঠাকুর দেবতা আছেন রাধাগোবিন্দ। ঝুলনে খুব উৎসব হ'ল পাঁচ দিন ধরে।'

পিতা কন্যার কোমল মুখখানির দিকে তাকালেন। বেশ গিন্নি-বান্নির মত কথা বলছে তো। ঠাকুর দেবতা ঝুলন রাস দোলের উৎসবের কথা সে এত শিখেছে এই ক' বছরেই!

গৃহিণী গেছেন বছর দেড়েক হবে। তার তিন বছর আগে মধুমালতী দুর্ভাগ্য নিয়ে ফিরে এসেছে বাপের ঘরে। ষোলো বছর বয়সেই। সন্তান হয়নি।

গৃহিণী থাকতে সে এত কথাবার্তা বলত না পিতার কাছে বসে। খাওয়ার সময়ও বসত না, জননীই বসতেন। এখন বিপত্নীক পিতা আর বিধবা কন্যা। মেয়ে বাপের মন ভোলাবার চেষ্টা করে গল্পে, রান্নার খাবার তৈরীতে। বাবার মনে যেন কোনো অভাব না হয় মা যাওয়ার জন্য।

আর পিতা ভোলাতে চান মেয়ের মন তাকে নানা কথা প্রশ্ন গল্প করে। দুজনে দুজনকে দুটি পরম বিয়োগবিচ্ছেদের বেদনা ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। অথচ সেটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত মনে শরীরে জুড়ে বসে রয়েছে। যেন ভোলা যায় না বলেই এত ভোলবার চেষ্টা। এত ছল!

এত নানাকথার অবতারণা!

পিতা দই মিষ্টিতে হাত দিয়েছেন।

বললেন, 'দইটি তো ভারি সুন্দর জমেছে আজ। ঠিক আগের মতন।' অর্থাৎ গৃহিণীর সময়ের মতন।

মেয়ে বললে, 'হ্যাঁ, মা যেমন জমাতেন তেমনি হয়েছে। এতদিনে বোধহয় আস্বাদ ঠিক করতে পেরেছি। আর এবারে তোমার গরুটার বাছুর বড় হয়েছে, দুধ তাই খুব ঘন হয়েছে তো।'

'কোনটি? মঙ্গলা না কালী?'

কন্যা একটু হাসলে। বাবা সব ভুলে গেছেন। মা থাকতে গরু গোয়াল, গোলায় ধান, খেজুর রস, খেজুর গাছ, বাগানের আম কাঁঠাল কলা লিচু সব ফলমূল—লাউ কুমড়োর মাচা কোথায় কি দরকার হিসেব খোঁজ নিতেন মার কাছে। নিজেও দেখতেন।

মেয়ে বললে, 'কালীর বাছুরই বড় হয়েছে। মঙ্গলার এবার হবে বাচ্চা।'

সহসা আচমকাভাবেই মেয়ে বললে, 'আমার ননদের একটি ভাগ্নীকে এবার দেখলাম। ভারি ভালো মেয়েটি। কি যে কাজের আর দেখতেও যেন দুর্গাঠাকুরের মত। ওদের বাড়ির গোয়াল গরু রান্নাঘর ভাঁড়ার ঠাকুর দেবতা সব কাজেই সে আছে।'

পিতার আহার শেষ হয়েছে। বললেন, 'বটে!' একটু হেসে বললেন, 'তোর খুব ভালো লেগেছে তাকে দেখছি।'

বামুনঠাকরুণ এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, 'মেয়েটি সত্যিই ভালো দাদা! আমি সেবার রাসের সময় ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ভারি কম্মের মেয়ে, দেখতেও খাসা। মধুও বলছে আরো নাকি মুখর হয়েছে।'

সহসা আচমকাভাবেই মেয়ে বললে, 'আমি ননদকে বলে এসেছি বাবা, মেয়েটি আমরা নেব। ওরা খুব খুশী।'

বাবা আঁচাতে যাবার জন্য উঠছিলেন। একটু অবাক হয়ে গেলেন। 'মেয়েটিকে নেবে তুমি? কার জন্যে? তোমার ভাসুরপোদের কারুর জন্যে। তাতে তাদের বাবা মা'র মত নিয়েছ তো?'

'না, তাদের জন্য নয়। আমার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ওরা এক গোত্তর হবে।'

পিতা বললেন, 'তবে?'

মেয়ের চোখ ছলছলিয়ে এলো। একটু চুপ করে চোখটি মুছে ফেলে বললে, 'তুমি অমত করতে পারবে না বাবা। ওকে আমি এ বাড়িতে নিয়ে আসব।'

পিতা সহসা মেয়ের চোখের জল দেখে অবাক হয়ে গেলেন, 'তা তুমি আন না। আমার অমত কেন হবে? পরে সুপাত্র দেখে বিয়ে দেওয়া যাবে। বড় একলাটি রয়েছ তুমি। নিয়ে এসো মেয়েটিকে।'

মেয়েটি চোখ মুছে ফেলেছে। বললে, 'সেকথা নয় বাবা। আমি তাদের বলে এসেছি তাকে আমার মা করে বাড়িতে নিয়ে আসব। তুমি ওকে বিয়ে করবে। আমার কেউ নেই। তোমায় বিয়ে করতে হবে সেইজন্যেই।'

পিতা মেয়ের মুখে আচমকা এমন প্রস্তাবে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন একটু। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে মধু! আমার বিয়ে! তোর এই দশা, আর আমি বিয়ে করব!' তারপর চলে গেলেন।

২

কিন্তু মধুমালতীর চোখের জল শুকোয় না। আর একে একে পাড়ার গিন্নিবান্নিকে দিয়ে পিতাকে বলায় বিয়ের কথা। এই শ্মশানের মত নির্বান্ধব পুরী বাড়ির কথা, পিতার জমিজমা বাগান পুকুরের কথা বলে। সব কার হবে এসব? কি হবে এসব? কে ভোগ করবে?

শেষে পিতার কাছে একদিন চোখ মুছতে মুছতে বলে, 'আর ভগবান না করুন, তুমি যদি হঠাৎ মরে যাও আমার কেউ কোথাও নেই। আর আমিই যদি মরি তোমাকে দেখার কে আছে অসুখে-বিসুখে বিপদে-আপদে। তোমার জ্ঞাতিগুষ্টি তো আপন বলতে কেউ নেই। যারা আছে আমাকে মেরে হয়ত সর্বস্ব ভুগিয়ে নিয়ে নেবে। বিয়ে করলে আমার দু'একটা ভাইবোনও হবে। আপনার জন হবে।'

বাপ বললেন, 'তা তোর জন্যে একটা পুষ্যিপুত্তুর দেখি না যে তোর আপন হবে।'

চোখ মুছে ফেলে মধু হাসলে। বললে, 'আমার জলপিণ্ড দেবার লোক শ্বশুরকুলে অনেক আছে বাবা। আমার পিতৃকুলের জন্যেই তোমাকে বিয়ে করতে বলা। তুমি তো আর বুড়ো হওনি। মা থাকলে সে যা-হয় তিনি করতেন। আমার যখন কপালে কিছুই হল না। এবারের বিয়েতে যদি ভাইবোন হয় তাহলে আমার সব দিক বজায় থাকবে।'

বামুনঠাকুরাণী ছিলেন সামনে। বললেন, 'তা দাদা, মধুর কথা ঠিক। যদি তোমার বিয়েতে সব দিক বজায় থাকে, তার চেয়ে আর কি ভাল আছে। মধুর ছেলেমেয়ে থাকলে সে এক কথা ছিল। আর সে মেয়েটি অনাথ, তারও গতি হয়। সম্পর্কও বজায় থাকে সব দিকে, মধুর ননদের ভাগ্নী তো।'

শেষ অবধি বিধবা ব্রহ্মচারিণী মেয়ে যেন জননী হয়ে বসল বিবাহে একান্ত অনিচ্ছুক লজ্জিত সঙ্কুচিতপ্রায় প্রৌঢ় পিতার। পিতাকে সে এভাবে থাকতে দেবে না। বিবাহ সে দেবেই।

পাড়ার দু'চারজন মেয়ে সমর্থন করলেন। কিছুজন পিতার আপত্তি সমর্থন করলেন। কিন্তু বিয়ে হয়ে গেল।

৩

রোগা কিশোরী ছোট মেয়ে উমা কনে সেজে বাড়িতে এসে দাঁড়াল।

মধুমালতীর আনন্দের সীমা নেই। যেন ছোটবেলা ফিরে পেয়েছে। পুতুলখেলার সঙ্গিনীর মত এসে দাঁড়িয়েছে উমা। পিতা যেন তার খেলাঘরে পুত্র আর বিমাতা হলেন কন্যার মত, পুত্রবধূর মত।

বিমাতাকে সে মা বলে। বিমাতাও তাকে মা বলেই ডাকে। সে তাঁকে কন্যার মত সাজায় বসনেভূষণে। খাওয়ায়। চুল বেঁধে দেয়। ভালো শাড়ী সিঁদুর আলতা আনায় পাড়ার লোকদের দিয়ে পিতাকে বলে।

পিতা লজ্জিত হন। মনে মনে যেন অপরাধী হন। তিনি আবার বিবাহ করে এত বয়সে সংসারধর্ম করছেন। আর মেয়ে সন্ন্যাসিনী হয়েছেন।

এমন সময় মধুমালতীর আনন্দের 'ভরা' পূর্ণ হয়ে উঠল। পিতার যেন লজ্জার 'ভরা'ও পূর্ণ হয়ে উঠল সেই আনন্দের মাঝেই। তিনি সংসারী হলেন দুঃখিনী মেয়ের সামনে।

তরুণী বিমাতার সন্তানসম্ভাবনার আভাস দেখা দিয়েছে।

তারপর একদিন পাড়ার লোকদের ভিড় শাঁখ বাজানো হৈ-হট্টগোলের মাঝে মধুর ভাই-এর জন্ম হল।

মধু এতদিনে একেবারে ঠিক ঠিক পিতার জননীর পদে সমাসীন হয়েছে। মায়ের আঁতুড়ের তত্ত্বাবধান করে বয়স্কা গৃহিণীদের মত। মাকে 'ঝালের নাড়ু' ঘি-মরিচ, গব্যঘৃত

খাওয়ানো না হলে নাড়ী শুকোবে না! সকাল বিকাল দুপুরে পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা কেমন করে শিখে নিয়ে নবীনা জননীর জন্য আয়োজন করে রাখে।

পাড়ার লোকেরা হিতৈষীরা মুগ্ধ। নিন্দুকরা বিচলিত, আশ্চর্য।

হিতৈষীদের পঞ্চজিহ্বা মুখর হয়ে ওঠে মধুর প্রশংসায়। নিন্দুকের শতজিহ্বা মুখের মধ্যে আন্দোলিত হয়। কি যেন বলতে চায়। ক্রমে ভাই বড় হয়। নামকরণ অন্নপ্রাশন করার ব্যবস্থাও সেই করে বৃদ্ধা পিতামহীর মত।

তার নিরানন্দ পিতৃগৃহ আনন্দে ভরে ওঠে।

মধুর আরো তিন-চারটি ভাইবোনের জন্ম হ'ল।

মধু প্রবল প্রতাপে অকুণ্ঠ আ··ন্দে বিমাতাকে তাঁর সন্তানদের লালন করে, যত্ন করে। মা যেন কিশোরী বালিকা বধূ। মাকে জল খেতে দিয়েছ? খাবার দিয়েছ?

যেদিন মার রাত্রে ঘুমের অসুবিধা হয়, ভাইবোনগুলিকে নিয়ে আসে নিজের কাছে। মা আর বাবা তার গৃহদেবতা। খেলার পুতুল। তার সংসারের ধর্মকর্ম আনন্দলোক।

৪

পাড়ার গৃহিণীরা আসেন। বিমাতার কাছেই বসেন, মধুর তো মরবার অবসর নেই। গোয়াল-গরু, বাগান, পুকুর, ফল, তরকারী, ভাইবোন 'তাদের পাঠশালা' খেলা সব মধুর দায়িত্বে। গল্প করবে কখন। তার মাঝে মাঝে পূজা আহ্নিক বারব্রত উপবাস নিয়মও আছে।

উমাকে কেউ বলেন মধুর মা। কেউ বেশী ঘনিষ্ঠ হবার আশায় বলেন, 'গোপালের মা'! তার নিজের ছেলের নামে।

একপক্ষ বলেন, মধুর কি কাজের সীমা নেই, শেষ নেই! বাপ্ রে! এতও পারে!

তারা চলে গেলে অন্যপক্ষ বলেন জনান্তিকে ইঙ্গিতময় ভাষায়, 'তা গোপালের মা, তুমি এখন চার-পাঁচটির মা হয়েছো। এখনো যেন কনে-বৌটি সেদিনের! একেবারে নিপাট ভালমানুষ বাছা তুমি।'

জন দু'এক মুখরা। 'হ্যাঁ না যা করবে মধু। বড্ড কিন্তু যেন কেমন কেমন বোধহয়। তা তোমারি তো ঘরকরনা বাপু। গিন্নীবান্নি হবে না?'

কখনো কোনো কথার আভাস মধুর কানে যায়। কখনো বামুনমেয়ের কানে যায়। মধুমালতী বুঝতেও পারে না? না, শুনতে পায় না।

বামুনদিদি রান্নাঘরের দরজার বাইরে এসে দাঁড়ান।

একটু থেমে গিয়ে বলেন, 'কার কথা বলছ গো। তা মধুরই তো সব ছিল। এখনো তাই, মধুই সব। লক্ষ্মীটি বল, গিন্নি বল, মেয়ে বল, মা বল, মধু না হলে সব অন্ধকার হয়ে থাকত। ও হ'ল মা-দুর্গা। ওদের মা।'

বামুনদিদির উক্তিতে বিমাতা অপ্রতিভ। প্রতিবেশিনীর দল নীরব।

মধুমালতী ঘাট থেকে স্নান করে আসে। বলে, 'কি হল মা? এখনো ভাত খাও-নি? কত বেলা হ'ল, মাকে খেতে দাও বামুন-মা। আমি একটু জপ সেরেই এখুনি আসছি। তারপর তুমি আমি বসব।'

মধু ঠাকুরঘরে, বামুনমেয়ে রান্নাঘরে ঢোকে।

বিমাতা শয়নঘরে ঢোকেন কোলের শিশুটিকে নিয়ে শোয়াতে।

মেয়ে শুইয়ে উমা ভাবেন, তা অনেকটা সত্যি কথাই বলেছে ওরা, মধুই যেন গিন্নি। কিন্তু মনে মনে মনের সব দিকে তাকান, সংসারের চারদিকে তাকান, আর স্বামীর মুখের দিকেও তাকান। সত্যই মধু ছাড়া সব যেন শূন্য! বামুনদিদির কথাই ঠিক—মধুই লক্ষ্মী, মধুই দুর্গা সব। দশহাতে দশদিক সামলাচ্ছে। নিজের আর ওর কি আছে। আহা! ওই তো তাঁকে ঘরে এনেছে বাপের সুখের জন্য—বাপের বংশ বজায় থাকার জন্য! আহা! ছেলে-মানুষ বিধবা মেয়েটি!

উমার জননী-মন কর্তৃত্বলোভী গৃহিণী-মনকে ঠেলে দেয়। বামুনদিদি ডাকে, 'ও বৌদি, খাবে এসো গো।'

৫

সমস্যার সমাধান এসে পড়ল অতর্কিতে।

মধুর শরীর ভেঙে পড়ছিল কিছুদিন ধরেই। তার মনের ভিতরের অন্তর্লোকের আশানিরুদ্ধ বেদনাতুর জীবনের কোনো পরিচয় কেউ জানে না। কিন্তু তার মুখের হাসিকে তার হাতের কাজকে মনের অসীম মমতাময় ত্যাগ স্বীকারকে অকস্মাৎ একদিন শরীর জবাব দিয়ে দিলে।

ক্রমে কাজে অবসাদ ক্লান্তি দেখা দিল।

মধুমালতী শয্যা নিলে।

পিতা বিমাতা উৎকণ্ঠিত মুখে এসে দাঁড়ালেন। বামুনদিদি বিচলিত। পরম অনুগত ভাইবোনেরা ব্যাকুল হয়ে বিছানার পাশে জড় হ'ল। পাড়াপড়শীও জমা হল। দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্যে মধুর এমন করে শয্যা নেওয়া কেউ দেখেনি। মায়ের বিয়োগের দিনও না।

পিতা জিজ্ঞাসা করেন, কি হল মা, এমন করে শেষভাদ্রে জ্বরে পড়লে? পচা পুকুরে নেয়ে হল কি? সামনে পুজো। আর তোমার জ্বর হল মা।

মধু জ্বরে আরক্ত চোখ মেলে পিতার দিকে চায়। চিরকালের মতই ঠোঁটে প্রসন্ন হাসির আভাস। কিন্তু চোখের দৃষ্টি বড় বিষণ্ণ ক্লান্ত। যেন এতদিন পরে' চোখে তার অন্তরের স্বরূপ ফুটে উঠেছে।

ডাক্তার এলেন। পিতাকে ডেকে কি বললেন।

পিতা আবার বললেন, গোপাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হল। বলেছিলে এবারে বিয়ে দেবে তুমি।

মাথার কাছে গোপাল বসে দিদির মাথায় হাত দিয়ে দেখছে। পাশে বিমাতা।

সে ভাইয়ের হাতখানিতে হাত রেখে হাসল। বিমাতার কোলের ওপর মাথাটা এনে বললে, তোমরা বিয়ে দিও মা।

আরো কয়েকদিন যায়। মধুর ভাল হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা যায় না।

রাত্রি জাগে ভাই মা আর বামুনদিদি।

কখনো কখনো পিতা এসে বসেন।

জ্বরের ঘোরে মধু ভুল বকে। ডাকলে কিন্তু ঠিক কথা কয়।

মধ্যরাত্রি। পিতা এসে বসেছেন। সে চুপিচুপি বামুনদিকে বললে, 'মা এসেছেন।'

বুঝতে না পেরে বামুনদি বললে, 'কে এসেছে?' দোরের দিকে চায়।

সে সেদিকে না চেয়ে বললে, 'বামুনদিদি। মা এসেছেন। আর ও এসেছে!'

পিতা বললেন, 'তোমার মা শুতে গেছে।'

সে বললে, 'না, ওই যে দাঁড়িয়ে আছেন মাথার কাছে—ওঁরা।'

বিচলিতভাবে পিতা বললেন, 'কে দাঁড়িয়ে আছে? কই, কেউ না তো!'

বামুনদিদি বললে, 'জামাইয়ের আর মার কথা বলছে।'

এত দীর্ঘকালের বৈধব্য-জীবনের মধ্যে মধুমালতীর মুখে সেই কদিনের দেখা ক্ষণিকের চেনা 'ও'—সেই 'মানুষটি'র কথা কেউ কোনোদিন শোনেনি। মাতা-পিতা নয়। বামুনদিদিও নয়। প্রতিবেশীরাও নয়।

বাপ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বামুনদিদি বললেন, আর থাকবে না ও।

মধু শুনতে পেল। বিহ্বলভাবে চেয়ে পিতাকে দেখতে পেয়ে আবার চোখ বুজল। মনে পড়ে গেল কি যেন বলছিল। যা কখনো বলেনি। কার কথা বলছিল?

পিতা উঠে গেলেন ব্যাকুলভাবে।

ভাই এসে বসল।

ভায়ের হাত ধরে সহসা বামুনদিদিকে চুপিচুপি বললে, বাবাকে বোলো আমাকে 'আগুন' যেন গোপাল দেয়।

ভাইয়ের চোখে জল আসে। বামুনদিদিও চোখ মুছে বলে, চুপ কর। বাজে কথা বকিসনি।

সে আবার চারদিকে চায়! কাকে যেন খুঁজছে। কাকে?

ভোরবেলা তার অন্বেষণ শেষ হয়ে গেল।

বিমাতা এসে বসেছিলেন। গ্রাম্য নারীর মতই কন্যাকে জড়িয়ে ধরে বিলাপ করে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন। রোদনরত ভাইবোনেরা ঘিরে দাঁড়াল।

পাড়ার লোক জড় হল। লোকে বললে যেন বামাচরণবাবুর মাতৃবিয়োগ হল।

প্রতিবেশিনীর দল এলো। যারা গোপালের মা'র দুঃখে অতি কাতর হয়েছিল তারা চোখ রগড়ে মুছে বললে, যে যাই বলুক, মধু যে এ সংসারের কি ছিল তা লোকে এইবার বুঝবে। জানতে পারবে। অন্য প্রতিবেশিনীরা নীরবে অবাক হয়ে চেয়ে রইল তাদের দিকে। কে বুঝবে? মধুর বিমাতাও তাদের দিকে বিহ্বলভাবে একটু চাইলেন। কিন্তু তাদের কথা বুঝতে পারলেন না কাকে বলছে।

একটি সেকেলে লেখক

বন্ধু গল্পের বইখানা ফেরত দিয়ে বললেন, 'মন্দ নয় গল্পগুলো....তবে একটু যেন সেকেলে ধরনের।' একটু থেমে তারপর বললেন, 'অমুকের লেখা কিন্তু বেশ—নয়? পড়েছেন তো?'

বন্ধু খালসা কলেজের একজন প্রফেসার। ইতিহাসের অধ্যাপক। বেশ বড় বড় ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখেন মাঝে মাঝে। পণ্ডিত মানুষ। বাংলা বইও পড়ে থাকেন অবসর সময়ে।

আর আমি ঐখানকার একটা কম্বল ও কার্পেটের কারখানায় ছোট হিসাবনবিস। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় হিসাব বিভাগের একজন কনিষ্ঠ কেরানী।

অবকাশ কালে একটু-আধটু লিখি আর পড়াশুনা করি। ঐভাবেই আমার অবসর যাপনটা হয়।

বন্ধু নতুন এসেছেন। বিদেশে প্রবাসে বাঙালী দেখলেই আলাপ করতে ইচ্ছা হয়। বাংলা কথা শুনতে এবং বলতে বড় ভাল লাগে। কাজেই মৌখিক আলাপটা প্রায় বন্ধুত্বের সীমায় এসে পড়েছিল। তারপর আবার আমার একটু লেখাটেখা আসে শুনে কৌতূহলী অধ্যাপক আমার গল্প-সংগ্রহের বইখানা পড়তে নিয়েছিলেন।

এখন লেখক হওয়ার একটু বিপদ আছে। সব সময়েই যেন শুনতে ইচ্ছে করে—'বাঃ, চমৎকার লেখা' বা 'বেশ লেখেন তো আপনি' কিম্বা অন্ততঃ 'আপনার এই লেখাটা আমার ভালো লেখেছে' ('খুব' না হোক)।

হেনকালে যদি কেউ অমনি বিরসমুখে নীরবে বইখানা ফেরত দেয় অথবা কোন অনুপস্থিত লেখকের রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে, নয়ত আমার বন্ধুর মতো সেই সঙ্গে বলে বসে মুরুব্বিয়ানা ধরনে—'মন্দ নয় লেখাগুলো—তবে সেকেলে ধরনের'...

তখন লেখক মানুষটি হঠাৎ কেমন থমকে যায়। কিছু বলবার মত কথাও তো মুখে আসে না। বুঝুন বিপদটা! কি বলবে? দেঁতো হাসিও তো আসে না।

আমিও থমকে গেলাম। কি বলি? নিজের লেখার ওকালতি করা যায় নাকি? জানিনে তো। বিশুষ্ক মুখে নীরস হেসে কি যে আবোল-তাবোল বললাম সেই লেখকটির সম্বন্ধে অথবা আর কিছু—তা আর মনে নেই। নিজের রচনার ওকালতি অবশ্য করিনি।

অবান্তর দু'চারটা কথাবার্তার পর উঠলাম।

কানে কিন্তু ঐ 'সেকেলে' মন্তব্যটি যেন একঘেয়ে বেজে চলেছিল।

বহুদিন বাস করছি পাঞ্জাবে। বাংলাদেশের ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল আধুনিক সাহিত্যের গতিবিধি কোন ধারায় বইছে, সে তো সবসময় সব পত্রিকা মারফত সুদূর বিদেশে পৌঁছায় না। সামান্য একটু পড়লেও ওয়াকিবহাল হওয়া যায় না।

কিন্তু সেকেলে? কিরকম সেকেলে তাও তো বুঝতে পারলাম না। যে 'সেকেলে' ক্লাসিকের পর্যায়ে পড়ে নিশ্চয়ই তা নয়—এ সেকেলেটা তাহলে কোন বস্তাপচা বটতলীয় সেকেলে?

মনটা বেশ একটু বিমর্ষ হয়ে গেল।

বিমনাভাবে খালসা কলেজের একটা পাশের দিকের বাগানের পথে ঢুকে পড়লাম। মনে অন্য ভাবনা আর নেই 'সেকেলে' ছাড়া।

সন্ধ্যে হয়-হয়। গরমের দিন। গাছে জল দিয়েছে মালীরা খুব। পথটাও বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে।

হঠাৎ গাছপালার আড়াল থেকে আমার নির্জন বিচরণের পথে দেখা গেল, একটি নীলরঙের একটা পাগড়ি আর একটা সাদা ওড়না মাথায় দুটি বিজন-বিহারীকে। কাছেই একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

আমাকে কাছাকাছি দেখতে পেয়ে একটু থমকে তটস্থভাবে দাঁড়ালো। দুজনেই। ছেলেটির সঙ্গে পরিচয় ছিল। মেয়েটির মুখ চিনি, ঐ কলেজে পড়ে, পাড়ারই মেয়ে।

ছেলেটির নাম শার্দূল সিং। সে আমাকে দেখে চিনতে পেরে একটু হেসে অভিবাদন জানালো 'সৎশ্রী অকাল' বলে। 'সৎশ্রী অকাল' অর্থ কালাতীত চিরন্তন সুন্দরের স্মরণ মনে হয়। যিনি 'অলখ নিরঞ্জন' আগোচর নিরঞ্জন পুরুষ। যাই হোক, মেয়েটিও মৃদুস্বরে 'সৎশ্রী অকাল' বললে। আমিও বললাম।

ছেলেটি একটু হেসে বললে, 'বাবুজি, সয়েল (বেড়াতে) করতে এসেছেন? যা গরম আজ।'

আমি হাসলাম। বললাম হ্যাঁ।

তারা কিন্তু বেশ চকিত হয়ে উঠেছিল যেন। যা হোক, তারা অন্য পথে চলে গেল। আমিও নিজের কথা ভাবতে ভাবতে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলাম আর কোনো জায়গায় না গিয়ে।

২

শুনেছি রবীন্দ্রনাথ যে অদ্বিতীয় পুরুষ, তিনিও তাঁর সম্বন্ধে, বিরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা বা মন্তব্যের কথা কেউ বলতে এলে বা কাগজে বেরুলে শুনতে চাইতেন না, পড়তেনও না। বোধহয় মন বিক্ষিপ্ত তাঁরও হত।

তাহলে আমরা তো কোন ছার।

আর লিখতে বসলে পারলুম না ক'দিন। লেখা আসে না। মনে হয় সত্যিই 'সেকেলে' লেখা হচ্ছে।

কাজেই সকাল বিকাল শুধু ঘুরি, ফিরি, পড়ি হয়ত।

আর দুপুরে আপিস করি। সন্ধ্যাবেলায় ঐ খালসা কলেজের নির্জন দিকের পথে বেড়াই। বন্ধুসঙ্গ বাদ দিয়ে চলি একেবারেই।

কিন্তু আমার বিজন বনপথের কোনো না কোনো খাঁজে কোণে প্রায়ই দেখতে পাই, সেই তরুণ শার্দূল সিংকে আর মেয়েটিকে।

আর তারাও চকিত হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, বন্ধু-অভিহিত 'সেকেলে' মানুষ হলেও বুঝতে পারি তরুণ তনুমনের তপোভঙ্গের চিরন্তন অতনু দেবতাটির রহস্যময় এক লীলা আরম্ভ হয়েছে খালসা কলেজের বিজন পথে।

তারাও সহজ হবার কথা ভাবে, যেন পড়তেই এসেছে, 'সৎশ্রী অকাল' বলে পুঁথিপত্র নিয়ে আর এক বিপথ বা পথ খোঁজে। আমিও লজ্জিত হয়ে অন্য পথে না পালিয়ে পারি না।

সহসা একদিন ঐ নীল-পাগড়ি পরা তরুণ শার্দূল সিং আমার সেই অন্য পথে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আজ আর সঙ্গে তরুণীটি নেই।

থার্ড-ইয়ারের ছাত্র হলেও তখনো তার শিখজনোচিত ঘন দাড়ি-গোঁফের সমারোহে মুখের তরুণ বয়সের সৌন্দর্য ব্যাহত হয়নি। আর চেহারাটি সুশ্রী সুন্দরও বটে।

'কালাতীত'র অভিবাদন-বাণী উচ্চারণ করে দুজনে শিষ্টাচার বিনিময় করলাম।

আমি বললাম, 'কি খবর সর্দারজি? কেমন পড়াশোনা হচ্ছে? ফোর্থ ইয়ারে উঠলে তো, এবার কেমন লাগছে?'

সে বিনীত হাসিমুখে বললে, 'হ্যাঁ, বাবুজি। ভালোই লাগছে।'

পাশে পাশে ঘোরে। আকাশ পাতাল, আবহাওয়া, গরম, লু সব কথাই শেষ হ'ল। সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এলো গাছের তলায় তলায়।

সহসা সর্দারজি বললে, 'এক থোড়ি বাত থি, বাবুজি। আর আমাকে সর্দারজি বলবেন না। আমার নাম বলে ডাকবেন। আমার নাম তো জানেন।'

কি মুশকিল। আমি হাসলাম। বললুম, 'নাম জানি বইকি, কিন্তু তোমার শার্দূল সিং নামের চেয়ে সর্দারজি-টা ভালোই লাগে বলতে। শার্দূল সিং কি সোজা নাম, বাপরে। তা বাড়িতে তোমাকে কি বলে ডাকে?'

সেও হাসল আমার কথায়, বললে, 'হ্যাঁ, বড় কড়া ধরনের নামটা। খুব তেজওয়ালা নাম কিন্তু। আমাদের দেশে ঐ ধরনের নামের খুব কদর ছিল। যেমন বিক্রম সিং, বীর সিং, জোরাবর সিং। এখন কিন্তু বাঙালী ধরনের নাম দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গায়। যেমন সুশীলকুমার, সুভাষচন্দর, বিনয়, সুরেশ। তবে আমাদের তো "দরবার সাহেব" (সোনার মন্দির) থেকে কোনো গুরু এসে নামকরণ করে যান। তাই নিয়ম মানা হয় শৌখিন নাম রাখলেও। আমাকে বাড়িতে "কাকা" (খোকা) বলে ডাকে।'

তা আমাদের দেশেও তো ডাকনাম, ভালো নাম, রাশনাম বা 'রাশিনাম' আছে। বাঙালীর ললিত-কোমল মিনমিনে নামগুলো এখন ওদের বেশ পছন্দ হচ্ছে! ভালো। তবে ওদের ওই বিশাল কলেবর আর কেশ-কাঁখ-কৃপাণ-কড়া-কাছেড়া-দাড়িগোঁফ-সুদ্ধু ও-নাম মানাবে কেমন তাই ভাবছি। কেশ, কাঁখ্ (চিরুনি), কৃপাণ, কড়া (হাতের লোহার একটি চুড়ি বা বালা) আর কাছেড়া (একটা অন্তর্বাস) এগুলি শিখধর্মের আনুষ্ঠানিক অপরিহার্য বেশভূষা নরনারী নির্বিশেষে। যাহোক বললাম, 'ও! কি তোমার কথা বলো তাহলে শুনি। কোথাও বসবে?'

শার্দূল সিং বললে, 'চলুন ঐ ঘাসটার ওপর বসি।'

বসলাম। শার্দূল সিং একটু দ্বিধাভাবে বললে, 'আমি একটা পরামর্শ চাইছি। আমরা অকালী শিখ জানেন তো? এই যারা নীল পাগড়ি পরে—"দরবার সাহেবে" দেখে থাকবেন।'

'তা তো দেখেছি আর অকালী শিখ দলের নামও শুনেছি। "বাবা অটলে"ও (একটি বিশেষ মন্দির) দেখেছি। কিন্তু তোমাদের যে কোনো নিয়মকানুন আলাদা আছে তা তো জানি না। তা তাতে কি ব্যাপার হয়েছে?'

তরুণ যুবক শিখ—তার দাড়িগোঁফ-সুদ্ধু মুখ বেশ একটু সলজ্জ হয়ে উঠল যেন। তারপর বললে, 'বাবুজি, ঐ যে মেয়েটি যাকে আমার সঙ্গে রোজ বেড়াতে দেখেছেন—তাকে চেনেন তো?'

'না, এমন চিনি না। তবে পাড়ার মেয়ে দেখেছি। ওর বাপ তো মিলিটারির একজন বড় অফিসার, না? ওর নাম হরবংশকুমারী—নয়?'

'হ্যাঁ, কুমারী নয়, কওর। হরবংশ কওর-ই ওর নাম। ওর সঙ্গে আমার, অনেকদিনের চেনা...।'

কুমারী আর কওরে কি প্রভেদ তা নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না। বললাম, 'তারপর?'

সর্দারজি আবার তরুণ নবীন দাড়িগোঁফের আড়ালে লাল হয়ে উঠল। তারপর বললে, 'তা আমরা বিয়ে করতে চাই। কিন্তু এখন তো "অকালী দল" আর সাধারণ শিখদের মধ্যে দলাদলি বড়ই বেড়ে উঠেছে। তাতে বাবা আবার অকালী দলের একজন চাঁই। কিন্তু বাবার এ বিয়ে হলে অমত হয়ত হবে না। কিন্তু হরবংশের বাবার মোটেই মত নেই এই ধরনের কুটুম্বিতায়। ওরা অবশ্য জানে না। কিন্তু ওদের কথাবার্তায় সেই আভাস পাওয়া যায়—হরবংশ বলেছে।'

'সে কি? তোমাদের শিখধর্মে তো কোনো জাতি বা শ্রেণী মানা অবধি নেই। তা আছে সত্যি এত ভেদাভেদ?'

'আগে তো এত ছিল না। ক্ষমতা নিয়ে দলাদলি বড় বেড়েছে এখন।'

'তা কি করতে চাও?'

'তাই জিজ্ঞাসা করছি আপনি কবি মানুষ (ওসব দেশে এখনো অনেক জায়গায় লেখক হলেই "কবি" বলে অভিহিত হন), আপনি কিছু পরামর্শ দিতে পারেন কি! হরবংশ তো বলে, এ বিয়ে না হলে, ও অন্য কোথাও বিয়ে তো করবেই না, ওর বাবা যদি জোর করেন, সে আত্মহত্যা করবে।'

'তুমি কিছু ব্যবস্থা করো।'

'তা আমি তো এখন পড়ি মাত্র। বাবা আছেন বটে, কিন্তু রোজগার না করলে জোর করে বিয়ে করিই বা কি করে? এদিকে হরবংশের বাপ কি করে কানাঘুষোয় জানতে পেরেছেন—শীগ্‌গির বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। ও আবার তাঁর একমাত্র মেয়ে। তাতে মা নেই ওর ছোট থেকে।'

কবিমানুষ আমি তো ভাবনায় পড়লাম। গল্পটল্প লিখি, পড়ি বটে। হয়ত প্রেমের কথাও থাকে তাতে। কিন্তু বয়স হল চল্লিশের কাছাকাছি, আজো বিয়ে করিনি বা করতে পারিনি। করব কিনা জানিও নে। এই 'লয়লামজনু'-ভাবিত প্রেমের আমি কি বুঝি যে তাকে একটা 'উচক্কা' পরামর্শ দোব। 'লয়লা-মজনু'র গল্প পাঞ্জাবে কেন, সারা হিন্দুস্থানে না জানে কে? শেক্‌সপীয়রের রোমিও-জুলিয়েট আর লয়লা-মজনুর প্রেম আর দুইয়ের পরিণাম একই।

কি বলি? বললাম, 'আচ্ছা ভাবি, সর্দারজি। তবে তুমি বলছ তোমার বাড়িতে এ বিয়েতে অমত হবে না। তোমার বাবা-মার মত আছে?'

সর্দারজি বললে, 'আমার মাকে বলেছি। তিনি হরবংশকে দেখেছেনও। বাবার মত মা করিয়ে নেবেন যদি ওঁরা বিয়ে দেন। আর ওর বাবার তো অনেক টাকা সম্পত্তি আছে—মিলিটারিতে মস্তবড় পদে ছিলেন—এখনো মোটা পেনশন পান—সেটা তো কম কথা নয়।'

ভারি খুশির কথা তাহলে তো। 'বাবা-মাকে বলো কোনো বন্দোবস্ত করতে, সেই ভালো হবে।'

'কিন্তু বিয়েটা হবে কোন্‌খান থেকে? অবিশ্যি হরবংশের একজন মাসী আছে, সে

আমার মার "সহেলী" (সই)। সেখান থেকে হলে হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওর বাবা আর বাড়ির লোকেরা একেবারে ক্ষেপে যাবেন।'

শার্দূল সিং বিমনাভাবে বসে থাকে। বলে, 'আপনাদের একটা ছবি "দেবদাস" আমরা একবার দেখেছিলাম। ফির পার্বতী কা এক বুঢ্‌ঢাকে সাথ সাদী হুয়া। হায় হায়। এ ছবি হরবংশও দেখেছে। লয়লা-মজনুর কাহিনীও তো জানেন। হরবংশ যদি জান নিকাল (আত্মহত্যা) দেয়...'

মনে মনে হেসে ফেললাম, বললাম, 'না না, দেবদাস হল গল্প। লয়লা-মজনুর কাহিনীও বোধহয় গল্পই। ওসব কেন ভাবছ তোমরা। তোমার মা যেন তাঁর সহেলীর সঙ্গে পরামর্শ করে শুভকাজটার ব্যবস্থা করে ফেলেন।'

'তারপর? ওর বাবা ওকে যদি ত্যাগ করে দেন? বড্ড সেকেলে ধরনের শিখ ওঁরা। আজকালকার "জমানা" ওঁরা বোঝেন না।'

'ত্যাগ করার ভয় কোরো না। আমি তো তাঁকে পাড়ায় দেখেছি, তিনি মেয়েকে ভীষণ ভালবাসেন। মাতৃহীনা একমাত্র মেয়ের উপর রাগ করে ক' দিন থাকতে পারবেন? মেয়ের বাচ্ছা হলেই ভুলে যাবেন। আর তোমাদের তো জাতকুল যাবার ভাবনা নেই। ওঁর তো আর কেউ নেইও।'

কলেজের গেট পার হয়ে পথে পড়লাম। দেখি, সামনে পথের ওপারে রঙীন চুন্নী বা ওড়না মাথায়, সুন্দর দামী সেলাওয়ার কামিজ পরা হরবংশ কওর কার সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু চঞ্চল উৎসুক দৃষ্টিটা খালসা কলেজের দিকেই বার বার পড়ছে।

আমি বুঝলাম শার্দূলের জন্যই সে অপেক্ষা করছে। 'সৎশ্রী অকাল' বলে আমি নিজের পথে গেলাম।

প্রশস্ত রাস্তার ধারে একটা তুন্দুরখানায় বা হোটেলে যেখানে আমি প্রতিদিন খাই, সেখানে একটা গ্রামোফোন-রেকর্ডে গান দিয়েছে তখন—"থোড়ি থোড়ি বাত হোগী....থোড়া থোড়া প্যার হোগা...ছম্-ছমাছম্-ছম্"—নৃত্যময় গীত। গানটার মানে : "একটু একটু কথা হবে...একটু একটু প্রেম হবে"...গায়িকা অন্তরীক্ষে রেকর্ডে নেচে উঠল। তন্দুরখানা বা হোটেলের ভোক্তা ও শ্রোতার দল ভারি খুশী। চিরকালের পুরাতন এই সেকেলে প্রেমের কথার ব্যাখ্যাতে।

ভাবতে থাকি বন্ধুর 'সেকেলে' মন্তব্যটির কথা। প্রেম ব্যাপারটিও তো চিরকালের সেকেলে।

কিন্তু এখন শার্দূল আর হরবংশের প্রেমকাহিনীই মনকে আক্রমণ করেছে।

সহসা হাসি পেল। মনে হল, আচ্ছা, শার্দূল সিং হরবংশ কওরকে ডাকবে কি বলে? ঐ বিরাট নামখানি দিয়ে 'বহুদিন মনে ছিল আশা' মেটার পর 'হৃদয়ের সুর দিয়ে নাম ধরে ডাকা'টুকু ওদের কিভাবে হবে?... এই 'হরভজন' 'গুরুবচন' 'ত্রিলোচন' কওরদের ওদের বরেরা ডাকে কি বলে? এত পৌরাণিক নাম সীতা, শকুন্তলা, গৌরী, উমা, পার্বতী, লক্ষ্মী, কুন্তী, রাধা...নামের কি শেষ আছে। নাঃ, ওরা এ ধরনের কোনো নামই রাখে না।

কিন্তু নিজেই নিজের মনের কাছে লজ্জিত হলাম এরকম হাসি ও প্রশ্নে। নিশ্চয় ওদের প্রিয়জনকে ডাকার মতো নাম থাকে, আছে। আর নাই যদি থাকে, তাতেই বা কি? কবির কথাই তো আছে। নাকি—গোলাপ নাম না হলেও, গোলাপ রূপেগুণে সুন্দরই

থাকে। 'হরবংশ' 'হরিভজন' বলে ডাকলেও প্রেম বা ভালবাসা তাতে নিশ্চয়ই আটকায় না।

৩

বাড়ি ফিরে এসে দেখি মা'র চিঠি। ছোট বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছে। কিন্তু টাকা নেই। টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। শীগ্‌গির এসো। অর্থাৎ এবারে দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশের পালা—আপিসে নয়, ঘরেই করতে হবে।

ছুটি নিলাম। দেশে গেলাম। এবং দেশে এসে আর মনেই রইল না লেখা বা ওদের কোনো কথা।

তারপর আরো ছুটি নিলাম। এবং মান অনুরোধে (?), নাঃ, মিথ্যে বলব না, কিছু ইচ্ছা কিছু দায়ে ও অনিচ্ছায় পড়ে বিয়ে করে ফেললাম। মেয়েটি সাদাসিদে। কিন্তু বঙ্কিমবাবু বলেছেন, 'বাঙালী নিজের স্ত্রীকে পরমাসুন্দরী দেখে'—আমি তত সুন্দরী মনে না করলেও খুবই ভালো মনে হল। এবং বোনের বিয়ের ঋণভারটাও কিছু লাঘব হল শ্বশুরের অর্থে।

পাঞ্জাবী গানের মতে ফুলশয্যাতে 'থোড়ি থোড়ি বাত'ও হল। 'প্যার' (প্রীতি) পরে আসবে গীতকার বলেছেন।

অমৃতসরে ফিরে বাড়িঘর দেখে নতুন সংসার পাততে বিশেষ ব্যস্তও রইলাম। খুশিও হলাম, বলা বাহুল্য।

আর খালসা কলেজে একলা বেড়াতে হয় না।

সন্ধ্যার পর পাঞ্জাবীদের মতো সস্ত্রীক বেড়াতে বেরুই, অচেনা পাড়ায় বা পথে দূরে দূরে। তখনো নতুন বিয়ের উপক্রমণিকাপর্ব শেষ হয়নি তো। 'বাত' বা আলাপ-পরিচয়ের যুগ শেষ হয়ে, 'প্যারের' বা প্রেমের এলাকায় পৌছে গেছি।

৪

কোথা দিয়ে কত বছর কেটে গেছে জানি না। এদিকে পুত্রকন্যারও সমাগম হয়েছে বাড়িতে—'প্রবল বন্যা'র মতো না হলেও। বিয়ের পরের ঠিক 'বাহা বাহা রে' (কবির ভাষায়) মনের ভাবও নেই আর। এখন আর গৃহিণীর সঙ্গে বেড়াতে বেরুতে পারি না। তিনি রন্ধনশালায়, নয়তো সন্তান-শালায় ব্যস্ত ও নিযুক্ত থাকেন।

আমি বড় ছেলেটিকে পড়াই এবং মাঝে মাঝে তাদেরই কারুকে নিয়ে বেড়াতে বেরোই গরমের সন্ধ্যায়। সেটা পথেই হোক বা খালসা কলেজের বাগানেই হোক।

একদিন বেরিয়েছি। সহসা পথে একটি চেনা-চেনা চেহারার আবির্ভাব হল। কাছে যেতে দেখি শার্দূল সিং। এই ছ'-সাত বছরে তার বিরাট বিশাল আকার হয়েছে। মিলিটারিতে বেশ বড় কাজ পেয়েছে—চেহারায় বিশালতা, শ্বশুরের প্রভাব ও শিখ জাতিত্বে। 'দাড়ি-গোঁফ-কেশ, কৃপাণ-পাগড়ি' নিয়ে বেশ গুরুগম্ভীর অফিসার-জনোচিত ব্যক্তিত্ব। তার চেহারার বিশালতার কাছে একটি ক্ষুদ্র কারখানার ক্ষীণ ক্ষুদ্র আকারের বাঙালী কেরানী নিজেকে যেন একটি নগণ্য তুচ্ছ প্রাণীর মতো মনে হল।

কিন্তু সেও চিনে হেসে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। আমিও হাসলাম। সেই পুরোনো 'সৎশ্রী অকাল' অভিবাদনও বিনিময় হল।

সে ভারি খুশি। আমিও খুশি হলাম তার আন্তরিক ভদ্র ব্যবহারে। কেননা শুনেছিলাম সে এখন মস্ত অফিসার হয়েছে। হয়তো খুব পদ সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে বা।

সে বললে, 'কোথায় আছেন? সেই বাড়িতেই? চলুন আমার বাড়িতে। বাড়িতে বিবি আছে। মনে আছে তো হরবংশীকে? বেশীদিন ছুটি নেই। শীগ্গিরই কাশ্মীর বদলি করবে শুনতে পাচ্ছি। চলুন আমার সঙ্গে। আমার বিয়ের খবর পেয়েছিলেন তো?'

একটু হেসে বললাম, 'মনে আছে বইকি তোমাদের দুজনকে। তা আর তো দেখা হয়নি শেষ অবধি। তোমাদের বিয়ে হয়েছিল সেই মাসীর বাড়ি থেকে, আর দু-পক্ষের বাবাই তোমাদের ওপর বেশীদিন রাগ করে থাকেনি খবর পেয়েছি। হরবংশ কওর ভালো আছে তো? তার বাবা কোথায়?'

শার্দূল সিং যেতে যেতে জবাব দিল, 'তিনি মারা গেছেন। সেইজন্যেই আমরা এখানে তাঁর সম্পত্তি-বিষয় সামলাতে এসেছি। তিনি আমাদের কাছেই থাকতেন।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা, আজ আর যাব না। পরে একদিন যাব, আজ বাড়িতে কাজ রয়েছে।'

শার্দূল সিং বললে, 'আচ্ছা তাহলে নিশ্চয়ই একদিন যাবেন, একটু কথাবার্তাও আছে।'

আমি হেসে নিলাম, 'আবার কি কথাবার্তা? তোমাদের তো সব সমস্যা মিটে গেছে।'

শার্দূল সিংও একটু হাসলে। বললে, 'নিজের না-হয় মিটেছে, কিন্তু অন্যের ভাবনা আছে তো!'

বললাম, 'তোমার আবার জন্য কে আছে?'

সে হাসলে। বললে, 'আছে বাবুজি, আছে।'

কয়েকদিন বাদে একদিন গেলাম শার্দূল সিং-এর শ্বশুরের বাড়িতে। সহসা গিয়েছি। মনে হল ক'জনে মিলে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে। পাঞ্জাবীদের বাড়িতেও সবারই অবারিত দ্বার, আমাদের দেশের মতোই অনেকটা। দরজাও খোলা। ঢুকে পড়েছি।

দেখি হরবংশ একটা খাটিয়ার ওপর বসে রয়েছে তার ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে। কে বলবে সেই তন্বী রূপসী হরবংশ কওর। এ এক বিশাল কলেবরশালিনী মোটাসোটা পাঞ্জাবী ললনা। রংটা আরো ফরসা হয়েছে। কিন্তু মুখে গালে চিবুকে এত মাংস লেগেছে যে, না বলে দিলে আমি ঠিক ভাবতাম হরবংশের অন্য কেউ আপনার লোক। মাসী-পিসীদের কেউ!

অন্য আর একটা খাটিয়াতে শার্দূল সিং বসেছিল। তার কাছে একটি অজানা মেয়ে বসেছিল। আমাকে দেখে যেন তিনজনেই একটু থমকে গেল। হরবংশ বললে, 'আসুন বাবুজি, সৎশ্রী অকাল। কতদিন পরে দেখা হল।'

শার্দূল সিংও পাশে বসল, অন্য মেয়েটি গিয়ে হরবংশের কাছে বসল। তাকিয়ে দেখলাম মেয়েটির মুখটা একটু বিষণ্ণ। দেখতে ভালো। হরবংশ বললে, 'যা বিবি, একটু চা পানি বানা বাবুজির জন্যে।'

বিবি অর্থাৎ মেয়েটি চলে গেল।

হরবংশ বললে, 'বাবুজি, আপনি ঠিক তেমনই আছেন!'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি একেবারে খাঁটি পাঞ্জাবী মহিলা হয়ে গেছ। এত মোটা হলে কি করে এই বয়সে? এই সাত-আট বছরে?'

হরবংশ লজ্জিতভাবে হেসে বললে, 'আমাদের দেশের কথা ছেড়ে দিন। এই তিনটে বাচ্চা হতে এত দুধ ঘি আর গঁদের লাড্ডু ঘি দিয়ে তৈরি করে সকলে খাওয়ালো, শরীর সারবে বলে যে, শরীর একবারে বস্তার মতো ফুলে উঠল। আর কমবার নাম নেই! কি মুশকিলে যে পড়েছি...!'

শার্দূল সিং হাসতে লাগল, 'ঠিক বলেছে হরবংশ। আমাদের মেয়েদের বিশ-বাইশ থেকে চল্লিশ অবধি প্রায় একই বয়স একই চেহারা দাঁড়ায়। বোঝাই যায় না তারা কে কত বয়সের।'

এমন সময় চা নিয়ে এলো সেই মেয়েটি—সঙ্গে কিছু 'খতাই' বা নান্‌খতাই—শোনপাপড়ীর মতো একটা মিষ্টি। ওরা ঘরে তৈরি করে প্রায়ই দেখেছি।

এবারে হরবংশ ছেলেটিকে তার কাছে দিয়ে বললে, 'তুই একটু "কাকা"-কে নিয়ে খেলা কর, আমি বাবুজির সঙ্গে একটু গল্প করি।'

খানিকক্ষণ আমার স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রশ্নোত্তরের পর শার্দূল সিং হরবংশকে বললে, 'কি বলো—বাবুজিকে বলি নানক কওরের কথা?'

হরবংশ বললে, 'সেইজন্যেই তো নানকীকে এখান থেকে সরালাম। ভারি বিপদ হয়েছে বাবুজি এই মেয়েটিকে নিয়ে আমাদের। এই মেয়েটা আমার চাচার মেয়ে। চাচাও মিলিটারিতে ভালো কাজ করতেন। এখন চাচা মারা গেলে এই নানকীকে বাবা কাছে আনেন। চাচী বেঁচে নেই, কিছুদিন হল মারা গেছেন। আর কেউ আমাদের ছিল না। ওকে আমাদের কাছেই রাখতে হয়। ছিলও তাই।'

এবারে শার্দূল সিং বললে, 'এখন আমার অধীন রেজিমেন্টের একটি নীচুপদ সেপাইয়ের সঙ্গে ওর বেজায় ভাব হয়েছে। আমি তো প্রায়ই এখানে-ওখানে ঘুরি, বদলিও হই। হরবংশ ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্যস্ত। শ্বশুরও অসুস্থ ছিলেন, মারাও গেলেন। হঠাৎ জানতে পারি যে, ওরা বড় বাড়াবাড়ি মেলামেশা করছে...।'

হরবংশ বললে, 'এখন ঐসব দেখেশুনে আমি ওদের নিয়ে এখানে চলে এলাম। ভালো ঘরে বিয়ের সম্বন্ধ করলাম। ওর বাবার অনেক টাকা আছে। বেশ ভালো জায়গায় বিয়ের ঠিকও করেছি, কিন্তু ও একেবারে কেঁদেকেটে রসাতল করছে।'

শার্দূল বললে, 'আর সেই সেপাইটা বা ছোঁড়াটা একেবারে কিচ্ছু নয়। বাজে পরিবারের নিতান্ত জাঠ চাষাঘরের ছেলে। আমাদের ঘরের মতো কুলমর্যাদাও নেই...।'

হরবংশ বললে, 'আসলে কি জানেন বাবুজি, সে তো জানে আমার চাচার টাকাকড়ি বেশ আছে, আর নানকীই সব পাবে। ভালবাসা না আর কিছু! টাকার লোভ তো কম কথা নয়। বোনটা আমার একদম বোকা। সে বলে ইকবাল সিং তাকে খুব ভালবাসে। টাকা না থাকলেও সে ওকে বিয়ে করত।'

শার্দূল সিং চিন্তিতভাবে বললে, 'এখন একটা সামান্য সেপাইয়ের সঙ্গে আমাদের ঘরের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ কি করে করি। ওরা একেবারে গাঁয়ের ক্ষেতখামারওয়ালা চাষা জাঠ। হরবংশের পিতৃকুলের মতো বড়ঘর তো নয়ই।'

বিরক্তভাবে এবার হরবংশ বললে, 'আমি এ-বিয়েতে মত দিতে পারি না একেবারেই। আমি খুব ভালো সম্বন্ধ করেছি, সেখানেই বিয়ে দেব।'

দুজনেই এবারে চুপ করে আমার দিকে চাইল।

শার্দূল সিং বললে, 'শুনলেন তো সব বাবুজি। কি করতে পারি কিছু পরামর্শ দিতে পারেন?'

বাবুজি অর্থাৎ আমি কি আর বলব, শুধু ছ'সাত বছর আগের ওদের দুজনের কথাই মনে পড়ল। কিন্তু নিজেদের কথা তো নজীর দিলে ওদের মনঃপূত হবে না।

বললাম, 'ছেলেটিকে দেখেছ তো? লেখাপড়া জানে?'

শার্দূল বললে, 'হ্যাঁ, দুটো পাস করেছে। কিন্তু খুব ছোট পদে আছে।'

'তা পরে তো উন্নতি হতে পারে গ্রেড অনুসারে। বাপ মা বাড়িঘর কেমন?'

হরবংশ তিক্তভাবে বললে, 'একেবারে গেঁয়ো। নিজেরাই ক্ষেতেখামারে কাজ করে। আমাদের বাড়িতে এলে বসতে-দাঁড়াতেও শেখাতে হবে।'

শার্দূল বললে, 'এরা বড় আধুনিক হয়ে উঠেছে। বড় বাড়াবাড়ি মনে হয়। খানদানী বলে একটা জিনিস আছে তো!'

আমি একটু হাসলাম, একেলে হওয়ার কথায় ওদের কথাই মনে পড়ল আবার। বললাম, 'ছেলেটি তো মূর্খ নয়—পদেও উন্নতি হবে। তোমরা কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখ না। যদি তোমাদের মন বদলায়—বা নানকবিবিরই মন বদলে যায়। জোর-জবরদস্তি না করে আর পাঁচটা সম্বন্ধও দেখতে শুনতে দাও।'

ইতিমধ্যে ক্রন্দনশীল 'কাকা'কে নিয়ে নানক কওর এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যা তখনো হয়-নি। দেখলাম বেশ সুশ্রী সুন্দরী মেয়েটি। ছিপছিপে গড়ন। মুখটা চিন্তিত ও বিমর্ষ বটে, কিন্তু সেজন্যই দেখতে বেশী ভালো লাগল।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিবি, তুমি কি পড়?'

একটু হেসে সে সলজ্জে বললে, 'এইবারে ম্যাট্রিক দেব।' বোনকে বললে, 'কাকা কাঁদছে—আর আমার কাছে থাকছে না।'

আমি উঠলাম।

শার্দূল সিং বললে, 'বাবুজি, আমি তো দু-একদিনের মধ্যে চলে যাচ্ছি। আপনি মাঝে মাঝে হরবংশের কাছে আসবেন।'

বললাম, 'আচ্ছা।'

* * *

আমার গল্প কিন্তু এখানে শেষ হয়ে গেছে। পাঠক-পাঠিকাদের উপর ভার দিলাম তাঁরা কল্পনা করে নেবেন শার্দূল সিং-হরবংশকুমারীর মতো ইকবাল সিং-নানক কওরের প্রেমের পরিণতি হল, কিম্বা নানকবিবি দুর্ধর্ষ নির্দেশে আর কোনো সম্ভ্রান্ত সিংজির সঙ্গে বিবাহিত হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না পাতল এবং ইকবাল সিং সামান্য সেপাই থেকেই একটি

জ্যেঠ কন্যাকে বিয়ে করল।

কিন্তু আমি যেন ওদের ও আমার নানা ভাবনা ও কল্পনার জঞ্জালের মাঝে আমার লেখার উপর বন্ধুর 'সেকেলে' মন্তব্যটির অকস্মাৎ একটি জবাব পেয়ে গেলাম।

সেটা হচ্ছে এই—মানুষ কত শীঘ্র 'সেকেলে' হয়ে যায়। আশ্চর্যভাবে মনে হল, এই সেদিনের হরবংশ ও শার্দূল সিং-এর আধুনিক প্রেম করা—সেকেলে মতামতকে গোঁড়ামি বলা নিজেদের কত একেলে ভাবা মন...আজ ইকবাল-নানকবিবির প্রেমকে বড়ই আধুনিক অনাচার ভাবছে।

মানুষের 'সেকেলে' হতে তবে ক'বছর লাগে? আশ্বস্তভাবে মনে হল তাহলে হয়ত সেকেলে ও একেলের মধ্যে সময়ের বেশী ব্যবধান নেই।

তাহলেও বন্ধুকে আর এ-গল্পটা দেখাবার দরকার নেই।

বসুধারা, আষাঢ় ১৩৬৭

তেপান্তরের মাঠ

শৈলর একতলার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে নীচে চাইলে দেখা যায় শুধু গলির একটুখানি টুকরো; আর ওপরে চাইলে দেখা যায়, এক ফালি মেঘ বা কুয়াশা কি নক্ষত্র-ভরা নীল আকাশ; তেপান্তরের মাঠও নয়, মাঠের ওপর রাজপুত্রের ঘোড়াও নয়, দিগন্তরের দৃশ্যও নয়। কিন্তু চোখ বুজলেই একটা তেপান্তরের মাঠ আকাশ বাতাস গলিপথ ভরে জেগে ওঠে।

কিন্তু সে মাঠে রাজপুত্রের স্বপ্ন সে কোনদিন দেখে না, কেননা সে রাজপুত্রের গল্পই শোনেনি ভাল করে কখনও। বিধবা মায়ের একমাত্র মেয়ে, যাকে নিয়ে বাড়িসুদ্ধ সকলের প্রকাশ্য এবং জননীরও স্বগত ধিক্কারের অবধি ছিল না,—যদি ছেলে হত! ছেলে হলে কি হত, তা অবশ্য জানা নেই, কিন্তু বিয়ে দিতে তো হত না। না, শৈল বিধবা নয় চিরকালকার গল্পের প্লটের বিধবার মতন, শৈলর বিয়ে হয়নি। বয়স এবং রূপ? বয়স একটা বিয়ের বয়সের সীমায়ই ছিল—ষোল থেকে চব্বিশ পর্যন্ত হতে পারে, যাই হোক। রূপ? রূপ শতকরা পনরোজন মেয়ের যেমন চেহারা হয়, তেমনিই ছিল। অর্থাৎ বাংলার 'পাঁচ'ও নয়, আবার অলোকসামান্য অপরূপও নয়। ঘষলে মাজলে যাকে রূপ বলা চলে, আর না হলে একরকম থাকে। শৈল বিয়ের কথা ভাবতে শেখেনি, কেননা সে জানত (সেটা সে শুনে শুনে বুঝেছিল), আর পাঁচটা ব্যবহার্য জিনিসের মত স্বামী সংগ্রহ করতেও খরচা লাগে। জিনিসটা একটু বেশি দামীও। পয়সা না থাকায় আর পাঁচটা বিলাসের মতন স্বামীর বা বিয়ের বিলাসের ধ্যান শৈল করেনি। অন্তত সচেতন মনে করেনি।

সবাই হয়তো ভাববেন, ওর কি তা হলে কেউ ছিল না? ছিল নাই তো। শাস্ত্রোল্লিখিত রক্ষণাবেক্ষণ করবার অধিকারী তিনজনের মধ্যে পিতা তো শৈশবে গত হয়েছিলেন, পতির কথা তো বলছিলামই—হননি, আর পুত্রের কথা তো উঠেই না। আর মাও বাল্যেই অর্থাৎ দশ বছরের মেয়েকে রেখেই গত হয়েছিলেন। শাস্ত্র আর কোন অভিভাবকের কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু শ্লোকের শেষের লাইন অনুসারে জ্যাঠতুতো ভাইয়ের সংসার ছিল, নিয়ম করে দুবেলা খেত, বছরে ছখানা কাপড় আর চারটে শেমিজ পেত। সকালের রান্না সেরে বেলা দুটোয় এসে ঘরের কোণটিতে শুয়ে আকাশের পানে চাইত, আবার পাঁচটায় আগুন পড়লে রান্নাঘরে ঢুকে রাত্তির পৌনে এগারোটায় ছাড়া পেত।

বাড়ীর কর্ত্রী ছিলেন বিধবা দিদি। তিনি ওর মায়ের চেয়েও বয়সে বড় ছিলেন। আর তিনজন বোন আর ক'টি ভাজ। তারা কেউ ওর চেয়ে ছোট, কেউ বা বড়, এমনই। মেজবউ, বড়বউ তাদের সব ছেলেমেয়ে, কারুর তিনটি, দুটি, চারটি। জ্যাঠতুতো ভাই ছজন। ছোট যারা, 'শৈলদি'ই বলে; অমান্য তারা প্রকাশ্যে কেউ করে না।

কিন্তু শৈল একদিন দিদিকে কাকে বলতে শুনেছিল,—সে বুঝি জিজ্ঞেস করে, ও মেয়েটি কে?

দিদি বলেন, ও? ও এই একজন।—বলে একটা মুখভঙ্গি করলেন। সে বললে, আহা, বিধবা?

দিদি বললেন, মূলে মা রাঁধেনি, তার আবার পান্তা! জ্বালাসনি—বিয়ে হবে, তবে না বিধবা!

বিধবা হলে একটা সুবিধা ছিল—কৈফিয়ৎ দেবার বিড়ম্বনা থাকত না, উপরন্তু আশ্রয়দাতৃত্বের উদারতার মর্যাদাও লাভ করতেন। প্রশ্নকর্ত্রী প্রসঙ্গান্তর চর্চায় মনোনিবেশ করলে। শৈল রান্নাঘরে বসে খুন্তি দিয়ে উনুনের অনেকখানি অনাবশ্যক মাটি চেঁচে দিতে লাগল। ও কথাতে অভিমান দুঃখ করবার মতন ভরসাও ওর নেই; ভাববার, কথা কইবারও ওর কেউ নেই। মাটিগুলো ঝরে ঝরে উনুনটা বেশ সুশ্রী হয়ে উঠতে লাগল। শৈল খানিকক্ষণের জন্যে সেইটাই যেন করছিল—এমনই মনে হল, দিদির কথাটা যেন অবান্তর।

গল্পের বইয়ে পড়া যায় যে, কত মহাপ্রাণ যুবক, সদয় তরুণরা ঐরকম অনাথাকে একেবারে উদ্ধার করে সমাদরে বরণ করে নিয়ে যায়। তা যায় হয়তো। কিন্তু শৈলর জ্যাঠতুতো ভাইদের শালারা, বন্ধুরা ভাইফোঁটায় এসে কতরকম খাবার, এমনই বেড়াতে এসে ডিমের সিঙাড়া, মাছের কচুরি, কত কি বিশিষ্ট নোন্তা মিষ্টি ওর তৈরিই খেয়ে যায়। খেয়ে বোনের ননদদের, বোনেদের জয়জয়কার করে। শৈলর আঁচলখানি রান্নাঘর থেকে দেখা যায়—শৈলকেও; কিন্তু এ তো আর গল্পের বই নয়।

শৈলও শুধু ভয়ে ভয়ে ভাবে, যদি নুন বেশি হয় কচুরিতে বা কম হয় তো কি হবে? যেন পৃথিবী রসাতলে যাবে। হল, হলই বা বেশি। কিন্তু ও কেবলই ওইরকমই ভাবে।

কিন্তু ওরা খেয়ে বলে, বাঃ, চমৎকার দিদি! কে করেছে?—'আপনি', নয়তো 'তুমি'?

কথার উত্তর না দিয়ে দিদি এবং বোনেরা সহাস্যে বলেন, নে না আর দুটো; কিই বা খেলি? বাড়ি গিয়ে না হয় আজ খাসনি।

সেদিন না হয় ওঁরা করেননি, কিন্তু শৈল শিখল কার কাছে? শৈল জানত কি? আজকে ও করেছে বটে, কিন্তু শেখা? সেটা তো মানতে হবে। সে হিসেবে ধরতে গেলে ওঁদেরই করা।

শৈল 'চমৎকার' শোনে, ভাবে, বললেন বুঝি, শৈল করেছে। কিন্তু কিছুই আর শোনা যায় না।

তা হোক, রান্না ভাল হয়েছে তো? তা হলেই হল। ওর চেয়ে বেশি আশা শৈলর মনেই জাগে না।

দোতলার ওপরে জেঠতুতো ভাইদের শোবার ঘর, তারা গল্প করে, গান গায়। ওদের ঘরের পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে শৈল রাত্তিরে এক একদিন দোতলায় ওঠে। কিন্তু দোতলার স্বর্গে ধ্যান সে করে না। ওর বুকের বালিকা শৈল এখনও মনকে রূপকথা বলে ভোলায়। সেদিন ওর আকাশটা বড় হয়ে যায়। এক আকাশ তারাসুদ্ধ যেন হাসিতে ভরা কার মুখ ওর পানে চায়। তারা যেন ওকে রূপকথা বলে, যে রূপকথা ও মার কাছে শোনেনি, যা তিনি শেষ করে বলেননি, যা কেউ বলেনি কখনও। তাই, আর পারুল বোনটি। ওর যদি ভাই থাকত! শৈল শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে। তেপান্তরের মাঠ কি রকম দেখতে হয়? শৈল বই বেশি পড়েনি, মানে, ওসব কথার মানে জানে না। ভাবতেও খুব গুছিয়ে পারে না, হিংসে করতে পারে না, রাগ করতে ভরসা পায় না, কাঁদতে অভিমান করতেও পারে না, ও শুধু ভয় পায় সবাইকে। কেউ কিছু বললে

ও শুধু ফ্যালফ্যাল করে চায়। তারপর ভুলে যায়। রাস্তা নিঝুম হয়ে গেল, পথিকের যাওয়া-আসা ক্রমশ কমে এল, পাশের বাড়ির বুড়োকর্তা কেবলই কাসেন। পাড়ার বাড়ির আলোগুলো নিবে আসে, ওর চমক ভাঙে, ও আবার তেমনই নেমে আসে।

দোতলার ঘরের কাছে একটু দাঁড়ায়। বউয়েরা সবিস্ময়ে বলে, কি শৈল ঠাকুরঝি?

ও বলে, কিছু না। নেবে যায়।

ভ্রূকুঞ্চিত করে একজন বউ বলে, এত রাত্তিরে ছাতে ওঠা কেন?

শৈলর কানে যায়। মার বুঝি আগে দু-একটি ছেলে মেয়ে হয়ে মারা যায়, তাই তার নাম রেখেছিলেন সইল। তা সইল ভাষাতত্ত্বমতে শৈল বানানে নাম হয়ে উঠল। তখন ছিল সইল, এখন হল শিলা থেকে। পেছনে এল উপসর্গ বালা। এ শৈল কিন্তু শিলার নয়—যেন পাথর নয়, আর কিছু, যেন স্রোতের শৈবালের মত। যেন গৌরী নয়, গিরিবালা। তবে শিলার মত সহিষ্ণু বটে।

সকালে উঠতে বেলা হল সেদিন। কে বউ বললে, অত রাত অবধি জেগে থাক ঠাকুরঝি, তাই বেলা হয়। যেন রোজই বেলা হয়।

শৈল অপ্রস্তুত মুখে বললে, আজ বড় বেলা হয়ে গেছে। দিদি, একটু তেল দেবেন? দিদি তেল মাখাচ্ছিলেন ভাজের চুলে। শৈলর আতেলা রুক্ষ মাথাটাতে এত চুল কি করে যে থাকে!

ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, একে তো উঠতে বেলা করেছ, তারপর ঐ কাঁড়ি চুলে তেল দেবে, তবে নাইবে, রান্নাঘরে ঢুকবে?

শৈল অপ্রতিভ মুখে ফিরতেও পারলে না, দাঁড়াতেও না। দিদি যদি বলেন, অত তেজ কিসের? বিরক্তিভরে দিদি বললেন, নাও, একটু নিয়ে যাও।

হাত পেতে তেল নিয়ে সে কলতলায় গেল। বিধবাদের চুল কাটতে আছে সে দেখেছে, কিন্তু ওদের কি কাটতে আছে? কিন্তু অত ভাবনার সময় আছে? দুটো উনুন জ্বলে খাই খাই করছে। চুলোয় যাক চুল আর নাওয়া।

বেলার আর বাকি নেই। দুটো বাজল। খেতে বসে দিদির খুব গল্প করা অভ্যাস। সেদিন হচ্ছিল অল্পদিন আগের পুষ্করদর্শন-বৃত্তান্ত। বাপ রে, সে কি দুষ্কর পথ! তোমরা কেউ পারতে না হাঁটতে বড়বউ। আর কি কুমীরের ছিষ্টি সেই হ্রদটায়!

বড়বউ বললেন, দিদি, তুমি নেবেছিলে নাইতে? ভয় করল না?

মেজবউ বললে, মাছের ঝোলটা আজ বেশ হয়েছে। নিরামিষ দিক থেকে দিদি বললেন, আর একটু করে দাও না শৈল।

শৈল মাছের কাঁসিখানা নিয়ে এল।

বড়বউ বললেন, কই, দেখি? একখানা নেজা আর কানকো দুখানা?

আচ্ছা, নেজাখানা মেজবউকে দাও আর কানকো একখানা আমাকে দাও। এবার তুমি বসগে, আর আমরা কিছু নোব না।

পুষ্কর, প্রয়াগ, বৃন্দাবনের গল্প চলতে লাগল। বেলা আর নেই, শীতের বেলা যেন দৌড়ে চলে।

শৈল ছ-আনা দামের দিদির পুরোনা মাদুরখানা উত্তরাধিকার সূত্রে নয়—দয়াসূত্রে লাভ করেছিল, সেইখানা পেতে শুয়ে পড়ে। শুধু কি ভাবে যেন।

গলির মাথায় নীল আকাশটুকু দেখা যায়। সাদা সাদা মেঘ হালকাভাবে তুলোর মতন পড়ে আছে তার ওপর। ওরই মতন যেন শৈলরও জীবনের পাতায় সুখ দুঃখ

বলে বিশিষ্ট কোন অধ্যায় নেই। মনের লেখা ইতিহাসের যত দূর ওর মনে পড়ে—কিছুই বিশেষ নয়। না খেলনা পুতুল, ফিতে কাঁটা, ভাল কাপড় জামা শাড়ি গহনা, কি কোন তুচ্ছ বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও করেনি, ভাবেও না। শান্তিও নেই, অশান্তিও নেই। ওর অত ভাববার শক্তিই নেই, জানেই না। শুধু একটা একটা ছাড়া-ছাড়া ভাবনা, তা নিজেরও সবটা নয়, ভাবে। হয়তো ভাবে, দিদিরা কেমন পুষ্করতীর্থ করতে গিয়েছিলেন, খেতে বসে গল্প করছিলেন। কি উঁচু পাহাড়ে উঠতে হয়! কি বালি নাকি! যেন বালির সমুদ্দুর—দিদি বলছিলেন। ওর নিজের যাবার সাধ? না, দুরাকাঙ্ক্ষা করবারও একটা ক্ষমতা দরকার, ওর ওদিকটা নেই। যে অত ভীরু, সে কখন আপনার কথা ভাববে? ও ভাবে, সাবিত্রী-ঠাকুর ওঁরা দেখে এসেছেন, আবার গায়ত্রীও আছেন, সুন্দর নাকি মূর্তিটি। সাবিত্রী নাকি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে ঐ উঁচু পাহাড়ে উঠে বসেছিলেন, আর সেই অবসরে স্বামী ঐ গায়ত্রীকে বিয়ে করে ঘরকন্না করতে আরম্ভ করেন। ওর একটু হাসি পেল। স্বামীর কথায় ওর বছর তিনেক আগের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। ওর জ্যাঠতুতো বোনের বিয়ের সময় সকলে ওঁদের নিন্দে করতে লাগল, বুঝি তাই ওরও একটি সম্বন্ধ এসেছিল। একদিন সকালে কারা দুজন দেখতে এলেন। তাড়াতাড়ি ওকে রান্নাঘর থেকে বের করে মুখে খানিক সাবান স্নো ঘষে মেজবউদির একটি সিল্কের শাড়ি আর তারই জামা, ঢলঢলে হল—তাই পরিয়ে মেজবউ কার একটা হার পরাতে চাচ্ছিল, দিদি বললেন, না হার দিসনি, তা হলে বিয়ের সময় দিতে হবে। হাতে ওর মার বালা আছে, ওতেই হবে।

বৈঠকখানায় ভাইয়েরা নিয়ে গেলেন। ও প্রথমেই একবার চাইতেই দেখলে একটি কাঁচা-পাকা—বেশিরভাগই পাকা চুলে ভরা, মাঝখানে অল্প টাকপড়া-মাথা একটি ভদ্রলোককে, আর ও চোখ তুলে চায়নি। ও গিয়ে বসল। সেই ভদ্রলোকটিকে ও ভেবেছিল, তিনি শ্বশুর—যাঁকে 'তোমার নামটি কি মা?' জিজ্ঞেস করলে মানায়, তিনি বললেন, নামটি কি?

ও বলে, শ্রীমতী শৈলবালা দেবী। অপরজন জিজ্ঞাসা করলেন, বয়স কত? তা বুঝি দাদারা হকচকিয়ে কি বলবেন ঠিক করতে না পেরে একসঙ্গেই একজন বললেন ষোল, একজন বললেন, আঠারো। মোট কথা, ওঁরা কত বয়স চান? তা হ'লে ঠিক করে বলা যেত।

ভদ্রলোকেরা একটু হাসলেন শৈলর বোধ হল, কিন্তু ও তো মুখ তোলেনি। পরীক্ষা হয়ে গেল। বোবা নয়, নাম বলতে পারে; খোঁড়া নয়, চলতে পারে; আর কানাও নয়, চোখ দুটি পদ্ম-চোখ না হোক, পরিষ্কার দুটি চোখ।

ওঁরা বললেন, নিয়ে যান। ও চ'লে আসতে আসতে শুনলে, দাদারা বলছেন, ও বোনটি আমাদের খুব কাজকর্ম পারে—ইত্যাদি। ভেতরে এসে কাপড়-চোপড় ছেড়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকল ভাতের ফেন গালতে। তারপর সব দাদারা ভেতরে এলেন, দিদি বললেন, কি হল, পছন্দ হল? জবাব এল, না! ওরা বললে, বড় ছোট মনে হচ্ছে। ঐ বুড়ো ভদ্দরলোকটিই বিয়ে করবেন কিনা—মাস কতক হ'ল স্ত্রী গত হয়েছে, চারটি ছেলে, তিনটি মেয়ে—সুন্দরীগাঁয়ের স্টেশন-মাস্টার। একটু বেশি বড় চান—আমার কেমন ভুল হল, নইলে বয়স ওর কুড়ি হ'ল না? তা, আবার খবর দেবে। কিছু দিতে পারলে হ'ত। দিদি বললেন, ওঃ, তা আর কোথায় পাবি? ভাজেরা বরের বর্ণনায় মুখ টিপে হাসলে।

কিন্তু আর তাঁরা খবর দিলেন না এবং বরের বা স্বামীর কথায় নিজের সম্বন্ধে প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছাড়া আর কারুরই কথা মনে আসে না, আর মনে হলেই কেমন ওর হাসি পায়, ও ভেবেছিল যে, তিনি 'মা' ব'লে কথা কইবেন। যথা সময়ে বোনদের বিয়ে হয়ে যেতে লাগল, তা যাক। কিন্তু সাবিত্রী কি বাবু—এত রাগ, আর ওঁরই বা কি বিয়ে করা? শৈলর নীল আকাশটুকু ঝাপসা হয়ে গেল; চোখের সামনে জেগে ওঠে প্রকাণ্ড দিক-দিগন্তহীন প্রান্তর—বাংলা দেশের মাঠের মত সবুজ নয়, শ্যামল নয়—এ মাঠ শৈল কখনও দেখেনি, এই যেন সেই তেপান্তরের মাঠ। অনেক দূরে একদিকে পাহাড়ের সারি, বেঁটে বেঁটে বাবলাগাছ এখানে ওখানে, আর শুধু পুরীর বালির মত ধুধু-করা বালি। যেদিকে তাকায়, সুমুখে পাহাড়ের ওপারে সাদা কি দেখা যায়—যেন বাড়ির মতন, সমতলে পেছনে দূরে মেটে ঘর। কোন্‌দিকে যাবে, শৈল ভাবে। কিসের জন্য তাও জানে না, শুধু ভাবে, আগে ঐ মন্দিরের দিকে যাবে—না কোথায় যাবে, কোন্ পথে এল তাও বুঝা যায় না। পাহাড়ে প্রান্তরে আকাশে আর অমিল নেই—সমস্ত শূন্য ভরে তারা ওরই পানে চেয়ে আছে শুধু।

ও দিদিমণি, আকা যে পুড়ে খাক হয়ে গেল, কত গুমোতে লেগেছে গো দিনের বেলায়!—পরিষ্কার কাংস্যকণ্ঠে ঝির আহ্বান কানে এল।

শৈল ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। দিদির গলা শোনা গেল, সকালে তিনমণ কয়লা পুড়বে, সন্ধ্যেয় দু-মণ পুড়বে তবে ঘুম ভাঙবে, অমনি! শৈলির দিনেও কি মড়ার ঘুম!

অপ্রতিভ শৈল কাপড় কাচতে কলতলায় গেল।

দুধ, বার্লি, সাগু, তারপর ডালের পরে ভাত, তারপর চচ্চড়ি, ডালনা, মাছ, রুটি, লুচি খানকতক। বড়দার বসবার ঘরের ঘড়িতে একটা একটা ক'রে কতগুলো বেজে যায়। চাকি-বেলুন, হাঁড়িকুঁড়ি ধোওয়া-মোছা হয়। এক এক করে সকলের খাওয়া হয়ে যেতে থাকে। সবাই চলে যায়। ও নিজের ভাত কটি নিয়ে বসে। কেউ জিজ্ঞাসা করে না, কি আছে না আছে, সেও কিছু বলে না। সে বলেও না, ভাবেও না—কলটেপা পুতুলের মত কাজ শেষ করে চলে।

রাত্তিরে আবার জানালা দিয়ে নক্ষত্রভরা আকাশ—কোন্ অজানা দেশের রূপকথার বইয়ের পাতা মেলে ধরে ওর চোখের সামনে। ছায়াপথের একটুখানি দেখা যায়। ওর কাছে যেন আকাশ আর পৃথিবী একই—সবই সমান যেন। ওটা যেন আর একটা পৃথিবীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ; রাত্রে তার রোজ দেওয়ালি, সকালে সূর্যের আলোর ধারাস্নান, ওর সাজ নেই তাই মেঘের রঙের উৎসব। কিন্তু তেপান্তরের মাঠটা? কোন্‌দিকে? কি রকম দেখতে? আচ্ছা, যদি কেউ ওকে নিতে আসত? রাজপুত্তুর? না, আগেই তো বলেছি, ও সে কথা ভাল করে শোনেইনি। তবে? মৃত্যু? না, ওর অভিমান নেই, রাগ নেই, কষ্ট নেই, ও শুধু সবাইকে ভয় করে, তাও শান্তভাবে, মৃত্যুকেও সে ভাবে না, মরণের মত অভিমান ওর মনে জাগেই না। তবে কে নিতে আসবে? তা সে জানে না। রাত্তিরের আকাশের ঝিকমিকে হাসিমুখ তার চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে আসে, ঘুম-চোখে শৈল তেপান্তরের মাঠের একখানা ছক খুঁজে খুঁজে বেড়ায় যেন সব জায়গায়—যদি পার হতে পারে।

জয়শ্রী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

ময়ূর-সিংহাসন

মোগল বাদশাদের তখ্‌ত-তাউসের কথা নয়, এবং জাহানারা রোশেনারা জেবউন্নিসা প্রমুখ শাহাজাদীদের কথাও নয়—যাঁরা বাদশার পর বাদশার রাজত্বে, একের পর একে, পিতার ময়ূর-সিংহাসনের পেছনে সাদা পাথরের জালায়নের ভেতরে বসে গৌরবান্বিত অস্তিত্বে, গর্বিত অন্তরে, আমীর, ওমরাহ্, শাজাদা, রাজা, মহারাজা বেষ্টিত পিতার সভা দেখতেন।

এ হচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত জমিদার নরনারায়ণ ভাদুড়ীদের ঐশ্বর্য ও বিলাসের কথা ও তাঁদের মেয়ে শিখার বিবাহের কথা। নরনারায়ণ ভাদুড়ীর প্রপিতামহ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের আমলে কি করতেন বা কি করে অতবড় জমিদারি অর্জন করেছিলেন, সে কথা তাঁদের বংশের সবাই জানে, কিন্তু বলে না; এবং সেই ধনসম্পদ যে দেবী চৌধুরাণীর ভাষায় 'জপতপের নয়', সে কথা বলা বাহুল্য। তবে এখনকার দিনে অন্য লোকে সে কথা জানে না, অতএব সকলেই তাঁদের বনিয়াদী ধার্মিক বংশ বলে।

সেকেলে ধরনের প্রকাণ্ড বাড়ি ও তারও চেয়ে বড় বাগান বরানগরে। বছরে গরম ও বর্ষার ক-মাস এখনও ওখানেই থাকা হয়। ওঁরা এখনও বালিগঞ্জীয় সভ্যতাকে পোষ্য গ্রহণ করেননি। সেকেলে আভিজাত্য-গর্ব অতিশয় রক্ষণশীলভাবে ওঁদের মনের ধমনীতে বয়। ওঁরা অপরের অনুকরণ করেন না, অপরে ওঁদের অনুকরণ করুক।

নরনারায়ণ ভাদুড়ী নেই। তাঁর ছেলে সুরনারায়ণ ও বীরনারায়ণ। সুরনারায়ণের মেয়ে শিখার বিয়ে উপলক্ষে এই সভা ও গায়ে-হলুদের ভোজে এই কন্যাসন সাজানো হয়েছে।

মেহগ্নি কাঠের অতি হাল্কা চৌকি—লতাপাতাফুল-আঁকা রূপার পাতে খানিক খানিক মোড়া; চৌকির পায়া চারটি বাঘের থাবার অনুকরণে তৈরি, তাদের নখের কাজগুলি রূপালী ফিকে নীল মিনার। পেছনে ঠেস দেবার জায়গাটা খুব সোজা নয়, একটু হেলানো; তার কাঠের কাচে সোনালী করা রূপার পাতের ফুল আর কাঠের কালো সূক্ষ্ম পাতায় মনে হয় যেন অপূর্ব। আসলে একখানি চৌকিই, একটু জমকালো রকমের কাজ করা। কিন্তু চারদিকের আবেষ্টনে, প্রকাণ্ড ঘরখানিতে, সেকেলে ধরনের ঝাড়লণ্ঠনের বাতির মধুর স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোতে, দেয়ালের পর্দাতে, ছবিতে, আর মেঝের ওপর পাতা বিছানাতে নিমন্ত্রিতা মেয়েদের বসন-ভূষণের ও রূপ-লাবণ্যের মাঝে কনে শোভিত কন্যাসনখানি যেন পুরাণের কোন্ রাজকন্যাকে মনে পড়িয়ে দেয়।

অবশ্য আজ নতুন নয়। অনেক বিয়ে হয়েছে এ-বাড়িতে। ঐ আসনখানিও বউভাতে বধূর আসন, কন্যার বিয়েতে মেয়ের আসন, বরাসন জামাইয়ের জন্য, অনেকবার হয়েছে।

এ সবই নরনারায়ণ ভাদুড়ীর পিতামহের আমলের জিনিস। তিনিই ছিলেন অতিশয় শৌখিন ও সূক্ষ্মরসজ্ঞ। তাঁর একটিমাত্র মেয়ে ছিলেন, নাম ছিল ভুবনেশ্বরী। তাঁর বিয়ের সময়েই এই চৌকিখানি কেনা হয়। সে অনেক বছর আগের কথা, অর্থাৎ তিনি

থাকলে তাঁর বয়স হত একশো বারোর কম নয়। তারপরে তাঁর ভাইঝি অর্থাৎ নরনারায়ণের বোনদের বিয়েতেও ব্যবহার হয়েছে। ওঁরা ছিলেন তিনজন। দু-জন নেই, একজন কোথায় কোন্ তীর্থে বাস করেন, কদাচ কখনও আসেন। তাঁদের বড়র নাম রাজমোহিনী, মেজ ব্রজমোহিনী, সব ছোটর নাম মুনিমনোমোহিনী। এই বৃদ্ধা মুনিমনোমোহিনী বেঁচে আছেন। যৌবনে নাকি তাঁর রূপের কথাটা 'ডাকের কথা'র মত চলিত ছিল। বড় সুন্দরী ছিলেন। একদিন নাকি তিনি ঐ আসনে বসলে আসনের রূপ যত বেড়েছিল, আর কোনও রাজকন্যার বেলা তা হয়নি—নিন্দুক লোকে বলে। যেন আর সুন্দরী মেয়ে ছিল না বাড়িতে।

সন্ধ্যা শেষ হয়ে রাত্রি বাড়তে লাগল। নিমন্ত্রিতার সমাগমে বাড়ি ভরে যেতে লাগল। শিখাও সুন্দরী। ছবির মত সে চৌকিখানিতে বসেছিল।

দলের পর দল আসে, যায়, খেয়ে এসে বসে, নয় বাড়ি ফেরে। জনতা ঘরে আর তেমন নেই। শুধু শিখার সমবয়সী কয়েকটি মেয়ে আছে।

সিঁড়িতে একখানি মুখ দেখা গেল। সে মুখ মুনিমনোমোহিনীর মত সুন্দর নয়—লোকে বলে। কিন্তু সে মুখখানির অধিকারিণীও কম আকর্ষণ করে না চোখকে।

শিখা হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল, বললে, পিসীমা! এগিয়ে এসে প্রণাম করলে। তোমার এত দেরি?

পিসীমা ভাইঝিকে বুকের কাছে নিয়ে কপালে মুখ ঠেকিয়ে বললেন, শরীর ভাল ছিল না রাণুমা।

এই পিসীমা ইন্দ্রাণী হচ্ছেন সুরনারায়ণদের বোন। এঁকে সুন্দরী বললে সব বলা হয় না, প্রতিমা বললেও ঠিক বলা হয় না, রূপেও তাঁর চেয়েও শ্রেষ্ঠ অনেক মেয়েকে হয়তো দেখা যাবে। কিন্তু ইন্দ্রাণী যেন ইন্দ্রাণীই।

ওঁদের বংশে মেয়েদের নাম যেমন জমকালো রাখার প্রথা ছিল, আদরও তেমনই জমকালো হত। অর্থাৎ আড়ম্বর ছাড়া কর্তারা এক পা চলতেন না। তাই শুধু 'ইন্দু' নামে চলেনি, ইন্দ্রাণী রাখতে হয়েছিল এবং জামাইকে নিমন্ত্রণে আদর করা হয়নি, ঘরে রেখে আদর দেখানো হয়েছিল।

ইন্দ্রাণীর পরিধানে লাল কস্তাপাড় শাড়ি। বড় কপালখানি ঘিরে পড়েছে সেই পাড়ের কিনারা, সাদা শেমিজ গায়ে। কপালে সিন্দূর-ফোঁটা নেই, মাথায় বড় করে সিন্দূর। হাতে গাছকতক গোখরী চুড়ি, গলায় দড়াহার—পুরানো দড়ির মতনই মলিন। শরীর অত্যন্ত লঘু মনে হয়—মোটা নয়, পাতলা। বয়স হবে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। কিন্তু কি জানি কেন, রূপের মাধুরীর আর শ্রীর যেন শেষ ছিল না। তাঁর শান্ত সুন্দর নিরাড়ম্বর দীপ্তির কাছে তরুণী শিখাও যেন ম্লান।

মা'রা কোথায় রাণু?—পিসীমা প্রশ্ন করলেন।

রাণী ওরফে শিখা বললে, ঠিক জানি না। সমবয়সী মেয়ে কটি পিসীমার দিকে চেয়ে ছিল।

ভাজেদের ও মাকে খুঁজতে ইন্দ্রাণী অন্য মহলে গেলেন। ভাজেরা বললেন, এত দেরি?

তিনি মায়ের সন্ধানে গেলেন।

মা সন্ধ্যা করছিলেন। ইন্দ্রাণীকে দেখে, তাঁর জপের সংখ্যা শেষ করে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললেন, ইন্দু, এত দেরি? ইন্দু শুক্লা পঞ্চমীর ইন্দুলেখার মতন ম্লানভাবে একটু হাসলেন। তাঁর দেরি আর হাসির অর্থ মা জানতেন।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, রাণুকে দেওয়ার মত কিছু ঠিক হল?

ইন্দুর চোখ নীচু হয়ে এল, বললেন, না মা।

মা চুপ করে রইলেন খানিক।

তোর নিজের কিছু নেই?—আবার মা প্রশ্ন করলেন।

মেয়ে বললেন, কই!

অন্যমনে দুজনের চোখই ঘরের লোহার সিন্দুকের ওপর পড়ল। ইন্দ্রাণীর সমস্ত গহনাই প্রায় ঐ সিন্দুকে ফিরে এসে জমা হয়েছে। একদিন ঐ সিন্দুক থেকেই ওঁর গায়ে তারা উঠেছিল।

তার ইতিহাস অনেক। কতদিনের কথা। রাজকন্যার বাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতা করে রাজকন্যার অর্থাৎ ইন্দ্রাণীর শ্বশুরের অবিবেচনার ব্যয়জনিত ঋণ: কিশোর স্বামীর ধনী শ্বশুরালয়ের আওতায় শ্বশুরশাশুড়ীর অত্যধিক প্রশ্রয়ে দায়িত্বহীন লালন; ইন্দ্রাণীর শ্বশুরের মৃত্যু; সেই তখন ঋণের পরিমাণ জানা; তারপর সংসারের দুঃখ ভাবনা অসুখ, ঋণ পরিশোধের ভাবনা, লোক-লৌকিকতা, ছোট খরচ, বড় খরচ, মান রাখার জন্য আভিজাত্যের নিখুঁত অভিনয়, ওই ওরাই—সিন্দুকে যারা আছে, তারাই ওঁকে সেই রাজকন্যার অভিনয় করতে সাহায্য করেছে।

ইন্দ্রাণীর তখন বাবা বেঁচে ছিলেন। বহুমূল্য অলঙ্কার বাইরে বিক্রি করতে দেননি। নিজের জিনিস নিজেই কিনে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ভালই, সময় ভাল হলে কিনে নিও। এখন মা আছেন। মাও সেদিন খোকার অসুখের সময় শেষ মিনা ও মুক্তার সরস্বতী হারটি কিনে রেখেছেন, ঘরের জিনিস ঘরে থাক। ইন্দুর কপালে নেই, কি করবেন মা-বাপ!

ইন্দ্রাণী চুপিচুপি রাত্রে এসে একে একে কত জিনিস বিক্রি করে গেছে। ভাই ভাজ—সবাই জানে অবশ্য, অবশ্য জানে নাই যেন।

মা এবার বললেন, কানের ঝুমকো-লতাটা?

না মা, নেই।

সেটা আবার কি হল?—আশ্চর্য হয়ে মা জিজ্ঞাসা করলেন।

ভাসুরঝিকে বিয়েতে দিয়েছে সেদিন।

মা উষ্ণভাবে চুপ করে রইলেন। জামাই? জামাইয়ের কি নিজের ভাইঝিকেও একটা কিছু দেওয়ার সঙ্গতি নেই? সেও ইন্দুর জিনিস নিয়ে দিতে হবে? মুখে কিছু বললেন না।

ইন্দ্রাণী চোখ না তুলেই সব দেখতে বুঝতে পারছিলেন যেন। কিন্তু তিনি জানেন, আজও তাঁকে সেই রাজকন্যারই অভিনয় করতে হবে, আর এও জানেন, নিখুঁত করে। সেই অভিনয়ের ত্রুটি হয় পাছে, তাই মার এত ভাবনা, ভয়, এত জিজ্ঞাসা।

আর ইন্দ্রাণীর সব মনে আছে, আঠারো বছরের ছেলে-জামাইকে ছেলের চেয়ে আদরে ঘরে রাখা, মেয়েকে নিজের ঘরে না দিয়ে কাছে রাখা, মাতার ও পিতার

ইন্দ্রাণীগত প্রাণের কথা এবং তার জন্য ভাইদের ওঁদের দুজনের প্রতি বিরাগের কথা—সমস্ত মনে আছে। পরকে আপন করার জন্য যে অতিরিক্ত আদরের প্রশ্রয়ের উৎকোচ দেওয়া মানুষের স্বভাব আছে, তার কাজ আদায়ের প্রয়োজন আজ ফুরিয়েছে, তাই আজ সেই তাঁর অর্থহীন সহায়সম্পদহীন অস্তিত্বের ওপর আর কারুর শ্রদ্ধা নেই।

শ্রান্তভাবে ইন্দ্রাণীর মনে হতে লাগল, ঐ সিন্দুক থেকে একটি—একটিমাত্র ওঁরই গহনা আজকের মত আবার ওঁর হয়ে যেত! রাণুকে দেওয়া যেত। তারপর? তারপর আবার যেমন দেউলে নিঃস্ব আছেন, তাই থাকতো। শুধু রাণুকে দেওয়াই ওঁর ভাবনা।

দুজনেই চুপ ক'রে রইলেন।

অনেক পরে মা বললেন, তবে?

ইন্দ্রাণী কিছু জবাব দেবার আগেই ঘরে মুনিমনোমোহিনী এসে দাঁড়ালেন।

ওমা, ঠাকুরঝি যে! এস, এস।—ইন্দ্রাণীর মা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনায় আহ্বান করলেন।

এই আসছি কাশী থেকে, লোক গিয়েছিল তোমার।

ইন্দ্রাণী পিসীমায়ের পায়ের ধুলো নিলেন।

বয়স তাঁর সত্তরের কাছে। সুশ্রী, একটু দীর্ঘাকৃতি, পাতলা চেহারা। সুন্দরী ছিলেন মনে হয়।

আস্তে আস্তে বাড়ির অন্য সকলে মায়ের ঘরে এসে পিসীমায়ের কাছে জমা হল।

ইন্দ্রাণী আর তাঁর ভাবনা বিয়ে-বাড়ির উৎসবে আর গোলমালে থমকে গেল।

অনেক রাত্রে ক্লান্তশরীরে ক্লান্তমনে ভাবনায় ভয়ে তিনি নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন অভুক্ত অসুস্থ শরীরে।

বিয়ের দিন।

গায়ে হলুদের উৎসব ছাড়িয়ে গেছে।

দোতলার ঘরে জেঠীমা পড়াচ্ছিলেন রাণুকে চন্দন, মা কাপড়-চোপড়-গহনা ঠিক করছিলেন পড়াবার জন্য।

রাণু অর্থাৎ শিখার জেঠীমা সেকেলে ধরনের জমিদারের ঘরের মেয়ে। পাড়াগাঁ থেকে এসেছেন, একটু সাদাসিদে, এখনও স্বজনকে সমীহ করেন, গুরুজনকে ভয় করেন, অন্যায় সত্য স্পষ্ট বলতে পারেন না, লজ্জা পান বলতে, দেখতে সুশ্রী।

রাণুর মা খুব সুন্দরী। শহরের গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে। শুধু রূপের জোরেই যে এবাড়িতে এসেছেন, তা উনি জানেন, আর সকলেও জানে; এবং সেই রূপকে রৌপ্যের আভিজাত্যের গৌরব যে কেউ দিতে চায় না, এ কথাও উনি জানেন। এ দুঃখ তাঁর যায় না। তাই তিনি ঘরে বসে সর্বত্র অপরের রূপের খুঁত ধরেন, অভিজাতঘরের জন্যে রূপের ও রঙের মহিমা যে অন্য অনেক কিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাই প্রতিপন্ন করার জন্যে অনেক স্পষ্ট কথা হক কথা বলেন, এবং তাঁর এক অবাস্তব মাতুলবংশের পরলোকগত আভিজাত্যের গর্ব করে থাকেন।

রাণুর মা বললেন, দেখলে দিদি, ঠাকুরঝির কাণ্ড! কাল অত রাত্রিতে এলেন, ভাল করে খেলেন না, এত বা অসুখ কি!

ওঁর যেন অন্তঃকরণটা কেমনতর!—ছোট বউ কিছু বিশুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করতে

ভালবাসেন। ছোটবেলা কোন্ মিশন স্কুলে পড়ে তিনি 'গুড কণ্ডাক্টে'র মেডেল পেয়েছিলেন।

জেঠীমা চন্দন বেঁকে যাবার ভয়ে খুব আস্তে আস্তে উত্তর দিলেন, হবে, অসুখ করেছে হয়তো বা।

রাণু বললে, হ্যাঁ, পিসীমার গা গরম ছিল আমি দেখেছি।

রাণুর মা বললেন, কি দিলেন তোকে তোর পিসী? জান দিদি, এখনও ঐ ভয়েই আসেনি। সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, দিয়ে নিয়ে একটাই ভাইঝি তো! এই তো আমি সেদিন আমার ভাইঝিকে মুক্তোর কলার দিয়ে আশীর্বাদ করলুম। মনের সে টান থাকলে তো!

জেঠীমা চন্দনের সূক্ষ্ম ফুল আঁকছিলেন মেয়ের গালে, বেঁকে যাবার ভয়ে রেখা টানার মতই আস্তে আস্তে বললেন, আজ মার সিন্দুক খুলেছিলাম রাণুর বরের দৃষ্টিভাতের রূপোর বাসনের জন্যে। জানিস, ঠাকুরঝির সব গয়না ঐ সিন্দুকে।

ছোট জা বললেন, মানে? মার কাছে রেখে গেছেন?

অনেকটা, জন্মের মত রেখে গেছেন। ওর সবই মা নিলেন শুনেছিলাম যেন।

ছোট বউ সবিস্ময়ে বললেন, এমন পোড়া কপাল! হ্যাঁ ভাই, হাই আমলা কে বাটবে? উনি?

দরজার পাশে ছায়া পড়ল, ঘরের বড় আরশিতে সেই ছায়াধিকারিণীকে নিমেষের জন্য দেখা গেল। দেখতে দেখতে সেই ছায়া বারান্দা পার হয়ে গেল।

জেঠীমা জবাবে তখন বলছিলেন, না, ও কেন করবে? ও তো অন্য সম্পর্কের কাজ।

রাণু বললে, পিসীমা!

জেঠীমা ও রাণুর মা নীচু মুখে ছিলেন, দেখতে পাননি। বললেন, কই? মেয়ে বললে, দেখলাম যেন সেইরকম।

বধূরা সভয়ে চুপ করে গেলেন।

বাইরের সিঁড়ির মোড় যেখানে বেঁকে তিনতলায় উঠে গেছে, সেখান থেকে নীচের প্রাঙ্গণের বরসভা দেখা যায়।

বাইরের সিঁড়ি, মেয়েদের ভিড় সেখানে নেই। ছেলেরাও নীচেয়।

ইন্দ্রাণী চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন রেলিঙের গায়ে ভর দিয়ে।

আলোতে উৎসবে ঝলমলে প্রাসাদের মত বাড়ি।

ইন্দ্রাণী ঝুঁকে নীচে বরসভা দেখতে লাগলেন। সেই চৌকিখানি, সেই একই ধরনের সাঁচ্চা সলমা-জরির কাজ করা গদি তাকিয়া। একই রকম সব। হয়তো একদিন মুনিমনোমোহিনীর বরও ওই বরাসনেই ঐরকমভাবে বসেছিলেন। সেদিন পিসীমাকেও ঐরকম সাজানো হয়েছিল।

স্বপ্নের মত এলোমেলোভাবে ইন্দ্রাণীর কত কথা মনে হচ্ছিল। ভাজেদের কথা? হ্যাঁ, কিছু কানে গেছে। কিন্তু তাতে কি? ইন্দ্রাণীর শুধু মনে হতে লাগল, সে যদি সব ভুলে যায়!

তবু মনের ছোট্ট কোণের একটুখানি জায়গায় ঘুরে ফিরে জাগে, কালকে রাণুকে কিছু একটা দেওয়া দরকার। আচ্ছা, সে তো আজ নয়, কাল। কিন্তু কি—কি দেবেন?

চুপ করে নীচের দিকে চেয়ে থাকেন।

হঠাৎ তাঁর কি রকম হাসি এল। হাসতে গিয়ে কিন্তু চোখ ভরে জল এল।

চারদিকের বাগানের ঘুমন্ত গাছের রাত্রে-ফোটা ফুলের গন্ধে বাইরের অন্ধকার, ভেতরের উৎসব মদিরভাবে ভরে উঠেছে যেন। তাই কি? তাতেই হয়তো ওঁর মাথা ধরেছে মনে হল। হাসি এল না। অন্য মনে ভাবতে চেষ্টা করলেন, কি ফুটেছে? বকুল? রজনীগন্ধা? বেল? না, যেন বোশেখী চাঁপা। মিষ্টি উগ্র মিশ্র গন্ধে, ভাবনায়, অবসাদে, মাথাধরায় ওঁর শরীর মন যেন ভেঙে পড়ছিল শিথিল হয়ে।

মনে হচ্ছিল, কোন একখানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন—অনেকক্ষণ অনেকদিন—সেই গল্পের কাঁটাবনের মাঝে রাজকন্যার মত চিরদিন—আর ঘুম না ভাঙে!

কাল তা হলে আর রাণুদের আশীর্বাদ করতে হয় না। মনে হতে লাগল, বয়সের ওঁর সীমা নেই, অনেক। দিনগুলো কি এখন রূপান্তরিত হয়ে বছর হয়ে উঠেছে!

হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ হল।

বড় ভাই আসছিলেন বধূদের নিয়ে, বরসভা দেখাবার জন্যে।

কি রে, এখানে কে? ইন্দু? ভাল আছিস? কাল এসেছিলি? দেখিনি তো! তোর ছেলেমেয়ে কই? কেমন বরসভা হয়েছে? তোর মুখটা অমন শুকনো কেন? জ্বর হয়েছে? ও! ওগো, ওর বাড়িতে তা হলে ভাল করে খাবার-দাবার যায় যেন, দেখো। কেমন সভা সাজানো দেখছিস? বেশ, না?

ভাইয়ের ঝড়ের মত প্রশ্ন ও কথায় ইন্দ্রাণী জবাব দেবার সময় না পেয়ে ঘাড় নেড়ে শুধু একটু হাসলেন।

ভাই চলে গেলেন। চুল-বাঁধার সময়ের কথা শুনতে পাওয়ার সন্দেহ ছিল, অপ্রস্তুত মিষ্টি সুরে ভাজেরা বললেন, তুমি এখানে একলা কেন ভাই?

বর আসবে, দাঁড়িয়েছিলাম।

চল, রাণুর কাছে যাই। সাজানো দেখেছ?

না, চল।

কনেচন্দনপরা রাণু পিঁড়িতে বসে জল সওয়ার জলে হাত ডুবিয়ে বসেছিল। বর আসবার আর দেরি নেই, আগে থাকতেই তাই রাণুকে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

জেঠীমা, মা আর পিসীমা এসে দাঁড়ালেন।

ঠাকুরঝি, রাণুর সব গয়না দেখেছ?—মেয়ের মা জিজ্ঞাসা করলেন।

ইন্দ্রাণী বললেন, সব বোধ হয় দেখেনি।

গায়ে তার গহনার সীমা পরিসীমা নেই। মা, জেঠীমা, ঠাকুমার সখে তৈরি করানো, পৃথক পৃথক আশীর্বাদের জন্যে গড়ানো, বাপের আদরে সাজানো, মাতামহী মাসী মামীদের যৌতুকের দেওয়া। না, ওর গায়েও ধরেনি সব, আর সংখ্যাও যেন নেই। ইন্দ্রাণীর নিজের দু-একটা কি জিনিসও রয়েছে তার মধ্যে। জিনিস ইন্দ্রাণীর বটে, কিন্তু সে তো দেয়নি! চট করে চারজনেরই যেন একসঙ্গে মনে পড়ল, এই আত্মীয়তালিকার উপহারের পাশে ইন্দ্রাণীর নাম নেই। ইন্দ্রাণীর তাই মনে হল অন্তত, ওদের মনে পড়ুক বা না পড়ুক।

বড় ভাজ বললেন, কাশীর ছোটপিসীমা রাণুকে এই দুটি মাথার কাঁটা দিয়েছেন।

ছোট ভাজ একটু হেসে ফেলে বললেন, যেন পেতলের মত রং, না দিদি? দেবার যখন ক্ষমতা নেই, নাই বা দিতেন বাবু।

ইন্দুর পক্ষে ঘরের হাওয়াটা যেন একটু ভারী হয়ে উঠল।

ছোট ভাজ বললেন, জান ভাই, আজ কি কাণ্ড হয়েছে! পিসীমার ঝি নাকি দুদিন ধরে আমাদের সেই গোলাপমধু আমের গাছের আম নিয়ে আসছিল, কারুকে না জিজ্ঞেস ক'রেই। এখন মালী রাখে গুনে কিনা, কাজেই কম পড়েছে তার। আজকে যেমন নেওয়া, সে আম কটি নিয়েছে হাত থেকে। তখন সে বলেছে, পিসীমা বলে দিয়েছেন তাঁর বাবার পোঁতা গাছ থেকে আনতে। তারপর আম আর নেয়নি, গেল পিসীমার কাছে, আর মালী গেল বাইরে। আমরা কিছু জানি না। এরা আম দিয়েছেন পাঠিয়ে ভেতরে মার ঘরে। এদিকে পিসীমা নাকি ভারী লজ্জিত হয়েছেন, রাগও করেছেন একটু, কি সব কথা হয়েছে জানি না। তা এঁরা নাকি বলেছেন, নিজের সীমার মাঝে থাকলে তো কথা হয় না, সীমা রাখতে জানা চাই।

ইন্দ্রাণীকে যেন কে এক ঘা চাবুক মেরে গেল মনে হল। সীমা? সীমা তার তাহলে কতটুকু? সে জানে তো রাখতে? নিজের গণ্ডির সীমানা সে মানে তো? অজান্তেই পিসী-ভাইঝির চোখোচোখি হয়ে গেল। শিখাও বালিকা নয়, সতরো-আঠারো বছর বয়স হয়েছে, এখনকার মেয়ে। শিখার চোখ নীচু হয়ে গেল।

ইন্দ্রাণীও চুপ করে ছাইয়ের মত মুখে চেয়ে রইলেন। কথা হয়ে যাবার পর হঠাৎ বধূদের মনে হল, যেন কথাটা মজার নয়, না বলবার মতই কথা।

রাস্তার মোড়ে দূরে বিলিতী বাজনার একটা ঝঙ্কার জোরে বেজে উঠল। ঘরের আবহাওয়াটা যেন নড়ে উঠল। রাণুর মা জেঠীমা তাড়াতাড়ি সব বেরিয়ে গেলেন। বাইরের দালানে শুধু পায়ের পর পায়ের শব্দ শোনা যেতে লাগল।

বর আসতে তখনও দেরি আছে। সকলে ভাল জায়গা নেবার জন্যে এগিয়ে গেছে।

ইন্দ্রাণী তখনও যাননি। রাণু সলজ্জ রাঙা মুখে পিসীমার দিকে চাইলে।

তার লজ্জা দেখে পিসীমা একটু হাসলেন, সাদা পাঙাশ তাঁর মুখে রক্ত ফিরে এল। এবারে সেও ফিক করে হাসলে।

অনেক রাত্রে ইন্দ্রাণী ফিরলেন। বিবাহ, বাসর, বর নিয়ে উৎসব সমারোহ প্রথামত বা তার চেয়ে বেশি করেও হয়ে যেতে লাগল।

ইন্দ্রাণীর বাড়ি ওদের বাড়ির কাছেই। গাড়ি করে ঘোরাপথে যাওয়া-আসা যায়, হেঁটে বাগানের পথে যাওয়া চলে।

আসলে সেটা জমিদারদের অতিথিশালা ছিল। এখন অনেকদিন ধরে সেই অতিথিপালনের প্রথা নেই। এখন ওটা কাছারি-বাড়ি, নায়েব, গোমস্তা, কর্মচারীদের বাসস্থান, আর নীচের তলাটা মোটরগ্যারাজ, চাকরদের ঘর ইত্যাদি কাজে লাগে।

ইন্দ্রাণী যখন পৃথক হলেন বাপের মৃত্যুর পর, তারপরেই তাঁর শ্বশুর-বাড়ির ঘোমটা-দেওয়া মানসম্ভ্রমের অসূর্যম্পশ্যা রূপের অবগুণ্ঠন খুলে যেতে সদ্যবিধবার মত শ্রীহীন রিক্ত নিরৈশ্বর্য মূর্তি দেখা গেল। সেদিন জামাই নিলেন কোথায় সামান্য দক্ষিণার কি এক কাজ। আর ইন্দু খুঁজলেন সস্তা ভাড়ায় বাড়ি। সঙ্গে তাঁর নিজের দুটি ও ননদের তিন-চারটি মাতৃহীন ছেলেমেয়ে।

ভেবে-চিন্তে তিনি ঐ বাড়ি ভাড়া চেয়েছিলেন। আর ভাইয়েরা ও মাও ভেবে-চিন্তে অমনিই থাকতে দিয়েছিলেন।

ইন্দু ভায়ের গাড়িতে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরলেন। ড্রাইভারের পাশ থেকে চাকর নামল। তারপর একে একে ঝুড়ি, চেঙারি, থালা, ডালা নিয়ে ভেতরে আসতে লাগল।

ইন্দ্রাণী চুপ করে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রকের ওপরে ইন্দ্রাণীর পায়ের কাছে আশেপাশে এদিকে ওদিকে যজ্ঞির রান্নায়, মিষ্টিতে, খাবারে, ফলে, ক্ষীরে, দইয়ে ভরা ঝুড়ি বাসন সাজানো হতে লাগল।

চাকর সব রেখে প্রণাম করে বললে, এবারে আমি যাই?

উদাসীন নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তিনি সেই দিকে চেয়েছিলেন, বললেন, হ্যাঁ, তুমি যাও। বাসন আমি পাঠিয়ে দোব।

ইন্দ্রাণী চুপ করে চেয়ে রইলেন। হ্যাঁ, সব জিনিস এসেছে—অনেক, প্রচুর। ওঁরা জানেন, মা বউদিরা দাদারা সব দিতে জানেন। ইন্দ্রাণীর ঠোঁটের কোণে কেমন একটা ক্ষীণ অদ্ভুত হাসির রেখা ফুটে উঠল। হ্যাঁ, ওঁরা সকলে জানেন, এরা এইসব ভাল জিনিস দু'দিন তিনদিন ধরে খাবে।

মা হয়তো কাল আবার কিছু পাঠাবেন। দাদারা হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন, ইন্দুর বাড়ি খাবার কতখানি গেছে? এবং হয়তো বলবেন, কত লোকজন খেয়ে যাচ্ছে, কত ফেলা-ছড়া হচ্ছে, চাকরবাকররা খাচ্ছে, আর ইন্দুর বাড়ি তোমরা আরও দাওনি কেন? আবার বউদিরা পাঠাবেন।

বাইরে গাড়ি বেরিয়ে গেল, শব্দ হল।

রাত্রি কত ইন্দুর খেয়াল নেই। জ্বরের ঘোরে, দুর্বল ক্লান্ত দেহে, চোখ বুজে ওঁর মনে হতে লাগল, ওগুলো শুধুই খাবার নয়, ওগুলো যেন সব ওঁর বাপের বাড়ির চাকর দাসী আত্মীয়স্বজনের গর্বিত মুখ—ওঁর দিকে সহাস্য গর্বে চেয়ে আছে। যেন বলছে, তোল, তোল এইসব, এইগুলো ঘরে তোল, কাল তোমার ছেলেদের, স্বামীকে, পরিজনদের দিও, ক'দিন ধরে দিও।

তিনি চোখ খুললেন না, সভয়ে চোখ বুজেই রইলেন, মুখে এল, চাই না, এ আমার চাই না, ফিরিয়ে নিক, ফিরিয়ে নিক।

ভেতর থেকে মেয়ে ডাকলে, মা।

চটকা ভাঙল, মা বললেন, যাই।

মেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। চাঙারিগুলো তখন ছোট নিরীহ হয়ে গেছে আবার—খাবারে ভরা।

মা বললেন, তোল তো মা তোরা এইগুলো। আমি আর পারছি না।

* * *

বর-কন্যা বিদায়ের লগ্ন পড়ল বিকালে।

ইন্দ্রাণীর জ্বর কমেনি। বরং দুর্বলতা বেড়েছিল। আর ভাবনার তো সীমা ছিলই না। বিকালবেলা রাণু এল বিদায় নিতে। চঞ্চলা অগ্নিশিখার মত রক্তাম্বরা, ঈষৎ শুষ্ক অথচ দীপ্ত সলজ্জ মুখে নববিবাহিতা শিখা পিসীমার কাছে এসে দাঁড়াল।

কেমন আছ পিসীমা? গেলে না তো? ওমা এখনও জ্বর আছে?—মাথায় হাত রাখলে রাণু।

পিসীমা ওকে দেখে আনন্দে এবং না-যাওয়া এবং কিছু না-দেওয়ায় লজ্জায় সজল চোখে উঠে বসলেন, বললেন, আয়।

শোও তুমি।—বলে রাণু পাশে বসল।

ইন্দ্রাণী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নিজের গলা থেকে সেই পুরোনো দড়ির মত হারটি খুলে অপ্রস্তুতভাবে বললেন, তোকে তো কিছুই দেওয়া হল না আমার। তা তুই এইটে ভেঙে একছড়া ছোট হার গড়িয়ে নিস, কেমন? আমার মনের মতন কিছু দেওয়া হল না।

ইন্দ্রাণীর চোখ দুটি ঠোঁট দুটি যেন, রাণুর মনে হল, অনেক দুঃখের কাহিনী লুকিয়ে রেখেছে।

খানিক আগেই রাণু ঠাকুমার ঘরের সিন্দুক থেকে সব গহনা পরতে বসেছিল। একটি একটি করে কতগুলি ছোট বড় মাঝারি গহনার কেস দেখলে; গহনা দেখলে তার মধ্যের; শুনলে পিসীমার সব। গত কালকের মার জেঠীমার কথার ধরন, ইন্দ্রাণীর সঙ্কোচ, বাপের সাধারণ ব্যবহার ওর মনে কি এক ঐক্যের ভাবে সঙ্গোপন সমবেদনা সৃষ্টি করেছিল, ওর নিজেরই জানা নেই— কেন।

পিসীমার কথায় এখন স্পষ্ট বুঝলে মায়ের কালকের কথা।

তাঁর কথায় ও হারটি হাতে করে নিয়ে পরে বললে, না, আমি পরব, দাও।

পিসীমা আরও অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, আমি তোকে পরে গড়িয়ে দোব। তুই ওটা পরে শ্বশুরবাড়ি যাসনি।

রাণু হারটি পরে উঠে দাঁড়াল, বললে, আমি পিসেমশাইকে প্রণাম করে আসি।

ইন্দ্রাণী চুপ করে ওর দিকে চেয়ে রইলেন। সে ঘর থেকে চলে গেল। বসনে ভূষণে রূপে শোভায় অপরূপ রাণু।

তাঁর বুকের কাছে গলার কাছে এলোমেলো অনেক কথা জড় হতে লাগল। তারা যেন সকলেই বলতে লাগল, ওরে, এই আদর সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। সত্যি নয়। কোনখানে এর সত্যি কিছু নেই। সমস্ত ফাঁকা, শুধু খেলা।

কতক্ষণ ইন্দ্রাণী চোখ বুজে শুয়ে রইলেন।

রাণু ফিরে এসে বললে, পিসীমা, মাথাটা তোল, প্রণাম করি।

পিসীমা উঠে বসলেন, রাণুর কপালে চুম্বন করে বললেন, সাবিত্রী হও, রাজরাণী হও, সর্বসুখী হও।

কেন কে জানে, বারে বারে ঐ একই কথা মুখে আসতে লাগল। গলার কাছে সেই জড়-হওয়া জমা-হওয়া কথাগুলো ঠোঁটের কাছে আসতেই রূপান্তরিত হয়ে গিয়ে মনে আসে, সর্বসৌভাগ্যবতী হও, রাজলক্ষ্মী হয়।

পিসীমা রাণুর মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে আবার আশীর্বাদ উচ্চারণ করেন। রাণুর চোখ ছলছল করতে লাগল। সে পিসীমার দেওয়া হারটা গলা থেকে টেনে আঙুলে জড়াতে লাগল।

পিসীমা বললেন, ওটা ভেঙে গড়িয়ে নিস কিছু।

যাবার জন্যে সে উঠে দাঁড়াল। মাথাটা কোন্ ভাগে নাড়লে, বোঝা গেল না।

ছোটগল্প, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১

মণিকর্ণিকা

হায় হায়, এ জান না? ব্রাহ্মণের মেয়ে—হিন্দুর মেয়ে! লোকে বলবে কি! এমন জানলে বুঝি আমি বিয়ে করতুম!—নৌকো বেশ স্রোতে চলেছে, স্বামী কপট গাম্ভীর্যে বললেন।

দশাশ্বমেধ ঘাট ভরা স্নানার্থী-স্নানার্থিনী। ঘাট থেকে মাঝে মাঝে একটা একটা নৌকো করে যাত্রীরা দেবদর্শনযাত্রায় বেরুচ্ছে।

স্ত্রী বললে, আচ্ছা আচ্ছা, না হয় ব্রাহ্মণ্যের একটু শিক্ষা স্বামীর কাছেই পেলাম। তোমার পুণ্যি ক্ষয় হয়ে যাবে না। জান, শাস্ত্রে বলে 'সস্ত্রীকো ধর্ম-মাচরেৎ'। আমি জানলে তোমারই ভাগ ভারী হতে পারবে।

এদিকে তো দেখছি শাস্ত্রের জ্ঞানও আছে!

আহা, বলই না, কেবল জ্বালাতন করবে!

আচ্ছা, শোন। সুপুরি-টুপুরি নেই?

কেন কি হবে? খাবে? আনিনি তো। এ তো মাঝগঙ্গায় আগে মনে করতে হয়।

হায় হায়, হাতে করে কথা শুনতে হয় যে!

যাও! বলতে হবে না। এবারে স্ত্রী রেগে গেল।

আহা, শোন শোন, এবারে সত্যি বলছি, শোন। ভাল করে পা ঢাকা দিয়ে তবে বস, খানিকক্ষণের জন্যে অন্তত গুরুজন বলে মনে কর।

স্ত্রী মুখটা গম্ভীর করে বসে রইল।

পুরাকালে একদা এক গ্রীষ্মকালের সিতযামিনীতে দেবাদিদেব মহাদেব ভগবতী পার্বতীর সঙ্গে এই বারাণসীধামে ভাগীরথীতীরে সলিল-সিক্ত স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করছিলেন। এই যেমন আমরা আজ সকালে—

আহা, কি বুদ্ধি! ঠাকুর-দেবতার কথার সঙ্গে নিজেদের কথা কইলে অপরাধ হয় না?

হয় বুঝি? ও, আচ্ছা শুধু বলছি, শোন।

অতঃপর রাত্রির গভীরতার সঙ্গে স্নিগ্ধতা লাভ না করে গ্রীষ্ম উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত হতে লাগল। বারাণসীর গরম দেখছ তো; সেবার আদি-দম্পতি কৈলাসের শৈলাবাসে যাননি।

আবার! এমনি যদি কর তুমি, চাই না শুনতে; আর যেন কালী সিংহীর মহাভারত পড়ছেন!—স্ত্রী রাগ করে মাঝির দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল।

তুমি কালী সিংহীর মহাভারত পড়েছ? শুধু এইটেই পড়নি? আচ্ছা আচ্ছা, রাগ কর না, ভাল করে বলছি। কিন্তু ও হতভাগা কি তোমার মর্ম বুঝবে, এইদিকেই অনুগ্রহ-নেত্র পাত কর।

তারপর—এদিকে স্বামীর সঙ্গে সপত্নীকে নৈশ-সমীরণ সেবন করতে দেখে গঙ্গা গরম হয়ে উঠেছিলেন; বুঝতে পার আশা করি, অবশ্য তোমার সপত্নী নেই।

স্ত্রী সকোপে গঙ্গার স্রোতের দিকেই চেয়েছিল; কথা কইলে না।

সুতরাং, সমীরণ যে স্নিগ্ধ না হয়ে উত্তরোত্তর 'লু'বৎ হয়ে উঠছিলেন, বলাই বাহুল্য।

তখন ভূতভাবন ভগবান ধূর্জটি মহাদেবীকে বললেন, দেবি, বহুক্ষণ বিচরণ-ক্লেশে তোমার যথেষ্ট শ্রান্তি হয়েছে এবং গ্রীষ্মটাও কিছু উৎকট প্রকারের; অতএব যদি অনভিপ্রেত মনে না কর, তা হলে আমরা স্বচ্ছশীতলা ভাগীরথী-সলিলে কিয়ৎকাল অবগাহন করে শ্রান্তি অপনোদন করি।

দেবী তোমার মতন ভ্রূভঙ্গি করে বললেন, না, ঘাটে তোমার প্রেতরা রয়েছে, আমি তাদের সামনে অবগাহন করব না। আসলে ভগবতী গঙ্গা কিনা দেবীর সপত্নী, তাই স্বামীকে তাঁর স্পর্শলাভ করতে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না।

টীকাটি কি কথক-ঠাকুরের স্বরচিত?—স্ত্রী একটু হাসলে।

বাঃ, বেশ তো কথা কইতে জান! নাঃ, টীকা আমার কেন? কেন, তোমাদের মনের কথা কে না জানে? এই সেদিন ওদের চায়ের আর পানের সুখ্যাতি করলুম, অমনই তুমি আর সেখানে গেলেই না।

সে কি, আমার সতীন?—স্ত্রী হাসলে। কি কথার ব্যবস্থা? আমাকে তো আর ভূতে পায়নি যে, যাকে তাকে হিংসে করতে যাব! আর সে তো কত বড় আমার চেয়ে! বল, তারপর? এমন বাজে বকতেও পার!

স্বামী ঈষৎ হেসে বললেন, ওঃ, তোমার বয়সী হলে বুঝি করতে?

স্ত্রী উত্তর দিলে না।

শোন, ভূতনাথ শঙ্কর তখন ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ কল্পনা স্থির হয়ে গেল। যোগবলে একটা ছোট্ট জলাশয় সৃষ্টি করে ফেললেন গঙ্গার ধারে, তারপর তো তাঁরা দুজনে স্নান-টান করে নিলেন। রাত্রি প্রায় তখন শেষ হয়ে এসেছে। পার্বতী ঘাটে উঠে মাথা মুছতে গিয়ে হঠাৎ বললেন, আমার কর্ণিকা? সেই যে মণি দেওয়া দুটোই তো পরেছিলাম, মা দিয়েছিলেন সেবারে।

কর্ণিকা কি?—স্ত্রী বললে।

ইয়ারিং গো, কানের তোমাদের।

ভোলানাথ বললেন, কর্ণিকা—পুষ্পেরটা?

দেবী বললেন, আঃ, বড় ভুলে যাও, সেই যে মণি দেওয়া জোড়া! ভোলানাথ ভুলেই গিয়েছিলেন, আর জলে নামতেও ইচ্ছে ছিল না। আমরা হলে হয়তো বলতুম, আবার কিনে নিও। কিন্তু সে সময় বোধ হয় কাশীর ট্রেজারি অন্নপূর্ণার হাতে।

যাই হোক, দেবী সিক্তবস্ত্রে চক্রতীর্থের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন।

আহা, এদিকে বলা হচ্ছে, গরম 'লু' চলছে!—স্ত্রী ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে।

আঃ, শীতে কেন গো, রাগে; শীতেই শুধু বুঝি কাঁপুনি ধরে? না হয় একটু অলঙ্কার দিলাম। যাই হোক, তিনি শুধুই দাঁড়িয়ে রইলেন না নয়, কর্ণিকা না পেলে কাপড় বদলাবেন না। ভগবান ভোলানাথ কি করেন! ফের জলে নাবলেন, কিন্তু অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না। তখন নন্দীকে ডেকে এই সমূহ বিপদের কথা জানালেন। নন্দী জানত মার ধাত। সে বুঝিয়ে মাকে কাপড় বদলাতে পাঠিয়ে দিলে; আর ইতিমধ্যে—ভূতভাবনের সব কটা ভূতকে দিলে সেই চক্রতীর্থে নামিয়ে। তারা মার প্রসাদ-আকাঙ্ক্ষায় না পারে এমন কাজই নেই। খানিকক্ষণ পরেই কর্ণিকাটি পাওয়া গেল।

বুঝতেই পারছ, তখন দেবীর সন্তোষ হল এবং দেবাদিদেবের প্রাণ বাঁচল। দেবাদিদেব বুদ্ধিমান দেবতা, ভোলানাথ হতে পারেন। সেই অবধি ঘটনাটি অনেক

অভাজনের দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকতে পারবে বিবেচনা করে চক্রতীর্থ একটি বড় তীর্থ, আর ঘাটটির নাম মণিকর্ণিকা—পুরুষজাতির মধ্যে এই প্রচার করিয়ে দিলেন।

হুঁ, সবই কি অনাছিষ্টি! এত কথা কইতে পার!

আহা, বিনা খরচে কথা শোনা হল তো? না হয় একটু গয়না পরিয়েছি, ঘাটের কথকরাও তো বলে, সেখানে শুনলেও যে একটি পয়সা দিতে হত! আমি বেচারা শুধুই বকে মরলাম।

আঁচল থেকে একটি পয়সা নিয়ে স্ত্রী গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করলে। মাঝি তখন একমনে দাঁড়ের দিকে চেয়েছিল।

স্বামী মৃদু হেসে 'এই ভক্তি তোমার অচলা থাক' বলে পয়সাটি কুড়িয়ে পকেটে রাখলেন।

মন্দিরের পরই মন্দির, ঘাটের পর ঘাট ক্রমে অতিক্রম করে নৌকা অগ্রসর হতে লাগল।

এটি হল মাতৃঋণ-শোধ ঘাট। একজন ছেলে এই মন্দিরের ঘাট বাঁধিয়েছিল; উৎসবাদির পরই এটি হেলে পড়ল নাকি, লোকে বলে।

খরস্রোতা ভাগীরথী; ওপারে রামনগর, সবুজ ক্ষেত, দূরে ঘন বন, স্বামীর মাঝে মাঝে টীকা শুনতে শুনতে মণিকর্ণিকার ঘাটে নৌকা এসে ঠেকল।

দূরে—দত্তাত্রেয়ের চরণ-পাদুকা মন্দির; সম্মুখে চক্রতীর্থ; চারদিকেই জনতা, পাণ্ডা, শিষ্য, মন্ত্রপাঠ, মন্দির, সিঁড়ি।

ওইদিকে শ্মশান।—স্বামী বললেন। চল এবার বাড়ি।

একটু শ্মশানটায় চল না। চিতায় জল দিতে হয়, ঠাকুমা বলেছিলেন। এখানে নাকি সধবা ছাড়া আসে না। দেখে আসি।

অনিচ্ছুকভাবে স্বামী সেদিকে অগ্রসর হলেন।

সবে একটি মেয়েকে এনে রেখেছে। রাঙাপাড় শাড়ি, টকটকে লাল সিঁদুর কপালে ঢালা, পা দুখানি আলতা-রাঙা। সঙ্গে অনেক লোকজন।

স্বামী চোখ ফিরিয়ে নিলেন। স্ত্রী মুগ্ধ হয়ে, অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

কখন কি আরম্ভ হল কে জানে। একটি যুবক, সম্ভবত মেয়েটির স্বামীই হবে, হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসেছিল; তাকে আহ্বান করলে একজন। তার মুখ দেখে স্বামী শিউরে উঠলেন। তার ওপরেই বোধ হয় অপ্রীতিকর কর্তব্যের ভার—

স্ত্রীও 'মাগো' বলে মুখ ফিরিয়ে নিলে, স্বামী তার হাতটা ছুঁয়ে ডেকে বললেন, চল, আর নয়।

নৌকায় বসে আর কোন কথাই মনে হল না কারুর। দুজনেরই দুদিক দিয়ে একই ঘটনা মনে ছবি আঁকতে লাগল—ভয়ে, বেদনায়, আশায়, দুঃখে, বিভীষিকায়।

সাত আট বছর গেছে।

বাপ-মায়ের শরীর খারাপ; তাঁরা কাশীবাস করবেন। ছেলে তাই তাঁদের নিয়ে এসেছেন। একটি বাড়ি কিছুদিনের জন্য নেওয়া হয়েছে। ছেলেদুটি নিয়ে এসেছেন।

ওগো, যাবে আজ? একটি দিন যদি বেরুলে আমাদের সঙ্গে?—স্ত্রী এসে অনুযোগ করলে।

স্বামী টেবিলের কাছে বসে অনেক কাগজপত্র—স্ত্রীর মতে বাজে কাজ—নিয়ে কাজ করছিলেন, মুখ না তুলেই বললেন, তুমি তারকের সঙ্গে যাবার ঠিক কর, লক্ষ্মীটি। এইগুলো আপিসে আজই পাঠাতে হবে।

মণিকর্ণিকায়ও তোমার যেতে ইচ্ছে নেই? ও-ও কি দেখেছ?

স্বামী চকিত হয়ে মুখ তুললেন, একবার বললেন, অ্যাঁ? তারপর 'না' বলে মুখ নীচু করলেন।

তুমি যাও ওদের সঙ্গে আজ, আমি তোমাদের সারনাথে নিয়ে যাব'খন।

তা হলে চারু রইল, দেখো, যেন একলা না রাস্তায় যায়।—স্ত্রী বেরিয়ে গেল।

বাবা, ও বাবা, দেখ এটা কি?—খানিক পরেই চারু ছুটে এল, হাতে একটি সুন্দর ছোট কেস। দেখ না কেমন সুন্দর?

বাপ সস্নেহে মুখ তুললেন, কি রে?

জিনিসটি দেখেই মুখ ম্লান হয়ে গেল, একটি সুন্দর কেসে ততোধিক সুন্দর মুক্তোর ইয়ারিং; পিতা কম্পিত অন্তরে সেটা খুলছিলেন।

কোথায় পেলে মা?

ঐ ঠাকুমার বাক্সে ছিল; টাকা বের করছিলেন, আমি নিয়ে নিলাম। কি বাবা? কোথায় পরে?

ওটা? ওটা কর্ণিকা, মণিকর্ণিকা। কানে পরতে হয়।

কার বাবা?

ও তোমার মার।—ব্যাকুল পিতা কাতর হয়ে উঠলেন।

আমি পরব?

পর।

বাপ চুপ করে কাগজের দিকে চেয়ে রইলেন, কথা কওয়া যেন অসম্ভব মনে হচ্ছিল।

তুমি পরিয়ে দাও না!

বাপ আস্তে আস্তে মেয়ের কানে সেটা পরিয়ে দিলেন। কন্যা নতুন গহনা পরে আনন্দে নৃত্য করতে করতে দাসীকে দেখাতে চলে গেল। বাপের মনে পড়ল—সেই প্রথমা পত্নী, মণিকর্ণিকা দর্শন।

কলকাতায় ফিরে অনেক খুঁজে পছন্দ করে, একটি ইয়ারিং কেনা, তার নামকরণ, তারপর—তারপর তার সাধ মিটে যাওয়া—সেই মণিকর্ণিকার মেয়েটির মতন।

রাত্রি নটা।

স্বামী ওপরে এসে কাপড় পরছেন; কোথায় নিমন্ত্রণ, বন্ধুদের সঙ্গে সব একত্রে যেতে হবে।

খাটে চারুর মা ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে। চারু ঘুমোচ্ছে।

হ্যাঁগা, চারুর কানে আজ একটা কি দেখলাম, কিনেছ? কি কর্ণিকা নাকি! ও বললে মার, আমার তো নয়!

খোকা ঘুমিয়েছিল; স্ত্রী তাকে শোয়াতে শোয়াতে মৃদু ভাষণে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে।

কি চারুর কানে? কই, না, কিনিনি তো কিছু। মনটা ব্যস্ত, মনে পড়ছে না; স্বামী পাঞ্জাবিটার বোতাম আছে কি না দেখছিলেন।

চমৎকার জিনিসটি! ও বললে, মার; তাই ভাবলুম, বুঝি কিনেছ বা। দেখ না, এই যে।—আস্তে আস্তে মেয়ের কান থেকে খুলে নিয়ে স্বামীর কাছে এসে দাঁড়াল।

স্বামীর আর বুঝতে বাকি ছিল না। তিনি নীচু হয়ে পাঞ্জাবিতে লাগাবার জন্যে সোনার বোতাম কটা তুলে নিলেন। স্ত্রী এসে সেটা তাঁর হাতে দিয়ে বোতাম কটা লাগাতে লাগাতে বললে, কি সুন্দর, না? কবে কিনলে?

ওটা এখন তো কিনিনি, ওটা তার ছিল।—স্বামী সেটি টেবিলের ওপর রেখে দিলেন।

স্ত্রী একেবারে চুপ হয়ে গেল। তার সপত্নীর ওপর ঈর্ষা ছিল না এতটুকু; নিজের তুলনায় সে যে অনেক বেশ আদরিণী ছিল, তাও সে জানত, বুঝতে পারত; আজও তার ওপর স্বামীর গভীর চিরস্তব্ধ গোপন প্রেমের কথাও জানত সে। সেজন্য স্বামীর ওপর বেশি শ্রদ্ধাই ছিল, যা ওকে ভালবাসা দেখালে হয়তো হত না; কিন্তু অভিমান নারীর—তাও তো ছিল। স্বামীর অর্ধভাগিনী সে যে নয়, সে তা জানত। পা যেন সেইখানেই থেমে গেল। বেদনায় সে মাথা নীচু করে টেবিলের ওপরের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে লাগল। যে কথার কোনও উত্তর নেই, সে কথা একেবারে কোন্‌খানকার সম্ভ্রম বেদনা দুঃখের বার্তা বয়ে হঠাৎ দাঁড়াল এসে। তাকে এড়িয়েও যাওয়া যায় না; এমন সম্পর্ক নয় যে, কিছু কথাও বলা যায়।

একটু থেমে নীচু মুখেই সে আস্তে আস্তে বললে, ফিরতে তোমার রাত হবে?

স্বামী তার দুঃখ জানতেন। একটু বিব্রতভাবে তার মাথার ওপর একবার মুখটা রেখে বললেন, হ্যাঁ, আমার তো আজ দেরি হবে, ওদের যে বিয়ে; তুমি শুয়ে পড়।

টেবিলের ওপরে মণিকর্ণিকাটিতে আলো পড়ে ঝিকমিক করছিল, স্ত্রী চুপ করে চেয়ারখানি ধরে দাঁড়িয়ে রইল। স্বামী নীচে গেলেন।

ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭

গঙ্গাফড়িং

খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। সন্ধ্যা বৃষ্টির মধ্যেই নেমে এলো। বৃষ্টি যখন ছাড়ল, তখন বিকাল আর সন্ধ্যা দুই শেষ হয়ে ঘন অন্ধকার রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে।

খেলার সুবিধা আর রইল না। বন্দী বালক-বালিকার দল নিরুপায়ভাবে একবার অঙ্গনে বেড়িয়ে এল, তারপর একবার ঘরে বেড়িয়ে এসে শেষে ঘরের দালানেই জটলা করে দুরন্তপনার উপায় আবিষ্কার করতে লাগল।

ইতিমধ্যে খেলার উপকরণ পাওয়া গেল ঠিক হাতের পাশেই; আলোর চারধার থেকে নিয়ে সমস্ত দালানটা নানাবিধ পোকা আর ফড়িং পিঁপড়েয় ভরে গেছে।

'ইঃ, সরে বস ভাই, তোর দিকে যাচ্ছে', 'মাগো, তাড়িয়ে দাও না ভাই', 'ওকি দাদা, ওদের মেরো না', 'উঁহু, খোকা, ধর না'—নানারকম সুরের মাঝখানে হঠাৎ ঠক করে একটি ভারী ধরনের শব্দ হল।

খোকা শিউরে বলে উঠল, দিদিভাই, আমাল মাথায় কি? ততক্ষণে সেটা আবার একটা লাফ দিয়ে আর একদিকে পৌছল। ঐ দেখ, কি পাখী!—খোকা বললে।

একটি বৃহদাকার গঙ্গাফড়িং। পাখীই বটে!

দাঁড়া দাঁড়া, মজা করি—পকেট থেকে লাট্টুর সুতো বের করে নিয়ে সন্তর্পণে অজিত পাখীটি ধরতে গেল। সেটি আবার দালানের ও-কোণে গিয়ে পৌছল।

খানিকক্ষণ হৈ হৈ করে অজিত সেটিকে ধরে ফেললে।

বিরাট একটা কোলাহলে সকলে অজিতকে ঘিরে দাঁড়াল। সবুজ রঙের ডানা, দুটি কালো মরিচের মতন গোল চোখ, আর দেড় বিঘৎ লম্বা মোড়া দুখানি পা, দেখতে দেখতে সে আবার লাফ দিলে।

এবারে একেবারে তার কর্মসূত্র মানুষের হাতের লাট্টু-সূত্রে বাঁধা পড়ে গেল। লাট্টুর সুতোয় তার একখানি পা বেঁধে অজিত পরমানন্দে তাকে একটি পেরেকে টাঙিয়ে দিলে।

সে একবার করে লাফ দেয়, বোধহয় দিয়েই বুঝতে পারে বাঁধা আছে, আবার স্থির হয়ে চুপ করে মরিচের মতন কালো গোল চোখে চেয়ে থাকে, কোন্‌দিকে তা বোঝা যায় না।

অজিতের খুল্লতাত দিদি ফড়িংটির বন্ধন-দশা দেখে বার দুই বললে, ছেড়ে দে না রে, আহা! কি কষ্ট দিতে ভালবাসিস! ঠাকুমা বলেন, ওরকম করলে পাপ হয়। যদি পা-টা ভেঙে যায়?

পতঙ্গটার পায়ের সুতো আলগা হয়ে গিয়েছিল, নীচু হয়ে সেটা ঠিক করতে করতে সে বললে, ঠাকুমাকে কে বলছে? আর দেখ না, পায়ের সুতো কত ঢিলে আর লম্বা—ও ভাঙবে কি করে?

ভাঙবে যে কি করে, তা দিদি বোঝাতে পারলে না। কিন্তু তার প্রতি লাফের সঙ্গে ভাঙবার সম্ভাবনা কেবলই মনে হচ্ছিল।

হ্যাঁ রে, খুকীর মাথাটা ভিজে জবড়ি, খেতে গেল দেখলাম। সব বুঝি ভিজছিস?—

বলতে বলতে একজন মা প্রবেশ করলেন। উ, কি কাণ্ড! নিদ্দুষী জীবের পা বেঁধে খেলা করা! দে ছেড়ে, মরে যাবে যে!

একটি ভৃত্য এসে দাঁড়িয়েছিল। সে স্বভাষায় বললে, ও অতিশয় নির্দোষী জীব এবং বিধাতার ঘোটকী, ওকে ছেড়ে দেওয়াই কর্তব্য।

সব ভূত! ছেড়ে দিয়ে খাবি আয়।—ভিজে খুকীর মা সমস্ত বালক-বালিকাদের নিয়ে প্রস্থান করলেন অজিতকে খুলতে আদেশ দিয়ে।

অজিত ছেড়ে দেবার ভান করেছিল মাত্র, ছেড়ে দেয়নি। সুতরাং বিধাতার মর্ত্য-জনরব-লব্ধ ঘোটকী আপাতত অজিতের লাগামেই আবদ্ধ রয়ে গেল। অন্ধকার দালানে বারম্বার লাফ খেয়ে সে পথ খুঁজে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। অজিতেরা খেতে গেল।

এবারে নিদ্রাতুর পৌত্র-পৌত্রীদের ও অন্য শিশুদের চোখের ঘুমকে আর খানিকক্ষণের জন্য আনাচ-কানাচে বেড়িয়ে আসার জন্যে তখন রান্নাঘরের সুমুখে ঠাকুমা রূপকথার অপরূপ আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন।

ও ঠাকমা, ঐ মেজদা আজকে একটি গঙ্গাফড়িং ধরেছে। বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে পেরেকে।—একটি ভগ্নদূত-মুখে বার্তা পৌঁছল।

অজিত তখন ঠাকুমার পাশে।

ওমা, ছি ছি! অমন করে জীবজন্তুকে কষ্ট দেয়? দিতে নেই। খুলে দিয়েছ তো?

অজিত অপ্রস্তুতভাবে না-সূচক মাথা নাড়লে।

যে যেমন কাজ করে, সে তেমনই ফল পায়। পাপ হয়। যে জীবকে কষ্ট দেয়, তাকে তেমনই কষ্ট পেতে হয়। কারুকে কষ্ট দিতে নেই। এক মুনির গল্প তোমাদের বলব'খন।—পিতামহী বললেন।

নানাবিধ পাপপুণ্য, মাণ্ডব্য মুনি, রত্নাকর মুনি, পাপের বয়স, তার ক্ষমা, বিশেষ বয়েসের বিশেষ ফল, পঞ্চম বর্ষের পর অপরাধ হওয়া—ইত্যাদি পিতামহীর জ্ঞানের ভাণ্ডারের সঞ্চিত কাহিনী বালকবালিকাদের গোচরীভূত হতে লাগল।

খাওয়া শেষ হল। চিন্তিত শিশুদল শয়ন করতে গেল। শুয়ে শুয়ে দিদি জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁরে, ছেড়ে দিয়েছিস?

না, আমার একলা ভয় করছে। কাল দোব'খন। তুমি চল না।

দিদি বললে, আর পারি না, থাকগে। কালই দিস।

একজন জিজ্ঞাসা করলে, পাপ কি ভাই? কি রকম দেখতে?

দূর, সে কি দেখা যায়!—দিদি জবাব দিল।

নানাবিধ ভাবনার মাঝে ছেলেদের তন্দ্রা আসতে লাগল।

দরজার পাশ থেকে, ছাদের কোণ থেকে ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল ভরা মাথা কার দেখা যায় মনে হয়। কোনবার বা সাদা কাপড় পরা ছায়ার আভাসে ভেসে আসে। পাপ কি রকম দেখতে হয়?

অজিতের ঘুমের ঘোরে মনে হল, কে একজন পাপ যেন সবুজ ঘোমটায় মুখ ঢেকে তার খাটের কাছে নত হয়ে কি দেখছে। অপ্রসন্ন মনে কেবল ঘুম ভাঙে।

দালানে শুধু অনেকক্ষণ পরে পরে, ঠক ঠক ক'রে শব্দ হয়।

সকালবেলা। শিশুরা এসে দাঁড়াল।

একটা শালিক ওদের উড়ে গেল ফড়িংটার কাছ থেকে।

দেখা গেল, সমস্ত রাত্রি এক পায়ে বাঁধা থাকায় লাফালাফি করে তার একটা পা একেবারে লম্বা হয়ে গেছে—যেন একগাছা খড়। অজিত কাছে এসে নীচু হয়ে দেখতে পেলে, একটা সবুজ ডানা মাটিতে পড়ে, আর পাখার আবরণী থেকে খুলে যাওয়াতে তার সমস্ত গা-টা শালিকটা ঠুকরে ঠুকরে তাকে প্রায় শেষ করে আনছিল।

অজিত শুষ্ক মুখে সেটাকে নেড়ে-চেড়ে একজনকে বললে, ভাই, একটু জল আনবি?

জল এল, পায়ের দড়ি খুললে, সে একটু নড়লও; কিন্তু উড়তে পারলে না।

দড়ি খোলার পর একটু অন্যমনস্কতার সুযোগে হঠাৎ সেই শালিকটাই সেটাকে নিয়ে উড়ে গেল।

বালক-বালিকারা বিমূঢ়ভাবে চেয়ে রইল।

২

ষোলো-সতরো বছর পরে।

'মাসীমা' বলে ডেকেই একটি যুবক বড় বাড়ির পাশের ছোট্ট বাড়িতে প্রবেশ করলে।

কে অজিত? এস বাবা।—'মাসীমা' আহ্বানে অভিহিতা নারী এগিয়ে এলেন।

রান্নাঘরের দরজায়ও একখানি স্নিগ্ধ স্মিত মুখ দেখা গেল।

আমার জন্য একটু চা করে পড়া দিবি আয়। আমি ছাদে বসিগে।—অজিত বললে।

বস বাবা। সুবি, চা করে দিয়ে আয়। আমি সন্ধ্যেটা সেরে নিই। মাসীমা রান্নাঘরে প্রবেশ করলেন।

সুবালা চা করে বই নিয়ে ওপরে উঠল। মাও ওঠেন কাজ সেরে।

পরিচয় হয়েছিল বছর ছয়েক আগে সন্ধ্যাবেলা, তখন সুবালার বাপ হঠাৎ একদিন হার্টফেল করে মারা যান।

তারপর এমনই ক'রে দিন যায়। অজিতরা দেখাশোনা করত, পাড়ার লোকে দয়া-শ্রদ্ধা করত। তখন সুবালা ছিল নয়-দশ বছরের বালিকা।

তারপর সুবালা পড়ে। মাসীমা, তস্যা কন্যা, পড়া, গল্প কদাচ কোনদিন চা খাওয়া,—স্রোতের মতন দিন কখন বয়ে চলল।

সুবালা সরলভাবে হাসে, সুন্দর দাঁতগুলি, হাসিটি মধুর; কথা কয়, গল্প করে, নির্ভীক মন কিছু ভাবে না।

মা ভাবেন, কি আর বড় হয়েছে, এখন একটু পড়ুক। যা কিছু পুঁজিপাটা আছে, বিয়ে দিয়ে তারপর চোখ বুজবেন।

অজিত ভাবে, কি সরল মুখ, সুন্দর হাসিটি!

অজিতও চব্বিশ বছরে পৌছল, সুবালাও ষোলোতে। ও-বাড়িতে অজিতের বিয়ের সম্বন্ধ আসে।

হঠাৎ মা ভাবলেন, সুবি তো দেখতে মন্দ নয়, ভালই। আর দুটিতে বেশ মিলও তো, ব্রাহ্মণের ছেলে, স্বঘর।

তার আগে অজিত সেটা ভেবেছিল। ভাবনার ঐক্যে দুজনেই সন্তুষ্ট আহ্লাদিত হলেন। সুবালার কানেও সংবাদটুকু পৌঁছল।

তা বাবা, একবার ব'লে দেখ না।—বিধবা অজিতকে বললেন।

অজিত রোজই ভাবে, ভয় করে, ভরসা হয় না। বাপকে তার বলতে সাহস হয় না, মা নেই। অবশেষে সে সতীর্থ আর বন্ধু জিতেনকে দিয়ে বলালে।

বড় বাড়ির কর্তা যেমন হতে হয়। জিতেনকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, যা অসম্ভব তা অসম্ভবই থাকে। এটা ও-বাড়ির বিধবার এবং তাঁর পুত্রের বোঝা উচিত। বাড়াবাড়ি করলে, উত্তরাধিকার, মানে—এই ঘর-বাড়ি, টাকা-কড়ি, গাড়ি-মোটর, সব আশা ছেড়ে দেয় যেন।

তখন সুবালার পড়া শেষ হয়ে গেছে। দুরাশামুগ্ধ তরুণ হৃদয় বেশ নিশ্চিন্ত মনে অজিতের বলিষ্ঠ হাতের মুঠোয় আপনার ছোট্ট কোমল করপল্লবটি ছেড়ে দিয়েছে। স্বপ্নলোকে আকাশকুসুম অনেক ফুটেছে; বাকি শুধু বাস্তবে ফুটে ওঠা।

অজিত!—মোটা গলায় কে ডাকলে।

সুবালার মা এসে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন।

কি রে?—ব'লে অজিত উঠে এল।

তিনজনে দাঁড়িয়ে যে কথা হল, তাতে বাকি আর কিছু রইল না শোনার।

অজিত বেরিয়ে গেল, জিতেন একবার চেয়ে দেখে চলে গেল।

মনোভঙ্গের অসহ্য দুঃখে মাতা-পুত্রীর চার-পাঁচদিন কাটে। অজিত ডাকলে, মাসীমা!

গম্ভীর মুখে বিধবা দরজা খুলে দিলেন।

অজিত যা বললে, তার মর্ম এই, সে বাপের অগোচরে বিবাহ করবে কিম্বা তাঁর অবর্তমানে করবে, এখন করবে না।

বিধবা চুপ করে রইলেন। অবর্তমানে, সে কতদিন? অগোচরে, সে কেমন করে? এখন নয় তো সুবি কতদিন পড়ে থাকবে? এমনই ধারা প্রশ্ন মনে ওঠে। মনে হয়, অসম্ভব কথা বলছে অজিত। তবু দুরাশা উঁকিঝুঁকি মারে।

সুবালার সব বিশ্বাস হয় সম্ভব বলেই। কেন হবে না? হতে পারে সবই। সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যতে সুবালার বিশেষ ভেদ ছিল না। নিজের অন্তঃকরণটির মতন, স্বচ্ছ চোখ দুটির মতন সবই নির্মল সহজ।

অজিত আসে যায়। সুবালার মনে হয়, ক্রমে সুবালার আরও মনে হয়, হয়তো সম্ভব সবই।

কিন্তু অজিতের বাবা যে ঢের বেশি বুদ্ধিমান অজিতের চেয়ে, তার প্রমাণস্বরূপ সকলের অজ্ঞাতে একদা শুভলগ্নে অজিতের একসঙ্গেই আশীর্বাদ ও গায়ে হলুদ হয়ে গেল। তিনদিন পরে বিবাহ। বাল্যকালের দিদি, দাদা, কনিষ্ঠা, কনিষ্ঠদের এবং খুড়ীমা, জেঠীমা, পিসীমাদের আগমনের কোলাহলে সুবালার মা চকিত হয়ে প্রতিবাসীর ঝিকে প্রশ্ন করাতে সব সংবাদ জ্ঞাত হলেন।

সুবালা আড়ষ্ট পাথরের মতন চোখে চেয়ে রইল।

সন্ধ্যেবেলা। কে ডাকলে, দরজাটা খুলুন তো?

সুবালার মা দোর খুলে দেখলেন, জিতেন।

জিতেন বন্ধুর অবিশ্বস্ততায় বিরক্তি-প্রকাশ ও আক্ষেপ করে অনেক সমবেদনা

প্রকাশ করলে।

সুবালার মা ব্যাকুল বেদনায় চুপ করেই বসেছিলেন, অবশেষে বললেন, বাবা, আমাকে একটা জায়গা ঠিক করে দিতে পার, আমি আর এমন ক'রে থাকতে পারছি না।

মায়ের কথায় শুষ্ক ক্লান্ত চোখ তুলে সুবালাও একবার জিতেনের পানে চাইলে। স্বল্প জ্যোৎস্নায় শুধু দৃষ্টিটি চোখে পড়ল।

৩

পথের ওপারে মুড়ির দোকান, বেশ বড় দোকান। মুড়িও বোধহয় বিক্রি ভালরকম হয়। দিনরাত্রি ভিড় থাকে। গরিব জনমজুর, বড়লোকের ঝি-চাকর সবাই নিয়ে যায়।

এক ধামা মুড়ি নিয়ে একটি মেয়ে আসে একটি ছেলের সঙ্গে,—সেই মুড়ি দিয়ে যায়। বেশির ভাগ সন্ধ্যেবেলায় সে আসে, কোনদিন বা দুপুরের শেষে।

বন্ধুর ডিস্পেন্সারিতে কি কাজে এসে বসে অজিত গল্প করছিল। রাস্তার দৃশ্য যেন সিনেমার ছোটভাই; তাতে ওপাশে পানের দোকান, খাবারের দোকান, চিঁড়ে-মুড়ির দোকান, ভিড় লেগেই আছে। কাজ না থাকলে বায়োস্কোপ দেখতে যাওয়া আর রাস্তার লোক দেখা প্রায় দুই সমান—অজিতের তাই মনে হয়।

ওপারে পানের দোকানের প্রকাণ্ড আরশিতে দুটি কালো চোখের ছায়া পড়ল, বিদ্যুতের আলো সেই মুখে পড়েছে। মুখ সরে গেল। একখানা ভাড়া গাড়ির ছায়া। পান কিনতে এসেছে এক বাড়ির ঝি, তার হাত-মুখ নাড়ার ছায়া।

ও চোখ কার? মুখটা তো মনে পড়ে না, চোখদুটি তো চেনা, কিন্তু—; কার? প্রশ্নে মন ভরে যায়। অজিত অন্যমনে ওষুধের শিশি টেবিলে ফেলে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা না করেই উঠে পড়ল।

বাড়ি গিয়ে মনে পড়ল ওষুধের কথা। ঘরে ঢুকে আলো নিবিয়ে শুয়ে দৃষ্টি পড়ল পাশের বাড়িতে। সেখানে ভাড়াটে এসেছে অন্য, যেমন তারা চেঁচায়, তেমনই ঝগড়া করে। মনে পড়ল, ও চোখ সুবালার।

মেয়ে ডাকলে, বাবা, খাবে চল।

যাই মা।—বাপ উঠে বসল। মাতৃহীনা কন্যার সঙ্গে না খেলে মেয়ের খাওয়াই হয় না।

মেয়ের মা বিয়ের পর পাঁচ বছর প্রায় বেঁচেছিল। অজিত তাকে ভালবেসেছিল কি না কে জানে, কিন্তু তাকে তার ভাল লেগেছিল। সুবালার চোখ গভীর কালো, এর চোখ একটু নীলাভ। সে ছিল সরল, অপ্রস্তুত হাসিমুখ; এ ছিল আদরিণী দুহিতা, তেমনই ধরনের সপ্রতিভ আদুরে মুখ।

রাত্রে জল খেতে উঠে সুবালাদের খালি বাড়ি চোখে পড়েছে। ব্যাকুলভাবে সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বিছানায় ফিরেছে। পাশে নিদ্রিতা, তেমনই ধারাই বয়স, একান্ত নির্ভরশীলা কিশোরী পত্নী। চোখে জল ভরে এসেছে। সে তার মাথায় মুখ রেখে জাগিয়ে দিতে চায়, সুবালার ওপর অবিচার যেন ভুলে যাবার পথ পায় না। স্ত্রী জেগে ওঠে, বিস্মিত হয়ে স্বামীর মুখপানে চাইতে যায়। অজিত তার মাথাটা নীচু করে দিয়ে বলে, জেগে উঠলে বুঝি? না, তুমি ঘুমোও।

তন্দ্রাজড়িতস্বরে স্ত্রী বললে, আহা, জাগিয়ে তো দিলে! শুধু এইটুকু কিশোরী তরুণী নারী বুঝতে পারে, ওটা সোহাগ নয়, আদর নয়, তার চেয়ে গভীর কিছু, যার সঙ্গে ওর পরিচয় স্বামী করে দিতে চান না।

এমনই ভাবে সয়ে যেতে যেতে, ভুলে যেতে যেতে সহসা কন্যার জন্মের পর একেও হারিয়ে ফেললে।

বাপের বিছানার পাশে, ছোট খাটে মেয়ের বিছানা। খাওয়া হলে দুজনে এসে শুল।

বাবা, তুমি বুঝি আজ আর পড়বে না?

না।—মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে বাপ বললে, আমার কতগুলো পাকা চুল হয়েছে দেখ্ তো।

রাত্তিরে বুঝি পাকা চুল দেখা যায়? আর তুমি কি বুড়ো?

বুড়োই তো, দেখ্ না খুঁজে। এক একটা চুলের দাম এক এক টাকা।

ইঃ, রাজা যেন! আচ্ছা দেখি!—মেয়ে বালিশের পাশে বসে পাকা চুল খোঁজে।

না বাবু নেই, মোটে তিনটে। আমার ঘুম পাচ্ছে!

পিতার মনে হচ্ছে, কি করে সময় কাটে, কোন্‌টা স্মরণীয়, কোন্‌টা ভোলা যায়!—আচ্ছা শো, আমার পকেট থেকে কাল টাকা নিস।

বালিকা নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে। ঘর অন্ধকার করে অজিতও শুয়ে থাকে। সবুজ রঙের শাড়ি পরে মস্ত গঙ্গাফড়িং। সুবালার মত দেখতে চোখদুটি, সে যার ছোটবেলায় পা ভেঙে দিয়েছিল, তারপর শালিকে ঠুকরে মেরে ফেললে। খাটের পাশে পাশে সে বেড়িয়ে বেড়ায়। ঘোমটা সরে যায় যখন, একবার মনে হয়, সুবালা কি? একবার মনে হয় মৃতা পত্নীকে।

ঘর্মাক্ত হয়ে ঘুম ভেঙে গেল, জলের কুঁজো সুবালাদের বাড়ির জানালার দিকেই। জল খেয়ে, চোখে মুখে জল দিয়ে আবার এসে শুয়ে পড়ল। মনে পড়ল, সেই বৃষ্টির দিনের গল্প—ফড়িং ধরা, পিতামহীর কাছে গল্প শোনা—পাপ কি? পীড়ন না অসম্মান? না, অবিচার? না, কি? প্রায়শ্চিত্তই বা কি? কর্মফলই বা কি? কারটা কে ভোগ করে? অভিভূতের মতন কখন ভাবনার মাঝেই আবার ঘুম আসে।

৪

সেদিন থেকে অজিত প্রায়ই সেই ডিস্পেন্সারিতে এসে বসে। মনে হয়, যেন ও সুবালাই। ভেবে পায় না, কি জন্যে সে তাকে খোঁজে, তবু সমস্ত অন্তর কি একটা বেদনায় বিমূঢ়ভাবেই ওকে খোঁজে।

দিন পনেরো পরে আবার দেখা গেল, সেই নারী এক ধামা মুড়ি নিয়ে দোকানে দাঁড়িয়ে, আর ছেলেটি সঙ্গে।

অজিত ছুতো করে উঠে গেল, কিন্তু মুড়ির দোকানের সুমুখে কি সূত্রে যায়, তা আবার ঐ দিনের মতন আলোকিত পথে?

ফিরে আসে। মুখ আর দেখা যায় না, স্পষ্ট চেনাও যায় না, তাই ভয়ও করে।

অবশেষে একদিন ছেলেটি একলা এল, প্রায় মাস দুই পরে।

অজিত তাড়াতাড়ি নেমে এল রাস্তায়। ভিড় কাটিয়ে রাস্তার ওপাশে গিয়ে ছেলেটির কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলে। বালক সভয়ে ফিরে চাইলে।

অজিত জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

যে চোখদুটি ত্রস্ত বিস্ময়ে ওর পানে চেয়েছিল, সে দুটি সুবালারই চোখ। বালক ভীত ক্ষীণ স্বরে বললে, ঐ গলিতে।

অজিত তার চোখ দেখছিল, বললে, কোথায়? বালক সভয়ে বললে, ঐদিকে। সে সরে দাঁড়াল।

উনি, ওই যে—তোমার কে?

কাঁদ-কাঁদ সুরে বালক বললে, আমার মা।

অভিভূত অজিতকে আর জিজ্ঞাসার অবসর না দিয়ে বালক জনতার মধ্যে মিশে গেল।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে তার পরদিন, তোমার হয়েছে কি, ঐ একটা ছোঁড়ার সঙ্গে খামকা কথা কইছিলে কেন? পকেট কেটেছে নাকি?

অজিত অপ্রস্তুতের হাসি হাসলে। কি উত্তর দিলে নিজেই সে বুঝতে পারলে না।

অনেকদিন আর ও সময়ে মেয়েটিও আসে না, বালকটিও না।

অজিতের বেদনাও ছাড়ে না, আশাও। অবশেষে গলিতে ঢুকে পড়ল একদিন। খানিক দূর গিয়ে একটি ছোট ঘরের সুমুখে বালকটিকে দেখলে পড়া মুখস্থ করছে পথের পাশের এক দোকানের আলোয়।

খোকা, তোমাদের বাড়ি কি এখানে? অজিতের প্রশ্নে বালক চকিত হয়ে চাইলে।

অনিচ্ছায়, ভয়ে সে দেখিয়ে দিল ঘরের দরজা। অজিত ঢুকে পড়ল উঠোনে, তার পেছনে বালকটি এসেছিল। প্রাঙ্গণবাসীরা আশ্চর্য হয়ে দুজনের দিকে চেয়ে রইল।

বালক ডেকে বললে, মা, একবার এস।

অজিত সেইদিকে এগিয়ে গেল।

একটি রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালা, একটি নারী নত মুখে কাশীদাসের মহাভারত পড়ছে। চুলগুলো পিঠ ভরে ছড়িয়ে আছে, আঁচলের প্রান্তটুকু মাথায় দেওয়া মাত্র।

পুত্রের আহ্বানে জননী সাড়া দিলে, কি রে? কেন? কণ্ঠস্বর মৃদু, যেন চেনা।

অজিত এসে দাঁড়াল।

সুবালাই বটে। শুধু চোখ আর চুল তার; আর কিছু চেনবার মত নেই।

সুবালাই অবাক হয়ে চেয়ে থেকে পরে চিনতে পেরে উঠে দাঁড়াল।

পুত্র জিজ্ঞাসা করলে মার পেছনে এসে, কে মা উনি? সেদিন তো দোকানের সামনে উনিই কথা কয়েছিলেন।

জননী সামান্য ইতস্তত করে আত্মসম্বরণ করে বললে, তোমার মামা হন। তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

অজিত তার ক্ষীণ, জীর্ণ দেহের পানে চেয়ে ছিল,—মুখের হাড় সব দেখা যাচ্ছে। অপ্রস্তুতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে কি চিনতে পারনি?

সুবালা ঘর থেকে একখানি ছোট মাদুর এনে পেতে দিলে।

৫

কেমন আছ? মা কোথায়?—ছেলের পিতার কথা জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন হল না, কেননা সুবালার পরিধানে থান।

ভাল আছি। মা মারা গেছেন।—সুবালার দুটি কথায় উত্তর হয়ে গেল। আবার কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে।

খোকার কি নাম?—অজিত জিজ্ঞাসা করলে।

ওর নাম মাণিক।—মহাভারতের পাতা উলটোয় সুবালা।

অনেক চেষ্টার পর সহসা অজিত বললে, কোথায় চলে গেলে তখন?

কখন?

সেই সময়ে।

মুখ নীচু করে সুবালা প্রদীপটি উসকে দিতে লাগল। তারপর মনে হল, বড় আলো হল। আবার কমিয়ে দেয়। নত চোখ থেকে দু'তিন ফোঁটা জল ঝরে পড়ল। মাণিক বাইরের আলোয় পড়তে গেছে।

একটু থেমে সে জিজ্ঞাসা করলে, সত্যি তুমি সব কথা জানতে চাও? চোখে মনে হল সাগর চকচক করছে, কিন্তু ঝরল না।

অজিত নীরবে উৎসুক জিজ্ঞাসু চোখে তার পানে চেয়ে রইল।

সুবালা আস্তে আস্তে এক সুরে সমস্ত বেদনা, গ্লানি, দুঃখ, অপমান, দারিদ্র্য, শোক, সান্ত্বনা সব কিছুকে—যেন বর্ষণের আগের শ্রাবণের আকাশের মতন থমথমে গভীর গম্ভীর ভাবের এক সুরেই বেঁধে নিয়ে এক এক করে বলে যেতে লাগল। সেই জিতেনবাবুর আগমন, সমবেদনা প্রকাশ, জননীর ব্যাকুল দুঃখে পরদিনই সেই বাড়ি ছাড়া, অজিতের বিবাহের সকল সংবাদ পাওয়া, মায়ের মনোভঙ্গে পীড়িত হওয়া, জিতেনবাবুর সাহায্য গ্রহণ, অবশেষে তাঁর তাকে গ্রহণ করার স্বীকৃতি, জননীর নিশ্চিন্ততা, তাঁর আসা-যাওয়া, ঘনিষ্ঠতা। সুবালা একটু থামলে।

তারপর জিতেনবাবুর জননীর অমত।

অবশেষে মা বুঝলেন, তিনি প্রতারিত হয়েছেন। তারপর কথান্তর এবং জিতেনবাবুর একেবারে প্রস্থান।

এক মুহূর্তের মধ্যে তার মুখ লজ্জিত বেদনার আভাসে আরও ছোট্ট হয়ে গেল। অজিত একদৃষ্টে তার পানে চেয়ে ছিল।

তারপর মাণিক হল।

অপমানিতা উৎপীড়িতা নারী মাথা নীচু করেই ছিল। কথা সুর এত মৃদু, যেন তার নিজের কানেও পৌঁছবার ভয় হচ্ছে।

অজিত চমকে উঠল, Coward, ইতর! পরক্ষণেই মাথা নীচু করে নিলে। শুধু কি জিতেনই?

সুবালা মুখ নীচু করেই ছিল।

আমি ভেবেছিলাম, তোমার—। অজিত আর বলতে পারলে না।

না, আমার বিয়ে হয়নি।—প্রশ্নটি এই জবাবে সে শেষ করে দিলে।

তারপর বছরখানেক কি কিছু বেশি পরে মার মৃত্যু হল।—আবার বলে যায়। অজিত নিরতিশয় পীড়িত বেদনায় ওর মুখের পানে চাইলে। দৃষ্টিতে যেন 'আরও তারপর?' জিজ্ঞাসা।

এবার সুবালা সহজভাবে মুখ তুললে।

তারপর অনেক কষ্ট পেলাম।

আমার খোঁজ একবারও কেন করলে না?

মনে হয়নি, বুঝতেও পারিনি। আর তুমি কি—। সুবালা থেমে গেল।

যাক। তারপর?—অজিত বললে। সে বুঝলে, সুবালা আসতে পারে, এমন কিছু নির্ভরযোগ্য কাজ সেও করেনি।

তারপর ঐরকমে দুঃখ পাবার ভয়ে অনেক পালিয়ে বেড়ালাম।

আবার কষ্ট পেলে?—সাশ্চর্যে অজিত জিজ্ঞাসা করলে।

আর পাব না? বুঝতে পারছ না?—বেদনা, তিরস্কার, অনুযোগ, অভিযোগ-ভরা কণ্ঠে সুবালা বললে।

অজিত চুপ হয়ে গেল।

শেষে ঐ কামার-গিন্নীর পায়ে ধরে, ধর্ম্মমা বলে, এখানে রয়েছি এই ন বছর। প্রথম প্রথম ও মুড়ির চাল এনে দিত, ভাজা হলে দিয়ে আসত। এখন খোকাকে নিয়ে আমিই যাই।

চৌকো আঙ্গিনার মাথার ওপরের আকাশটুকু থেকে তারারা নীচু মুখে দেখছিল। হয়তো শুনতেও পাচ্ছিল সুবালার কথা। বাড়ির ওধারে তখনও কামার-গিন্নির ঘরে খাওয়া-দাওয়া চলছে।

৬

অজিত অনেকক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলে বললে, সুবালা, চল আমার বাড়িতে।

সুবালা অবাক হয়ে অদ্ভুতভাবে ওর পানে চেয়ে রইল।

যাবে?—আবার প্রশ্ন করলে অজিত।

কোথায়?—মূঢ় দৃষ্টিতে সে জিজ্ঞাসা করলে।

আমার বাড়িতে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। তোমার সম্মান মর্যাদা সম্পূর্ণ বজায় রেখে তুমি আলাদা থাকবে।

সুবালা চেয়ে রইল নির্বোধের মতন।

কার কাছে থাকব?

আমার বাড়িতে। আমার মেয়ে আছে, তার অভিভাবকের মতন তুমি থাকবে।

সুবালার চটকা ভাঙল।

না। তোমার স্ত্রী কি বলবেন? আর—সে হয় না। তিনি কিছু না বললেও আমি যাব না।

তিনি নেই, থাকলেও তিনি কিছু বলতেন না।—অজিত বললে।

সমবেদনা-ভরা চোখে সে অজিতের পানে চাইলে। কিন্তু বললে, না, আমি যাব না।

আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। আমি আমার মেয়ের সঙ্গে মাণিকের বিয়ে দোব। তুমি চল। তুমি জান না, আমি নিজের কাপুরুষতায় কত কষ্ট পেয়েছি।

সে বিশ্বাস করছি। কিন্তু আমি যাব না।

তুমি কি আমাকে একটু শান্তিও পেতে—শান্তিও পেতে দেবে না? অজিত ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলে। আমার প্রায়শ্চিত্ত করি—

বিয়ে দেওয়াতে কি আর হবে, আবার হয়তো তোমার নির্দোষ মেয়েটি আমার ছেলের হাতে কষ্ট পাবে। ওই কি বড় হয়ে—যাকগে।

লজ্জিত অপ্রতিভ অজিতের অর্ধসমাপ্ত কথাটার শেষ বুঝতে বাকি রইল না। একটুখানি চুপ করে থেকে সে আবার বললে, তোমাদের এখন কি করে—? বলে থমকে গেল।

সুবালার মুখে একটু হাসির আভাসের মত দেখা গেল, ঐ মুড়ি ভেজে। একটু থেমে বললে, দরকার হলে কামার-মা দেন, আর অন্য কাজও করি—পাড়ার লোকের চাল কড়াই ভাজি, বাছি।

অজিতের চোখ তোলবার ক্ষমতা ছিল না। সুবালার শ্রান্ত উদাসীন চোখদুটি তার পানে চেয়ে ছিল। অবশেষে বললে, তবে তুমি শুধু খরচের টাকাই আমার কাছে নাও।

না। আমার আর আশাও নেই, নেশাও নেই, কোনরকমে সোজা এই পথেই শেষ খুঁজে নিতে দাও।—সুবালা মৃদু দৃঢ় স্বরে বললে। আমার অচল আর হবে না। আর—তুমি এস না।—সুবালা উঠে দাঁড়াল।

অজিতও উঠল হতাশভাবে, গভীর দুঃখ-ভরা দৃষ্টিতে সে সুবালার দিকে চেয়ে রইল।

সে নত হয়ে প্রণাম করলে, শুধু বললে, ভালর জন্যেই বলছি, আর এলে আমাকে উঠে যেতে হবে।

সে আর মুখ তুললে না।

উত্তরা, শ্রাবণ ১৩৩৭

রাজযোটক

ব্যাপারটা কিছুই নয়, সরু চোঙে ভরা বুলগেরিয়ার দধিবীজ মাত্র, এবং সেটা রাখা হয়েছিল ভাঁড়ারের তাকে, আর আনা হয়েছিল ডাক্তার অসিত চাটুজ্যের একটিমাত্র ছেলের জন্যে, যেটিকে ডাক্তাররা বলে 'রিকেটি', মায়েরা বলে 'মুখ-চাওয়া' রোগে ছেলে, পাড়ার গিন্নীরা বলেন, 'পুঁয়ে পাওয়া' ছেলে।

ডাক্তারের ছেলে যে অমন হয় কেন, এ কথা ডাক্তারের বাড়ির লোকও ভাবে, পাড়ার লোকও ভাবে এবং বলে। সে হেতু-নির্ণয় এখন থাক।

ছেলে প্রায় তিন বছরের। বারো মাসের মধ্যে ছত্রিশ সপ্তাহ জ্বর থাকে, না থাকলে কাসি থাকে, তা না হলে সর্দ্দি, অথবা অজীর্ণ, নতুবা অকারণ কান্না—এ থাকেই। আর তার মা বলে, সেটা অসুখ। আসলে আড়াই বছরের আড়াই মাসও তাকে আর তার রোগকে পৃথক করে দেখা যায়নি। যদি কোনদিন ভাল থেকেছে, 'শনি' 'মঙ্গল' 'নজর' 'দৃষ্টি' সমস্যার ভয়ে সেটা কেউ মুখে উচ্চারণ করেনি। অতএব সে রুগ্ন তো বটেই, তার ওপর নির্জীব ও নিরানন্দও।

বাপ বেচারা অনেক ভাবে, কিন্তু একমাত্র ডিস্পেন্সারির ওষুধ আনা ছাড়া তার ডাক্তারি আর কোন কাজেই লাগে না। তার বিদ্যা হার মেনে গেছে কি অজ্ঞাত কারণে, সে নিজেই বোঝে না। ফলে মাঝে মাঝে তারও ঐসব অলৌকিক 'নজর' 'মাদুলি'তে বিশ্বাস আসে যেন। এবারে ছেলের মা বললে, বাড়ির ডাক্তারের এলাকাড়ির চিকিৎসায় কি রোগ সারে? আমার মার মাসীমা বলেন, বদ্যিকে পয়সা না দিলে অসুখ সারে না।—কথার বাঁধুনিতে ওর বয়স যত মনে হয়, তত পৌরাণিক মোটেই নয়, মাত্র উনিশ বছর বয়স।

ডাক্তারের ডাক্তার বন্ধু এল। এসে অবাক হল, আশ্চর্য হল এবং রাগ করলে। বললে, নাকে সর্ষের তেল দিয়ে এতদিন ঘুমোচ্ছিলে? ডাক্তার-বাপের ছেলে এমন বাদুড়ের মত হল কি করে? আরও অনেক কিছু যা বললে তা যথেষ্ট, আর যা না বললে তাও কম নয়।

চিকিৎসাপত্র লেখা হল।

শিশি শিশি ওষুধ, বোতল বোতল ফুড, গায়ে মাখার জন্য কডমাছের তেল, আর তার সঙ্গে এল বুল্‌গেরিয়ার দধিবীজ, অর্থাৎ ভাষায় যাকে আমরা 'দম্বল' বলি।

তখন কিছুদিন দেশময় বুলগেরিয়ার দধিবীজের নতুন খ্যাতি উঠছিল। মাসিকপত্রের পাতায় পাতায়, ডাক্তারদের মুখে মুখে, খাদ্যতত্ত্বজ্ঞদের নির্দেশে (এটা বর্ণাদ্যক্ষরিকা ভিটামিন যুগের আগের কথা), তার প্রচার ও পসারে রোগী এবং সুস্থ সকলেরই লক্ষ্য পড়ছে তার দিকে।

এতক্ষণ অবধি কোনও গোল ছিল না। গল্পে-শোনা হিন্দুস্থানী জননীর মত অনুপ্রভা ভেবে গর্ব অনুভব করছিল, তার ছেলে চিররুগ্ন, বাড়িটি হাসপাতাল, এবং তার 'ইলাজমে এত্‌না রুপৈয়া লাগা,' অর্থাৎ প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছে চিকিৎসাতে। বিপত্তি

হল হঠাৎ। রাত্রে ঠাকুর দই পেতে রেখেছিল চোঙ থেকে দম্বল নিয়ে অনুর শাশুড়ীর নির্দেশমত। সকালে সে দই বেশ জমেওছিল। ছেলে ভোরে খাবে হরলিক্স, তারপর ঐ দইয়ের ঘোল, তারপর জীয়ানো মাছের ঝোল—পোরের ভাত সহ, তারপর আবার ঐ দইয়ে কাটানো ছানার জল ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনু পুজো করে উঠল। চোখে পড়ল তাকের ওপর দইয়ের বাটি। বেশ জমেছে। অনুর মুখ প্রসন্ন। তারপর চোখে পড়ল দম্বলের চোঙটি। তার ওপরে অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা—দই ও প্রস্তুতকারীর নাম ধাম ঠিকানা। অনু ইংরেজীতে চিঠিপত্রের ঠিকানা লিখতে ও পড়তে পারত। হঠাৎ কি মনে হল।

খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাকের ওপরের জিনিসপত্র নামাতে লাগল।

সামনের দালানে আশ্বিনের হিম লাগবার ভয়ে পায়ে গরম মোজা জুতো, গায়ে ফ্লানেলের জামা, মাথায় পশমের টুপি পরা, ঝড়ের সময়ে কম্পিতশিখা প্রদীপের মত ম্লানহাসিমুখ একটি ক্ষীণ শিশুকে কোলে নিয়ে ছেলের ঠাকুমা বসেছিলেন ঘোল তৈরির আশায়। ঘোল তৈরি না করেই বধূকে অন্য কাজে ব্যাপৃত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি গা বউমা? ইঁদুরে কিছু তুলেছে?

বধূ বললে, না, মা। বুল্‌গেরিয়ার দম্বল।

তাতে কি মা?—আশ্চর্য হয়ে শাশুড়ী বললেন।

ছিষ্টি বিলিতী অনাচার! ঠাকুর একেবারে তাকে তুলেছে।

শাশুড়ী চুপ করে রইলেন। কথাটার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। আবার কেমন নতুনও মনে হতে লাগল। কিন্তু তর্ক করে লাভ নেই, এবং আচারনিষ্ঠায় নিজেকে পুত্রবধূর চেয়ে খাটোই বা কি করে করা যায়?

বেরুবার কাপড় পরে অসিত ওপর থেকে নেমে এল। নিজের মাকে আর ছেলেকে দালানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এল। মৃদু হেসে ছেলের শীর্ণ রক্তহীন গালে টোকা মেরে জিজ্ঞাসা করলে, খেয়েছ কিছু?

ছেলে হাঁটতে না পারুক, কথা ভাল কয়। বললে, না, মা ঘর ধুচ্ছে।

অসিত আশ্চর্য হয়ে ভাঁড়ারের দিকে চাইলে, কেন? ওকে খেতে না দিয়ে ঘর ধোয়ার দরকার?

মার দিকে চাইলে।

মা চুপ করে রইলেন।

দইটা জমেছে ভাল হয়ে?

মা বললেন, হ্যাঁ।

তা ওকে দিয়েছ?

মা বললেন, কি বিলাতী দম্বল এনেছিস, সব ছোঁয়া-লেপা হয়ে গেছে।

মানে? ডাক্তার অবাক হয়ে রইল।

মা জবাব দিলেন না।

ঘরের ভেতর হতে বধূ নির্লিপ্তভাবে ঝিকে নিয়ে কি সব ধোয়া-মোছা করছিল। এবারে ডাক্তার মা'র দিকে চেয়ে বললে, পিসীমার চিঠিপত্র পাও?

মা বললেন, কেন?

একবার আসতে লেখ না। এলে সন্তুষ্ট হবেন। খোকার অমন বাদুড়ের বাচ্চার মত চেহারা শুধু আমি দেখব? দাও, দইটা আমাকে দাও, আমিই করছি।

চাকর এসে বললে, বাইরে সতীশবাবু এসেছেন।

অনুর ধোয়া-মোছা হয়ে এল। ওদের মাছ-মাংস অখাদ্য অনাচার, আর অনুদের ঠাকুর-দেবতা বিধবা-বামুন, আচার-বিচার,—অনু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মনে কর, কেউ যদি ঐ দইয়ের পঞ্চামৃতে ঠাকুরকে স্নান করায়! অনু মনে মনে ভাবে, ঐজন্যেই আর দেশে দেবতার দয়া নেই, তাই না খোকা অত ভোগে!

২

আগের ঘটনাটা হচ্ছে এই।—

অনুর বিয়েটা সবর্ণ আর যথারীতি শাস্ত্রলোকাচারাদিসম্মতই হয়েছিল। মেয়ে সবর্ণা ও গৌরবর্ণাও, এবং বাপের দিক থেকে উজ্জ্বলরজতবর্ণচ্ছটার অভাবও হয়নি।

বিয়ের আগে পিসীমা আর জেঠীমা তাকে দেখে এসেছিলেন কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়ে। পিসীমা বললেন, খাসা সুন্দরী মেয়ে—ছোটটি। আর বাপ যা পয়সা করেছে কি বলব! আমাদের অসি যেমন ডাক্তার হয়ে বেরুচ্ছে, সেও তেমনিই বড় ডাক্তার কিসের বুঝি। কলকাতার লোক পরেশ চক্রবর্তীর নাম না জানে কে! তুমি একবার দেখ না বউ, মেয়েটি। আমাকে মেয়ের মা আর পিসী যা ধরলে!

বলা বাহুল্য, অসিতের জননীর উদ্দেশে এই কথাগুলো বলা হচ্ছিল।

অসিতের মা বললেন, তুমি যে বলছ ছোট্ট! সাজবে কি? আর তা হলে লেখাপড়াও কি জানে তেমন? অসির পছন্দ হবে তো?

ননদ ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, তুমি জানতে লেখাপড়া? আমার বিদ্বান ভাইয়ের যুগ্যি তুমি কত বড় 'বিদ্বান' ছিলে? ওর বাপ যদি চিরকাল তোমাকে নিয়ে ঘর করেছে, তার ছেলেও করবে।

এ যুক্তির জবাব মা দিতে পারেননি। চুপ করেই ছিলেন।

সেকালের লোক বাপের ব্যবসা করত, এখনকার লোক শ্বশুরের ব্যবসায়ের উত্তরাধিকার পেতে পারে কি না ভাবে। যাই হোক, সবদিক ভেবে পিসীমা জেঠীমা ঠাকুমা এবং মাতা ও পিতা সকলের সম্মতিতে অসিতের বিবাহের আয়োজন হতে লাগল।

মাসীমা বেড়াতে এসে বললেন, দিদি 'রাজচটক' নাকি মিল হয়েছে! গণৎকার দেখিয়েছেন তোমার শাশুড়ী। এমন মিল নাকি সেই রাম-সীতার হয়েছিল!

জ্যোতিষশাস্ত্রমতে রাজযোটক মিল হল। গণ-বর্ণেও নাকি মিল চমৎকার। মেয়ে একেবারে শূদ্রবর্ণ। বর্ণশ্রেষ্ঠ মেয়ে! এ পর্যন্ত যাদের বিয়ে হয়েছে, দেখে এস গিয়ে (ঠাকুমা বলেন) তাদের দুর্গতি, তাদের নাম বলতে নেই!

অসিত শূদ্রবর্ণ শুনে একটা রসিকতা একবার করতে গিয়েছিল, ঠাকুমার পরিহাস ও ধমকে চুপ হয়ে গেল।

যথাকালে যথারীতি অনুপ্রভার অসিতের বিবাহ হয়ে গেল।

সেই ছোট বউ দিনে দিনে বিয়ের জল পেয়ে শশিকলার মত অথবা বর্ষার কলাগাছের মত প্রবর্ধিত হয়ে উঠল।

ঘরবসতে এল শ্বশুরবাড়ি। ভাঁড়ারের উনকুটি-চৌষট্টি সব কাজ করে, পান সাজে। শুচিতা রক্ষা করে সর্বাংশে।

খ্যাতির শেষ থাকে না।

তারপর ঠাকুমা যথাকালে স্বর্গারোহণ করেছিলেন। পিসীমা প্রথম-স্থানীয়ের প্রশংসাপত্র দিয়ে তীর্থবাসিনী হয়েছিলেন। মাসীমা রাজযোটকের জোড় দেখতে আর আসতে সময় পাননি। অসিতের বাপও মারা গিয়েছিলেন।

বাড়িতে ছিলেন অসিতের মা আর তাঁর অন্য ছেলেমেয়েরা। আর অনু আর তার ঐ ছেলেটি। আর অনু আর তার শুচিতা।

অসিতের অনুকে মনে করলে আচার বাদ অনুকে মনে হয় না, আর আচার মনে করলে (অসিত অবশ্য জানে না আচার-তত্ত্ব), শুচিতা মনে করলে অনু ছাড়া তার অস্তিত্ব নেই, ওর মনে হয়। এই অনু আর ছেলের কথা হচ্ছিল এবং পিসীমার।

মধ্যপথে সতীশ আসাতে অসিতের রাগটা হজম করে নিতে হল, এবং হাসিমুখে বাইরে যেতে হল।

তারপর সহাস্যে চেয়ার টেনে বললে, বসবে? চা খাবে?

সতীশ বললে, না, বসব না। মেয়েটা সাতদিন একাজ্বরী হয়ে আছে। একবার দেখবি তুই?

ডাক্তারের গাড়ি বের করাই ছিল, সতীশের মেয়েকে দেখতেই আগে গেল। বছর দশেকের মেয়ে, জ্বর হয়েছে, রুগ্ন মনে হয় না, আচ্ছন্ন মোটেই না। সকালে জ্বর কম, বেশ সহজভাবে কথা কইলে।

মেয়ের মা পাশেই বসেছিল, অপ্রস্তুতভাবে নমস্কার করলে।

ঘরে টিপয়ে ওষুধ-বিষুধ, টেবিলে প্রেস্ক্রিপ্‌শন-আদি, ছোট এক টুলে কুঁজো গেলাস, খাটের তলায় 'চিলিম্‌চি'। খান দুই চেয়ার, একখানা ইজিচেয়ার আর একটা ছোট ক্যাম্প-খাট মোড়া একধারে।

রোগী দেখা হল।

ডাক্তারের হঠাৎ মনে হল, রোগীর স্বাস্থ্য তো ভাল। রোগ এখনও কিছুই করেনি। নিজের 'পুঁয়ে-পাওয়া' ছেলেটিকে তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল, এবং তারপরেই মনে হল, এদের ঘরটি বেশ পরিষ্কার ঝরঝরে। না, দামী ছবি আসবাবপত্র বড়লোকের মত কিছু নেই, সব সোজাসুজিই।

কিন্তু ওর মনে হল, ওদের যেন বেশ পছন্দ আছে। আর মনে হয়, ওরা যেন বেশ সুখী। অবশ্য সুখ বা অসুখের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে জানে না, তবু—

ডাক্তার ওষুধ লিখলে, পথ্যের ব্যবস্থা দিলে, মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলে, বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করলে, বন্ধুর স্ত্রীকে ভরসা আশ্বাস দিলে রোগ সম্বন্ধে, অবশ্য একটু সহজভাবেই।

উঠল যখন, তখন ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে নটা বেজে সাঁইত্রিশ মিনিট, প্রায় দু ঘণ্টা হল। ওর ডাক্তার মিত্রের সঙ্গে একটা রোগী দেখতে যাবার কথা আছে ঠিক দশটার সময়। ডাক্তার আর দাঁড়াল না। বললে, আবার ওবেলা খবর দিস।

ওবেলা খবর দেওয়ার আগে আপনি এল।

তারপর এবেলা ওবেলা করতে করতে কখন রোগটা হয়ে গেল টাইফয়েড, এবং অবস্থা হয়ে এল সঙ্কট, আর সপ্তাহটা দ্বিতীয়ের শেষ সীমায় পৌছল, মেয়ের বাপের চিন্তিত এবং মার শঙ্কিত কাতর দৃষ্টি একান্ত করে ওর শরণ চেয়ে ওকে বাড়ির লোকের মত করে ফেললে, ও জানতেও পারলে না।

ওর মেয়েটির ওপর হল মায়া, বন্ধুর ওপর দয়া, বন্ধুর স্ত্রীর ওপর জন্মাল এমন একটা মনোভাব যেটাকে শ্রদ্ধা বলা যেতে পারে, সম্ভ্রমমিশ্রিত করুণাও বলা যেতে পারে এবং ভদ্রতামিশ্রিত মোহও বলা যেতে পারে। আসলে ওদের সাহচর্য লাভের একটা লোভও ওর ডাক্তারির কর্তব্যের দায়িত্বের চেয়ে ওকে পেয়ে বসল। সোজা কথা, ওদের ভারী ভাল লাগল, এবং মুহূর্তে সেই ভাল লাগার মহেন্দ্রক্ষণ এল—যে সময়ে ওর বাড়িতে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। ফলে ওর বন্ধুর বাড়ির সব কিছুই যেন অতিশয় অভিনব মনে হচ্ছিল। অনুর সঙ্গে যেন কেবলই তুলনার কথা মনে ওঠে।

৩

দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ হল। তৃতীয়ের রাত্রি যত বাড়ে, রেণুর মার শঙ্কিত চোখ ততই ওর পানে কাতর হয়ে চায়। এটা-সেটা গোছায়, আর ঘর থেকে নড়ে না।

ডাক্তার নাড়ী দেখে, শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা গোনে, রোগীর খুঁটিনাটির বদল লক্ষ্য করে। রাত্রি বাড়ে।

যেমন উঠতে যাবে, হঠাৎ নিরু বললে, আজকে অসিতবাবু থাকুন না। স্বামীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, যদি কালকের মতন বাড়ে?

সতীশ উৎসুকভাবে বন্ধুর দিকে চাইলে।

অসিত ডাক্তার-হিসেবে কি করে হাসিমুখে রোগীর স্বজনদের অনায়াসে মিথ্যা কথার আশ্বাস দেওয়া যায়, তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। নিরুর মুখের দিকে চেয়ে তেমনই ভাবেই বলতে গেল, না, ভয় কি আর? ভয় তেমন যদি হয়, আমি আসব'খন ডাকলেই।

বলতে পারবার আগেই নিরু বললে, আপনার খাবার এখানে করতে বলে দিই না? নাই বা গেলেন আর। সেখানে ড্রাইভার গিয়ে খবর দেবে'খন।

সতীশ বললে, আবার ডাকব কালকের মতন? তার চেয়ে থাক না আজ। কষ্ট হবে?

অসিত বললে, আচ্ছা। কিন্তু খাওয়ার ব্যবস্থা নয়, আমি এগারোটা আন্দাজ আসব। কিন্তু আজ দরকার হবে না বোধ হচ্ছে।

নিরুর মিনতি-কাতর চোখ ওর দিকে চেয়ে থাকে। অসিত হাসলে, আপনি তো আচ্ছা ভীতু! আসব'খন। ততক্ষণে মার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পথের লোক-চলাচল কমে গেল। পাড়া নিঝুম হয়ে আসে। একটি আধা-জাগ্রত অর্ধেক-আচ্ছন্ন শান্তি পল্লীর পথে জেগে থাকে। সতীশ আর নিরু পথ চেয়ে থাকে।

অসিত ডাক্তারখানা থেকে বাড়ি ফেরে। খায়, যথারীতি শোবার ঘরে গিয়ে ছেলের

গা দেখে, আগামী সকালের কাজকর্ম কেসের কথা ডায়েরিতে দেখে রাখে, আরও কিছু বা টুকে রাখে।

ঘরের দক্ষিণের জানলা বন্ধ, মশারি-ফেলা খাটে ছেলে ঘুমোয়, বউ তখনও খেয়ে আসেনি। নিজের বিছানার দিকে একবার চাইলে। বিছানা ওর মনে কোনই মোহ জাগায় না, কর্মক্লান্তের আকর্ষণও না। ও মার ঘরে গিয়ে বলে, তা হলে মা আমার একটি রুগী দেখতে এখন যাচ্ছি। হয়তো আসতে পারব না।

কথার জবাব নেবার দরকার হয় না। তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়, দরজা পার হয়ে গাড়ি আপনি চালিয়ে বেরিয়ে যায়।

রোগীর বাড়িতে মেয়ের বাপ জেগে ইজি-চেয়ারে বসে সিগারেট খায়, আর মাঝে মাঝে হাই তোলে। ঘড়িতে সওয়া এগারোটা। মা ক্যাম্প-খাটখানিতে মেয়ের পাশে শুয়ে, মেয়ের মাথার পাশে মাথা রেখে তার একটি হাত ধরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ডাক্তার এসে রোগীর রোগের বিবৃতিপত্র দেখে বন্ধুর কাছে এসে বসল।

ভাল আছে মনে হচ্ছে। তবে বলা যায় না কিছু, এসে যখন পড়েছি, তা হলে থাকি, ইত্যাদি।

আরও রাত্রি বাড়ে। বাপ হাই তোলে আর ঘড়ি দেখে। অবশেষে বলে, নিরুকে ডাকি?

না, না, তোমরা ঘুমোও। উনি ঘুমোন না, বড় ক্লান্ত হয়েছেন। আমি আছি।

বাপও ঘুমোয়—ইজি-চেয়ারেই। ডাক্তার মাঝে মাঝে বই পড়ে, মাঝে মাঝে রোগীকে দেখে।

নিরু একবার চোখ খুললে, তারপর ডাক্তারকে দেখে আশ্বস্ত-ভাবে একটু হেসে আবার ঘুমোল।

কিন্তু বিপদের রাত্রি আর বিপন্নের দুঃখ কি একটা, না, একদিন? সে রাত্রি ভাল কাটল তো অন্য রাত্রি আছে, দিন আছে। কোনদিন বা শেষরাত্রে গেল জ্বর নেবে ৯৬·৪-এ, গা যায় হিম হয়ে। কোনদিন বা ১০৫·৮-এ এসে বিহ্বল করে তোলে। মা-বাপেরও বিহ্বলতা আসে ভয়ে। মা যেন মেয়ের মতই অসাড় হয়ে যায়।

ডাক্তার একমনে ইন্‌জেক্‌শনের ওষুধ ঠিক করে। আইডিন দিয়ে এটা মোছে, ওটা মোছে।

ডাক্তার যেন অনাসৃষ্টি দেরি করেন! নিরু ভাবে, রেণু কি হিম হয়ে যাচ্ছে! গলা থেকে যে স্বর বেরোয় 'ওগো,' তা কান্নার চেয়ে বিশ্রী।

ডাক্তার চমকে ফিরে তাকায়, তারপর রোগীর নাড়ী দেখে ধমক দিয়ে বলে, ছি, করছেন কি?

কিন্তু অত্যন্ত করুণা হয়। বাড়ি যাওয়া আর হয় না। এমনই করে তিনের সপ্তাহ—ভয়াবহ তৃতীয় সপ্তাহ গেল ; রোগ কমার মুখ নিলে। চতুর্থও যায় প্রায়।

ডাক্তারের নাইট ডিউটির দায়িত্ব আর যায় না।

যদি?—যদির কথা বলা যায়?

চতুর্থের শেষের দিকে সতীশ বললে, আচ্ছা ভাই, তুমি বাড়ি যাও আজ। কদিন না শুয়ে তোমার যা অবস্থা হয়েছে। দরকার পড়ে—বোধহয় আর দরকার হবে না। কি বল?

ডাক্তার সাহ্ধ্য চা পান করতে করতে মৃদু হাসে।

নিরু বললে, আর কিন্তু আপনাকে কষ্ট দেওয়া অন্যায় হচ্ছে। স্বার্থপরের মত কাজ।

অসিত ভাবে, ভারী সব নিঃস্বার্থ হয়েছে আজ! একটু হেসে সে ওঠে।

৪

প্রথামত শোবার ঘরের খাটের বিছানা সাজানো পাতা থাকে। অসিত বাইরেও থাকে, আবার আসতেও পারে।

অসিত ঘরে ঢুকল। নিয়ম এবং অভ্যাসমত (যদিও কদিন অত নিয়ম ছিল না) মশারি তুলে ছেলের গা দেখে, মাথায় ঘাম হচ্ছে কি না দেখে। না, জ্বর নেই। অঘ্রাণ। কিন্তু ঘরটা কি বিশ্রী গরম! জানালা কটা সব বন্ধ। অনু অকাতরে ছেলের পাশে ঘুমোচ্ছে। অসিত মাথার কাছে জানলাটা খুলে দেয়। এই বিশ্রীভাবে সব বন্ধ করে শোওয়া যে কত খারাপ, ও বলে বলে অনুকে পারে না। কিন্তু কি লাভ?

এখুনি খোকার কি হবে কে জানে, দিনের পর দিন আবার তাই নিয়ে ওকেই ভুগতে হবে।

কিন্তু ঘরের এই বদ্ধ গরমে মশারির ভেতর অনু বেশ ঘুমোচ্ছে। ওর আশ্চর্য মনে হয়, ওদের সবারই কি শোওয়া একরকম! নিরুও তো অমনই করে ঘুমোয়। সে বা সতীশ জাগে তো একেবারেই জেগে থাকে, ঘুমোয় তো নিজের কথাই মনে থাকে না, তা ছেলেমেয়ে!

সে যাক। কিন্তু নিজের বিছানায় শুয়ে, নিজের ঘরে শুয়ে ওর না হল ঘুম, না হল আরাম। যেন এর চেয়ে ওখানে ঘুম হত। কদিন বা ওখানে থেকেছে! কিন্তু কি অদ্ভুত, নতুন অভ্যাসেও পুরানোতে অনভ্যস্ত করে দেয়!

অসিতও ঘুমোয় না। মাথার কাছে খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চায়। আকাশের অন্তহীন জ্যোতির্লেখা আর মনের অনন্ত ছায়ালিপি মিশে যায়। মন কি বলে, কি ভাবে, ও যেন বোঝে খানিকটা। কিন্তু—কিন্তু, কি দরকার তাতে?

ও অত্যন্ত অভিভূতভাবে আড়ষ্ট হয়ে নিজের শয্যায় অপরিচিতের মত শুয়ে থাকে। ওর মনে হয়, ঐ ঘুমন্ত অনুকে চেনে না। ওদের কাউকে চেনে না। ও সন্ন্যাসী নয়। সুষুপ্ত যশোধরাত্যাগী সিদ্ধার্থও নয় সে। কিন্তু ওর যেন সমস্ত মন অসাড় হয়ে থাকে। ঐ রুগ্ন সন্তান? হ্যাঁ, ওরই। কিন্তু মায়া হয় না ওর ওপর। শুধু মমতাহীন দয়া হয় একটু।

নিজের এই অদ্ভুত মনের ভাবকে ওর ভাল লাগে না। কিন্তু আশ্চর্য, ওর খারাপও লাগে না। ওর সত্য মনে হয়। কি রকম একটা অতি অদ্ভুত শূন্যতা আর একটা অপূর্ব বিস্ময়ব্যথিত সজ্ঞান দুঃখ ওর মনকে মথিত করতে থাকে। হঠাৎ যেন টের পায় এতদিনে যে, অনুকে চায়ওনি, পায়ওনি এবং কোন মোহ-মমতাও ওর মনে নেই তার জন্যে।

অনুর দিকে একটুখানি চায়, সে বেশ ঘুমোয়।

খোকা উসখুস করে। একবার একটু কাসলে।

অসিত চকিত হয়ে উঠল। উঠল, আলো জ্বাললে। অঘ্রাণ মাস। বলা যায় না,

হয়তো খোকার ঠাণ্ডা লাগতে পারে। ঘড়িতে তিনটে। এতক্ষণ জেগে ছিল, না একটুও ঘুমিয়েছিল, অসিত মনে করতে পারলে না। কিন্তু আর তো জেগে থাকা উচিত নয়। জানলা বন্ধ করে দিয়ে একখানা শতরঞ্জি আর গায়ের কাপড় বালিশ নিয়ে সে বারান্দায় বেরিয়ে এল। ডাক্তারি হিসেবে ঘুমোনো উচিত।

বারান্দা থেকে যে আকাশ দেখা যায়, তার নীচে প্রান্তর অরণ্য না থাক, কলকাতার বাড়ির সমারোহই থাক, সে আকাশ অনেকখানি। অনেকগুলো তারা ওর দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু শীতের ঠাণ্ডায় একটা নিষ্ঠুর ঘুম-পাড়ানো স্পর্শ আছে। অসিতের ঘুম আসতে দেরি হল না।

যথারীতি অসিত সকালে বেরোয়। সতীশের বাড়ি একবার যেতে হবে, কাল রাত্রে রেণু কেমন ছিল! ভালই অবশ্য, তবু ওর তো কর্তব্য।

সতীশের চা ও জলযোগের ব্যবস্থা টেবিলে রয়েছে।

নিরু চায়ের কথা জিজ্ঞাসা করে। ডাক্তার বসে।

সতীশ আর ডাক্তারে গল্প হয়। নিরু শোনে। ডাক্তারের মনে হয়, নিরু যেন সব বোঝে, বুঝতেও পারে। নির্মল বুদ্ধির দীপ্তি ওর মুখে ললাটে চোখে দেখা যায় যেমন, এমন তো কই আর সকলের মুখে লক্ষ্য করেনি ও!

সকলে আর কে? তবে?—যাক সে?

ডাক্তার চুপ করে একটু দেখে। নিরুর প্রতি যেন ওর শ্রদ্ধা-প্রশংসার শেষ থাকে না।

নিরু জানে। নিরু বুঝতে পারে ওর প্রশংসার ভাব। ওর অপ্রস্তুত মনে হয়। কিন্তু বেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সতীশ বুঝতে পারে, যেন একটু পরিহাসের ভাবে দেখে। নিরুও যেন ডাক্তারের ভক্ত, অবশ্য মেয়ের জন্যই। তবু সতীশের একটু যেন ঈর্ষাও হয়।

তোমার বেরুবার সময় হল না অসিত?—সতীশ জিজ্ঞাসা করে।

ডাক্তার জবাব দেয়, হ্যাঁ, এইবার উঠি। একটু রেণুকে দেখে গেলাম। এখনও তো নিয়ম দরকার।

নিরু প্রশ্ন করে, এখনও কি ভয় আছে নাকি অসিতবাবু?

স্নিগ্ধভাবে ডাক্তার বলে, না, ভয় আর নেই বড়। তবে ভয় হলে তো আমরা আছিই।

মা বলে, আর কাজ নেই আপনাদের—বাবা!

ডাক্তার অপ্রস্তুত হয়ে যায়। তার মনে হয়, এরা—রোগীর স্বজনরা কি অকৃতজ্ঞ। এতদিন ধরে এত কষ্ট স্বীকার করে ওর সন্তান বাঁচালাম, দরকার পড়লেই আসব, তবু—। অন্যরকমও তো বলতে পারত।

সতীশ জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ হে, কোথাও একটু চেঞ্জে গেলে কেমন হয়? তা হলে বোধহয় নতুনত্বে মেয়েটা একটু সারেও শিগগির, না?

প্রশ্নটা যেন ডাক্তারের মনকে আঘাত করে। সামলে নিয়ে সে বললে, কোথায় যাবে ভাবছ?

তুমিই বল না?

অসিত বলবার আগেই মেয়ের মা আর মেয়ে প্রস্তাব করলে, মেয়ের মামার বাড়ি অর্থাৎ মার বাপের বাড়ি—পাটনা।

পাটনা এ সময়ে বেশ, না?—নিরু প্রশ্ন করে।

সতীশ জিজ্ঞাসুভাবে চায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দিন ও অন্য সব সুবিধা-অসুবিধার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। দিন আষ্টেক পরেই যাওয়া। রেণু ততদিনে দুটি ভাত পেতে পারে।

সতীশের মুখ বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল। নিরুরও।

কিন্তু ডাক্তার গম্ভীর হয়ে গেল। সে গম্ভীর মুখে ওষুধ-পথ্যের কথা বলতে বলতে উঠল সেদিনের মত।

নিরু বললে, আবার ওবেলা আসবেন।

৫

ওদের যাত্রার দিন এসে পড়ল।

হাওড়া স্টেশনে ওদের গাড়িতে তুলে দিতে গেল অসিত। মেয়ের শোবার জায়গা করে, বিছানা পাতিয়ে, মার বসবার জায়গা করে দিয়ে, তখনকার স্বাচ্ছন্দ্য, রাত্রির সুবিধা, রোগীর ওষুধ ও আহার্যের নিয়ম,—নানা কথা বলে, নানা ব্যবস্থা করে সে। সব ঠিকঠিক করে।

সতীশ বসে সিগারেটের কেস খুলে অসিতকে দেয়।

ডাক্তার বসল রেণুর বেঞ্চিতে। নিজেরাই তো তিনজন, চতুর্থ বার্থটায় লোক নেই। গাড়ি ছাড়তে সামান্য দেরি আছে।

সতীশ চুপচাপ সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে।

উল্লসিত রেণু অনর্গল বকে যাচ্ছে। তার মা কেমন অপ্রস্তুতভাবে প্ল্যাটফর্ম দেখছে।

ঐ দেখ মা, চীনেবাদামওয়ালা। কবে খেতে পাব চীনেবাদাম, ডাক্তারবাবু? ও মা, আজ একটা খাই? ও বাবা?

মা বললে, না, ওকি?

বাপ জবাব দিলে না। ডাক্তার চুপ ক'রে হাসলে শুধু।

বাঁশী বাজল, ডাক্তার নেমে গেল। সতীশ উঠে প্ল্যাটফর্মে নেমে আন্তরিকভাবে ওর হাত ধরে খুব ঝাঁকানি দিয়ে একটা হাত ধরেই গাড়ির পাদানের ওপর পা দিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ যেন ট্রেন ছাড়বার উদ্দেশ্যে, ওর বন্ধুর ওপর যে একটু বিরুদ্ধ ভাব নিরুর কৃতজ্ঞতার জন্য জন্মেছিল, সব মিলিয়ে গেল।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। বিদ্বেষ ও বিপদমুক্ত বন্ধু এবারে আন্তরিক হেসে বন্ধুকে নমস্কার করলে। নিরুও নমস্কার করলে।

নিরু বললে, বড় ভাল আর ভদ্র, না?

সতীশ কাগজ পড়ছিল বোধহয়, জবাব দিলে না।

ওধারে গেছে পঁয়ত্রিশ দিন রেণুর অসুখে। আর এদিকে দিন তিনেক।

অসিতের পুরোনো নিয়ম, ধারাবাহিকতা আবার এসেছে। খোকা অনু, মা—তাঁদের

শুচিতা, চাকর, ঠাকুর, আর কাজ ও তার গোলমাল নিয়ে স্বচ্ছন্দে আছেন। পুরাতন প্রথায় একইভাবে সংসার চলছে।

খালি মাঝে কদিন ও টের পায়নি। তাতেই ওর যেন গতিচক্রের ধরন একটু নতুন লাগছিল।

ঠাকুমার কোলে খোকা তেমনই রুগ্ন মুখে হাসে।

অনুর পক্ষে স্বামী যেন একটা অবান্তর বিষয়। সে কাজকর্ম আর আচার-শুচিতারক্ষা প্রথামত করে যায় তেমনই।

তার স্বামী এতদিন যে ছিল আর মাঝে কদিন যে ছিল না, তার কথা ভাববার ওর অবসর নেই। ও হচ্ছে সেই জাতের স্ত্রী, কাছে থাকলে অনুগত, অবশ্য স্বভাবানুগতা ভার্যা, দূরে থাকলেও সেবাব্রত গৃহিণী, বিরহান্তরিতা দয়িতা নয়।

চিঠি এল। ওরা পৌঁছে খবর দিয়েছে।—রেণু বেশ ছিল, বেশ আছে। সকলেই বেশ ভাল আছে, আর খুব ভাল লাগছে ইত্যাদি।

অসিত চিঠিখানা পড়ে নির্লিপ্তভাবে ব্লটিং-প্যাডখানার তলায় রেখে দিলে। সে আর আশ্চর্য কি! ভাল লাগবেই, জানা কথা। কিন্তু ওর যেন ভারী দরকার সেটা জানা। আর রেণু ভাল আছে! বেশ, ভাল কথা। কিন্তু এ চিঠি তো জবাবের জন্যে নয়। রাখবার বা কি দরকার? তা থাকগে। চিঠি চাপা থাকে। ওর কেমন বন্ধু আর বন্ধুর স্ত্রীকে অকৃতজ্ঞ মনে হয়। মনের এক কোণে সে কথার প্রতিবাদ ওঠে। কিন্তু তবু মনে হয়।

অসিত উঠে পড়ে, বেরুতে হবে।

৬

বেশ শীত পড়েছে। রাত্রি অনেক হল। অসিত কি একখানা নতুন বই পড়ছিল। টেবিলের কাছে বসে পড়তে বেশ শীত করতে লাগল।

অনেক দিনের পর পুরোনো নিয়মমত উঠে ছেলের টেম্পারেচার নিতে যায়। না, জ্বর নেই। চেহারাটাও যেন ভাল দেখাচ্ছে। নাড়ী বেশ ভাল। অনু একভাবে তেমনই একটি হাত ছেলের গায়ে রেখে ঘুমোচ্ছে। ওর নিরুকে মনে পড়ে গেল।

আশ্চর্য, আজ আর ওর দয়া হয় না খোকার ওপর। বেশ মায়ায় স্নেহে মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনুর দিকে চায়। মনে পড়ল, ওর আচার-বিচার, ছেলের অস্বাস্থ্য। মনে হল, সেই দধিবীজের বিরক্তিকর কথার পর আর ওর সঙ্গে বড় কথাবার্তা হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য, সে কথা ওর মনেও ছিল না। যেন ঐরকমই স্বাভাবিক। কিন্তু সে কি সম্পর্কহীনের মত উদাসীন? ওদের কি কথান্তর হয়েছিল? না, মনে পড়ে না তো।

অনুর ক্ষীণ দেহখানি কাত হয়ে ছেলের দিকে ঝুঁকে আছে। এখন চোখ বুঁজে, তাই মুখশ্রী বয়সের মতই কোমল, ছেলেমানুষ। নইলে সংসারের মধ্যে অনু যেন পিসীমার মূল্যবান পকেট-সংস্করণ—কথায় ও আচারে। ওর রকম মনে করে অসিতের হাসি পেল। অনু সুন্দরী, ঘুমোলে খানিকক্ষণ দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু অন্য সময়ে? তা হলেও আশ্চর্য, আজ ওর ওপরও অসিতের মায়া হয়।

অনুর গায়ের কাপড় সরে গেছে। কুঁকড়ে শুয়ে আছে। শীত করছে বোধহয়। বিদ্যুৎ

নিবিয়ে সে পাশের খাটে নিজের বিছানায় উঠে অনুর গায়ের কাপড় টেনে ঢাকা দিয়ে দেয়। ঠিক করতে লেপে টান পড়তে অনু বললে, উঁ?

অসিত বললে, কিছু না।

লেপটা টেনে গলা অবধি ঢাকা দিয়ে দিলে।

অনু সেটাকে আরও টেনে মুড়ি দিয়ে পাশের খাটে ওর দিকে সরে এল। জড়িত স্বরে বললে, বড় শীত।

অসিত বললে, হ্যাঁ, লেপটা সরে গেছে যে।

অনু আরও সরে এল। ওর গরম নিশ্বাস অসিতের বুকের পাশে পড়তে থাকে।

কোণের আধখানা খোলা জানলা থেকে পথের আলো পড়ে ঘরের অন্ধকারটা যেন একটু পাতলা হয়েছে।

নিদ্রাহীন চোখে সেই আলোর পথের দিকে ও চেয়ে থাকে।

ঘরে শুধু দুটি ঘুমন্ত মৃদু শান্ত নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

অসিত অন্যমনে ছেলের বিছানার দিকে তাকায়।

হঠাৎ অসিতের মন কি রকম অদ্ভুত অজানা দুঃখে কোমল হয়ে ওঠে। পাওয়ার মধ্যে যার পরিচয় ও জানে না, সেও হয়তো জানে না, একেবারে অচেনা, অথচ দিনের সঙ্গে রাত্রির সম্পর্কের মত যার সঙ্গে সম্বন্ধ একান্ত নির্ভরশীল, আপেক্ষিক, অচ্ছেদ্য যেন,—সেই অপরিচিতা, অপরিচিত ওর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতায় কেমন নিশ্চিন্ত, তৃপ্ত।

ওর মন পরম করুণায় ভরে যায়। অনুর পিঠে হাত রাখে।

পাতলা ঘুম-চোখে অনু আবার বলে, কখন এলে?

যেন রোজই একভাবে কেটেছে, একটুও ফাঁক পড়েনি, যতি ছিল না, ব্যতিক্রম হয়নি। স্বামীর মনের পরিচয়ও সে জানে না যে, তাও বোঝে না যেন।

সকরুণ আদরে অসিত তাকে বলে, ঘুমোও।

আজ আর তার অনুর ওপর বিরাগ হয় না, বিতৃষ্ণা আসে না, এমন-কি ওর বিপর্যয় আচারের কথাও মনে থাকে না।

নিছক দয়াতে ওর মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার মনের উদ্বেলিত করুণাসাগরের তরঙ্গের মাঝে কোন কিছুই, কাউকেই স্পষ্ট করে দেখা যায় না—অনুকেও না, নিরুকেও না। ও যেন সেই 'ঘরে বাইরে'র ভাঙা আরশি।

কি জানি কেন, অসিতের গোপন অজানা মন কেবলই বলে, আহা!

সে যেন আজ জানতে পারলে, ওই অনু তার দয়িতা নয়, প্রিয়া নয়, ও দয়ার পাত্রী।

আর আস্তে আস্তে সেই 'আহা'টা মস্ত হয়ে, বিরাট হয়ে ওর সমস্ত মনের মোহ, প্রেম, আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসা সব ঘিরে ঢেকে ফেলল।

ওর বাহুর মূলে মাথা রেখে নিরুদ্বেগ ঘুমে আচ্ছন্ন অনু। অসিত নির্লিপ্ত উদাসভাবে শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবে।

অপরিসীম শ্রদ্ধা, আনম্র প্রেম, দুর্বার মোহ, কোনকিছুই ওর নেই,—ও জানতে পেরেছে।

ছোটগল্প, পৌষ ১৩৪০

বোর

'বোর' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ কি জানবার জন্য ওরা কেউ মাথা ঘামায়নি। কিন্তু প্রতিপদ না থাক 'বোর' যে আছে তা নিয়ে ওদের হাসাহাসি আর আলোচনার কোন ব্যাঘাত হয়নি।

আসলে যতীন ছিল ওদের কাছে 'বোর'। তার জনান্তিকে এতে কারুর মতভেদ ছিল না। কিন্তু যতীন নাহলে চলে না। যত কষ্টসাধ্য যত অসুবিধা-জনক কাজ সবই যতীনকে দিয়ে করানো যেত—তা বৃষ্টির সময় কেটলি ভরে চা আর সিঙ্গাড়া কচুরি বেগুনি মুড়িই হোক—আর সিনেমার সস্তা টিকিটই হোক—আর কারুর বিয়েতে স্টেশন থেকে রাত্রি এগারটার সময় অথবা ভোর পাঁচটায় পিসিমা জাতীয় কোন একটি সামাজিক 'বোর'কে আনবার দরকারই হোক। নিজেকে অসুবিধায় ফেলার মধ্যে যে একটা বীরত্ব আছে, আর সকলের কাজে লাগায় 'বাহবা' পাওয়ার যে মোহ আছে, এই দুটো যেন যতীনকে পেয়ে বসেছিল।

পড়াশোনায় সে মাঝারি। দেখতে শুনতেও মাঝারি, বড়লোকের ছেলেও নয়, বাড়িতেও চমক নেই কিছু, নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থ ঘরেরই ছেলে। কলেজের দলে কিন্তু ঐ গুণে সে বেশ চেনা হয়ে গিয়েছিল।

সুনীল ছিল দলের মধ্যে ভালছেলে। সারা বছর হেসেখেলে কাটিয়ে শেষ তিন মাস পড়ে পাস করে এবং ভাল করেই পাস করে। সুধীর মন্দ নয় কিন্তু বড়লোকের ছেলে, তার পড়া খেলাধূলা সবই পল্লবগ্রাহী সখের। অমূল্য ছিল সৌখিন কবি। যদিও তার কবিতা কদাচ কখনো কলেজের মাসিকে বেরিয়েছে, তবু বই-পড়া আর জমিয়ে গল্প করাটাই তার ভালো লাগত। আরো অনেক ছিল—নিরুপম, নলিন, অশেষ, প্রমোদ—যারা বক্তা নয় শ্রোতা, নেতা নয় দলের মাথা বলে ধরে নেওয়া যায়।

যতীন ছিল এদের সকলেরই ভক্ত, আসলে দলেরই ভক্ত। অতি সাদাসিদে সহজ সরল মন। বিচার-বিশ্লেষণের ধার ধারে না। কাজ করতে হলে করে দেয় এবং খুশী হয়। রাগ করে না, বিরক্ত হয় না। শুধু যে কাজ করেছে সেটা কি করে করছে, কেমন ভাল করে করেছে এইটুকুই সে বলতে ভালবাসত। ক্রমে কথা কইতে গেলেই সে নিজের-করা পৌরাণিক, আধুনিক, দুঃসাধ্য, অসাধ্য কাজ করা আর তা করতে পারার ফিরিস্তি দিতে বসত।

বন্ধুমণ্ডলী সব সয়ে নিত, ভাবত, আর বলত, যে অত করে একটু বলে থাকে, তা বলুক। একঘেয়ে আত্মকথায় তারপরে বিরক্ত হত, অবশেষে একদিন কে একটু হেসে তাকে 'বোর' বলে। সেই অবধি তার আড়ালে তার নাম যতীন রইল না।

এমন কি বন্ধুদের বোন ভাগনী ভাইঝিরাও শুনলে, রবীন্দ্রনাথের 'গোরায়' দুটি 'বোর' আছে: একটি অবিনাশ, একটি পানুবাবু। ওরাও একটি সত্যি সজীব স্পষ্ট 'বোর' দেখেছে, গল্প নয়, সে হচ্ছে যতীন। অবশ্য সে হারানবাবুর পানুবাবুর মতো বিশ্রী নয়, খুব সাদাসিদে সরল 'বোর'।

বোন বা ভাগিনীরা হেসে বলে, এবার যেদিন তোমার কাছে বেড়াতে আসবে, দেখব।

ক্রমে যতীন বন্ধুদের ভগিনী ভাগিনী ভাইঝি সমাজেও পরিচিত হয়। তার অসাধ্য সাধন শোনায় এবং সেইসব বাড়িতে নরম গরম ও চটপটে নানাবিধ তর্কসভার সাহিত্য আলোচনায় সে প্রায় ঘন্টার পর ঘন্টা চুপ করেই বসে থাকে নির্বাক নিরীহ মূর্তির মত। এমন সময় হঠাৎ একজন পানীয় বা খাবারের কথা তোলে, আর একজন চোখ টিপে ইঙ্গিত করে, আর অন্য একজন বলে, ভাই যতীন, একটু চায়ের যোগাড় কর না। যতীন ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে। তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই দেখ, সে না হলে ওদের চলেই না! কদাচ কোনো সময় হয়ত বাড়ির ছেলেরা বলে, 'থাক্ থাক্, বাড়িতে বলে দিচ্ছি।' ভিতরে গিয়ে বোনকে বা ভাগ্নীকে বলা হয়, তারাও করে দেয়। কিন্তু তারাও একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে, আজ বুঝি তোমাদের সেই যতীনবাবু নেই।

জনান্তিকে প্রাপ্ত অজানা এই খেতাব নিয়ে ফার্স্ট ইয়ার কেটে গেল, যতীন জানতেও পারল না।

বর্ষাকাল। বিশ্রী বাদল নেবেছে। সাবধানী পরিচ্ছন্ন অকর্মা বন্ধুর দল সুধীরের বাড়িতে ভিড় জমিয়েছে।

কিন্তু যতীন আসেনি।

অমূল্য বললে, 'ভাই খালিপেটে আর গল্প জমছে না, একটু চা পেলে হত!'

সুধীর বললে, 'মা গেছেন মাসীমার বাড়ি। সকলের রাত্রে নেমন্তন্ন। দেখি মীরা আছে কিনা।' সুধীর ফিরে এলো। 'হ্যাঁ মীরা আছে, কিন্তু উনুন জ্বলেনি এবং চাকররা সুযোগ বুঝে বেড়াতে গেছে। আর কেরোসিন নেই, স্টোভ জ্বলবে না।'

সুধীর বললে, 'এসো, খানিকটা তাসখেলা যাক। গল্প আর জমছে না।'

খেলা জমে এসেছে। অকস্মাৎ বিবর্ণ ছাতা আর পরিচিত সরল হাসি নিয়ে যতীন এসে দাঁড়াল।

'আরে আরে—এই এতক্ষণ তোমাকে ভাবছিলাম সকলে মিলে।' 'তুমি না থাকলে যে কি বিপদে পড়তে হয়!' 'আমাদের সঙ্কটে মধুসূদন তুমি।' এক একজন এক এক কথা বলে উঠল।

যতীন সমবেত অভ্যর্থনার সম্বর্ধনায় হকচকিয়ে উঠলো। তারপরেই বোঝা গেল আসল কথাটা।

সুধীর একটু অপ্রস্তুতভাবে বললে, 'তুমি তো প্রায় ভিজেই গিয়েছ।'

অমূল্য বললে, 'হ্যাঁ ভাই, নাহলে আমরা নিশ্চয় যেতাম।'

সুনীল বললে, 'শুধু চা-তে চলবে না ভাই, আর কিছু আনাও।'

যতীন একটু দ্বিধাভরে বাইরে রাস্তায় গোড়ালি-ডোবা জলের দিকে ধূসর আকাশের অবিশ্রান্ত বর্ষণের দিকে চাইল। তারপর বললে, 'তোমাদের তো ওয়াটারপ্রুফ আর ছাতি রয়েছে, একজন কেউ এসো না। নইলে বিষ্টিতে ছাতাসুদ্ধ খাবার চা আনা শক্ত।'

সুধীর বললে, 'ভাই, ও পরে গেলেও ভিজে যাব।'

সুনীল বললে, 'তুমি তো ভাই ভিজে গেছই, আর কাদাও লেগেছে কাপড়ে।'

সকলে সমবেত হয়ে দাঁড়িয়ে—সে যে মুখে এসেছিল সেই মুখেই—তাকে টাকা, খাবার বাঁধবার জন্য তোয়ালে, আর একটা দেড়সেরী চায়ের কেত্‌লি হাতে দিয়ে রাস্তায় এগিয়ে দিয়ে এলো। পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট করে ঘড়ির কাঁটায় আধঘণ্টা কেটে গেল।

হঠাৎ মীরা পর্দা তুলে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হল দাদা, তোমাদের চায়ের কিছু ব্যবস্থা হল? চাকররা এসেছে দেখলাম, চা করতে বলব?'

সুধীর হেসে বললে, 'নারে আর দরকার নেই আমাদের, "বোর" এসে পড়েছে।' বন্ধুরা হেসে উঠল। মীরার বলার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যদের পিছন ও পাশ ফেরা মুখ—দরজার সামনে সিক্ত যতীন এসে দাঁড়িয়ে ছিল। মীরার মুখ হাসতে গিয়েও হাসল না, অপ্রস্তুত হয়ে পর্দার ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে সুধীর আর বন্ধুরা ফিরে চাইল। সকলের হাসি থমকে গেল।

যতীন বারান্দায় ছাতাটা নাবিয়ে ঘরে এসে কেত্‌লীটা রাখল টেবিলের উপর। তারপর মুখ নীচু করে ঝাড়নবাঁধা চেঙারীটা খুলতে লাগল।

অপ্রস্তুত বন্ধুরা অমায়িকভাবে অনেক রকম কথা বলতে লাগল। 'যতীন না হলে আড্ডা দিয়ে সুখ নেই।' 'খুব শীগ্‌গীর এলে তো।' 'আঃ, খুব ভিজে গেছ ভাই।' 'ছেড়ে ফেল কাপড়টা, একটা কাপড় এনে দিই।'

সুধীর ভিতর থেকে ধুতি আর পেয়ালা আনতে গেল। আর একসঙ্গে মনে মনে সকলেই ভাবছিল, নিশ্চয়ই বৃষ্টির শব্দে শুনতে পায়নি।

নতমুখ যতীন খাবার খুলে দিল। সুধীর পেয়ালা আর ধুতি নিয়ে ফিরল। যতীনই চা ঢালতে লাগল। সুধীর বললে, 'তুই কাপড়টা বদলে নে, আমি চা ঢালি।'

এতক্ষণে যতীন কথা কইলে। সহজ মুখেই বললে, 'না, কাপড় আর ছাড়ব না, বাড়ি গিয়েই ছাড়ব।'

সকলে বাঁচল মনে মনে। ভাবল, 'নাঃ, শুনতে পায়নি তাহলে।' আর কখনো ওকথা বলা হবে না।

আশ্বস্তভাবে সকলেই ঘোর রবে প্রতিবাদ করল; 'না, না, ছেড়ে ফেল হে। একেবারে ভিজে গেছ।'

যতীন এক কাপ চা মুখের কাছে তুলে নিল। আজ আর তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল না, বা বললে না যে কি কষ্ট করে গরম চা আনতে হয়েছে।

'কই তুমি কিছু নিলে না? শুধু চা খাচ্ছ?'

'এই যে নিচ্ছি!' কি একটা তুলে নিল যতীন।

বন্ধুরা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল বোধহয়, 'তুমিই' বলতে লাগল।

'একটা কেন নিলে? আরও নাও?'

যতীন ভিজে কোঁচাটা পকেটস্থ করে, 'আর খাব না ভাই, এখুনি বাড়ি যেতে হবে, দরকার আছে' বলে বারান্দায় বেরিয়ে ছাতিটার জল ঝাড়তে লাগল।

'এখুনি যাবে? এই তো এলে?' সুধীর জিজ্ঞাসা করলে।

'হ্যাঁ ভাই, কাজ আছে।'

সুনীল রসিকতা করে বলতে গেল, 'ঠিক যেন আমাদের খাওয়াবার জন্যেই এসেছিলে।' ততক্ষণ যতীন রাস্তায় বেরিয়ে গেছে।

পূজার ছুটি এসে পড়ল। তারপর পরীক্ষার প্রস্তুতি। যতীন আসে যায়। অপ্রস্তুত দ্বিধাগ্রস্ত মন বন্ধুরা সতর্ক হয়ে গেছে। তাদের কেবলি মনে হয় যেন যতীনের কি বদল হয়েছে।

যতীনরা বাসা বদল করল।

'সেকি? কোন্‌খানে বাসা নিচ্ছ?' বন্ধুরা অবাক হয়।

'উল্টোডাঙায়।'

'কলেজ যে অনেক দূর হবে,' তারা বললে।

'দেখি—', যতীন আর নিজের কৃতিত্বের কাহিনী বলে না। আগে হলে বাড়ি খুঁজে পাওয়ার একটা বিশদ বর্ণনা শুনতে পেত বন্ধুরা।

একদিন নলিন বললে, 'ওহে আমাদের "বোর" যে পড়া ছেড়ে দিলে। চাকরি করছে।'

বন্ধুরা বললে, 'সত্যি? কোথায়?'

'কর্পোরেশনের ইস্কুলে।' আর যতীন আসতে সময় পায় না।

আস্তে আস্তে 'বোর'কে আর তার কাজ করাকেও বন্ধুরা বোধহয় ভুলে গেল। শুধু মাঝে মাঝে কখনো কখনো কারুর মনে পড়ে যায় বৃষ্টির দিনের ঘটনাটা। এবং মনে হয় বোধহয় শুনতে পেয়েছিল! সঙ্গে সঙ্গে ভাবে, নাঃ, হয়ত পায়নি।'

কয়েক বছর কেটেছে। কোন বন্ধুর না আত্মীয়ের অসুখ, সুধীর কারমাইকেল হাসপাতালে তাঁকে দেখতে এসেছে।

ঘর আর বিছানার নম্বর দেখতে দেখতে রোগীর বিছানার পাশে পৌঁছল সুধীর।

প্রায় কুড়ি পঁচিশটি বিছানা। আর তার পাশে টুল চৌকি, দেখতে আসা লোকের জন্য। লোকও ঘরে গিস্‌গিস্‌ করছে। আগন্তুকদের নিজেদের লোকদের সঙ্গে অন্য বিছানাবাসী ও অভ্যাগতদের দিকেও বারবার চোখ পড়ে, কান যায়।

সুধীরের আত্মীয়টির পাশের দুটি বিছানার পরে একটি ভদ্রলোকের বিছানা। তার মুখে চোখ অবধি নামানো ব্যাণ্ডেজ, হাত পায়েও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বিছানার পাশ খালি তার। কেউ দেখতে আসেনি তাকে।

কৌতূহলী লোকেরা তাকে দেখছিল মাঝে মাঝে। যেন মনে কচ্ছে—কি জন্য এত ব্যাণ্ডেজ আর দেখতেই বা কেউ আসেনি কেন? হঠাৎ দুর্ঘটনা? বাড়ির লোক খবর জানে না? বিদেশী? কেউ আছে না নেই? কি দুর্ঘটনা?

কেউ চুপি চুপি প্রশ্ন করে পাশের বিছানাবাসীকে।

সুধীরও করল।

শোনা গেল, 'হ্যাঁ, উনি কাল রাত্রে এসেছেন। উল্টোডাঙায় ওর বাড়ি, কাল কোন্‌ বস্তিতে আগুন লাগে, সেখানে কাদের ছেলেমেয়েদের বের করে আনতে গিয়ে খুব পুড়েছে। মাথার চুল পুড়েছে খানিকটা, চোখ-মুখ খুব ঝলসেছে। হাত দুটো পুড়েছে। কি নাম বললে, যতীন দত্ত বুঝি।'

'যতীন দত্ত? যতীন? উল্টোডাঙায় বাড়ি?' ওদের যতীনও তো বাসা বদলে

উল্টোডাঙায় ছিল। সুধীর চুপ করে সেই দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললে, 'কথা কইতে পারছে?'

আত্মীয় বললে, 'তা ঠিক জানি না, অমনিভাবেই তো রয়েছে। তবে ডাক্তার আর নার্স এসে কথা কয় মনে হয়।'

কি মনে করে সুধীর উঠল। দুটি বিছানার পর তার বিছানার পাশে সে দাঁড়াল। না, তাকে দেখতে কেউ আসেনি।

চোখ-ভ্রূ সব বাঁধা, বাকী মুখটা ঝলসানো লাল। ঠোঁট আর চিবুকের গড়নটা যতীনের মতনই যেন। সে পাশের টুলটাতে বসল।

কি জিজ্ঞাসা করবে? জ্ঞান আছে কি? বলবে কি—সে সুধীর , তুমি কি যতীন?

রোগীও যেন বুঝতে পারল, কে এসে বসল। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

সুধীর মাথাটা নিচু করে তার কানের পাশে মুখ নিয়ে বললে, 'তুমি কি যতীন—আমি সুধীর, সুধীর বোস।'

রোগী একটু নড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু তার সর্বাঙ্গ যেন ভারি হয়ে আছে। আস্তে আস্তে সে বললে, 'আমি যতীন, তুমি কি করে খবর পেলে?'

যতীন একটু চুপ করে রইল, তারপর বললে, 'এখানে কেউ নেই। আমার স্ত্রী আর বোন দেশে আছে। আমি মেসে ছিলাম।'

সুধীর একটু ভাবলে, তারপর বললে, 'তাঁদের খবর দেবে? আমি দোব? তুমি কি খুব পুড়ে গেছ? কি করে পুড়লে?'

যতীনের উত্তর দেবার দরকার হল না। তাদের পাশে এসে একজন দাঁড়ালেন ময়লা কাপড় পড়া গৃহস্থ ভদ্রলোক।

তিনি বললেন, 'কাল রাত্রে আমাদের পাড়ায় এক বস্তিতে আগুন লাগে...উনি তাদের ছেলেমেয়েকে ঘর থেকে আনতে গিয়ে বেশ পুড়ে ঝলসে গেছেন। আপনি চেনেন নাকি ওঁকে? খুব পরোপকারী লোক।'

সুধীর বললে, 'আমরা একসঙ্গে পড়তাম। তা ওর বাড়িতে খবর দেওয়া যায় কি করে?' তিনি বললেন, 'আমি তো ওঁর ঠিকানা জানি না। আমি পাড়ার লোক, ওঁকে চেনা ছিল, কাল তাই হাসপাতালে দিয়ে গিয়েছিলাম।'

এইবার যতীন আস্তে আস্তে বললে, 'ভাল হয়ে দেবো....শুধু শুধু তারা ভাববে খবর পেলে।'

সুধীর চুপ করে রইল। পাশের লোকটিও কিছু বললেন না।

সুধীর বাড়ি ফিরলো। তার বেশি মনে হতে লাগল যতীনের সব কাজ করা, করতে চেষ্টা করা আর তাদের হাসাহাসি করা, বিরক্ত হওয়া, 'বোর' বলা। আর মনে করতে চায় তার ভাল করার জন্য তো ওরা 'বোর' বলত না। বলত বড় একঘেয়ে এক কথা বারবার বলত তাই।

তবু অস্বস্তির ভার নড়ে না, হালকা হয় না। তার মনে হয় যতীনের ঝলসানো মুখের অবশিষ্ট অংশটুকু আগেকার সঙ্গে মিলে না। শান্ত গম্ভীর না, গভীর একটা ভাব। যেন কোথায় দূরে সে চলে গেছে। পীড়িত বলে কি? না সত্যই সরে গেছে?

তার পরদিন বিকাল এলো। সুধীরের আজ যাবার দরকার ছিল না। কিন্তু তবু সে হাসপাতালের উদ্দেশেই বেরিয়ে পড়ে।

কর্তব্যানুসারে আগে আত্মীয়টিকে দেখেশুনে তারপর যতীনের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আত্মীয়টি বললেন, 'ওঁর খুব কষ্ট গেছে, ডাক্তার এসেছিলেন, খুব জ্বর নাকি।'

সুধীর জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন আছ ভাই?'

সে বললে, 'ভালো।'

'কাল বড় কষ্ট গেছে?'

যতীন বললে, 'একটু।'

সুধীর চুপ করে ভাবে। আর কি বলবে? কি জিজ্ঞাসা করবে? ভাল হয়ে যাবে তো! যদি ভাল না হয়! জ্বর হয়েছে...যদি জ্বর বাঁকা পথ নেয়? ওর বাড়িতে খবর দেওয়া উচিত।

রোগীর চোখ কপাল অবধি বাঁধা, হাত দুখানিও বাঁধা, কপালে হাত দিয়ে হাত দুখানি হাতে করে বয়ে মমতা প্রকাশ স্নেহ সমবেদনা জানাবার কোনো উপায় নেই। চেয়েও দেখতে পাচ্ছে না।

অকস্মাৎ একটা দুর্দমনীয় ব্যাকুলতা জাগে, মনে হয় জিজ্ঞাসা করে, ভাই আমাদের তোমাকে 'বোর' বলা কি তুমি ভাবতে পেরেছিলে, শুনতে পেয়েছিলে সেদিন? যেন ক্ষমা চেয়ে নিতে ইচ্ছা করে।

ছটা বাজতে পাঁচ মিনিট, ভিড় বেরিয়ে যাচ্ছে।

সুধীর জিজ্ঞাসা করলে, 'ভাই, বাড়িতে খবর দিই? তোমার ঠিকানাটি কি?'

অস্পষ্টস্বরে যতীন বললে, 'বাড়িতে? আজ থাক, কাল নিও।'

কাঠের মত আড়ষ্ট হয়ে নির্বাক সুধীর বসে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, স্পর্শের অনধিগম্যতা অতিক্রম করার কোনো উপায়ও নেই। দু-মিনিট আর সময় আছে। এত বলা যায় তা সুধীর জানত না। কিন্তু কিছুই বলা গেল না, কাল বলবে। মাপ চেয়ে নেবে ঠিকানা নেবার সময়। কিন্তু হয়ত সে শুনতে পায়নি, জানে না এও তো হতে পারে...আবার মনে হয়।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল, সকলে বেরিয়ে যেতে লাগল।

সুধীর বললে, 'কাল আসব ভাই।'

যতীনের ঠোঁটটা একটু নড়ল মাত্র। জ্বরে সে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। বন্ধুরাও শুনতে পেল।

যতীনের অনভিজ্ঞতা সরলতা বা নির্বুদ্ধিতা, নিরভিমানিতা, একঘেয়েমি ইত্যাদি সব আজ তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তাকে চতুর তৎপরতাকে যেন অপ্রস্তুত করে দিল।

কেউ বললে, 'একদিন দেখতে যাব। নম্বরটা কত? কেউ কুণ্ঠিতভাবে বললে, 'ছেলেটি সত্যি খাসা ছিল, কিন্তু, আজ তো হবে না, কাল যাব, তুমি যাবে তো, সেই একসঙ্গেই যাব।'

বিকাল চারটে বাজবার আগেই বেরিয়ে পড়ে সুধীর। মনে হয় ঠিকানাটা নিয়ে আসি ওর বাড়ির, খবর দিতে হবে!

সুধীরের হাতঘড়িতে চারটা বাজল। হাসপাতালে তখনো বেশী লোক আসেনি। আজ আর আত্মীয়টির বিছানার কাছে গেল না।

যতীনের বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আজ চোখের বাঁধা খোলা। বন্ধ চোখ,

অসাড় অনড় ভারী দেহে নিস্তব্ধ শান্ত মুখে যতীন শুয়ে আছে। মনে হচ্ছে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কালকের কষ্টের আভাসমাত্র মুখে নেই।

'ঘুমচ্ছো?' বলে ডাকতে পারল না। এদিকে ওদিকে চাইল। টেম্পারেচারের লেখাটা দেখতে লাগল। জ্বর খুব।

পাশের বিছানার রোগী বললেন, 'উনি কাল থেকেই অমনিভাবে রয়েছেন। ডাক্তার কবার এসে দেখে গেছে।'

'ঘুমুচ্ছেন, না? আমার একটু দরকার ছিল।'

এবারে আত্মীয়টি উঠে বসেছিলেন। তিনি বললেন, 'না, কাল থেকে একইভাবে রয়েছে।'

'একবার ডেকে দেখি।' সুধীর বিছানার পাশে এগিয়ে যায়। কানের কাছে মুখ দিয়ে ডাকে, 'যতীন, ভাই, তোমার বাড়ির ঠিকানা যে আজ দেবে বলেছিলে।'

বোঁজা চোখের পাতা কি একটু নড়ল? ঠোঁট নড়ল?

আবার তাকে ডাকে নাম ধরে শুধু, 'যতীন। যতীন ভাই।'

অনেকক্ষণ পরে আবার বললে, 'ভাই, ঠিকানাটা বলবে একটু।'

ঘরে ভিড় হয়েছে এতক্ষণে। আশপাশের বিছানাবাসীদের স্বজন অভ্যাগতরা সব এসেছে। তারাও একটু করে দাঁড়িয়ে যায়।

যতীন নিঃসাড়ে শুয়ে থাকে।

সুধীরের গলার কাছে যেন কি জমে ওঠে, আর ডাকতে পারে না, একমনে যতীনের স্থির শান্ত, যেন সমাহিত মুখের দিকে চেয়ে থাকে। যদি চোখ খোলে বা ঠোঁট নড়ে একবার, ঠিকানাটা চেয়ে নেবে। আর বলবে কি, নিজেদের 'বোর' বলার কথা? খুব আস্তে একবারটি শুধু!

হঠাৎ ঘন্টা বেজে ওঠে। সাক্ষাৎকারীর দল বেরিয়ে যেতে থাকে। একজন নার্স এসে দাঁড়াল যতীনের খাটের পাশে।

সুধীর জিজ্ঞাসা করলে, 'কেমন আছেন?'

সে বললে, 'ভাল নয়। আপনি ওঁর কেউ হন?'

সুধীর বললে, 'না।'

দলে দলে জনতা বেরিয়ে যেতে থাকে। সুধীর দেখলে, সেও কখন রাস্তায় এসে পড়েছে।

গল্পভারতী, ১৩৫৫

তিমিরসম্ভবা

বি. টি. কলেজ। অনেকগুলি ছাত্র-ছাত্রী বয়স্ক শিক্ষক শিক্ষিকাও ভর্তি হবার জন্য একদলে সমবেত হয়েছেন। একটি মেয়ে বোধহয় কিছু দেরীতে এসেছিল, একেবারে সব শেষে পিছনে দাঁড়িয়েছিল। সেইজন্যেই বোধহয় অনেকেরই চোখ পড়ছিল তার দিকে। তাদের মনে হল একেবারে অচেনা মেয়ে। যেন মফঃস্বলের কলেজের পাস করা মেয়ে।

চেহারা ভালো। বেশ একটু লম্বা। চোখদুটি খুব কালো। মুখটা কলকাতার কলেজের মেয়েদের মত চটপটে হাসিখুসী ভাবের নয়। যেন একটু অন্যরকমের গভীর ধরনের। মাথার চুলগুলিও আঁটসাঁট করে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বাঁধা নয় এখনকার মত।

ছাত্র-ছাত্রীর দল একে একে ফর্ম নিয়ে ভর্তি হয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। সে এগিয়ে এলো।

এবার চোখে পড়ল তার কাপড় পরার ধরনটাও এখনকার মত নয়। একেবারে সোজাসুজি ঘরোয়াভাবের কাপড় পরা।

পাতলা ঠোঁট দুখানা টেপা। কি ভাবছে যেন।

মাত্র জন তিনেক বাকি, তারা ছেলে। তাকে এগিয়ে যেতে দিল তারা।

সে এগিয়ে গেল, একখানা চিঠি দিলে যিনি ভর্তি করছেন তাঁর হাতে।

তিনি চিঠিটা পড়লেন, তারপর তার দিকে চেয়ে তাকে আপাদমস্তক দেখলেন।

অতঃপর সে ফরম ভরে ভর্তি হয়ে টাকা জমা দিয়ে বেরিয়ে এলো। চোখের উঁকিতে তার পাশের ছেলেটি তার নামটা সইয়ের সময়ে দেখে নিল। এ. মণিকা দাস।

কলেজ খুলে গেছে। কমবয়সী ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন হয়, পড়াশোনাও করে জটলাও করে। চেনা অচেনা নানাবিধ বন্ধুও জুটে গেছে সকলেরই কদিনেই।

এবং আলোচনাও চলে প্রফেসারদের নিয়ে, পড়ানোর ধরন নিয়ে, নোট নেওয়া নিয়ে। যথারুচি মন্তব্যও করে ছেলেমেয়েরা।

শুধু মণিকা দাসকে সে-দলে ভিড়তে দেখা যায় না।

সে একেবারে ঠিক সময়ে এসে ক্লাসে ঢুকে পড়ে। আর ক্লাস হয়ে গেলে সোজা বেরিয়ে যায়।

কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে এক মিনিট দাঁড়ায়। একটু হেসে কথার জবাব দিয়ে বেরিয়ে যায়। যেন ধরা-ছোঁয়া যায় না। ভাবও করে না কারুর সঙ্গে।

'কোথায় থাকে?' 'হস্টেলে তো থাকে না'? 'কাপড়ও দেখ ভাই', 'ঠিক ঐ একই রকম ধরনেই পরে আসে।'

'আবার জানিস, শীকর গুপ্ত বলছিল ওর নামে নাকি একটি 'এ' আছে। এ. মণিকা দাস নামটি।'

'ও আবার কি রকমের ভাই?' 'কি নাম ভাই?' জনান্তিকে নানা জল্পনা করে মেয়েরা সে না থাকলে।

সীতা গুপ্ত বলে, 'দেশী খৃষ্টান, জানিস্। আমি তো ওদের স্কুলে পড়েছি, ঐরকম ধরনের কাপড়ই ওঁরা পরেন, সব মিস্‌রা!'

কিন্তু অন্তঃশীলা কৌতূহল বেড়েই চলে। এখন তো আর সেকাল নেই যে গ্রামের লোকদের মত 'তোমরা—আপনারা?' বলে চট করে জাতকুল জিজ্ঞাসা করে নেবে লোকে। সে ধরনের প্রশ্নের কথা এখনকার সহরের মানুষ কল্পনাও করতে পারবেন না।

শিপ্রা চৌধুরী বলে, 'আশ্চর্য, দেখেছিস একমনে নোট নেয়, কারুকে কিছু জিজ্ঞেসও করে না। প্রফেসারদেরও না। খুব চাপা মেয়ে কিন্তু।'

সহসাই একদিন অন্যান্য স্কুল দেখা পরিদর্শনের নির্দেশ আসে প্রথামত।

কেউ যাবে ভবানীপুরের দিকে। কেউ কেউ শ্যামবাজারের দিকে নানা নামের নানা স্কুলে। আবার নার্সারি স্কুলও দেখতে যেতে হয়।

ট্রেনিং তো পুরো নিতে হবে!

মেয়েরা যায় মেয়েদের স্কুলে। ছেলেদের স্কুলে ছেলেরা যায়। ফেরবার সময় হয়ত একদল ট্রামে বাসে উঠে পড়ে। তারপর নেবে যায় নিজের নিজের সম্ভাব্য পথের মোড়ে।

সেদিন মণিকাও দলে রয়েছে, যেতে হবে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের কোনো স্কুলে।

এ পথটায় খানিকটা হাঁটাপথ পড়ে।

সব দলেই চলে তিনচারজন মেয়ে।

শিপ্রা চৌধুরী বলে, 'মিস দাস, আপনার কেমন নোট নেওয়া হল? আমার তো কিছু তৈরি হয়নি। এমন হৈ হুল্লোড় করে সবাই ক্লাসের পর, যে অর্ধেক সময় গুছিয়ে মনে রাখতেই পারি না। আপনি যে রকম সিরিয়াস, আপনি ফার্স্ট ক্লাস তো পাবেনই, হয়ত ফার্স্ট সেকেণ্ডই হয়ে যাবেন।'

সীতা বল্লে, 'হ্যাঁ, আমাদের তাই মনে হয়। আপনি কিন্তু আশ্চর্য খাটিয়ে মেয়ে।'

মণিকা একটু হাসল। বললে, 'খাটিয়ে আর কি। তবে রোজকার রোজ পড়াটা আর নোটগুলো ঠিক করে নিতে পারলে পরে আর খাটুনি হবে না—এটা খুব সত্যি। আমাদের স্কুল কলেজের টিচাররাও তাই করতে বলতেন।'

রেবা সেন বললে, 'তাই করতে পারলে তো ভালই হয়। পারি কই। কলেজে একরকম হৈ-হৈ। বাড়িতে আর একরকম। হয় কাজ, না হয় কোথায় না কোথাও যাওয়া। নানা ঝামেলা। আপনার বোধহয় ওসব বালাই নেই? কোথায় আছেন?' খুব মনে কৌতূহল! যদি মণিকা আত্ম-পরিচয় দিয়ে দেয় এবারে।

মণিকা একটু হাসল আবার। বললে, 'আমি এক বন্ধুর বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে রয়েছি। তারও অফিসের কাজ; আর আমারও সময় নেই। কাজেই সময় কেটে যায়।' কথা বাড়ল না। গন্তব্য স্কুল এসে পড়ল।

পরীক্ষা এগিয়ে আসছে, পরিদর্শনও চলেছে। ছেলেমেয়েরা সব খুবই ব্যস্ত, কি করে কে কি ভাবে তৈরী হবে।

নভেম্বরের শেষ। সহসা সেদিন বৃষ্টি নামল। কে জানে যে বৃষ্টি হবে! সকালে একটু কুয়াসার ভাব মনে হচ্ছিল আকাশে—সেটা যে কখন মেঘ হয়ে উঠবে আর বৃষ্টি হয়ে নাববে মাথার ওপর, সেকথা আর কে ভেবেছিল।

অন্ততঃ মণিকা তো মোটেই ভাবেনি। তার ধর্মতলার ফ্ল্যাটের ছোট ঘরখানি থেকে আকাশ অরণ্য প্রায় কিছুই দেখা যায় না। শুধু দেখা যায় নিচের পথ আর অজস্র দোকান আর অসংখ্য নানা বেশী নানা দেশী মানুষ আর ফাঁক দিয়ে ওপরে এক ফালি নীল আকাশ দেখা যায়।

তা সেও তার দেখবার সময় নেই, পড়াশোনা, রান্না খাওয়া—কাজের অবসরে যদি হঠাৎ চোখে পড়ে তো পড়ল।

ট্রাম থেকে নামবার আগেই বৃষ্টি নামল অজস্র ধারায়। ছাতা আনেনি। মনে ছিল না। কিন্তু নামতে তো হবেই। সেও নামল বৃষ্টির সঙ্গে।

সহসা কে এসে পাশে দাঁড়িয়ে বললে, 'আসুন ছাতাটার নিচে।' মণিকা চাইল। শীকর গুপ্ত ছাতা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। বললে, 'ভিজে যাবেন, চলে আসুন ঐ গাছটার তলায় একটু দাঁড়াই। একটু বৃষ্টি ধরলে কলেজে ঢুকব।'

ছাতার ওপর তড়তড় শব্দে বৃষ্টি পড়ছে। পায়ের তলায় জলস্রোত। পথে মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে চলেছে।

মণিকা অস্বস্তিভরে ছাতাটার তলায় দাঁড়াল। চলতে চেষ্টা করল, শীকর বললে, 'এখন যাওয়া যাবে না। আপনি ভিজে যাবেন বেশী। আমি ভিজলেও অসুবিধে নেই।' আপনার শাড়ী জলে কাদায় একাকার হয়ে যাবে, আমরা তো ধুতি গুটিয়ে চলতে পারব। তাছাড়া বই খাতাগুলোও ভিজে যাবে। আর ছাতার তলায় দুটি মানুষ চলতে পারা যাবে না।' একটু হাসল। বললে, 'আপনিই পারবেন না।'

এবারে মণিকাও হাসল। বললে, 'হ্যাঁ, একটু দাঁড়ানোই ভালো।' শীকরের মনে হল কি মিষ্টি হাসিটুকু। এত কাছাকাছি তো কোনোদিন দাঁড়াবার সুযোগ হয়নি। বৃষ্টিটা আরো খানিক হলে যেন বেশ হয়।

কিন্তু বৃষ্টি থামল। ওরা কলেজে ঢুকল।

এবারে পরিচয়টা যেন এগিয়ে এল। মণিকার অত নির্লিপ্ততা সত্ত্বেও ওদের দুজনের পরস্পরের নোট দেখা, বই আদান-প্রদান হয় মাঝে মাঝে।

শীকর যাওয়া ও ফেরার পথে দু'একটা কথা কয়—মণিকাও উত্তর দেয়।

কিন্তু কোন পরিচয় দেওয়া বা নেওয়া হয় না। জিজ্ঞাসাও করে না কেউ কাউকে। মণিকা তো নয়ই।

শীকরের সঙ্কোচ বোধ হয়—ভাবে কি জিজ্ঞাসা করবে?

তবু একদিন সহসাই জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি কোত্থেকে পাস করেছেন?'

মণিকা বললে, 'আমি শ্রীরামপুর কলেজ থেকে পাস করেছি।' এত ছোট্ট সংক্ষিপ্ত জবাব। তারপরেই বই, ছাতা, খাতা গুছিয়ে নিয়ে পথে ট্রাম বা বাসের অপেক্ষায় দাঁড়ায়। যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে।

পরীক্ষা হয়ে গেল। কলেজে জোর গুজব, মণিকার 'পেপার' খুব ভাল হয়েছে। কৌতূহলী ঈর্ষাতুর আনন্দিত নির্লিপ্ত সহপাঠী সতীর্থের দল শেষ দিনে পরস্পরকে নানা প্রশ্ন করে। জিজ্ঞাসা করে কে কেমন লিখেছে। মণিকা বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে প্রশ্ন আর জটলা থেকে। শীকরও নেমে এলো পথে।

জিজ্ঞাসা করল, 'এবার তো ছুটি মিস দাস; এখানেই থাকছেন, না বাড়ি যাচ্ছেন?'

মণিকা চুপ করে দাঁড়াল একটুখানি। তারপর বললে, 'ঠিক বলতে পারছি না। রেজাল্ট বেরুতে তো দু'আড়াই মাস হবে। দেখি কোথায় যাই।'

এবারে সাহস করে শীকর বললে, 'আপনি এখানে কোথায় থাকেন? দেখা হতে পারবে?'

'এখানে এক বন্ধুর কাছে আছি, তার তো মোটে জায়গা নেই। বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া শক্ত।'

শীকর একটু হেসে বললে, 'এতদিন সবাই একসঙ্গে পড়াশোনা করলাম, অনেকের সঙ্গে চেনাশোনা হল। কিন্তু আপনি যেন কারুকেই কোন আমল দিলেন না। আপনার নাম পরিচয়টাও সবাই পুরো জানিনে।'

মণিকা একটু হেসে তার কালো চোখদুটি তুলে তার দিকে একটু চাইল শুধু। কিছু বলল না।

শীকর অপ্রস্তুতভাবে বললে, 'আপনাকে আমার ভারি ভাল লেগেছে। এই চেনা জানা এইখানেই শেষ করে দিতে হচ্ছে, না, আপনার কোনো আপত্তি না থাকলে আপনার ঠিকানাটা আমায় দেবেন, চিঠি দিতে পারব।'

মণিকা ওর আগ্রহে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। বললে, 'এখন তো ও-বাড়িতে থাকছি না। 'রেজাল্ট' বেরুবার সময় আবার দেখা হবে। তখন কোথায় থাকব জানাব।'

বাস এসে পড়ল। মণিকা উঠল। শীকরও উঠল আর একটু ওর সঙ্গ পাবার জন্য। কিন্তু ভিড়ের মাঝে দুজনেই দুদিকে সরে গেল।

জুলাই। পরীক্ষার ফলের জন্য ছাত্রছাত্রীরা উদ্‌গ্রীব, উৎকণ্ঠিত। কে গোপনে পেয়েছে নিজের ও অনেকের খবর। কে নিজের নম্বরও জানতে পেরেছে।

কে জেনেছে মণিকা খুব ভাল স্ট্যাণ্ড করেছে নাকি।

রেবা দত্ত, শিপ্রা চৌধুরীরা অনেকে ভাল করেছে সব—কিন্তু পাকা খবর নয়।

পাশের খবর টাঙানো হয়েছে। দলে দলে ছাত্রছাত্রীরা ভিড় করেছে এসে। কেউ প্রসন্ন, কেউ বিষণ্ণ, কেউ উল্লসিত, কেউ উদাসীন।

মণিকাও এসেছে। ওরা সত্য কথাই বলেছে। মণিকা তৃতীয় স্থান পেয়েছে ফার্স্ট ডিভিশনে।

শীকর দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে।

সতীর্থ দল সকলে ঘিরে দাঁড়াল। মণিকাকে কেউ বলে মিষ্টি খাওয়ান। কেউ বলে মিস দাস, আপনি আমাদের অবাক করে দিয়েছেন। পরস্পর হাসি অভিনন্দনে পাস করার পালা শেষ হল। পরে শীকর এসে দাঁড়াল মণিকার পাশে।

'মিস দাস', দু'চোখে একটি জিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসা মানব-মানবীর চিরকালের একটি কথা।

মণিকাও একটু হেসে বললে, 'আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।' শীকর একটু হাসল। বললে, 'হ্যাঁ, বেরিয়ে আসতে পেরেছি তার জন্যই জানান। চলুন, একটু কোথাও বেড়াতে যাই আজ।' একটু ইতস্তত করে মণিকা বললে 'কোথায় যাবেন। বেলা হয়েছে, বাড়ি যাবেন না?'

'আসুন ঐ দোতলা বাসটার উপরের সামনের সিটে গিয়ে বসি। বোধ হচ্ছে খালি আছে। এইটুকুই "নিরুদ্দেশ যাত্রা" করি আজ। তারপর লেকের ধারে একটু বসেন-তো বসব। নই'লে ওতেই ফিরে আসব।'

'চলুন।'

বাস বাড়িঘরের পথের সীমানা ছাড়াল। ময়দান এসে পড়ল। ওরা ঠিকই বসবার জায়গা পেয়েছে পাশাপাশি। ভিড়ও বাসে নেই। কিন্তু দুজনেই নির্বাক। রৌদ্রময়ী পৃথিবীর শ্যামল আঁচল ময়দানে ছড়ানো রয়েছে। গরু চরতে এসেছে মাঠে। ছোট ছোট শিশুদের ঠেলাগাড়ি নিয়ে আয়ারা তখনো গাছতলায় বসে জটলা করছে। বাড়ি ফেরেনি।

পথ শেষ হয়ে গেল।

দুজনে বিশেষ কথা বলেনি। কি ভাবছিল?

তারা নাবল না। বসেই রইল ফেরত টিকিট কিনে নিয়ে। বাস খালি। ওপরে লোক বেশী ওঠেনি।

আবার ময়দান এলো। শেষ হল। গির্জার ঘড়ি প্রায় বারোটা। এবারে মাঠে চারণরত গরু ছাগল ছাড়া প্রাণী কেউ নেই।

ধর্মতলার মোড় এসে পড়ল।

মণিকা বললে, 'শীকরবাবু, আমি এবার নাবি।'

শীকর কি ভাবছিল, চকিত হয়ে উঠল, 'ও! তা আপনার ঠিকানাটাও তো দিলেন না। কিছু পরিচয়ও তো দিলেন না।'

মণিকা বললে, 'আমি লুধিয়ানায় একটি কাজ পাচ্ছি। সেখানে গিয়ে চিঠি দোব, ঠিকানাও পাবেন। এখানে তো ঠিক কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই। বি. টি-র ফলের জন্য এখানে ওখানে অপেক্ষা করছিলাম।'

সহসা শীকর তার হাত ধরল। 'আপনি আমার মনের কথা কি বুঝতে পারছেন না? আর এম. এ. পড়বেন না? একেবারে দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন?'

মণিকা তার শান্ত, গম্ভীর চোখদু'টি তুলে বললে, 'না না, আর পড়ব না। চাকরিতেই যাব।'

বাস প্রায় খালি। শীকর বললে, 'আসুন ময়দানে নাবি। একটু কোথাও বসি ছায়ায়।'

মণিকার হাত ধরে শীকর বললে, 'আমার আপনাকে ভাল লেগেছে এই কথাটিই আজ জানাবার ছিল। আর পরিচয়টা এখানেই শেষ না হয়ে যাক, এই বলতে চাই।'

মণিকার হাত দু'খানি তার হাতের মধ্যে ঘেমে উঠল। কিছু বলতে পারল না।

দু'জনে নামল।

একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে শীকর বললে, 'একটু বসবেন কোথাও? তাড়া আছে? আজ একটু আপনার নিজের কথা বলুন না?'

মণিকা বললে, 'তাড়া নেই বটে। কিন্তু আর বসব না। আমার পরিচয় ঠিকানা কাল সব চিঠিতে জানাব।'

শীকর বললে 'পরিচয় চাচ্ছি বটে। কিন্তু জাত গোত্র কুল পরিচয়ের চেয়ে কি মানুষ পরিচয়ই আরো বড় পরিচয় নয়?'

মণিকা শান্তভাবে হাসে একটু। শুধু বললে, 'আমি জানি না। বলা শক্ত। মানুষকে কি মানুষ চিনে নিতে জানে? নেয়?'

সামনে ট্রাম এলো। চারদিক রৌদ্রে ঝাঁ ঝাঁ করছে। দুজনেই এগোলো গন্তব্য পথের দিকে। দুজনেরই মনে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা জমে উঠেছে।

পরদিন ডাকে শীকর গুপ্ত হোটেলের ঠিকানায় মণিকার চিঠি পেলো, চিঠির ওপরে কোনো ঠিকানা নেই। লেখা, শীকরবাবু—

আজ ঠিকানা দিলাম। আর পরিচয়ও দিচ্ছি। কালকে সন্ধ্যায় পাঞ্জাব মেলে লুধিয়ানা যাবার ঠিক করেছি। সেইখানকার ঠিকানা দিলাম।

অনেক দূরের ঠিকানা হবে সেটা। হয়ত তাই ভালো। আপনি বলেছিলেন মানুষই কি মানুষের বড় পরিচয় নয়? সেটা আজ আপনি নিজের কাছে যাচাই করে নিতে পারবেন।

কেননা, আমার সত্যিই কোনো পরিচয় নেই। আমি সমাজের অন্ধকার জগতের একটি মেয়ে।

আমার বাবার পরিচয় আমার জানা নেই। মারও না। মা কোনোসময় খুব বিপদে পড়েছিলেন। তখন তাঁর ছোটবেলায় পড়া মিশন স্কুলের কর্ত্রী এক মেমসাহেবের শরণ নিয়েছিলেন।

সে বিপদ আমি।

মেমসাহেব মাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তারপর আমাকে। আমার মার কথা কিছুই মনে নেই। আমার ছোটবেলাতেই তিনি মারা গিয়েছিলেন।

মেমসাহেবই 'গড মাদার' হয়ে আমার নাম দিয়েছিলেন নিজের নামে।

'অ্যান' মণিকা দাস।

এখন মনে হয় ওটা যেন অ্যান এর 'এ' নয়। অন্ধকার কন্যার 'এ' নিয়ে মণিকা দাস হলেই ঠিক হয়। ঐ 'এ' বর্ণটা যেন সেই কথা বলতে চায়।

আপনার অনুক্ত কথা আমার মনের কোণে পৌঁছোয়নি তা নয়।

আমি জীবনে যা পাইনি, পাবার কথা ভাবিনি, আশা করার সাহসও করিনি, নিজের জীবনের কথা জেনে সেই শ্রদ্ধা ভালবাসার লোভ, গৃহহীন জীবনে ঘরের লোভ, সেও তো মানুষের কাছে কম নয়, মেয়েদের কাছে বিশেষ করে।

কিন্তু পরিচয়হীন জীবনের দাম আমি দেখেছি। আমি সেই মোহকে প্রশ্রয় দিইনি। আপনি জানেন তা।

আমার জাত, ধর্ম, কুল, বংশ পরিচয় কিছু জানি না, হিন্দুর মেয়েই ছিলাম বলে মনে হয়।

পুরাণে আছে কণ্বমুনি মা বাপের পরিত্যক্ত শকুন্তলাকে লালন পালন করেছিলেন।

কিন্তু সেটা সাধারণ মানুষের সমাজ নয়। সেটা মুনিঋষি তপস্বীদের সমাজ। শাশ্বত মানবধর্মের সমাজ। তাই শকুন্তলা আশ্রমে লালন পালনের পর নানা সংঘাতের পর গৃহধর্মও পেয়েছিলেন।

আর দুষ্মন্তও ছিলেন রাজা। অর্থাৎ নরপতি, তাই সমাজপতি। আমরা সাধারণ মানুষ সমাজের বুদ্বুদমাত্র—এই আমার পরিচয়।

আমি লুধিয়ানার ঠিকানা দিলাম আপনার অনুরোধ মত।
আপনি হয়ত এ চিঠির জবাব দিতে পারবেন না।
আমি আশা করব না, তবে অপেক্ষা করব। ইতি—
মণিকা দ.

চিঠিখানা ঠিক সময়েই শীকর পেল। পাঞ্জাব মেলের ছাড়ার অনেক আগে। স্টেশনে যাবার সময় ছিল। সময় অনেক আছে। দেখা করা যেতে পারে। কিন্তু শীকর সহসা যেন পাথর হয়ে গেছে।

নিজের আর মণিকার একটা কথাই কানের কাছে গুঞ্জন করতে লাগল। সে বলেছিল খুব বড় কথা: 'মানুষের কাছে মানুষ পরিচয়ই পরিচয় নয় কি?'

আর মণিকা বলেছিল, 'কি জানি।'

সেদিনও সে মণিকার কথার উত্তরে কিছু বলেনি। ভেবেছিল সে নিজে খুব বড় কথা বলেছে। আজ নিজের মনকেও কিছু বলতে পারল না।

অনেকক্ষণ পরে চিঠিখানা আবার দেখল। হ্যাঁ, ঠিকানা রয়েছে, লুধিয়ানা গার্লস্ হাইস্কুলের ঠিকানা। কিন্তু উত্তর দেবার মত কোন কথা শীকরের আছে কি? যার জবাব নিজের মনেও নেই। আর কোথাও মানব সমাজে আছে কিনা তাও জানে না।

হঠাৎ মনে হল, মণিকার সেই কথাগুলি, সেই 'কি জানি'-টা কত বড়! সে কি দেশ কাল মানুষ আকাশ পাতাল আচ্ছন্ন করে আছে? শীকরের সেকথা ভাববার ক্ষমতাও নেই আজ।

মণিকা ভেবেছিল সে আশা করছে না। অপেক্ষাও বুঝি করছে না। কিন্তু আশা না করেও যেমন লোক আশা করে, অপেক্ষা না প্রতীক্ষা করে—অবচেতন মনে মণিকাও করল।

সপ্তাহ শেষ। মাস গেল। ডাকের সময়ও প্রতিদিন চলে যায়। জুলাই, অগস্টের প্রকাণ্ড পাঞ্জাবী দিন ভোর পাঁচটা থেকে পৌনে আটটা অবধি আশায় আশায় হাট মাঠ বাট ভরা দিন, সেদিনও কেটে যায়। যে আলো—জগতের চিরন্তন আলো—কারুর জন্য কমও নয় বেশীও নয়। যে আলো উদাসীন নির্লিপ্ত সকলের পক্ষেই।

অন্ধকারের কন্যার জন্যও যে আলো উদাসীন। সে আলো অন্ধকার কন্যার মনে কিছুই ছাপ দেয় না।

না জানা দেশের ছাত্রীদল, নরনারী, আবহাওয়া, আর নিজের মনের কাছে অযাচিত-ভাবে এসে পড়ে শীকরের ঘনিষ্ঠতার একটা অবসাদময় চাপ নিয়ে। মণিকার দিন কাটে।

মোহে দুরাশায় প্রথম প্রথম ভাবতে ইচ্ছে হয়েছিল শীকরের অবসর নেই। তারপর ভাবে অসুস্থ হয়েছে। হয়ত কোন আকস্মিক বিপদ হয়েছে।

কতরকমের 'হয়ত' আছে তো।

এবারে প্রচণ্ড গরম, প্রকাণ্ড দিন গিয়ে বিষম শীত আর সংক্ষিপ্ত পাঞ্জাবী দিনের শীত ঋতু এসে পড়ল। এবং শেষ হয়ে গেল। তারপর মাস—বছরের পর বছর কেটে যায়।

অমৃতসর স্টেশনের বুক স্টল।

কি মা[illegible]লোকে বই দেখবার জন্য বেড়াতেও আসে। ট্রেনের দেরী থাকলেও লোকে বই স[illegible]। কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। কেউ বা কারুকে পৌছতে এসেছে। কেউ বা নিতে দিবে[illegible]সেছে।

দাঁড়িয়েছিল মণিকা আর একটি শিখ যুবক। সামান্য পরিচিত। দুইজনেই বই ঘাঁটছিল।

সহসা এসে দাঁড়াল আর দুজন। একটি পুরুষ আর একটি নারী। পুরুষটি একটু তাকিয়ে বললে, 'মিস দাস না? আশ্চর্য, এখানে দেখতে পাব তা তো ভাবিনি। আপনি তো লুধিয়ানায় না কোথায় ছিলেন না? আমি শীকর গুপ্ত, চিনতে পারছেন না?'

মণিকাও অবাক হয়ে গিয়েছিল, সহজভাবেই বললে, 'হ্যাঁ, চিনেছি বই কি। আমি আজকাল এখানে রয়েছি। তা আপনি কি করে?'

গর্বিত মুখে, 'ও আমি? ইনি হচ্ছেন আমার স্ত্রী শ্রীমতী দময়ন্তী সেন, এখন গুপ্ত। বিয়ে করেছি কয়েকদিন। কাশ্মীর চলেছি হনিমুন করতে। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের নামকরা ছাত্রী ছিলেন।'

মণিকা একটি নমস্কার করলে দময়ন্তী সেনকে, তিনিও নমস্কারের উত্তর দিলেন।

শীকর। 'তারপর? আপনি দেখছি ঠিক সেইরকমই আছেন?'

মণিকা বললে, 'হ্যাঁ, তাই তো আছি দেখ্‌ছি। তবে আপনি বদলেছেন।'

শীকর। 'হ্যাঁ, মোটা হয়েছি বেশ। বাংলাদেশের ভাতের জন্য বোধহয়। বিলেতে ছিলাম। সেখানে কিন্তু মোটা হইনি।'

শীকরের মুখে গর্ব। স্থূল পরিতৃপ্তির আভাস। সে বি. টি পাস করে মাস্টারীতে বসে নেই। বড় কাজ করছে। বিদেশ ঘুরে এসেছে। সেটাও না জানিয়ে পারল না যেন।

শীকর। এই কাজেই রইলেন নাকি?

মণিকা বললে, 'হ্যাঁ, তাই তো এখনো রয়েছি।' সহসা একটু হেসে তারপর শিখ যুবকটির বাহুতে হাত দিয়ে বললে, 'ইনি মিলিটারী অফিসার সর্দার অর্জুন সিং। এঁর সঙ্গেই নতুন জীবনযাত্রা শুরু হবে আমার—ঠিক রয়েছে।

শীকর আচমকাভাবে চমকে গেল যেন।

তারপর কিরকমভাবে একটু কষ্ট হেসে বললে, 'ওঃ, আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাঃ, ভারি আনন্দের কথা।'

শিখ যুবকটি যেন আশ্চর্য হয়ে গেল।

শীকর তারপর হাতঘড়ির দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি বললে, 'আচ্ছা, আমার ট্রেনের সময় হয়ে এলো। লাহোরে দুদিন থেকে তারপর যাবো কিনা। নমস্কার কেমন।'

পরস্পরে নমস্কার 'নমস্তে' শেষ হোল। শীকর আর দময়ন্তী তাদের গাড়ির উদ্দেশে ধাবমান হল।

আর বই দেখা হল না!

মণিকা বললে, 'চলুন সর্দারজী, বড্ড গরম, বেরিয়ে যাই স্টেশন থেকে।'

সর্দারজী বা অর্জুন সিং নীরবে ওর সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল।

স্টেশন পার হল। টাঙার ভিড়ও পার হল।

মণিকা বললে, 'না, টাঙায় বসব না। একটু হাঁটবেন সর্দারজী?'

সর্দারজী বললে, 'নিশ্চয়, চলুন।'

গরমের পাঞ্জাবী সন্ধ্যা শেষ হয়ে এসেও আলো রয়েছে।

পথের পাশে একটি ঢিবি-মত। বড় বড় পাথরের স্তূপ।

মণিকা বললে, 'একটু এখানে বসি।'

অর্জুন সিং আশ্চর্য ও নীরব।

এবারে মণিকা বললে, 'আপনি খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন—আমি বুঝতে পারছি। কিছু মনে করবেন না। ওটা একটা হঠাৎ বলা কথার মত বলে ফেলেছি। কেন যে বলেছি তা একটু আপনাকে বললে আপনি বুঝতে পারবেন। আর সেইজনেই আমার এই অসঙ্গত কথাটাকে মাপও করতে পারবেন আশা করি। আর সেইজন্যেই আমার নিজের জীবনের ইতিহাসও একটু আপনাকে বলব। যদিও তা জানানোর মত আপনার সঙ্গে আমার কোনো ঘনিষ্ঠ পরিচয় কোনোদিনই নেই।'

জড়ো করা পাথরের ওপর পাশাপাশি বসে নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব মণিকা নিজের প্রথম জীবনীটুকু সংক্ষেপে বলে গেল। পরে শীকর গুপ্তর সঙ্গে প্রথম পরিচয়, তার ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা। তারপর নীরবতা—তাও বলা হল। আকাশের দিগন্তে শেষ আলোটুকুও মিলিয়ে গেছে। কিন্তু আলো আছে যেন কোথায় একটু।

মণিকা উঠে দাঁড়াল।

বললে, 'আজকের এই সন্ধ্যা আজকের ব্যাপারেই শেষ করে দেবেন। আপনিও মনে রাখবেন না। আমিও না। আমরা যেমন সাধারণ বন্ধু ছিলাম, তেমনিই রইলাম। আমার এই আকস্মিক কথায় আপনাকে জড়ানোর জন্য আপনি আমায় ক্ষমা করবেন।'

একটু থেমে বললে, 'ওর হালকামিতে আমার যেন একটি নির্বুদ্ধিতা জেগে উঠেছিল। ওর ওই চাল দেওয়া আমার সহ্য হচ্ছিল না। তবু এটা আমারই ভুল আর দোষ। ওর সঙ্গে আর আমার কি সম্পর্ক। আমি কিছু না বলেই চুপ করে থাকতে পারতাম।'

এবারেও অর্জুন সিং কোনো কিছু বললে না। দুজনেই নীরব। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি এসে পড়ল।

অর্জুন সিং একটু দাঁড়াল। তারপর বললে, 'মিস দাস, আপনার তো সব কথা বলা হয়ে গেছে। কিন্তু আমি এখনো কোনো জবাব দিতে পারিনি। কথাও বলতে পারিনি কিছু। কিন্তু কোনোদিন যদি আমার কিছু বলবার থাকে তো সেদিন আপনি একটু শুনবেন। এমনো হতে পারে, আজকের এই সন্ধ্যা আজকেই একেবারে শেষ হয়ে যাবে না।'

অর্জুন সিং মণিকার হাতটি ছুঁয়ে শিখ ধর্মের অভিবাদন জানিয়ে বললে, 'আজ বিদায় নিই। সৎ শ্রী অকাল, মিস দাস।'

অনৃতভাষিণী

চৌঠা মাঘ বিয়ের দিন ঠিক করেছে তারা। পৌষমাসেই সব যোগাড়-যন্ত্র করতে হচ্ছে। বাড়িটা রং করা হয়েছে। সাজানো হচ্ছে। শতদ্রু নিজে এসে দেখে যাচ্ছে। ঘরের দেওয়ালের রং-এ পর্দার রং মেলানো হচ্ছে। আধুনিক হালকা আসবাব কেনা হচ্ছে খুঁজে খুঁজে। অত্যাধুনিক হওয়া চাই বিমলের মতে। শতদ্রু হাসে। সে বলে, 'সোজাসুজি পরিচ্ছন্ন কম কম জিনিস দিয়ে ঘরবাড়ি সাজাও! মিথ্যে কেবলি নতুন খুঁজে বেড়িও না! নতুনের শেষ আছে?' আবার হাসে, বলে, 'অত নতুনে লোভ থাকা ভাল নয়।' এবারে দুজনেই হাসে।

বিয়ের আনুষ্ঠানিক যোগাড় একটা করতে হবে। তার জন্য বিমলের বিধবা বোন সুনীতিও এসে গেছে, তার তিনটে রোগা হ্যাংলা ছেলেমেয়ে নিয়ে। থাকবে না অবিশ্যি। যদিও তার ধারণা সে থেকে যাবে নতুন বৌয়ের সঙ্গিনী হিসেবে।

বুদ্ধি দেখ! এখনকার দিনে আবার নতুন বৌদের আগলাবার কি সঙ্গী লাগে! বিমল হেসেছিল তার কথায়। অবিশ্যি বলেনি কিছু। তার দুঃখ হবে বলে। বড় গরীব শ্বশুরবাড়ি তার, তাইতেই বোধহয় ছেলেগুলি অমন। যেন তাড়া খাওয়া হ্যাংলা জন্তু। (জীব-জন্তু কথাটাই সে মনকে বলে। যে কথাটা মনে আসে সেটা আর স্পষ্ট করে ভাবে না।)

তাদের দেখলে দয়া হয় কিন্তু গা যেন শিরশির করে। কেমন নোংরা-নোংরা মনে হয়।

বিমলের দাড়ি কামানো আর ঐসব ভাবনার মধ্যে শতদ্রুর চাকর একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

শতদ্রুর সঙ্গে কদিন দেখা হয়নি। সেই যেদিন সুনীতি এসেছিল সেইদিনের পর সে আর যেতে সময় পায়নি। আর শতদ্রুও আসেনি। বিয়ে এগিয়ে এলো, ঝঞ্ঝাট ঝামেলা ওর। আর বিয়ে এগিয়ে এলো বলেই বোধহয় তারও আসতে সঙ্কোচ হচ্ছে।

চিঠিখানা মোটা, ভারি। বিমল মনে মনে হাসে। ভাবে সে খুব রাগ করেছে। কদিন যেতে পারেনি।

কামানো শেষ করে বেশ প্রসন্ন পরিচ্ছন্ন মুখে সে চিঠি খুলল। মস্তবড় চিঠি। কি ত লিখেছে! বিমলের আবার অত চিঠিপত্র লেখাপড়া এখন আর আসে না। াজাসুজি বেড়াতে চল, গল্প কর, সিনেমা চল, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে জমিয়ে আড্ডা দাও। ক'শোনা, চিঠি লেখা ওসব কাব্য তার এখন আর পোষায় না। ওসব যারা বসে কে তারা পারে।

প্রিাদের এই যুদ্ধের দিনের কালো, ফিকে কালো, ঘোর কালোবাজারে নানা জিনিসের কা'রে, কাব্য করার সময় কোথায়? লেখাপড়া পাস-টাস সেও করেছিল। কলেজ আজর দু-একটা কবিতাও হয়তো আছে কলেজ ম্যাগাজিনে। তারপর? তারপরের ভাগ্যিস কালোবাজার, কাগজের কালোবাজারের সন্ধান পেয়েছিল। যাক্‌গে।

আসলে বিমলের মতে টাকাই হচ্ছে একমাত্র নির্ভর করবার জিনিস পৃথিবীর মাটির মত। আকাশে চাঁদ আছে দেখে মুগ্ধ হও, মেঘ দেখে মোহিত হও, সূর্যাস্ত সূর্যোদয় দেখে কত কাব্য কর; কিন্তু সে যে দেখো সে তো আর আকাশে দাঁড়িয়ে নয়, মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়। তেমনি মাটির মত টাকাই হচ্ছে সবারি আগে একমাত্র নির্ভর করবার জিনিস। অবশ্য বিমল এও বলে মাটির মত পায়ের তলাতেই রেখে।

কিন্তু চিঠি তো শতদ্রু কোনোদিন লেখেনি। দরকার হয়নি লেখার। কেননা কেউ বিদেশের নয়। অভিভাবকের ভয়ে ভীত নয়। কারুরই অভিভাবক গুরুজন নেই। বসে বসে অবসর যাপন করার সময়ও তাদের নেই। চিঠি লাগে না তাই। মাস ছয়েক পরিচয় হয়েছে। শতদ্রু কাজ করে সাপ্লাইয়ে। সেইখানেই তাদের পরিচয়।

বংশ-পরিচয় সামান্য দুজনেরই। বাপ মা গুরুজন কারুরই নেই। ভাই-বোন আছে। কিন্তু পিতৃমাতৃহীন স্বাধীন পরিবারে ভাইবোনের বন্ধন হয় খুব সূক্ষ্ম, নয় খুব স্থূল। অর্থাৎ সূক্ষ্ম মানে নেই, স্থূল মানে পদস্থ স্বজনের অনুগ্রহজীবী।

এক জাত কিনা? তাও ভাববার দরকার নেই। টাকা আছে বিমলের, জাতের বা কারুর ধার ধারে না সে। এক কথায়—ভালবাসার এবং বিয়ের পথে ওদের কোনো বাধাই নেই।

বিমল চিঠি পড়তে লাগল।

বিমল, আমি কিছুদিন আগে একটা চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম। চাকরিটা পেয়েছি। ছাড়লাম না, নিলাম।

মনে হল, বিয়েটা এখন থাক। ভাল চাকরি তো অপেক্ষা করতে পারে না! ভালবাসা হয়তো অপেক্ষা করতে পারে।

কিন্তু ভালবাসার কথা রেখে কেন যে চাকরি নিলাম, সে কথা আমি কদিন ধরে ভাবছি, তাই বলছি।

যেদিন তোমার বোন সুনীতি এলো, সেইদিন থেকেই ভাবছি। আমি সেদিন সেইখানে তোমাদের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সে তোমার ঘরের সুমুখে এসে দাঁড়াল। তার ছেলেদের আমি ভাল করে দেখিনি, শুধু ছোট্ট মেয়েটির দিকে একটু চেয়েছিলাম। সাবান কাচা আধ ময়লা ফ্রক পরা, পায়ে জুতো নেই, মুখ হাত পা ট্রেনের কালিধুলো মাখা। তোমার বাড়িতে এসে তারা যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল—এত পরিচ্ছন্ন এত সুন্দর (তাদের কাছে) বাড়ি! এত লোকজন জিনিস-পত্র আসবাব মানুষের থাকে? আছে? হয়ত ভাবতে পারলে ভাবত কি কাজে লাগে এত আয়োজন

তোমার বোন আর তার ছেলেমেয়ে তোমার দিকে এগিয়ে গেল। বোন তো তোমা চেয়ে ছোট, বোধহয় প্রণাম করতে গেল। তুমি পিছিয়ে গেলে। কেন, অপরিষ্কার বলে যাই হোক, সেও আর এগিয়ে গেল না, প্রণামও করতে পারলে না। ছেলেমেয়েরা সেইখানেই থমকে দাঁড়িয়ে রইল। মেয়েটি একবার হাসিমুখে 'মামা' বলে ডে আমি শুনতে পেয়েছিলাম। আমি তার রোগা কালো হাতখানা ধরে জিজ্ঞেস করো আজ 'কি নাম তোমার?' সে নাম বলার আগেই তুমি বোনকে বললে, 'যা তোরা ব চোপড় বদলে আয়, বড় ময়লা হয়েছে সব।' তারপর চাকরকে বললে, 'ওদের নিয়ে যেতে।'

সুনীতি অপ্রস্তুত মুখে বললে, 'আমার জিনিসপত্রগুলো নাবিয়েছে কি? দাদা, তোমার জন্যে পাটালী গুড় এনেছি। আর আমসত্ত্ব। তুমি ভালবাসতে।' তুমি বললে, 'থাম্ থাম, কলকাতায় যেন পাটালী গুড় আমসত্ত্ব পাওয়া যায় না।'

এইবার তার জিনিস তোমার চোখে পড়ল। ময়লা কাপড়ের বোঁচ্‌কা পুঁটলী, অপরিষ্কার শতরঞ্জিতে দড়িবাঁধা বিছানা, রং-ওঠা টিনের বাক্স, সরা গুড়ের হাঁড়ি,— তোমার মুখ বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। টিফিন কেরিয়ার, হোলড্-অল্, মিলিটারি থলে, সুটকেস দেখা তোমার এখনকার চোখ।

তুমি বিরক্তভাবে বললে, 'এত জিনিস এনেছিস এই ক'দিনের জন্যে?'

সে যেন কেমন হয়ে গেল (তুমি তার মুখ দেখনি, জিনিসের দিকে চেয়েছিলে)। থমকে গিয়ে সে বললে, 'আমাকে যে দেওররা বললেন এখন থেকে তো ওখানেই থাকবে। আর ফিরে আসছ না, সব নিয়ে যাও।'

তুমি বললে, 'আর তুমি তাই শুনলে।'

সে আরো অপ্রস্তুত হয়ে গেল, 'মেজ দেওর তার শাশুড়ীকে এনেছেন, জায়ের অসুখ। বাড়িতে ঘর নেই, আর আমার ঘরেই তিনি থাকবেন। ছেলেদের পড়াও হচ্ছে না।'

চাকর এসে দাঁড়িয়েছিল, তারাও শুনতে পেল সব। তুমি বললে, 'ওদিকের কোণের ঘরে ওদের নিয়ে যাও।'

তারা চলে গেল।

তোমার তখনো তাদের খেতে বলা কি বসতে বলাও হয়নি। আমার একবার ছেলেমেয়েদের শুকনো মুখ দেখে বলতে ইচ্ছে হল, কিন্তু পারলাম না বলতে। যদিও ঐখানেই ঘরে আমাদের চায়ের টেবিলে সবই ছিল—মাখন রুটি বিস্কুট মিষ্টি সন্দেশ জ্যামজেলি। এরপর আমরা দুজনেই বাজার করতে না বেড়াতে বেরিয়ে গেলাম। আমার মনে হচ্ছিল, ওরা কি খেল? সুনীতি কি করছে! নিশ্চয়ই চাকররা সব ব্যবস্থা করেছিল।

সুনীতির ছেলেমেয়েদের দেখে এই প্রথম আমার নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। অবশ্য আমি কিছুই জানি না।

কিন্তু আমার মনে হল আমার মাও কি ঠিক ঐরকমভাবেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর আত্মীয়দের বাড়ীতে এসেছিলেন। আমিও ঐরকমভাবেই তাদের কাছে গিয়েছিলাম কি? সুনীতি অত অপ্রস্তুত হয়ে যাচ্ছিল কেন? ওইরকমই কি সব মেয়ে হয়?

তোমার তার মুখ দেখে মায়া হয়নি? দয়া হয়নি?

আমারও মায়া-দয়া হয়নি, সে সম্পর্কও নয়। কিন্তু কি একটা কষ্ট হচ্ছিল। কেমন লজ্জা হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, তুমি একটু ভাল করে মিষ্টি করে কথা বললে না কেন ওদের সঙ্গে? কর্তব্য মনে করেও তো বলতে পারতে, ভদ্রতা করেও পারতে। মিষ্টি করে কথা বলতে, যত্ন করতে তো তোমায় দেখেছি। এই তো সেদিন আমার বন্ধুদের বেশ যত্ন আদর করলে। তাহলে ও কি গরীব বলে করলে না? না, তোমরা নিজের প্রিয়জন কিম্বা দরকারী লোক ছাড়া কারুকে আদর যত্ন করতে পার না। তোমার কাছে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। কিন্তু, সে লজ্জা সঙ্কোচ তোমার কাছেই আজ করব না। আজ সত্যি কথাই বলব সম্পর্ক না থাকলেও। আমার আপনার লোকদেরও তো দেখেছি

ঐরকমই। তাঁদের পরমাত্মীয়াদেরও সুনীতির মতই ঐরকম দীন মূর্তি দেখেছি। আরো যেন কত জায়গায় দেখেছি, তাদের নাম পরিচয় মনে নেই, কিন্তু সে মুখ সকলেরই একই রকম।

তাহলে মানুষের কাছেও জীব-জগতের মত আদিম আর জৈব ভালবাসাই চরম আর পরম? আর সব কথা, কথা মাত্র?

আমার কেউ নয় সুনীতি। কিন্তু আমার মনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল ওকে দেখে আমাদের নিজেদের কথা। আমরা কত দীন, কত অসহায়! আর অন্যদিকে তোমাদের কাজে লাগার সময়ে এই আমাদের জন্যই কত সুখের আয়োজন। যে সুখের লোভে, যা হারাবার ভয়ে আমরা কখনো আপনার জাতের কথা ভাবিনি। নিজেদের কথাও স্পষ্ট করে ভাবিনি।

আমার কেমন ভয় হল। ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের ভয় নয়। জানি, তোমার অনেক টাকা, তোমার অনেক ব্যবস্থা করবার শক্তি আছে, তোমার স্ত্রী-পরিবারের জন্য। দারিদ্র্যের দুঃখ আমার অন্ততঃ সুনীতির মত হবে না।

আমার ভয় হল, তোমাকে এত ছোট দেখব কি করে? সেদিন হয়ত তোমার ভুল হয়েছিল তাই ভাববার চেষ্টা করব। কিন্তু কাছে থেকে তোমার ছোট হওয়া কি করে সইব?

এইজন্যে কি ছোটতে বিয়ের ব্যবস্থা ছিল! বুদ্ধি পরিণত হত না, সাহস থাকত না। স্বার্থও হত এক। তোমাদের তৈরী আদর্শ ও সত্য-মিথ্যা নিয়ে আমরা দেবী হতাম, রাণী হতাম, পথের ধারেও দাঁড়াতাম! 'হতাম' কেন, হই। আর চিরকালের স্বাচ্ছন্দ্যের মোহে সুখের দায়ে মূঢ় ভয়ে অসত্যের বোঝা বয়ে আদর্শ মেয়ে হয়ে থাকি। মনে কিছু হলেও যার বলবার ভরসা নেই। কি মিথ্যে-ভরা ক্ষুদ্রতা-ভরা জীবন আমাদের। চিরদিন মিথ্যে শুনি, বলি, আর তা আদর্শ বলে বিশ্বাসও করি।

সেদিন যখন আমি বলতে পারলাম না কোনো কথাই, তখন বুঝলাম তোমার ওপর কোনো কথাই কখনোই হয়ত বলতে পারব না। বিরাট অজগরের সামনে মুগ্ধ জন্তুর মত তোমার ঐশ্বর্যের সুমুখে আমিও মূঢ় হয়ে যাব।

অনেক ভাবলাম। সুখ-স্বস্তির ঘরের লোভ আমারো কম নেই। 'ধরণীর এক কোণে স্বর্গ খেলনা' গড়বার মোহও ছিল। কিন্তু তোমাকে কিছু বলবার, তোমার কিছুতে প্রতিবাদ করবার শক্তি সাহস যদি আমার না থাকে সে 'স্বর্গ' দুজনের হবে না।

আমি তো ছোট হয়ে যাবই, তুমিও আমার কাছে ছোট হয়ে যাবে।

সুখ-স্বস্তির মোহে অন্নের দায়ে, বেঁচে থাকার দায়ে যারা চিরদিন নিজেদের কথাই ভাবল, মিথ্যাকে সত্য বলে মনে করল, তাদের একজন একজনের কাছে আজ সত্যি করে বলি—তাদের এই মিথ্যার ইতিহাস, এই ভয়ের কাহিনী,—এই চিরকালের অনৃতভাষিণী আমাদের কথা। ইতি — শতদ্রু।

উত্তরা, শ্রাবণ ১৩৫৫

তিন কন্যা

একটি নারী হলেন—স্ত্রীলোক; দুটি মেয়ে মানে—গল্পগুজব, কথালাপ; আর তিনটি নারী লেখা মানে—কলহ-কোলাহল। চীনেভাষার অভিনব চিত্রকলা-পদ্ধতি-অনুগামী বর্ণমালা নাকি এইরকম।

মা ছিলেন না, ছিলেন বুড়ো বাপ, আর তিন মেয়ে। বড়টি বিধবা; মেজটিকে শ্বশুরবাড়িতে পীড়ন করে, সে যায় না; ছোট অবিবাহিতা। বড়র নাম কমলমণি, মেজ কাদম্বিনী, ছোট কুমুদিনী।

বাবাকে ওরা সকলেই খুব ভালবাসে এবং ভয় করে না একটুও। গল্প করে, শাসন করে, সেবা করে; যেন তিন মায়ের একটি ছেলে। ফলে, অসুখ করলে টক্কর দিয়ে সেবা করে। পিকদানিটা, চিলিমচিটা, জলের ঘটিটা নিয়ে কাড়া-কাড়ি পড়ে যায়। বিছানার চাদর কাপড় বদলানো নিয়ে, পায়ে মাথায় হাত বোলানো নিয়ে তিন বোনে কথা কওয়া বন্ধ হয়ে যায়। বাপের শারীরিক অসুখ ভুলে গিয়ে মানসিকটা এমন প্রবলতম হয়ে ওঠে যে, বেচারা পারতপক্ষে কন্যাদের জানান না।

কুমুদিনীকেও ভালবাসে দুই বোনে। মেজর সঙ্গে ভাব, বড়র আছে কন্যা-স্নেহ। মেজর খেলার সাথী, বড়র হাতে করে মানুষ করা—মাতৃহীনাকে। কুমু একবার ধাক্কা খায় মেজদিদির কাছ থেকে, আবার খায় বড়দিদির কাছ থেকে।

কুমুর হয়নি বিয়ে, আর বাপের ছিল স্থায়ী বাত; কাজেই আন্দোলন-দোলনের শেষ ছিল না। কথা হয় দুই বড়তে; সব বড়র কাছে পৌছয়; সব ছোট হয় সাক্ষী; বাপ সাক্ষীগোপাল হয়ে চেয়ে থাকেন।

ভাবেন, আহা, ওটা বিধবা মানুষ, চিরদুঃখী। মেজকে শাশুড়ী যা কষ্ট দেয়—কবে যে স্বামীটা সুবুদ্ধি করে ওকে আগলাবে। দুই বোনেই রাগ করে, কাঁদে, কালবোশেখীর মতন আসে, বাপের মন অন্ধকার করে দিয়ে চলে যায়।

কুমু পান সাজছে। মেজদি রান্নাঘরের যোগাড় দিতে ব্যস্ত। বড়দি পূজায় বসেছেন।

হঠাৎ একটা 'উহুহুঃ' শোনা গেল। কুমুদিনী কাছের ঘরে ছিল। কি বাবা, কি হল?—বাপের ঘরে প্রবেশ করলে। গোলমালের ভয়ে বেচারা বৃদ্ধ দিন তিনেক অতি কষ্টে চুপ করেছিলেন, কষ্টটা বেড়েছে—সেদিন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

না রে, আবার হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছে।

কুমু ব্যস্ত হয়ে বললে, হাত বুলিয়ে দোব বাবা? সেঁক দোব?

না না। হৈ হৈ করিসনি। একটা মাষতেল আনিয়েছি, তাতেই কমবে'খন। কাজ নেই গোল করে।

বাতের ব্যথা, তখন অমাবস্যার কাছাকাছি, চিড়িক মারতে আরম্ভ করেছে, ওঠবার চেষ্টামাত্রেই একেবারে 'আহাহাঃ' বলে মুখটা কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

কুমুদিনী বিনা বাক্যব্যয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল, বড়দি তখনও পূজায়, মেজদি তরকারির ঝুড়িতে বেষ্টিত হয়ে বসে কুটনো কুটছিল।

ভাই, বাবার আবার হাঁটুটা টাটিয়েছে। ক্'ক্ষেপ হয়নি, না? একটু মালিশ করি?

মেজদি বললেন, একটু সেঁকও দে না, কমবে'খন। চল, আমারও হয়েছে। একটা মালসায় করে কাঠকয়লার আগুন তৈরী হচ্ছে। কমলমণির পুজো হল, তাম্রকুণ্ডখানি হাতে করে তুলসীমূলে জল ঢালতে এলেন। মালসাটি একবার নিরীক্ষণ করে নীরবে সূর্যমন্ত্র পাঠ, সূর্যপ্রণাম করে জলটুকু তুলসীতলে ঢেলে বললেন, কি রে কুমু, আগুন কেন?

বাবার আবার এতদিন পরে বাতের বেদনাটা দেখা দিয়েছে। মেজদি বললে, সেঁক দিয়ে দে।

কুমু ক্ষিপ্র হাতে পাখার বাতাস দিয়ে আগুনটা গনগনে করে তোলবার চেষ্টা করছিল। বাবার চাকর পাশে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সে নিজেই বাতাস দিতে লাগল।

কমলমণি বললেন, ও শুকনো সেঁকে তো বেশি কমবে না, ঠাকুরকে খানিক জল বসিয়ে দিতে বলগে। একেবারে 'কম্পোরেস' করে দিইগে। বাবা কোথায়—ঘরে, না বৈঠকখানায়?

ঘরে আছেন।—বলে কুমু দিদির আদেশ প্রতিপালন করতে রান্নাঘরে ঢুকল।

কুমু ঠাকুরকে জলের কথা বললে। কাদম্বিনী বাবার জন্যে শাকের ঘণ্ট দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, বললেন, কি রে কুমু, জল কেন? বাবা এই বাতের ওপর নাইবেন? ক্ষেপেছিস?

কুমু বললে, না বড়দি বললেন, কম্প্রেস করতে। শুকনো সেঁক দিলে কমবে না।

আহা, চিরটাকাল গেল—লোকে সেঁক দেয়, মালিশ করে ব্যথার জায়গায়, আর আজ কমবে না? বলে, হারিকেনের আলোর ওপর নেকড়া তাতিয়ে কত সেঁক দিয়েছি, কমেনি তাতে?

পেছন থেকে বড়দি বললেন, তা, তাই দে না, এটাতে কমত, উপকার হত, এই আর কি!

কমলমণি গম্ভীর মুখে নিরামিষ-ঘরে প্রবেশ করলেন, ঠাকুরকে আদেশ দিলেন জল নামিয়ে নিতে।

বিকেল গেল, সন্ধ্যে কাটল, বড় মেয়ে আর ঘরে ঢুকলেন না। বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, হ্যাঁরে কুমু, তোর দিদি কই? কি হল আজ? কোথাও দেখাশোনা করতে গেছে নাকি?

বৃদ্ধ 'উহুহুঃ' করে উঠলেন।

কুমু ধুনো দিতে ঘরে ঢুকেছিল, তোমার কষ্ট কমেনি তো বাবা! দিদির কথা বলছ? আছেন তো।

ওঃ। ব্যথাটা আছে বইকি। বৃদ্ধ হাঁটুটিকে এমন কোনরকম করে রাখবার চেষ্টা করছিলেন যাতে আরাম পান। কিন্তু প্রতিকারের প্রচেষ্টাতেই আরামের 'আঃ' স্থলে আর্তনাদের 'উঃ' বেরিয়ে আসে।

কুমু রান্নাঘরে প্রবেশ করলে, দিদি নেই, মেজদি আছেন, সান্ধ্য তরকারি কোটা হচ্ছে।

দিদি কোথায়, ভাই? বাবার এবেলাও কষ্ট হচ্ছে খুব।

কি জানি, বোধহয় সন্ধ্যে করছে। তা তুই একটু বাতবিজয় তেলটা মালিশ কর না। আচ্ছা, আমিও যাই।

আগুন এল কড়ায় করে, নেকড়ায় বেঁধে তুলো; দুখানি আসন পেতে দুই বোনে আগুনের দুধারে বসে গল্প করতে করতে একজন তেল-হাত গরম করে, অপরা তুলো গরম করে বেদনাস্থলে লাগিয়ে দিতে লাগল।

মৃদু গুঞ্জন, গল্প, হাসি আর বাপের সেবা চলতে লাগল।

কমলমণির সন্ধ্যে করা শেষ হয়েছিল। হাসি-গল্পের উচ্ছ্বাসে বিরক্ত হয়ে গম্ভীর মুখে ঘরে প্রবেশ করে কনিষ্ঠার দিকে চেয়ে শুষ্কস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা কি খাবেন?

বৃদ্ধ বোধহয় আরামে অথবা তন্দ্রায় চোখ বুজে ছিলেন, শশব্যস্তে চোখ খুলে বললেন, ব্যথাটা তো কিছু কমল না মা, কি করি বল তো?

ঐ তো সেঁক-তাপ বেশ হচ্ছে, ওতেই কমবে'খন। কি খাবে এ বেলা?

চিন্তিত মনে বললেন, শরীরটা ভাল নেই, এ বেলা আর কিছুই খাব না।

অপর দুই কন্যার দিকে চেয়ে বললেন, আমার গরম হচ্ছে, থাক এবার।

পিতা অভুক্ত থাকবেন, কমলমণির রাগ পড়ে গেল। না না, সে কি! শুকনো কিছু খেও না হয়, একটু দুধ-মিষ্টিই নয় খেও। জ্বর হয়নি তো?

বসনের শুচিতার জন্য অস্পৃশ্য না থেকে পিতার ললাট স্পর্শ করে দেখলেন, না, জ্বর কোথা? বুড়ো মানুষ রাত-উপসী থাকলে যে ঘুমোতে পারবে না। একটু কিছু খেও'খন।

কুমু বলছিল কম্প্রেসের কথা, তা দিবি একটু করে? সেবারে তাতে কমেছিল। যদি কমে তো পরে খাব'খন।

স্নেহকাতর ব্যাকুল বৃদ্ধ অভিমানিনী দুহিতাকে একেবারে জল করে দিলেন।

আর রাগ চলে না।

চাকরকে জল চড়াতে বলে কুমুকে নিয়ে সেঁকের পর কম্প্রেস আরম্ভ হল।

এমনই করে একবার করে বাতের প্রকোপ, একবার করে কুমুর বিবাহের প্রচেষ্টা এবং ঐ বিষয়ে কথা আর কথান্তরে পিতা-পুত্রীদের দিনগত পাপক্ষয় হয়। মতের মিলে কাটে দুদিন, তো অমিলে এক পক্ষ কেটে যায়।

বাত যদি কমে তো কেমন হৈ হৈ করে সকালে কমলমণি, বিকালে কাদম্বিনী এসে বসেন বাপের কাছে; কুমুর দিকে আর চাওয়া যায় না, আঠারো পার হয়ে গেল, হলই বা এখনকার দিন, চুপ করে থাকাই কি ঠিক হচ্ছে ইত্যাদি।

ব্যাকুল পিতা অন্যমনে তামাক খেতে খেতে দিগন্তের পানে চেয়ে থাকেন। দূর বৃক্ষশ্রেণীর কুন্তলে দিক্‌চক্রবালে নীল আকাশের উত্তরীয় এসে ঠেকেছে, আর একটু এ নীচু আর ও উঁচু হলে এ এসে ওর ললাট স্পর্শ করে যাবে।

সাজা তামাক নিবে যায়, টেনেই ডাক দেন, ও বিষ্টু, একটু তামাক দে না রে।

কানে আসে তিন বোনের বিতর্ক-বিতণ্ডা। ব্যাকুলতায় অন্তর ভরে ওঠে, দীর্ঘকাল পরলোকগতা পত্নীকে মনে পড়ে। কবে একসঙ্গে পঠিত "তোমারে খুঁজিতে এসে চাব কার পানে" মনে পড়ে যায়। বার্ধক্যের শুষ্ক চোখে জলও আসে না; নিশ্বাস পড়ে

শুধু। ঠাকুর এসে ভাত দেয়, কমলমণি মার মতন পাখা হাতে বসেন, কাদম্বিনী ঠাকুরের হেঁসেলের তদারক করেন, কুমু দুধ মিষ্টি আনে—এই নিয়ম।

যেদিন ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ বোনেদের মধ্যে একজন অনুপস্থিত থাকে, সেদিন আর বৃদ্ধের ভাল করে আহার হয় না।

এদিক ওদিক চান, কার প্রতীক্ষা করেন। কিন্তু ভয়ে জিজ্ঞাসাও করেন না। পাছে স্নেহের মানদণ্ডে কোন দিক ভারী মনে করে আবার কারও কিছু হয়।

যাই হোক, কুমুর বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। দুই বোনের, বাপের সমান আনন্দ।

হ্যাঁ মা, তা হলে এবারে চল, কাশীতে গিয়ে থাকিগে।

বালবিধবা জ্যেষ্ঠাকে 'মা' বলা তাঁর অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।

মেজ চুপ করে উঠে গেলেন।

কমলমণি বলেন, পুঁটি কোথায় থাকবে? আদর দিয়ে মাথাটা খেলে বাবা ওর। দাও এবারে পাঠিয়ে—এখন তো আর ছেলেমানুষটি নেই।

বৃদ্ধ চঞ্চল হয়ে উঠলেন, সেখানে যে শাশুড়ীটা বড় দুর্দান্ত মা। তাই তো ওর কথা আমি অত ভাবিনি।

তা ওকে নিয়ে কাশীবাস হবে না। আমার তো সব চুকে গেছে, আর থাকত যদি একটা কেউ পুড়িয়ে খেতে, তা হল কি ছাই—

বাপ চারদিক চেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। মনে হয়, কাদম্বিনী বেচারা কি মনে করবে। খেতে আর দেরি হয় না, উঠে পড়েন।

কুমু ফিরেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে।

নিরামিষের উনুনে পিতার আর জ্যেষ্ঠার জন্য রাত্রির দুধ মিষ্টি ক্ষীর ইত্যাদি করতে করতে কাদম্বিনীর চোখ অকারণেই সজল হয়ে আসে।

ক্ষীর যায় এঁটে; সন্দেশ কোনদিন হয় কড়াপাক, কোনদিন কাঁচাপাক; অন্য মিষ্টির ভিতর আঁটি জন্মায়।

কুমু এল পানের বাক্স নিয়ে, ভাই, কি করছিস? একটু সুপুরি কাট না। তোর চোখে ধোঁয়া লাগল কোত্থেকে?

কি জানি! মধ্যমা সুপারির পেতেটি নিলেন। চোখ আপনিই নীচু হয়ে থাকে।

কুমুর বোঝার বয়স খুব হয়েছে, তাই ছেলেমানুষ থাকা ভাল, এ জ্ঞানটাও আছে। কুমুর গল্পের স্রোত বইল। কাদম্বিনী শ্রোতা ভাল, নীরবে শোনেন। ওঁর মনের অতলান্তিক সাগরের থই পাওয়া যায় না।

আচম্বিতে কুমু জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ ভাই, তোর শ্বশুরবাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না? সিংগীমশাই তো লোক মন্দ নয়।

নামটা তার রমেশ, কিন্তু দিদির মুখে হাসি আনবার জন্যে কুমু তাকে সিংগীমশাই বললে।

দিদি একটুখানি হাসলেন, বললেন, তুই দেখ না ঘর করে।

যাঃ!—বলে কুমু পান নিয়ে উঠে গেল।

বাবাকে খাবার দেওয়া হল।

কমলমণির বার্ধক্যের সীমায় পৌছবার এতই সাধ যে, তিনি কুমুর বিবাহের পর

মালা করতে করতে বৃদ্ধা পিতামহীর মত বাপের কাছে এসে দাঁড়ান। চুলগুলি দিন দিন আরও ছোট করে কাটেন। মুখখানি প্রসন্ন অথচ এমনই গম্ভীর, তাঁকে বাপ ভয় করতেন ভারী, এগারোয় বিবাহ এবং বিধবা হয়ে এক নিয়মে ত্রিশ বছর বয়স হল, তাঁর আর কিছুতেই নিজেকে ছোট মনে হয় না; যে কদিন মা ছিলেন সেই কদিন মাত্র তিনি দুহিতা ছিলেন। এখন একেবারে পিতামহীর আসনে বসেছেন যেন। তা হ'লে কি করবে ঠিক করলে?—মুলতুবী রাখা কবেকার কথা হঠাৎ এনে গম্ভীর মুখে তিনি বাপের দিকে চাইলেন।

কিসের মা?—বাপ জিজ্ঞেস করলেন।

এই কুমী তো যাবে আশ্বিন মাসে। পুঁটিকে কি করবে? আমাদের যে কাশী যাবার কথা বলেছিলে না?

পিতার তরকারি রইল প'ড়ে, ভাজা দিয়ে খেয়েই চট করে দুধের বাটিতে হাত দিলেন।

কুমু বললে, ওকি বাবা। তরকারিটা নাও, ও যে নতুন কুমড়োতে পটল দিয়ে তোমার জন্যেই করেছে। বাবা নীরবে দুধ সরিয়ে আবার তরকারিতে হাত দিলেন।

তা তুমি একখানা ওদের চিঠি লেখ—রমেশকে। এই তো সেদিন কুমী'র বিয়ের সময় এসেছিল, কেমন কথাবার্তা। মা ছাই তো—বউ ঘর করবে না! এমন কথাও শুনিনি! আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি, আজ বাদে কাল কাশীবাস করব, ওকে নিয়ে কোথায় যাবে?

বাপ বর্ষীয়সী পদাভিলাষিণী আবাল্যব্রহ্মচারিণী দুহিতার মুখের পানে একবার চাইলেন।

কাদম্বিনী এসেছিলেন মিষ্টি নিয়ে, একবার বাপের মুখপানে চাইলেন।

বাপও চেয়ে চোখ নীচু করে ছিলেন।

কুমু গেল পান নিতে। কাদম্বিনী অন্ধকারে চুপ করে বসেছিল। আমাকে তাড়ালেই তোরা বাঁচিস। দিদি ভাবেন, আমার জন্যেই সব অসুবিধে।

দিদি এসে পড়লেন, কুমী, বাবার থালাখানা নিয়ে এসে খেতে বস।

মধ্যমার দিকে চেয়ে বললেন, কি মন্দ বলিছি! ঘরকন্না করতে হবে তো! বুড়ো বাপকে ভাজাভাজা করলি—ভাবিয়ে মারছিস, বুঝিস না?

আমিই কি সব দিকে ভার হয়েছি!—কাদম্বিনী উঠে গেলেন।

কুমুর বিয়ে যদি হয়ে গেছে তো কাদম্বিনী-সমস্যা বাতের প্রকোপের সঙ্গে পাল্লা দেয়।

দুই বোনে কথা বন্ধ হয়ে যায়, কুমু একবার এদিক একবার ওদিক করে। আবার কেমন করে মিল হয়ে যায়।

আশ্বিনের প্রভাত। বর্ষার ধারাস্নানজলে দীঘি পুকুর ভরে গেছে। গাছ-পালা তখনও অপরূপ স্নিগ্ধ ধৌত শ্যাম।

কুমু সকালের ডাকে একখানা চিঠি পেয়েছে। সেই নিয়ে চিলের কুঠুরির পাশে দাঁড়িয়ে পড়ছে। মেজদিদি স্নানান্তে সিক্ত বস্ত্র শুকোতে দিতে উঠল।

আস্তে আস্তে ভগিনীর পেছনে দাঁড়িয়ে স্নেহমধুর হাস্যে বললে, তাই বলি—! এখনও নাসনি তো?

দিদি ডাকলেন, ও কুমী, নাব না। পুঁটিকেও ডাক।

রমেশের পত্রোত্তরে পুঁটির শাশুড়ীর সংবাদ এসেছে, বাপের কাছে ওকে আজই যেতে হবে। ঘোষালকাকা দিয়ে আসবেন। এই ব্যাপার।

কাদম্বিনী অসহায়ের মতন ব্যাকুলভাবে চুপ করে রইল। দীর্ঘনির্বাসিত শ্বশুরালয় বেচারীকে ভয় ভাবনা ভরসাতে সমানভাবে অভিভূত করতে লাগল।

কুমু বাক্স গোছাতে, কাপড় খুঁজে রাখতে বসল। আপনার জামাকাপড় এনে সে দিদির বাক্স গোছাতে লাগল।

কমলমণির মনে হল, পুঁটি ছোটবেলায় টেঁপারি খেতে ভালবাসত, ইলিস-মাছ ভেটকিমাছের ঝাল, বড়ার অম্বল, ভাজা বড়ি, কুলের আচার, কাঁচামিঠে আম, ওঁর হাতের মিষ্টি আমের আচার—আহা, কুল তো সে মাঘ মাসে! এবারে কি ছাই আচারই কিছু করা হল যে, থাকবে ঘরে! কুমীর বিয়ের হুজুগে কি নিশ্বাস ফেলবার সময় ছিল!

কবে একদিন পুঁটি বলেছিল, দিদির মত ঘন্ট রাঁধতে কেউ পারে না, ছানার মুড়কি কবে কতদিন আগে একবার করতে বলেছিল! পোড়া বুদ্ধি, একদিন দুদিন সময় দেয় লোকে, তা না আজই! সেই কাশীতে সে কি আর পাঠাবে! দিদির অন্যমনে স্তূপে স্তূপে তরকারি কোটা হল।

কুমু এসে বলল, একি দিদি! জামাইবাবু আসবেন নাকি?

জ্যেষ্ঠার দূর অতীত স্বপ্নে ভরা দৃষ্টি সজল হয়ে এল, বললে, না, এমনি।

তিন বোনে খেতে বসল।

কোথায় চিরসঙ্গোপন স্নেহকাতর মনটি কেবলই কি যেন বলতে চায়, কথা খুঁজে পায় না। পুঁটি, আর দুটি ভাত নে? মাছ আর একটু দিতে বলি? হ্যাঁ রে, টকটা কেমন রেঁধেছে? ঘন্ট ভালবাসিস, তা তেমন আর মনের মত মোচা পেলাম না। হ্যাঁ রে কুমু, দিদির আলতা সিঁদুর রেখেছিস গুছিয়ে? সবটা দই পাতের করিসনি যেন, আর তোর একটা রাঙাপাড় কাপড় পরিয়ে দিস। ওরে, আচারটুকু নে, ও যে বোসগিন্নীর কাছ থেকে চেয়ে আনালাম।

দিদি একলাই বক্তা। কুমু কাদম্বিনী উঠে পড়ল নীরবেই। চোখ আর ওঠে না। তিনটেয় গাড়ি, ঘোষালকাকা দেড়টা থেকে তাড়া দিচ্ছেন, সেই কাটোয়া—

কাদম্বিনীকে চুল বেঁধে আলতা পরিয়ে সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হল।

বাপকে প্রণাম করে তিনি দাঁড়ালেন, বাপ কম্পিত স্বরে কি বললেন, কি আশীর্বাদ করলেন, বোঝা গেল না। কুমু জড়িয়ে ধরল।

কমলমণি এদিক ওদিক জিনিসপত্র—বাতাসা মিছরি ফল ওর রোগা শাশুড়ীর জন্যে সব দিতে ব্যস্ত। ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এসে দাঁড়ালেন। বোন প্রণাম করে চোখ মুছে গাড়িতে উঠলেন।

ঠিক ততখানিই উৎকণ্ঠার সহিত কমলমণি এসে ভাঁড়ারে ঢুকলেন, কোথায় কি তিনি তো জানেন না, সেই সব রাখত যে!

সন্ধ্যে আর হয় না। সন্ধ্যের আগেই কাপড় কেচে ঠাকুরঘরে ঢুকলেন। জপ হল আজ দ্বিগুণ, মালা কতবার কে জানে!

কিন্তু মুহূর্তগুলি মন্থর হয়ে—তিন বোন, বাল্যকাল, মা বাপ, সুখ, দুঃখ, কলহ, শান্তি, বেদনা, স্বপ্নের স্মৃতি বয়ে ক্রমাগত কমলমণিকে পরিক্রমণ করে যেতে লাগল।

বিজলী, ১ম বর্ষ, ১৩২৭

চিরকালিনী

ভাদ্র মাসের সন্ধ্যা। সারাদিন এলোমেলো বৃষ্টি পথিকদের এলোমেলোভাবেই ভিজিয়েছে। অতর্কিতভাবে এসেছে ও থেমেছে।

অসিত সরিৎ সুধাংশু ও অমল বেরিয়েছিল। অকস্মাৎ বৃষ্টি এসে পড়ায় ঐ পথের ধারে একটি পানের দোকানের পাশে তারা মাথা বাঁচাবার জন্য দাঁড়াল।

সরিৎ ঝোলানো দড়ির আগুন থেকে সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করল, অসিত পান সাজতে বলল।

বৃষ্টি জোরে নামল। অন্ধকারও ঘনিয়ে এলো।

সহসা তাদের চোখে পড়ল দোকানের অন্যপাশে একটু অন্ধকারে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য একটু এগিয়ে এসে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে রয়েছে পান আর একটা কি। পরিধানে ধূপছায়া রংয়ের বাগেরহাট শাড়ি, গোলাপীরংয়ের আর নীল রংয়ের চকচকে কাপড়ের জামা, বাক্সওয়ালাদের কাছে কেনা। কপাল অবধি নামানো পাতাকাটা চুলের নীচে ভ্রূর মাঝখানে মস্তবড় কালো টিপ, হাতে গোছা-করা কাঁচের আর কেমিকেলের চুড়ি, কানে সোনার আধুনিক ঝুমকো, মাথার কাপড় খোলা। খুব সঙ্কুচিতভাবে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে তারা এই আকস্মিক বৃষ্টি আর এদের দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা করছে। অবশ্য দুইই নিরর্থক হচ্ছে।

এরাও অস্বস্তিভরে এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, যদি অন্য কোথায়ও দাঁড়ানো যায় অথবা বৃষ্টি কমে এলো কি না।

না, বৃষ্টি পানের দোকানের টিনের ছাত বেয়ে সশব্দে তাদের জুতো আর কাপড় ভিজোতে আরম্ভ করে দিল, আর মেয়েদুটির শাড়ি।

ওদের পান খাওয়া সিগারেট ধরানো হল। কিন্তু বৃষ্টি ধরল না।

সকলেই অতিশয় আড়ষ্টভাবে নানাদিকে চাইছিল মেয়েদুটির দিক বাদ দিয়ে—তবু প্রত্যেকেরই তাদের দিকে মাঝে মাঝে ঘুরে ফিরে চোখ পড়ছিল।

হঠাৎ সরিৎ বললে, 'চল, এক কাজ করি।'

সকলেই উৎসুক হয়ে তার দিকে চাইল, জিজ্ঞাসা করল, 'কি?'

সরিৎ মেয়েদুটির দিকে একবার চাইল, তারপর বললে, 'ওদের বাড়ি গিয়ে বসবি?'

বন্ধুরা ওর দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে অমল বললে, 'তোর মাথা খারাপ হয়েছে?'

সুধাংশু বললে, 'ক্ষেপে গেছিস?'

অসিত বললে, 'না, চল রাস্তার ওপারে গিয়ে দাঁড়াই।'

সরিৎ বললে, 'কেন দোষ আছে কিছু? এদিকে তো সব মানুষ সমান, অনেক বড় বড় কথা বলিস? সত্যিই চল না, দেখে আসি ওদের থাকা।' বন্ধুরা কেউ নড়ল না। অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়েই রইল।

সরিৎ বললে, 'তাহলে আমি যাচ্ছি।' সরিৎ এগিয়ে গেল মেয়েদুটির দিকে। আর তারা লজ্জা ও ভয়ে প্রায় যেন মিশেই গেল দেয়ালের গায়ে। সরিৎ জিজ্ঞাসা করলে,

'এই—আপনাদের বাড়ি কোথায়? আমরা একটু...', মেয়ে দুটি থম্‌কে হতবুদ্ধির মত বললে, 'আমাদের বলছেন?'

সরিৎ বললে, 'হ্যাঁ।'

পানওয়ালাটা প্রগল্‌ভভাবে একটা অন্ধকার গলি দেখিয়ে বললে, 'ঐদিকে যান বাবু।'

সরিৎ এগিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরাও গেল।

অন্ধকার গলি, তার দুধারে অন্ধকার ও স্তিমিত-আলো-জ্বালা কাঁচা পাকা বাড়ি, মাঝে মাঝে সরু রক। একটা সরু রকের ধারে একটি ছোট বাড়িতে মেয়েদুটি ঢুকল। তাদের সঙ্কোচের সীমা নেই। এদের কি করে সম্ভাষণ করতে হয় তারা জানে না। একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটি মেয়ে বললে, 'আসুন ভেতরে।'

অত্যন্ত বিরক্তভাবে বন্ধুরা ও নির্লিপ্তভাবে সরিৎ ঘরে ঢুক্‌ল।

ছোট ঘর, ছোট একটি চৌকি, বিছানা পাতা। ঘরের কোণে একটি জলচৌকির ওপর ঝকঝকে পানের বাটা আর বাসন-কোসন। মেজেতে একটি মাদুর পাতা। দেওয়ালে মা কালীর, তারকনাথের আর অন্য দু'একখানা ঠাকুরদের পট ও ক্যালেণ্ডারের ছবি। একটি পরিষ্কার হেরিকেন জ্বালা এককোণে।

'আসুন'-বলা মেয়েটিই বললে, 'বসুন।' ওরা মাদুরে বসল। মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে তারপর বললে, 'পান খাবেন? যুঁই, পান সাজ।'

ওরা বললে, 'না। পান আমরা খাই না।'

'খাবেন না? খাবার আনব কিছু?'

ওরা বললে, 'না না, খাবার দরকার নেই।'

এবারে 'যুঁই'-বলা মেয়েটি কি বললে চুপিচুপি। আবার অন্য মেয়েটি বললে, 'আমাদের পান না খান, বাজার থেকে এনে দিই?'

এবার অসিত বললে, 'না, পানের দরকারই নেই, আমরা খাই না।'

অমল বললে, 'বৃষ্টি থেমেছে মনে হচ্ছে, চল যাই।'

সরিৎ জিজ্ঞাসা করলে কথা-বলা মেয়েটিকে, 'তোমার নাম কি?'

সে বললে, 'মল্লিকা।'

দুটি কালো মল্লিকা আর যুঁই...অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়েছিল। নামের সঙ্গে তাদের কোনখানটাই মেলে না। তবু সরিতের মনে হল যেন মেলে কোনখানে। রূপে নয়, সৌন্দর্যে নয়, সঙ্কোচে অপ্রস্তুত নত মুখটিতে যেন মেলে যুঁইয়ের।

অসিত জিজ্ঞাসা করলে, 'এ ঘরটি কার?'

মল্লিকা বললে, 'যুঁইয়ের।'

তারপর সকলে চুপ করে থাকে।

হঠাৎ সরিৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'এখানে তোমাদের আর কে আছে?'

এবারে যুঁই বললে, 'মা আছে।'

ওরা অবাক হয়ে বল্লে, 'মা আছে?'

এবারে মল্লিকা হেসে ফেলল—'নিজের মা কি বাবু! আমাদের যে নিয়ে আসে তাকেই মা বলি।' সে বোধহয় বড় হবে কিছু, কিম্বা বেশী চটপটে যুঁইয়ের চেয়ে।

আবার বন্ধুরা চুপ করে গেল কিছুক্ষণ।

'আচ্ছা তোমরা লিখতে পড়তে জান?'

এবারে যুঁই কথা কইলে, বললে, 'একটু একটু জানি।'

মল্লিকা চুপ করে রইল, সে জানে না।

'কি কি পড়েছ?' ছেলেদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, জিজ্ঞাসা করে।

'পেরথম ভাগ পড়েছি।'

'তারপর আর কিছু পড়নি?' অসিত বলে ফেলে।

লজ্জিতভাবে যুঁই বলে, 'না।'

অমলের ও সুধাংশুর মুখে হাসির আভাস ফুটে ওঠে যেন। প্রথম ভাগ? লেখাপড়া? পড়তে জানা? সরিৎ আর অসিত চুপ করে থাকে। আর প্রশ্ন আসে না মনে।

দরজার বাইরে দু'একটি আরো কৌতূহলী অন্য ঘরের অধিবাসিনীর আবির্ভাব হয়েছিল। হঠাৎ তাদের মনে হয়, এদের অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছে! ওরা উঠে পড়ল। সরিৎ পকেটে হাত দিল। দেখাদেখি সকলেই হাত দিল। সকলের ব্যাগ পকেট খুঁজে কয়েকটি টাকা আর কিছু ভাঙানী পাওয়া গেল।

লজ্জিতভাবে সরিৎ গিয়ে ওদের মাদুরে রাখল, বললে, 'তোমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল বোধহয়, আমরা এবারে যাই।'

অপ্রস্তুত যুঁই চুপ করে রইল। মল্লিকা বললে, 'এখনো বিষ্টি পড়ছে বাবু।' তাদের কি মনে হতে লাগল এবং কি বলবে, তারাও বুঝতে পারল না। শুধু বুঝতে পারছিল, এরা অন্য সকলের মত নয়, যেন কারুর মতই নয়, যাদের ওরা চেনে।

দুর্গোৎসবের মহাষ্টমী। সার্বজনীন পূজামণ্ডপে ঠাকুর দেখতে যাবার কথা ওঠে।

যুঁই-মল্লিকার দল গঙ্গাস্নান করতে যায়। বিকেলে বসে প্রসাধন করতে করতে গল্প জমে ওঠে। ভাই 'সর্বজননী' ঠাকুর দেখতে যাবি? কোথায় কোথায় কত দূরে কে ঠাকুর দেখেছে কত, বাড়ীর কর্ত্রী কোথায় কোথায় ঘুরে এসেছে সব গল্প হয়।

যুঁই বলে, 'ভাই সর্বজননী বলে কেন?'

বিজ্ঞভাবে কে জবাব দেয়, 'সকলের মা কিনা, জননী কিনা তাই। তাই এখন আমাদের ওসব জায়গায় দাঁড়াতে দেয়।'

দলনেত্রী বা বাড়ীর কর্ত্রী বলে, 'নাও গল্প রাখ, যারা দেখতে যাবে সব ঠিক হয়ে নাও।'

পূজা-মণ্ডপের ভিড় ভেঙে অসংখ্য ভদ্রমেয়েদের সঙ্গে তারা মিশে যায়। চোঙের মধ্য দিয়ে চেঁচিয়ে কার গলা একঘেয়ে নানা কথা বলে যাচ্ছে, কার ছেলে হারিয়েছে, কার ছেলে পাওয়া গেছে, কাকে ডাকছে সে শীঘ্র অমুক গেটে আসুক, সকলে সাবধানে টাকা পয়সা গহনা রাখুন, গলার হার সামলে নিন্, ইত্যাদি ইত্যাদির মাঝে তারা ভিড় পার হয়ে যায়। হঠাৎ বেরুবার পথে চোখে পড়ে সরিৎ দাঁড়িয়ে দু'তিনটি সুবেশ সুশ্রী মেয়ের সঙ্গে। একটি মেয়ের কোলে একটি সুন্দর ছেলে।

যুঁই মল্লিকাকে বললে, 'দেখ ভাই, সেই বাবুটি না! আর কি সুন্দর ছেলেটি দেখ মেয়েটির কোলে।' রাজকন্যার মত সুন্দর সুশ্রী মেয়েদুটি সরিতের সঙ্গে হেসে হেসে কথা কইছে। যুঁই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, অজানতেই যেন সেদিকে এগিয়ে কাছাকাছি

গিয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ দলের নেত্রী ডাকে, 'এই সব দল ছাড়া হচ্ছিস কেন? আ মর্ যুঁই, হাঁ করে দেখছিস কি?'

সরিতের আর তার সঙ্গিনীদের ঐ নারী-বাহিনীর দিকে চোখ পড়ে, যুঁই তখন মেয়েদুটির কাছে। অমেধ্যস্পর্শের মত তারা দুজন বিতৃষ্ণাভরে চকিতে সরে দাঁড়ায় যুঁইদের পাশ থেকে।

তাদের কানে আসে, 'একেবারে ঘাড়ে এসে পড়েছে। আর কি করে খোকার দিকে চাইছে! যেন গিলে খাবে। নজর দিচ্ছে না তো?'

একটু হেসে সরিৎ বললে, 'কে? চল, চল, যতসব বাজে কথা।'

অপ্রতিভ যুঁই পেছিয়ে এলো। মল্লিকা ধমক দিলে। দলনেত্রীও ধমকালে, বললে, 'আ মর, ভদ্রলোকের মেয়েদের ঘাড়ে গিয়ে পড়েছিস? ছেলে কি কখনো দেখিস্‌নি? শুনলিনি, বললে নজর দেবার কথা?'

যুঁই ভাবে, বাবুটি কি চিনতে পেরেছে, সেই বাবুটিই কি? না অন্য কেউ?

পূজা শেষ হয়ে গেল। অপ্রতিভ নির্বোধ যুঁই ভাবতে জানে না, কিন্তু তবু অনেক কথা মনে হয়। সেই বাবুদের কথা...আচ্ছা, তারা পড়াশোনার কথা জিজ্ঞাসা করলে যে? তা ও তো পড়তে জানে। আচ্ছা ছেলেটি কার, বেশ ছেলেটি, নয়? ওই মেয়েটি কে? বাবুটির বৌ না আর কে? কি রকম কটমট করে চাইলো মেয়েদুটো তার দিকে। ও তো ওদের কাছে শুধু দাঁড়িয়েছিল, কিছুই করেনি, ছেলের গায়ে হাতও দেয়নি। কিন্তু কি সুন্দর ছেলেটি...ভদ্রলোকদের বাড়ি আর বৌ-ছেলেমেয়ের কথা ভাববার চেষ্টা করে...

দুপুরবেলা ফিরিওয়ালা ডেকে যায়, পেরথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, ধারাপাত, লক্ষ্মীর কথা, শ্রীকৃষ্ণের শতনাম, চণ্ডীর কথা। সহসা যুঁই সচেতন হয়ে ওঠে। মল্লিকাকে নিয়ে আসে দ্বিতীয় ভাগ প্রথম ভাগ কিনতে।

মল্লিকা হাসে, বললে, 'দূর, আমাদের পড়ে শুনে কি হবে, তুই পাগল!'

'কিন্তু সেই অন্য বাবুরা যে বলাবলি করছিল পড়ে চাকরি করা যায়।'

'আ বুদ্ধি! সে বুঝি ওই পেরথম ভাগের পড়া!' মল্লিকা হেসে লুটিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে, আরও অন্য ঘরের মেয়েরাও।

তবু যুঁই বই কেনে, লুকিয়ে লুকিয়ে দুপুরে পড়ে, 'জল পড়ে,' 'পাতা নড়ে,' 'অকুতোভয়,' 'পরিবেশন'। লেখবার চেষ্টা করে শ্লেট নিয়ে। তার যেন মন ভাবতে জানে না, সেইখানে অস্পষ্টভাবে তার আশা ফুটে ওঠে, আবার কোন সময়—ঐ বাবুরা এলে সে দেখাবে সে পড়তে জানে, শিখেছে আরো!

তার সঙ্গিনীরা কিন্তু বুঝতে পারে সব, হেসে বলে, 'তোর রাজপুত্তুররা আর আসবে না। বৃষ্টির জন্যে একদিন এসেছিল।'

তাদের কথায় যুঁই চকিত হয়ে ওঠে। তার মনে হয় কিন্তু আবারো একদিন ঐরকমই বৃষ্টি হতে পারে, তারাও আসতে পারে। কিন্তু তারপরে কি? যুঁই শুধু স্বপ্ন দেখে তাদের পরিচ্ছন্ন সুশ্রী দীপ্ত মুখ আর শান্ত গম্ভীর কথা।...যেন কোন দেবলোকের লোক তারা।

তার পড়া ঐ 'জল পড়ে' 'পাতা নড়ে'তেই থেমে থাকে। যুঁই এখন ভাবে অনেক

কথা। অকস্মাৎ এক দুর্দমনীয় কি ইচ্ছা তার মনে জাগে, মনে হয় সে ঝিয়ের চাকরি করবে। তাহলেই বেশ দিন কেটে যাবে। টাকার অভাব থাকবে না।

সঙ্গিনীরা হাসে পরিহাস করে—বাড়িওয়ালী মাসী বকে।

সে তবু বলে, 'হ্যাঁ, কাজ করব।'

সবাই বলে, 'করুক. করুক, বাসন মেজে মরুক! গালাগাল খেয়ে মরুক!'

সঙ্গোপন কোন সাধ মনে নিয়ে সে চাকরি খুঁজতে যায়। যদি হঠাৎ সেই বাবুটিকে দেখতে পায়? যদি তাদেরই বাড়িতে কাজ পায়? কিম্বা সে-বাড়িতে যদি সে বেড়াতে আসে!...সব ভাবনা সে স্পষ্ট জানে না, তবু মনে ভাবে অনেক আকাশ-পাতাল।

মল্লিকার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে চাকরি খুঁজতে।

রাস্তায় ঝিয়েদের সঙ্গে দেখা হয়, তাদের কাছে খোঁজ নেয় কাজের।

ঝিয়েরা তাদের দিকে চেয়ে দেখে আপাদমস্তক। তারপর বলে,পারবে কি বাছা অত খাটতে? কেউ বা ইঙ্গিতময় ভাবে হাসে। কেউ সরলভাবে বলে, অমুক অমুক বাড়িতে কাজ আছে।

তারা খালি কাজের বাড়িতে যায়।

ঝিয়েদের মত গৃহিণীরাও তাদের দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর কেউ বলেন, 'না বাছা, আমার লোক এসেছে।' কেউ বলেন, 'তোমাকে দিয়ে হবে না বাছা।' কেউ বলেন, 'বড় কম বয়স, পারবে না তুমি।' কেউ বা এমন কাজের তালিকা দেন যে সে ভয়ে পেছিয়ে যায়।

কাজ খুঁজে খুঁজে যুঁই ফিরে আসে। আর তারপর দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে।

সঙ্গিনী রাত্রিচারিণীদের কোলাহলে ঘুম আসে না। আর নিদ্রাহীন চোখের সামনে ভাসে, কাজ খুঁজতে যাওয়া গৃহস্থবাড়ির গৃহিণীদের, তাদের পুত্রবধূ, মেয়েদের, তাদের বাড়ির তাদের ছোট ছেলেদের ছবি। কেমন বাড়িগুলি! মনে হয় ওরা কেমন সুখে আছে। বৌটি কেমন 'মা' বলে এসে দাঁড়াল, মেয়েটির মনে হয় ছেলেপিলে হবে। কিন্তু ওর দিকে তারা কিরকমভাবে চেয়ে রইল, কেন? গিন্নি কেন বল্লেন, 'না বাছা, তুমি পারবে না!' ও পারত—পারত নিশ্চয়। তার সুপ্তিহীন লুব্ধ মুগ্ধ মনের চোখের সামনে স্বামী-সন্তান পরিজন পরিবেষ্টিত মধুর জীবনযাত্রার ছবি ভেসে আসে। সিঁদুর-শাঁখা-শাড়ি পরা মেয়ে-বৌ, মোটা বালা-পরা গৃহিণী, সুশ্রী দীর্ঘকায় তরুণ যুবক 'মা' বলে বাড়ি ঢুকল একদিন দেখেছিল এক বাড়িতে, তাদের জীবন তাদের কথা....তারা কেমন.... ।

ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয় কে!

সে নিঃসাড়ে শুয়ে থাকে। আবার ধাক্কা পড়ে।

তারপর কে ডাকে, সে সাড়া দেয় না।...

একদিন দুদিন করে দিন কেটে যেতে থাকে।

যুঁইয়ের হাতের টাকা ফুরিয়ে যায়। খরচ কমিয়ে ফেলে, তবু মল্লিকার কাছে ধার হয়ে গেল ঘর ভাড়ার টাকা। ঝুমকো বাঁধা রেখে আবার ধার করে... অন্য খরচও তো আছে।

আর আবার দুপুরে কাজ খুঁজতে যায়।

এক বাড়িতে ঢোকে। গৃহিণী তাকে নিরীক্ষণ করে দেখলেন, তারপর বল্লেন, 'না বাছা, লোক দরকার নেই।'

তার পাশে আর একজন বর্ষীয়সী দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বল্লেন, 'এত গহনা পরা কেন বাছা? কাজ করতে এসেছ! লোকজনের গায়ে অত গহনা দেখলে গা কেমন করে!'

যেন কাজ করলে গহনা পরতে নেই! মুখরার মত মল্লিকা কি বলতে গেল, কিন্তু কি বলবে? তোমরা কেন পর? না—আমাদেরও তো পরতে ইচ্ছে হয়? না, পরলে দোষ আছে? কিন্তু কিছুই বলতে পারলো না। শুধু বেরিয়ে গেল তারা।

মল্লিকা বলে, 'আর চাকরি খুঁজতে হবে না। শুনলি তো কেমন কথা। আমি আর তোর সঙ্গে যাব না। মরণ তোর! গেরস্তবাড়ি তোকে রাখবে না।'

যুঁই চুপ করে থাকে। কিছু বলে না বা বলতে পারে না। কিন্তু এতদিনে সে কি ভাবতে শিখেছে? সেকথা জানে না, আর কেউই জানে না। শুধু কাজ খুঁজতে আর বেরোয় না।

রাত্রে বান্ধবীরা ডাকাডাকি করে, সঙ্গে যাবার জন্য গল্প করার জন্য, যুঁই চুপ করে শুয়ে পড়ে। ঘুমের ভান করে।

দিন রাত্রি যেন আস্তে আস্তে মন্থর গতিতে কাটে, হাতে পয়সা নেই, অনেক ধার হয়েছে, সঙ্গিনীরা আর ধার দেয় না। রাগ করে, ঠাট্টা করে, বিদ্রূপ করে বলে, রাজপুত্তুরদের ধ্যান করছে ও, ওর সব মন্ত্রীপুত্তুর কোটালপুত্তুররা এসেছিল যে একদিন! আসবে না, তারা আসবে না, এলে এতদিন আসত।

ভাবনায় ও বিতৃষ্ণায় অবসন্নভাবে যুঁই শুয়ে থাকে। কেউ আসে না ওর ঘরে।

সহসা অনেক রাত্রে কে ধাক্কা দেয়। ডাকে, 'দরজা খোলো।'

গলাটা চেনা। খাবারওয়ালার দোকানের সরকার চিনেমশাই। অনেক টাকা তার। মাঝে মাঝে আসে। কালো, মোটাসোটা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁপওয়ালা থেবড়া মুখ, চিনেমশাই ওকে ভালবাসে। ওর ঘরে আসে। তার টাকা আছে, ওর ঘরে আসে বলে বাড়ির সবাই ওকে হিংসে করে।...ওর তখন খুব অহংকার ছিল. কিন্তু এখন আর উঠে দরজা খুলে দিতে ইচ্ছে করে না। আজও করল না।

সে নিঃসাড়ে শুয়ে থাকে। চিনেমশাই হয়ত ফিরে যায়, নয়ত অন্য কারুর ঘরে গিয়ে বসে। আজ তার জন্য উদ্বেগ নেই তার।

রাত্রি গভীরতর হয়, রাত্রিজীবিনী নিশাচারিনীদের ঘরে কোলাহল থেমে আসে। অস্পষ্ট ব্যাকুলভাবে বিনিদ্র চোখে সে শুয়ে শুয়ে ভাবে, নানান্ সব গৃহস্থবাড়ির কথা যেখানে তারা রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয়, দিনে কাজকর্ম করে...। শান্ত নিস্তব্ধ তাদের রাত্রি আর কোলাহলময় দিন...সে কেমন লাগে?

আবার কে আসে, ধাক্কা দেয় দরজায়, সে সাড়া দেয় না।

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, ভাড়া বাকি পড়েছে একমাসের। মল্লিকার কাছে ও-মাসের ভাড়াটা ধার রয়েছে, মল্লিকা কাল টাকা চেয়েছিল। ও ভেবেছিল চাকরি করে শোধ দেবে, মল্লিকাও তাই ভেবে দিয়েছিল। চালও বাড়ন্ত। গহনা? চুড়ি? সেই যে সে-

বাড়িতে বলেছিল গহনা পরার কথা! সব কেমিকেল সোনার! ওর হাসিও আসে, চোখে জলও আসে।

দরজার বাইরে পায়ের শব্দটা অন্যদিকে চলে গেল।

সে চকিত হয়ে উঠে বসল। তারপর দরজা খুলে দিয়ে বললে, 'এসো।' হাতে তার একটিও পয়সা নেই।

না, কেউ নেই। কে এসেছিল, চিনেমশাই? সাধুচরণ?

সে যেন বাঁচে, আশ্বস্ত হয়, কেউ তাহলে আসেনি। পরক্ষণেই মনে পড়ে যায়, চাল বাড়ন্ত, ঘরের ভাড়া, আর ধার। চৌকাটের উপর নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। যদি তারা ফিরে আসে!

আকাশ-ভরা অসংখ্য তারা আর আঙিনার ওপর অন্ধকার পৃথিবী...যুগ যুগান্তর ধরে কোটি কোটি ওর মত মেয়ে হয়ত তারা এমনি দেখেছে...আজকে ওর দিকে মিটমিট করে চেয়ে আছে। তাদেরও হয়ত সেদিন চাল ছিল না ঘরে, পয়সা ছিল না হাতে।

♠ *গল্পভারতী*, ১৩৬৫

দর ও দস্তুর

পর, পর মা, গয়না পর।

ওরা কনে দেখে ফিরে গেল, গহনা কাপড় সব ছেড়ে ছাদের কোণে এসে বসে নিভার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল।

সূর্যাস্তের সময়। রাঙা হয়ে উঠেছে পশ্চিম দিগন্ত। কালো কালো মেঘ, একদিকে গোটাকতক সোনালী-পাড় কাপড়ের মতন পড়ে আছে। অন্য সময় ঐ শোভা দেখাতে সে ছোট বোনকে মেজ বোনকে ডাকে, আজকে তার চোখে ওসব শোভা হিসেবে পড়ছিল না আর। এমনিই চেয়েছিল।

আজকে ওরা আবার—বড়রা কেউ ছিল না—সব নাকি ছেলেটির বন্ধুরা,—ওকে ইংরিজী বাংলা লেখালে।

ওরা কি জানে না, ও লিখতে জানে? কেন, ছোটকা তো বললেন ওর সামনেই যে, ওকে সেকেন ক্লাস অবধি পড়িয়ে আমরা স্কুল ছাড়িয়ে নিয়েছি, বড় বড় মেয়ের স্কুলে যাওয়ার প্রথা আমাদের বাড়িতে নেই কিনা। তারপর বললে, গান জানে?

কাকা বললেন, জানে; কিন্তু ওর লজ্জা করবে মশাই, ছেলেমানুষ কিনা। একটা ছেলে একটু মুখ টিপে হেসে বললে, ছেলেমানুষই মেয়ে হয় মশাই।

গান গাইতে গলা কেঁপে গেল, ছাই হল গান। অত ছাই ও কোনদিন গায় না, এমন কি বিচ্ছিরি করে চেষ্টা করলেও ওরকম হয় না। কাকা কেন বললেন না, গান ও জানে না!

ওর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। ওরা নাকি সভ্য, ওরা নাকি সব বিদ্বান! ওদের বোনকে এদের কেউ অমনই করে দেখে!

মেজদি এল কাপড় কেচে, ছাতে কাপড় শুকুতে দিতে।

ওমা, তুই বুঝি এখানে বসে, আর মা সারা পৃথিবী খুঁজছেন! খাবার খাসনি যে? কাঁদছিস কেন?

ও রাগ করে বললে, কই কেঁদেছি? চোখদুটো সঙ্গে সঙ্গে জলে ভরে এল।

ওরে, এ দুঃখ সবারই করতে হয় রে, তোর একার নয়। আমাকে আবার আমার মামাশ্বশুর সমস্ত দালানটা হাঁটিয়ে নিয়েছিলেন। আর একটা কে ছিল, সে বললে, চুলটা খুলে দেখাননি কেন মশাই? বড় খোঁপা দেখে ভাবলে বোধ হয়, গুছি দিয়ে চুল বাঁধা। ও তো ভাল। সেই প্রতিমার—আমার ননদের মেয়ে রে, খুব সুন্দর দেখতে, মনে আছে তো? তাকে আবার দেখতে এসে সব বলে, মশাই, হাতে মনে হচ্ছে কড়া পড়েছে! নন্দাইয়ের রাগে মুখ লাল হয়ে গেল, তবু বললেন, টিপে দেখুন হাত। ছেলেটি এম. এ. পাস করেছেন, বাড়ি আছে নিজের, বাপ মা আছে, কি করা যায়, সবই সহ্য করলেন। কিন্তু এখন যদি হাতদুটো দেখিস তার! শাশুড়ী ঝি-চাকরের জল-বাটনা নেয় না। রোজ তাল তাল বাটনা বাটে, জল তোলে। মুখখানি কচি টুলটুল করছে, হাত দুখানা যেন কার! তা হলে কড়া পড়া তখন কেন যে বলেছিল, কে জানে!

কথাগুলো খুব আশাপ্রদ নয়। নিভা অবাক হয়ে শুনছিল। সে বললে, দিদি, তোমাকে তারাই পছন্দ করলে, যাঁরা হাঁটালে?

মেজদিদি বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই হাসলে, হাঁটালেন তো বাড়ির কেউ নয়, মামাশ্বশুর।

নিভা আরও অবাক হয়ে বললে, জামাইবাবুর মামা তো! তা তুমি সেখানে গিয়ে রাগ করনি, কিছু বলনি কারুকে? জামাইবাবুকেও না?

ওঁর দোষ কি? আর এ যে রেওয়াজ, সবাই এই করে।

নিভার রাগে গা জ্বলে যায়। কিন্তু মেজদির যেন সবই খুব সহজ মনে হচ্ছে।

পাশের বাড়ির ছাতে কে উঠলেন,বললেন, তোমাদের নিভাকে আজ দেখে গেল? কি বললে?

মেজদির উপদেশ-স্রোত থামল। কথার গন্ধ পেয়ে পুলকিত হয়ে আলসের ধারে গিয়ে দাঁড়াল, হ্যাঁ, দেখে তো গেল, এখনি কি কি বলবে, কিছুই বলেনি। (ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে) আর শ্যামবর্ণ কিনা তাই, সহজে কি পছন্দ করে? বাবা এই দুটি ছোট বোনের বিয়ে দিতে জেরবার হয়ে যাবেন ভাই। যে দেখছে সেই বলে, সব ভাল মশাই, কিন্তু রংটি যদি একটু ফরসা হত। গান গাওয়ালে, লেখা দেখলে, কত কি।

প্রতিবেশিনী একটু মুখভঙ্গি করে বললেন, লেখা নিয়েই বা কি করবেন? গানেই বা কি করবেন? সেই সুনীরার কথা মনে আছে তোর? সেই যে আমার ছোট পিসীমার মেয়ে? কি চমৎকার গলা, পাড়ার লোক দাঁড়িয়ে যেত গানের সুরে তার। রং তেমন ছিল না, ঐ গানের আর বাপের টাকার জোরে বিয়ে তো হল, এখন শুনি নাকি বর কারুর কাছে কোন জায়গায় গান গাওয়া পছন্দ করে না। বড্ড খপিশ! বলে, মেয়েদের আবার বিয়ের পরে গান কি! কোনখানে পাঠায় না। মেয়ে-যজ্ঞিতেও গাইতে বারণ, কাজের বাড়িতে পাঁচটা পুরুষ আসে তাই।

মেজদি বললে, অথচ মরবে সব বিয়ের সময় সব জিজ্ঞেস করে। যার হাতে পড়বে সেই যদি ওসব না চায়—ছাই দরকারেও লাগে না।

তা দরকারে লাগে না বটে, কিন্তু সুনীরার মেয়েটি যে কি চমৎকার গায়!

মা এলেন, কথায় বাধা পড়ল।

হ্যাঁরে, নিভা কই? কি সব ঢং বল তো, খাবার খেলে না অবধি! চিরকালকার জিনিস, তারা নিয়ে যাবে—দেখবে না? দেখেছে তো মেয়ে অমনি গলে গেলেন!

মার পেছন দিয়ে নিভা নেবে গেল।

ভাল লাগে না জানি, তা কি করব ছাই!—একসঙ্গে এত কথা এবং এত রাগ গলার কাছে জড় হল যে, মার আর কথা বেরুল না মুখে।

অনেক রাত্রি।

ছোট ছেলেরা সকলে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়েছে। পুরুষদেরও খাওয়া চুকেছে, মার কাজ সারা হল।

পাশের ঘরে মেয়েছেলেরা ঘুমোচ্ছে, নিভাদের বাবা এ ঘরে চুপচাপ শুয়ে আছেন।

নিভার জননী জলের ঘটি, দুধের বাটি, পানের ডিবে, মিছরি বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। একে একে সবগুলি যথাস্থানে নাবিয়ে স্বামীর বিছানার পাশে এসে বসলেন।

তারপর?

স্বামী বললেন, কিসের?

এই যে গো, নিভাকে দেখে কি বললে? পছন্দ করেছে ছেলে?

স্বামী বললেন, কাল ওর বোনেরা, মা আর ঠাকুমা আসবে দেখতে। ছেলের ছোট ভাই ছিল, বলে গেল।

মাতা পিতা দুজনেই জানালার পথে রাস্তায় গ্যাসের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

অবশেষে মৃদু নিশ্বাস ফেলে মা বললেন, মেয়েটার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, কতবার যে সব দেখলে!

বাপ চুপ করে রইলেন।

মা বললেন, দেখ না, সেবার নরেশবাবুরা হাঁটালে, বিষ্টুবাবুরা কি সব বলে গেল! তারপর জগন্নাথবাবুরা মুখের ওপর 'কালো' বললে!

মা আবার বললেন, ওরা নাকি বলে, আমাদের চেয়ে বাজারে মাছের দর আছে।

নিভার পিতা অন্যমনে শুনছিলেন, শেষ কথাটায় একটু হাসলেন, বললেন, মিছে বলে না।

খানিক চুপ করে বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা ঘুমোচ্ছে?

মা বললেন, হ্যাঁ।

রাত্রি গভীর হয়ে এল, ক্লান্ত স্বামী ঘুমোলেন।

নিভার মার চোখে আর ঘুম এল না। মনে হয়, বারে বারেই নব অভিজ্ঞতায় এই একই অভিনয় দেখছেন। অসম্মান, সম্মান, অবমাননা, অত বোঝে না মন, শুধু একে একে মনে পড়ে কত বিয়ের কথা, জানাশোনা, স্বজন আত্মীয়—কত কথা।

কারও বা গহনা, কারও বা গহনার ওজন, কারও বা গহনার রং, কারও বা নিজেরই রং; কারও বা তুচ্ছ কথা, কারও দরিদ্র পিতামাতা, যা হোক অমনিই তো হয়ে থাকে। বলে, লক্ষ কথা না হলে বিয়ে হয় না।

ছোট বোন সুধারই তো বিয়ের পরদিন কুশণ্ডিকার আগেই গহনা ওজন করে দেখেছিল তারা। যাট ভরিতে দেড় ভরি কম ছিল। কাঁটা হয়ে ওঠেনি। তাঁদের বাপ গিয়ে তাড়াতাড়ি কাঁটার ত্রুটি সেরে নিলেন কাঁটা দিয়ে।

হয়তো তখন সুধার মনে একটু কাঁটা ফুটেছিল।

তা হোক। আজ সুধার ঐশ্বর্য দেখে কে! ছেলে মেয়ে সুখ ঐশ্বর্য ঘর বাড়ি হীরে মুক্তা!

আহা, তা বেঁচে থাক। আহা, বাবা দেখে যাননি। কিন্তু—

তা কি হবে, এইরকমই তো সব ঘরে!

রাত্রি গভীর হয়ে আসে। ছেলেমেয়েরা সব ঘুমোচ্ছে। মা তাঁর কালো মেয়েটির মুখের দিকে একবার চান। গ্যাসের আলো ঘরে পড়েছে, তারই সামান্য আলোয় দেখা যায়, খোকার গায়ে চাদর নেই, নিভার মাথার বালিশটা কোথায় সরে গেছে। ঠিক করে দিয়ে মা শুয়ে পড়েন।

আকাশে নিস্তব্ধ শান্তি। এক আকাশ তারা ঝিকমিক করে ঘুমের রাজত্বে চেয়ে আছে।

পরদিন বৈকালে ছেলের মা আর অন্য পরিজনরা দেখতে এলেন ভেতরে, আর বাইরে এলেন বাপ, মাতুল, কাকা।

পূর্বদিনের চেয়ে বেশি করে সাবান স্নো ঘষে রংটা অনেকটা খসখসে করে, মাথা ঘষে চুল খুলে মাথাটা মাথার তেলের বিজ্ঞাপনের মতন করে শাড়ির সঙ্গে জামার রঙে মিল করিয়ে, ভেবেচিন্তে অনেক পরিশ্রমে শ্যামা মেয়েটিকে সবাই সাজাল।

অবাধ্য অপমানবোধ কেবলই নিভার চোখের কোলে উপছে জল পাঠায়। আর দিদিরা ধমক দেয়।

কাকে আবার না দেখেছে, কে আবার না দেখে! তোর রকম দেখে বাঁচি না—চোখ-মুখের কি ছিরি হবে!

মেজদি বললে, বেশ দেখাচ্ছে এবার। নিভার মুখখানি যে বেশ।

যথারীতি প্রণামাদি ও শিষ্টাচারের কথা সমাপ্ত করে মেয়ে দেখা। মেয়ে অন্দরে প্রেরণ করাও হল।

খোশগল্পে আসর জমকে ওঠে। যথারীতি দেশের কি অবস্থা, বেকার-সমস্যা, ঘি-দুধের দুর্মূল্যতা, পাস করার নিষ্ফলতা এবং না-পাস করা কেঁইয়াদের উপার্জনে কৃতিত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গে এসে ছেলের মাতুল পৌঁছলেন।

বলবেন না মশাই, রাম রাম, কি যে সব হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্যাপার, আমরা তবু রোজগার করছি, ছেলে ব্যাটারা আর খেতে পাবে না।

পাত্রীর পিতা 'আজ্ঞে হ্যাঁ' বলে সমর্থন করলেন। তারপর কন্যাদায় ও তারপর পাত্রপক্ষের নানারকম অভদ্রতার কথাও ওঠে।

এবার পাত্রীর পিতা কিছু বলতে পারেন না। কে জানে, যদি কারও গায়ে বাজে!

কিন্তু মশাই, আসল ব্যাপার হচ্ছে এই কালোকে ফরসা করতে জানা। মাতুল ডাক্তার, বেশ নাম-করাও। উৎসুক হয়ে শ্রোতারা মুখের দিকে চেয়ে রইল, ভদ্রলোক কিছু ঔষধ বললেন না কি?

অট্টহাস্যে মাতুল বললেন, তা হচ্ছে মশাই এই—রং অনুপাতে রৌপ্যমুদ্রা, ওষুধ-বিষুধ নয়; এই আমাদের পাড়ায় সম্প্রতি একটি যক্ষ্মাকালো মেয়ের বিবাহ হল। বাপ বেশ বড় কাজ করে। মেয়ের মুখ তাকিয়ে দিলে মশাই। বলব কি, আট হাজার নগদ দিলে। ছেলেটি সোনার চাঁদ—যেমন রূপ, তেমনই গুণ। খরচ করলে যেমন, পেলেও তেমনই। বুঝলেন কিনা? মাতুল আবার উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়ে দিলেন। অবশ্য আমরা অর্থাৎ আমার ভগ্নীপতিদের টাকা নগদ নেওয়ার প্রথা নেই; তবে—

বিমূঢ় অপমানিত বেদনায় অনুজ্জ্বলবর্ণা মেয়ের পরিজনরা হাসবার চেষ্টা করলে তাঁর সঙ্গে, পাছে ভদ্রতার লাঘব হয় আর তাতে মেয়ে-পছন্দতে ত্রুটি ঘটে।

নিভা ওপরে উঠে এল। এবার মা জলটল খাওয়াবেন ওদের। আর চোখে জল এল না। যা হোক একটা নিষ্পত্তি—এস্পার কি ওস্পার হয়ে চুকে গেলে ও বাঁচে।

এ বাড়ির ও বাড়ির চিনু বিনু রুণু রেবা আশা সব বারান্দায় ছাতে দাঁড়িয়েছে।

নিভা উদাসীনভাবে ছাতের অন্য এক কোণে দাঁড়ায়। গল্পের কথা কানে টুকরো টুকরো ভেসে আসে।

জান ভাই, আমার বে'তে পাঁচবার দশবার দেখাদেখি কিছু হয়নি। যেমন শাশুড়ী দেখলেন, অমনই সব কথা ঠিক হওয়া।

তা ভাই, তোমার বাবা যে তেমনই ছ'হাজার করে খরচ করেছিলেন! তোমাদের ঐ সুধার কেন অত নাকাল?

দেখতে তো সুধা ভাল নয়। আর কাকা তেমন খরচ করলেন কই।

এইবার একটি মুখরা মেয়ের গলা শোনা গেল বেশ জোরে, তা বলে তোরা যারা রূপসী তাদেরই সব ভাল হবে? তা হলে তোদের লীলার কেন ভাল ঘরবর হল?

সে যে তার বাপের একটিমাত্র মেয়ে, অত বিষয় সেই পাবে। আর কালো, তা মুখখানি কি সুন্দর! স্বামী খুব আদর-যত্ন করে।

মুখরা মেয়েটি শ্যামা, বিদ্রূপ-হাস্যে সে বললে, তাই বল, আসল কথা টাকা, তাই মুখখানি ভাল, তাই তার শ্বশুরবাড়ির যত্ন!

যে তর্ক করছিল সে বললে রাগ করে, তা টাকা তো কি? যার বাবার আছে, তিনি দেবেন না?

কেউ হারে না, নানামুখী তর্ক চলে।

রাত্রি হল। অন্ধকারে নিভা একলা ছাতে শুয়ে ভাবে।

মনের একপাশে দাঁড়ায় আকাশভরা তারা, অন্য ধারে পৃথিবী-জোড়া অন্ধকার।

সেদিন দিদি এসেছিল। ওপরে এল তারা।

হ্যাঁরে, ওপরে একলা?

নিভা উঠে বসে।

সেই একই কথা। দিদি বেশ করে বসে সান্ত্বনা দেবে ভাবে, বলে, এমনিই হয়েছে ভাই। সে তাদের পাড়ার কার কন্যাদায়ের নিদারুণ মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যা দেয়। আর উপসংহারে বলে, কি করবি, এমনই ঘরে ঘরে।

তারপর মেজদি তার মামাশ্বশুরের শ্বশুরবাড়ির কার এক কন্যাদায়ের ভয়াবহ অথচ উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দেয়; অর্থাৎ কৃষ্ণা মেয়েটি বিয়ের পরে নাকি আত্মহত্যা করে। তার উপসংহারে সে বলে, তার চেয়ে আমাদের নিভা দিবা ঢের ফরসা—

রাত্রিও বাড়ে, গল্পও বাড়ে। আসর জমে ভূতের গল্পের মত। নিজ নিজ নিতান্ত নিরীহ নিরপরাধ হৃদয়বান অথচ পিতৃমাতৃভক্ত স্বামীদের বাদ দিয়ে—অন্য সকলের ভদ্রতাহীন বিয়ের কথা বলে। শ্বশুরালয়ের খোঁটার কথা বলে।

নিভা আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে থাকে। বর এবং বরপক্ষীয়দের সম্বন্ধে তার ধারণা তো খুব ভাল হয়ই না, বরং বেশ ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে।

অনেক রাত্রে দিদি গেল ছেলে শোওয়াতে।

চুপ করে থেকে থেকে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, আচ্ছা ভাই মেজদি, মেজ জামাইবাবুরাও তো অমনই করেছিলেন?

মেজদি সোজাসুজিই বললে, দেনা-পাওনার কথা আবার কোন্ বিয়েতে না হয়? হয়েছিল বইকি। তা সে তো আমার দিদিশাশুড়ী আর শ্বশুর করেছিলেন। উনি তার কি জানেন?

মেজদির স্বামীকে ভাল বলবার সরল প্রচেষ্টায় নিভার হাসি পেল। সে একটু চুপ করে থেকে বললে, তা হলেও ভাই উনি তো মা-বাপের ছেলে, বলতে পারতেন না কি?

মেজদি বললে, তা কি করে বলবেন? মাথার ওপর গুরুজন বাপ মা, তাঁরা যা করবেন ভালর জন্যেই তো? আর এ তো সবাই করে।

নিভা অপ্রস্তুতভাবে বললে, তা হলেও অত বিদ্বান জামাইবাবু—

মেজদি বললে, তাতে কি?

নিভার অন্তরে বিদ্বান পুরুষসমাজের ওপর ঈষৎ শ্রদ্ধা ছিল তখনও। সে ভাবত, বোধহয় তারা পৌরুষে দীপ্ত, আকাশের মত উদার, অচলের মত দৃঢ়, সমুদ্রের মত গভীর। নিত্যকার ছোট ছোট দৈন্য, ক্ষুদ্রতা, লোভ তাদের স্পর্শ করে না।

আবার সে বলে, আচ্ছা ভাই, তোমার শাশুড়ী নাকি বড় খোঁটা দিয়েছিলেন বাবাকে, তাতেও জামাইবাবু চুপ করে রইলেন?

তা কি করে বলবেন?—তুই এক পাগলী। মা-বাপকে বলা যায়? হলই বা শোনালেন আমার শাশুড়ী। তাঁদের হল গিয়ে ছেলে, আমার বাবার মেয়ে! লোকে কত কথা বলে, তাঁরা আর এমন কি বলেছেন? বিয়েতে লক্ষ কথা হবে, আর ছেলের পক্ষ মেয়ের পক্ষকে বলবে, এই হল ধারা।

যুক্তিসঙ্গত জবাব পেয়ে নিভা চুপ করে গেল।

আকাশের এক প্রান্ত থেকে কৃষ্ণা-তৃতীয়ার বাঁকা সোনার থালার মত চাঁদ উঠল। মা ডাকলেন, ওরে ও মেয়েরা, কত রাত্তির হল, ছেলে-মেয়েকে খাইয়ে নে না? নিভাকেও খেতে ডাক।

নিভা উঠল।

এবারে সে কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা দিদিভাই, তোমাদের জামাইবাবুদের ভাল লেগেছিল?

তার ষোলো বছর পার হয়ে গেছে, গল্পের বই পড়ারও প্রচুর সময় ছিল, কাব্য-জাগতিক আদর্শ স্বামী সম্বন্ধে কল্পনার যথেষ্ট অবকাশ ছিল।

মেজদিদি উঠছিল, হেসে গড়িয়ে পড়ল, স্বামীকে ভাল লাগবে না? কেন? শোন একবার মেয়ের কথা! হাসিয়ে পাগল করতে পারে ও! মাগো, ওদেরও তো বিয়ে হয়েছিল সব, কই, এসব কথা তো ভাবেওনি! মেজদিদি, দিদি আর মার কাছে এত হাসির কথা বলতে নেবে গেল।

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে নিভা দিদিদের ছোট ছেলেদের ঘুম পাড়াতে মার কাছ থেকে নিয়ে এল।

আদর কাড়াতে নিভা পায় না, আদরই পায়নি। দর থাকলে আদর থাকে। বোনেদের প্রথম নয় শেষ নয় সে, আদর কাড়াতে অপ্রস্তুত মনে হয়।

তবু অনেক রাত্রে যখন দিদিরা ঘুমোল, ছেলেরা ভাইয়েরা ঘুমোল, মার পায়ের শব্দে নিভা উঠে বসল। সবাই ঘুমোচ্ছে।

জননীর চোখ পড়ল, কি রে?

একটু জল খাব।—উঠে এসে কুঁজো থেকে জল খায়।

কলকাতার আকাশ ঝাপসা জ্যোৎস্নায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে মহানগরীর দিকে চেয়ে আছে। পাড়ার প্রায় সব বাড়িই অন্ধকার।

মা তখন ভাবছিলেন, স্বামীর কাছে গিয়ে কিছু পরামর্শ করবেন, জিজ্ঞাসা করবেন।

নিভা এসে দাঁড়াল কাছে।

কি রে?

আমার ওরকম করে বিয়ে দিও না মা।

কি রকম করে?—মা ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

ঐ কেবলই টাকা আর গয়না দিয়ে। আমি ওদের ভালবাসতে পারব না। তার চোখ ছলছল করে এল।

শোন কথা! ওরা টাকা নিয়ে বিয়ে করবে, তার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ কি? পাগল আর কি! এঁরাও তো টাকা নিয়েছিলেন।—

তাঁর নিজের ভালবাসার কথা মা আর বললেন না।

রাত হয়েছে, যা শুগে।

বাপ জেগেই প্রায় ছিলেন; জিজ্ঞাসা করলেন, নিভা কি বলছিল?

মা বললেন। নিভার বাপ একটু চুপ করে থেকে একটু হেসে বললেন, তা ভালবাসার ব্যাঘাত হয় না। দৃষ্টান্ত যা দিয়েছ, তার জবাব দেবার উপায় ওর আর নেই, আমারও নেই।

স্ত্রী অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

কথা উল্টে বললেন, ওরা কি বললে? জবাব কবে দেবে? পছন্দ হয়েছে?

স্বামী বললেন, ওরা বলে গেল, মেয়ে পছন্দ হয়েছে ওদের, রং ফরসা করার উপায়ও একটা বাতলে দিয়েছে, সেটা হলেই ওরা বিয়ে সামনে বৈশাখে দেবে।

উৎসুক নিভার মা জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি উপায়?

কিছু বেশি টাকা। নগদ ওরা নেয় না, কিন্তু রকম নেয়।

খানিক চুপ করে পত্নী বললেন, তা কি করবে?

তাই দোব আর কি। ছেলেটি ভাল, স্বাস্থ্য ভাল, বাপের অবস্থা ভাল, বাজারে দর আছে। তা ছাড়া মেয়েকে গয়নাগাঁটি দেব, আদরও করবে। তারপর একটু থেমে ঈষৎ হেসে বললেন, আর তুমি তো বলেছ ঠিকই—ভালবাসতে কোনই বাধা হয় না।

ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

স্ত্রীধন

অঙ্গনে শ্রাবণধারার ঝমঝম শব্দের বিরাম নেই। বেলা যে কতটা কিছুই বোঝা যায় না, পূর্ব-পশ্চিম সমান অন্ধকার, দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা যে কোনও সময় হতে পারে—মনে হচ্ছে।

দালানে, ঘরেও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মল-পায়ে ঝমঝম করে বেড়াচ্ছে। কান্নার কোলাহলে, ভুরিভোজনের আয়োজনে, ধারাবর্ষণে বাড়ি মুখরিত।

ফুলের মালায় খোঁপা জড়ানো, হাতের কাজললতাখানি কখনও মাথায় গোঁজা, কখনও হাতে, উপবাসক্লিষ্ট কোমল মুখখানিতে চন্দন-তিলক আঁকা, একটি ঘরের এক কোণে কনে বসে আছে। আশে-পাশে সম-অসম-বয়সী সখীরা দিদিরা বধূরা নানাবিধ কথার চর্চায় মশগুল। বেশিরভাগই আপনার আপনার বিয়ে, বিয়ের দিনের কথা—কি রকম গোলমাল, বিষ্টি পড়া, কত রাত্রে লগ্ন, কি ভীষণ ঘুম পাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

একটু বড় জনকতক এলেন।

খাওয়া হল তোমাদের দিদি?

দিদি মাথা নাড়লেন। বোঝা গেল বেলা তিনটে পার হয়ে গেছে।

কি কি দেওয়া হল রে সুকু? সবই কি প'রে আছে?—দিদি সম্বোধিতা, একটি কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করলেন।

সুকুমারী বললে, না, রাত্তিরে পরানো হবে, এখনও সব পরানো হয়নি; আমি জানি না সব কি কি।

তোরা কে কি দিলি?—আর একজন প্রশ্ন করলেন।

বছর দেড়েক আগে মাত্র বিয়ে হয়েছে। সুকুমারী ভাবনায় পড়ল। আলাদা কিছু দিতে হয়, সে তো জানে না, সে জানে কুটুম্বরাই দেন। দিদিদেরও দিতে হয়?

অপ্রস্তুতভাবে বললে, জানি না তো।

কথার স্রোত অন্যদিকে বইল, সুকুর বিয়েতে অনেক খরচপত্র হল কিনা, জ্যেঠামশায়ের রাগ হল।—দিদি বললেন একজনকে। কনে, কনের দিদি সুকুমারী যেন নেই সেখানে।

তাইতে বুঝি সুনীতির গয়না কম-কম হল?—অপরা জিজ্ঞাসা করলেন।

হবেই তো। ওকে যে বেশ ভাল ঘরে দিলেন, প্রথম মেয়েটি। মানুষ আর কি বারে বারে পারে? দেখি রে তোর চুড়িটা?

দিদি সুকুমারীর হাতখানি টেনে নিলেন, চমৎকার দুগাছি চুড় অর্থাৎ একটু চওড়া চুড়ি।

কে দিয়েছে? শাশুড়ী?

না, বাবাই তো দিয়েছিলেন।—সুকু জবাব দিলে।

সকলেরই চোখ কনের মণিবন্ধে পড়ল, কনেরও চোখ দিদির চুড়ির দিকে পড়ল। কনের হাতে সোনার সরু সরু চুড়ি কগাছা ক'রে।

সবাই চুপ করেই রইল। আবার অন্য পথে কথা চলল।

বাপ রে, কি বিষ্টি নেমেছে! বলে, ধারাশ্রাবণ, ঠিক তাই। আজকেও দেখছি, কাঁথা-চাদর কিছু শুকোবে না, কি করে যে শোবে সব!

সকালবেলা বর-কনে-আশীর্বাদের সময় দেখা গেল, সুকু তার চুড় দুগাছি বোনকে দিলে।

সঙ্গিনী একজন জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁরে ওটা দিলি যে? শাশুড়ী জানেন? বলেছেন?

ওটা ওর ভারী পছন্দ। আর শাশুড়ী আর কি বলবেন? সুকুমারী নতমুখী কনের স্বল্পাভরণ অঙ্গের দিকে চেয়ে ছিল।

হ্যাঁগা বউমা, তোমার দুগাছা চুড় দেখছি না, তোমার বাবা যে দিয়েছিলেন সেই? ফেলে এসেছ? মাকে চিঠি লিখে দাও। কি অসাবধান বাছা! শাশুড়ী বধূর গহনা লোহার সিন্দুকে তুলছিলেন।

বধূ অপ্রতিভ মুখে এসে দাঁড়াল, সেটা মা, সুনীতিকে আশীর্বাদ করেছি।

অবাক!—বলে শাশুড়ী আধমিনিট চুপ করে রইলেন। অবাক হবারই কথা।

বলা নেই কওয়া নেই, দিয়ে দিলে? আমাকে একবার বলতে হয়, মরিনি তো! আর, কেমন আক্কেলই বা তোমার মার, তোমার জিনিস নিয়ে দিয়ে দেয়?

বধূও অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে ভেবেছিল, তার জিনিস হলেই বুঝি সে দিয়ে দিতে পারে।

আমি তো জানতুম না মা, আমি ভেবেছিলাম, ওটা তো আমারই—

বাধা দিয়ে শাশুড়ী বললেন, আমারই হলই বা। তোমারই বলে কি বড়দের একটি জিজ্ঞেসাবাদ নেই? তা না হয় তুমি জান না, ছেলেমানুষ, তোমার মা-বাপেরও তো একটা বিবেচনা আছে!

মা তো জানেন না, মা।— অতি মৃদু স্বরে বধূ বললে। তার প্রায় চোখ ভরে এসেছিল।

হ্যাঁ, মা জানে না! তোমার বাছা সবতাতে জবাবটি দেওয়া চাই। শাশুড়ীর অনেক বিরক্তিতে মনে মনে নানাবিধ কথা উঠছিল—এই বে-আক্কেলে নেকামি আস্পদ্দা গোছের।

কি মা?—ননদ এসে দাঁড়ালেন।

যথা-প্রথা সমালোচনা-আলোচনা হল। মা পাঠালেন ছেলেকে, সব কথা বলে বিহিত করতে।

বিহিত হল। সুকুর বাবা এলেন, হাতে দুগাছা নতুন সেই গড়নের চুড়।

শাশুড়ী বললেন, হ্যাঁ তাই তো, উনি হলেন গিয়ে জ্ঞানমান ব্যক্তি। তুলে রাখ এখন তোমার কাছে।

ঘরে এসে ছলছল চোখে মেয়ে বললে, বাবা, আবার কিনলে? ও যে আমার ছিল, তুমিই দিয়েছিলে।

বাপ হেসে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, পাগলী, হলই বা তোর, এদের না জিজ্ঞেস করে হল কিনা—

মানে বুঝতে পারা যায় না, মেয়ে চুপ করে রইল একটুখানি। কিন্তু এ তো ওঁদের দেওয়া নয় বাবা, আর আমার জিনিস আমি কাউকে দিতে পাব না? চোখ ছাপিয়ে উঠল। তবে আর শুধু পরে কি হবে?

বাপ তেমনই হেসে মেয়ের মাথায় মৃদু মৃদু আঘাত করতে লাগলেন, এই রকম করতে হয় মা, তুমি ছেলেমানুষ, জান না।

বাপের সার্থক ঘরে দেওয়া হয়েছিল। যাকে বলে, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী থাকা। সুকুমারীর গহনার পর গহনা, কাপড়-চোপড়, বাড়ি-ঘর, গাড়ি-ঘোড়া, ঐশ্বর্য, তিন ছেলে, এক মেয়ে।

অনেকেরই ঈর্ষার ভাগ্য।

মেয়ের আর দুটি ছেলের বিবাহ হয়েছে.

সুকুমারী সিন্দুক খোলেন, সব জিনিস নাড়াচাড়া করেন, গোছগাছ করেন। ভেতরে বাইরে সব জমজম করছে।

সুনীতির পর যাদের বিয়ে হয়েছে, শাশুড়ী স্বামী তাঁদের মাকড়ি কিনে দিয়েছেন, আংটি কিনে দিয়েছেন, কখনও বা মাথার ফুল-কাঁটা দিয়েছেন। মনের কোনখানে কখনও বেজেছে; কিন্তু সব অভ্যেসেই কড়া পড়ে তো।

কিন্তু যাই হোক, ঘর-কন্না তার, স্বামী-পুত্র তার, ঐশ্বর্য—ঐশ্বর্যের যদি আনন্দ থাকে, গর্ব থাকে, সব তার;—মুষ্টিভিক্ষের চাল থেকে লোহার সিন্দুকের চাবি তার।

সুতরাং পুরোনো কথা ভাববার অবসর নেই, বেদনাবোধও নেই।

চাল সে যত ইচ্ছে খরচ করতে পারে, তারই তো! টাকাও সে খরচ করে, তা পাঁচ থেকে পনরো কুড়ি টাকা অবধি নিজেই খরচ করতে পারে; তারপরে অবিশ্যি জিজ্ঞেস করতে হয়, কিন্তু তারই তো! আর কারুর তো নয়!

অবসরহীন দিন। ডায়ার্কি-প্রণালীতে সংসার চলে; দায়িত্বপূর্ণ পরিচালনায় সমস্তক্ষণ নিযুক্ত থাকতে হয়; ষোলআনা ভার। স্বামী অবধি মাঝে মাঝে পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন, ছেলেরা সুবিনীত।

লোকজন চাকর-ঝি, স্বজন-কুটুম্ব, দান-ধ্যান, গৃহিণীপনাতে নিরবসর দিন কাটে।

ভাই-বোনদের কখনও মনে পড়ে, কখনও পড়ে না। মাঝে মাঝে বাপকে মনে পড়ে—মধুর আনন্দে, নির্মল কৃতজ্ঞতায়। ক্ষোভের অবসর নেই। সরল গর্বে আনন্দময় হয়ে দেখে। তারই সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাপ দেখেছেন, স্বামী দেখছেন, ছেলেরা দেখে।

চাকাটা অন্যদিকে ঘুরল। কর্তা গেলেন। সুকুমারীর শরীর-মন ভেঙে পড়ল।

কালের নিয়মেই, ভাঙা শরীরে সুকুমারী আবার ওঠেন।

কিন্তু 'কিন্তু' জাগে অনেক। তবে মন মায়ার বশ, ভুলেও যায় সব।

পশ্চিমের দিকে সুকুমারীর আয়ুর চাকা ঘোরে। ছেলেরা এসে কাছে বসলে মাঝে মাঝে বলেন, বাবা, শরীর তো বড় খারাপ, এইবার তোমাদের সব ভাগ-যোগ করে দিই।

ছেলেরা বলে, তাড়া কেন মা?

ছেলেরা কিন্তু ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পেয়েছে।

বউদের ভোট দেবার অধিকার, অর্থাৎ ঝি-চাকর ছাড়াবার রাখবার ক্ষমতা।

বউয়েরা নিমন্ত্রণে যাবে, শাশুড়ীর শোবার ঘরে এসে দাঁড়াল, শাশুড়ী চাবি দিলেন।

সিন্দুক খুলে দুই বউয়ে গহনা নিতে বসল।

ভাই, দেখ, মার চুড়গুলো কি চমৎকার।

মেজবউ বললে, কে বলবে সেকেলে গড়ন, যেন ঠিক এখনকার মতন। আমি সেদিন জাস্টিস মিত্তিরের বউয়ের হাতে দেখেছিলাম।

মেজবউয়ের বাপ বেশ বড় উকিল।

মার কানে গেল, বললেন, তা তোমরা পর না বাছা, যার যা ইচ্ছে হয়। সীতাহারটি মেজবউমা পর। বড়বউমা, চুড় দুগাছা পর। আর ওপর-হাতের তাবিজ আর বাঁক, দুজনে দুজোড়া পর।

তোমার সব গয়নাই কিন্তু মা বেশ শৌখিন, একেলে ধরনের।—বড়বউ বললে।

মেজবউ বললে, মা, তোমার সব গয়নাই কি বাবা দিয়েছিলেন তোমায়? এই সব চুড়, মুক্তোর মালা?

না, চুড়জোড়াটা আমার বাবা দিয়েছিলেন। তিনি খুব সূক্ষ্ম পছন্দর লোক ছিলেন। কোন্ বিলিতী দোকান থেকে করিয়ে এনেছিলেন। আরও অনেক গয়নাই দিয়েছিলেন তিনি। আর কতক আমার শ্বশুর, কতক তোমার শ্বশুরও দিয়েছিলেন এদানি। মুক্তোর হারছড়াটি আমার শ্বশুর আশীর্বাদ করেছিলেন।

অতীতের সুখের ছায়াপথে মন একবার থমকে দাঁড়াল।

সুনীতিকে চুড় দেওয়া, তাই নিয়ে কথা শোনা, বাপের কথা; তারপরে শত শত জায়গায় যাওয়া-আসা; বসনভূষণের, শ্রী-গড়নের প্রশংসালাভ। কৃতজ্ঞ, ব্যথিত আনন্দে মা-বাবাকে মনে পড়ল, স্বামীর কথা মনে হল।

বউয়েরা নিমন্ত্রণে চলে গেল।

গহনাসূত্রে অনেক কথাই মনে পড়তে লাগল।

সন্ধ্যের পর ছেলেরা এসে মার কাছে বসল। মার মনে হল, আর দেরি করে কি হবে? ইচ্ছেটা প্রকাশ করলেন।

বড় বললে, তোমার কি নেহাৎ ইচ্ছে? তা হলে হোক।

বাড়ির ভাগ, বাসনের ভাগ, চুল চিয়ে কড়াক্রান্তি ক'রে হয়। পেতল, কাঁসা, তামা, লোহার বাসনই কি কম? আট সিন্দুক বাসন-কোসন—দোল-দুর্গোৎসব সবই আছে। রূপার বাসনই এক সিন্দুক—বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পৈতে-ক্রিয়াকাণ্ডে সব বেরোয়।

তবু মা কি ভাবেন কেবলই। শেষে একদিন জপের পর রুগ্ন দেহে বারান্দায় বসে ভাবতে ভাবতে মনে হল, আর দেরি করা নয়।

ছেলেরা এল।

মা বললেন, দেখ বাবা, সব তো করলাম, এইবার আমার দু-চারখানা যা গয়না আছে আর কিছু নগদ টাকা আছে, তার ভাগ করলেই নিশ্চিন্ত হই।

কি রকম ভাগ করতে চান? ছেলেরা চুপ ক'রেই রইল।

বলতে আর পারেন না, ইতস্তত ক'রে শেষে বললেন, সরিকে ভাল ঘরে দিতে পারিনি, তেমন কিছুই ওর নেই, আমার নগদ টাকা কটি আর গয়নার অর্ধেক ভাবছি তাকে দিই, আর যা থাকবে বাকি, তা থেকে শৈলেনের বউয়ের জন্যে, আর কিছু কিছু এ বউমাদের থাক। এইটি হলেই নিশ্চিন্ত হই।

খানিকক্ষণ ছেলেরা চুপ করেই রইল।

বড় ছেলে খানিক পরে বললে, শৈলর বিয়ে হলে বউমাকে দিতে হবে বইকি, তা তো সত্যি; কিন্তু সরিকে আবার কি দেবার দরকার? তার কি বিয়ে দাওনি?

আর সে সময় তো খুবই দিয়েছিলে। সরিকে দেবার কোন মানে আমি খুঁজে পাই না।

মা সঙ্কুচিতভাবে বললেন, ওর বিয়ের সময় তিনি খুব দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ওরা যে নিতান্ত গেরস্থঘর কিনা, আর স্ত্রীধন তো দেওয়া যায় মেয়েকে, তাই—তাই ভাবছিলাম—

ছোট ছেলে বেড়িয়ে ফিরল, সে এসে বসল মার কাছে।

ঈষৎ উচ্চ সুরে বড় ছেলে বললে, গেরস্থ আর কি! আর স্ত্রীধন বলে তো বিলিয়ে দিতে পার না? টাকা কিছু দিতে চাও দাও, তাই বলে ওটা আমার মনে হয় না। আর এরাও কি তোমার মেয়ের মতন না?

মা লজ্জায় অপ্রস্তুতে পড়লেন। তা এদের তো সবই রইল বাবা। তোমরা বেঁচে থাক, কত আনবে, দেবে, তোমাদের বাড়ি-ঘর-টাকাকড়িও তিনি করে গেছেন, অভাব নেই।

উষ্ণভাবে বড় ছেলে বললে, ওকে কি সৎপাত্রে দাওনি? পয়সা কপালে করে। আজ যদি কিছু ভালমন্দ হয় ওর, আমাদেরই তো দেখতে শুনতে হবে।

ষাট ষাট, ও কি কথা বাবা!

অপ্রস্তুত হয়ে বড় ছেলে বললে, সে কথা বলছি না আমি, কিন্তু আমাদের ভালমন্দ হলেও তো ও দেখবে না।

বালাই, কি বলিস সব!

কথা কেমন থেমে গেল। মনের ভেতর তার নানা অঙ্কুর বেরোতে লাগল! কিন্তু সকলেই চুপ করে রইল। মারও শ্রান্তি বোধ হচ্ছিল, চোখ বুজে চুপ করে রইলেন, বধূকালের সুনীতিকে চুড় দেওয়ার কথা মনে পড়ল একবার।

তা মেজবউ, যাই বল তুমি, এ মার ঠিক হয়নি কিন্তু।

সকালবেলা ভাঁড়ার-ঘরে দুই জায়ে কথা হচ্ছিল।

কিন্তু আমি ভাই শুনেছি বাবার কাছে, এরকম নিয়ম আছে।

মেজবউয়ের বাপও উকিল, মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর শখও ছিল।

তা হতে পারে, কিন্তু দেওয়া তো ঠাকুরঝিকে কম হয়নি। উনি তো বংশ ছাড়াই গোত্র ছাড়াই হলেন। মেয়ে তো হাজার হোক। কোন কাজে উনি লাগবেন? দিলেই তো সব পরে পরে গেল। বিয়েতে হাজার বারো তেরো বাবা খরচ করেছিলেন, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ পড়া ছেলে বলে।

মেজবউয়ের মনে ছবির মতন বাড়ি-গাড়ি-মোটর-ঐশ্বর্যময় শ্বশুরবাড়ির চিত্র ভেসে গেল, সে কিছু আর বললে না। মনে হল, আমাদেরও তো দিয়েছিলেন, আর রইলও তো সবই।

বড়বউ বললে, আমাদের বাপ তো আমাদের দেননি বাপু ছেলেকে বঞ্চিত করে। এ উচিত নয়।

মেজবউ চুপ করে রইল। এবং উচিত কথা বলাও উচিত নয়, সর্বত্র সত্যি কথা বলা যায় না।

যাই হোক, ভাগ হল।

মার রোগশয্যার পাশে লোহার সিন্দুক উজাড় করে গহনা পড়ল।

কন্যাকাল, বধূকাল, কিশোরীকাল, তারপর সমস্ত জীবনের নানাবিধ গড়নের নানা রকমের ছোট বড় অজস্র গহনা—মুকুট, সিঁথি, টায়রা, কপালপাটি, ঝাপটা, কান, ইয়ারিং, মাকড়ি কানবালা, ফুলকাঁটা, চিরুনি, সাতনর, সীতাহার, নেক্‌লেস চিক, দড়িহার, গোটহার, বিছেহার, মুক্তোর মালা, কলার , তাবিজ, বাঁক, অনন্ত, জসম, বাজু, রুলি, বালা, ব্রেস্‌লেট, চুড়, মুক্তোর চুড়ি, সোনার চুড়ি, রতনচুড়, আংটি, তারপর গোট, চন্দ্রহার ইত্যাদি সব কত কি ছোট-বড় স্তূপাকারে পড়ল রূপোর থালায়। তিনখানা থালায় ভাগ হতে লাগল।

তিন ভাগ হল—বড়, মেজ, শৈলেনের;—সব ভাগের পর সরযূর জন্য রাখা হবে কিছু।

ভালমন্দ—সেই অকল্যাণের কথার পর মা আর কিছু বলেননি, আজও বললেন না। যুক্তি-বিচার-তর্কের অবকাশ মনে নেই—শুধু শ্রান্তিভরে চুপ করে দেখতে লাগলেন।

মেজ আর বড়র ছেলে-মেয়েরা সব জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। তা হলে মা, এই অনন্ত, গোট, রুলি আর দড়িহার রইল সরির? জিজ্ঞাসু চোখে ছেলেরা মার পানে চাইলেন, ভারী আছে—ওজন কম নয়।

ঝিয়ের মতন অনন্ত!

মা ফিরে দেখলেন। বললেন, আচ্ছা।

শুধু মনে হল, শাঁখা-সিঁদুর পরে মনের তৃপ্তিতে সে থাক; দিয়ে কে কাকে সমৃদ্ধ করতে পারে?

ছেলেরা তৃপ্ত মনে কথা কইছিল। মার হল গিয়ে মেয়েলী বুদ্ধি; যা সম্ভব তাই করা উচিত;—এইসব ধরনের কথা মনে উঠছিল। কথাও সেইভাবের—যেন স্পষ্ট নয়। মার বুদ্ধিকে ছোট করা হল; না, মাকে কি—মেয়েমানুষের কবে বিষয়বুদ্ধি থাকে!

বউয়েরা অবগুণ্ঠন টেনে দরজার কাছে বসেছিল।

বড়বউ উঠে দাঁড়াল, রান্নাঘরে ঠাকুর ডাকাডাকি করছে, মার পথ্য তৈরী করতে হবে।

সুকুমারী বললেন, তোমরা তুলে ফেল মা এবার এইসব।

বউয়ের মেয়ে বললে, এসব আমি নোব মা। একটা মস্ত চন্দ্রহার সে গলায় পরে মার সঙ্গে উঠল, আজকে সে সেইটে পরে থাকবে। তুমি পাবে না, সুরো পাবে না।

সস্নেহে বাপ একটু হাসলে, বললে, আচ্ছা, তুমিই নিও সব। এই বয়েসে বেটি গয়না চিনেছে, দেখেছ মা?

শাশুড়ী বললেন, ওগো বউমা, ওকে একটা হার পরিয়ে দাও। চন্দ্রহার পরেছে গলায়।

বাপ হাসলে, মেয়ের হাত ধরে বাইরে উঠে গেল। মেজ ছেলেও উঠল।

সুকুমারী মেজবউকে ডেকে বললেন, ও বউমা, তোমারটা তোল। মেজ-বউয়েরও কাজ পড়েছিল—শাশুড়ীর পুজোর যোগাড় করা, কাপড় ছাড়ানো, শরবৎ করে দেওয়া। —এসে দাঁড়াল।

তুলতে একটু ইতস্তত করতে লাগল; তার পেলে ক্ষতি নেই, না পেলে বিরক্তি নেই, এই বোধহয় ভাবটা।

ছোট ছেলে মার জন্যে ওষুধ ঠিক করছিল; বললে, মেজবউ, মাকে জল এনে দাও তো।

মা বললেন, তোরটা কোথায় রাখবি? বউমারা তুলবেন?

মেজবউ জল আনতে গিয়েছিল।

এবার ছেলে বললে, আমার থেকে আদ্দেক সরিকে দাও না মা?

মার চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

একটু থেমে বললেন, তুমিই দাও বাবা, ও তো তোমারই দেওয়া। আর নাই বা দিলে, দেওয়া তো হয়েছেও, হলও।

কই?

মেজবউ জল নিয়ে এল।

ওষুধটা খাও এবার।—ছেলে বললে।

দাঁড়া, কাপড় ছাড়ি, পুজো করি।—মা উঠলেন।

কি হে, হঠাৎ যে! সরযূর স্বামী গিরীন্দ্র ঘরে ঢুকে কনিষ্ঠ শ্যালককে দেখে বললে, মা ভাল তো?

শৈলেন বললে, এমনই, আপনার তো ছুটির দিনও দেখা পাওয়া দুর্লভ। মার অসুখটা কম আছে, সরিকে দেখতে এসেছিলাম।

সময় কোথায় হে? একজামিনের পেপার নিয়ে পড়েছি যে।—ভগ্নীপতি বললে। শৈলেন খানিক গল্প করে চলে গেল।

টেবিলের ওপর স্তূপাকার খাতাপত্র। গিরীন্দ্র একমনে কাজ করছে।

ছেলের দুধের বাটি, পানের ডিবে, বিস্কুট, বাতাসা, ঝিনুক ইত্যাদি নানাবিধ নৈশ জিনিসে হাত ভরিয়ে সরযূবালা ঘরে ঢুকল।

তবেই হয়েছে, ঐ কাজ নিয়ে পড়েছ।—স্ত্রী টীকা করলে।

স্বামী অন্যমনে বললে, হুঁ, তারপর?

তারপর আবার কিসের?—সরযূ বললে।

এই যে তুমি কি বললে না?—স্বামী মুখ তুললে।

সরযূ হেসে বললে, কিন্তু আজ শোনবার মতন কথা আছে। আজ ছোড়দা এসেছিল। গহনাভাগের সমস্ত পালা বলে সরযূ মৃদু হেসে বললে, তাই মা বলেছিলেন সরিকে গেরস্থঘরে দিয়েছি। সকৌতুকে স্বামীর মুখের দিকে চাইলে।

তারপর?—স্বামীও কৌতুকভরে জিজ্ঞাসা করলে।

তাই ছোড়দা সব গল্প করছিল, আর আমার কি কি ছিল দিয়ে গেল।

সত্যি? তা হলে আজ কিছু লাভ হয়েছে বল তোমার। সকালে মুখ দেখেছ কার? বিশ্বাস তো কর না। দেখলে আমার চেহারার 'পয়'?

আহা, তা হলে তো রোজই পাওয়া উচিত।

ঝিনুক-বাটির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে খোকাকে স-কোলাহলে দুগ্ধপাননিরত স্ত্রীর পানে চেয়ে বললে, কিন্তু গেরস্থদের বউ আজ গরিব গেরস্থকে পান দিতে ভুলে গেছে।

ওমা দেখেছ, একেবারে ভুলে গেছি। দিই। ছেলেকে শুইয়ে হাত ধুয়ে সরযূ পান নিয়ে স্বামীর চেয়ারের পাশে দাঁড়াল। স্বামী পানসুদ্ধ তার ডান হাতখানা নিজের বাঁ হাতে মুঠো করে ধরে নিলে, তা হলে গেরস্থঘরে পড়ে সরোর কিন্তু বড় দুঃখ, না?

যাও, কি যে কথার ছিরি! নাও পানটা। সরযূ টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে খাতার বহর দেখছিল, আজ আর খাতা দেখতে হবে না।

কেন বল তো? অনেক কাজ আছে যে! স্বামী হাসলে।

রোজ রোজ কি কাজ, পোড়া কপাল ছুটির!

স্বামী অন্যমনে তার দিকে চেয়েছিল, মুঠোটা ছেড়ে পান খাবার কিংবা কাজ করবার কোন আগ্রহই তাঁর মুখে দেখা যাচ্ছিল না।

সরযূর বাপের বাড়ির সংসারের কাজ সারা হল।

ছেলেপিলে, অসুখ-বিসুখ, ঝি-চাকর, দারোয়ান-কোচম্যান সব সমস্যা আলোচনা হয়ে থামল।

বড়বউ বললেন, ঠাকুরপো তার ভাগ থেকে আদ্দেক ঠাকুরঝিকে দিয়ে এসেছে, জান?

নগেন বললে, বটে? না তো।

তা মার যে সব উল্টো ছিষ্টি, একবার তো বাপু দেওয়া হয়েছে!

নগেন শুধু 'হ্যাঁ' বললে, আর কথা কইলে না। ফেনিয়ে অকারণে কথা কওয়া তার স্বভাব নয়—বিশেষ করে মার বিষয়ে। মার বুদ্ধিতে তার খুব শ্রদ্ধা না থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে সেটা আলোচনা করা!—

মেজবউ বললে, কিন্তু যাই বল, এটা তোমাদের ভাল কাজ হয়নি, হকের হিসেবে; আর মা তো আদ্দেকই দিতে বলেছিলেন, তোমাদের তো সব রইল।

কাগজ পড়তে পড়তে বরেন বললে, হুঁ।

বাবা বলেন—

মেজবউ আর দু-একটা কি বলতে গেল, উত্তর পেলে না, রাগ করে শুয়ে পড়ল।

সুকুমারীর পথের যখন হিসাবমতন মাইল কতক পথ আছে, আর মাস ছয়েক হয়তো সময় আছে। হঠাৎ খবর এল, সরযূর ভাগ্য ভালমন্দের মন্দটা বেছে নিয়েছে।

মাইল এসে গজ কতকে ঠেকল, ছ'মাস এক মাসে দাঁড়াল; সেই যে মা মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লেন, আর সোজা হয়ে দাঁড়ালেনও না, ফিরেও চাইলেন না।

শাঁখা-সিঁদুর-সমৃদ্ধির পাশবন্ধন কাটিয়ে সরযূ মুক্ত হয়ে জগৎ-মিথ্যার পথে এসে দাঁড়াল।

বছর কতক কেটেছে—ইতিমধ্যে শৈলেনের বিয়ে হয়েছে। একটি ছেলেও হয়েছে।

সরযূ বেশিরভাগই এখানে থাকে। একটিমাত্র ছেলে—বছর সাতেকের।

সন্ধ্যার পর বউয়েদের কোথায় নিমন্ত্রণ আছে, তার জন্যে তারা ঘরের ভেতর ব্যস্ত।

সরযূ ছোটভাইয়ের ছেলেকে কোলে নিয়ে বারান্দায় বসেছিল।

ছোটবউয়ের প্রসাধন হল।

ওমা, তুই হাতে শুধু ঐ পরে যাবি?—বড়বউ নিজের হাতে কি একটা গহনা পরতে পরতে বলল।

মেজরও হয়েছিল, সেও চেয়ে দেখলে, তাই তো, ছোটবউয়ের ও কি আজ হল? হাতটা যে নেড়া মনে হচ্ছে! তোমার হাতের আর কিছু নেই?

ছোটবউ জায়েদের হাতের আর গলার আধুনিক অলঙ্কারের দিকে চেয়েছিল, তাদের তুলনায় ওর নিতান্ত আদ্যিকেলে গহনা।

হোকগে ভাই, হবে'খন এতেই।—সে বললে।

মেজবউ বললে, না, কেমন সং দেখাবে, না বড়দি? আমরা বড়রা এত পরে যাব—

মাথার ঘোমটা ঠিক করতে করতে বড়বউ আরশির দিকে চেয়ে বললে, হুঁ, দেখি আমাদের আর কি আছে?

সুবিধে মতন কিছু পাওয়া গেল না নিজেদের বাক্সে।

হ্যাঁ ভাই, তোমাদের হল? রাত হল যে! সরযূ এসে দাঁড়াল। বেশ হয়েছে। কই ছোটবউ, দেখি!

ছোটবউয়ের তেমন সুবিধেমতন কিছু পাওয়া গেল না।—বড়বউ বললে।

সরযূ বললে, আমার কিছু দোব? এস তো দেখি।

গলার আর হাতের কি দুটো দিয়ে সম্পূর্ণ হল। ওরা চলে গেল।

অন্ধকার বারান্দায় সে খোকাকে ঘুম পাড়াতে বসল। অন্ধকারভরা বাগান, আকাশে কৃষ্ণপক্ষের তারা। 'আয় ঘুম, যায় ঘুম, বাগ্দীপাড়া দিয়ে,' খোকার জন্যে 'একশো টাকার মলমলি-থান সোনার চাদর' কিনে দিয়ে ঘুম এল।

অনেক রাত্রে তারা এল ফিরে, খোকার পিসীমা তখন শুয়ে পড়েছে। বারবার ডাকায় কিন্তু ঘুম আজ বোধহয় তার ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন, তাই তার কাছে আর এলেন না।

বারান্দার একদিকে মাদুরে সে শুয়ে ছিল।

শৈলেন তখন বই পড়ছিল। সুসজ্জিতা পত্নীকে দেখে একটু পরিহাসের হাসিভরা দৃষ্টিতে সে চাইল।

পতিব্রতা স্ত্রীরা সেকালে শুনেছি স্বামীর জন্যই সাজতেন, একেলে পতি-প্রাণারা নিমন্ত্রণবাড়ির সখীদের জন্য সাজেন।

হ্যাঁগো!—টেবিলের ওপর অলঙ্কারের স্তূপ জমা হচ্ছিল। আচ্ছা, এই চুড়দুটো কি মার?—প্রশ্ন করলে।

ছোটবউ হাতে তুলে দিলে স্বামীর। কোন্‌টি?—শৈলেন বললে।

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, এটা মারই ছিল—কোথায় পেলে?

ঠাকুরঝি দিলেন পরতে। তাই দিদিরা বলছিলেন।

কি বলছিলেন?

ওঁরা বললেন, মা তো ওটা তোর জন্যেই রেখেছিলেন, ঠাকুরঝির কাছে কবে গেল?

শৈলেন ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, মার ইচ্ছে হয়েছিল, সরো তাঁর সব জিনিস না হোক খানিকটা পায়। যাক, সেটা হল না যখন, তখন আমি আমার ভাগের থেকে অর্ধেক সরোকে দিয়ে এসেছিলাম মার মত নিয়ে। ও মার মেয়েই তো।

আমি কি বলছি কিছু? দিদিরা বললেন, ঠাকুরঝিকে তো বিয়ের সময় কম কিছু দেওয়া হয়নি, আর ওঁর দরকারই বা কি এখন গয়নার? ছোটবউ মুক্তোর মালাটাও খুলে রাখলে। ওঁরা বললেন, হিসেবমতন মা ওটা তোর জন্যেই রেখেছিলেন।

তোমরা সব কি কথা কও!—বলে শৈলেন উঠে গেল। সুসজ্জিতা স্ত্রীর রাত্রির সমস্ত মাধুর্য ঝরে পড়ে যেন একটা হাড়-বের-করা সঙ্কীর্ণ লোলুপতা সুমুখে এসে দাঁড়াল।

সরযূর কানে পৌঁছল খানিক। মনে হল, একবার উঠে কোথাও সরে যায়, কিন্তু শৈলেনের বিরক্ত মুখের কথা পাশের ঘরে তার কানে পৌঁছল।

এত ইতিহাস সে জানত না। বহুদিন আগের সেই সন্ধ্যা মনে পড়ল।

গহনার দুঃখ আর কি হবে? হাসি এল একটু, কিন্তু পরক্ষণেই চোখ ভরে উঠল।

সমস্ত রাত্রি কি অন্যমনে, নির্বাক অদ্ভুত জটিল বেদনায় কেটে গেল, ঘুম আর আসে না।

শেষরাত্রে, তখন ভোরের পুব-আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে, বারান্দার মাদুরে—ঘুম এল। ছেলে ঘরে ঘুমোচ্ছে।

শৈলেন ডাকলে, সরো, এখানে যে? এত বেলা?

সরোর ঘুম ভেঙে গেল। ভোরের স্বপ্নটা কোথায় পথ হারিয়ে ফেললে, অপ্রস্তুত হয়ে সে উঠে বসল।

শৈলেন একটু আশ্চর্যভাবে তার দিকে চেয়ে রইল। সমস্ত রাত্রির ব্যাকুল জাগরণক্লিষ্ট মনের ছাপ মুখে পড়েছে। মুখের হাসির পাশে মনের সাগরে অশ্রু টলমল করছে।

সন্ধ্যার সময় বারান্দায় সুপারি নিয়ে সরযূ বসেছিল। স্বপ্নটা সারাদিন ধরে মনে আর আনতে পারছিল না। নিরভিমান মনে আর কোন কথা ছিল না।

ছোটবউ এসে দাঁড়াল, কি করছ ভাই?

জাঁতি আপনার কাজে মন দিলে, সুপারি কাটা হতে লাগল। কিছু না, বসেছিলাম সুপুরিগুলো নিয়ে। সরযূ সোজা হয়ে বসল।

তোমার গয়নাগুলো নেবে? এখন তুলবে?—ছোটবউ দুটো গয়নার কেস হাতে করে জিজ্ঞেস করলে।

ননদ বললে, এগুলো তুমি রাখ না ছোটবউ।

আমি তো তোমাকে কিছু দিইনি এমন।

সে কি ভাই?—সবিস্ময়ে ছোটবউ চেয়ে রইল ননদের দিকে। ঠাকুরঝি কি ওদের আলোচনা জানতে পেরেছে? কি করে জানল? কিন্তু কথা তো রাগ করবার মতন নয়, বেশ সহজই তো মনে হচ্ছে।

স্মিত হাস্যে সরযূ বললে, ভাবছ কেন, আমি তো দিতে পারি তোমাকে, বয়সে তোমার কত বড়, আর আমার কি হবে ওসব?

সে কি ভাই? তোমার নলিন বেঁচে থাক, তার বউ পরবে।

না রে পাগল, তখন তার মামারা দেবে।—সরযূ বললে। যাও, রেখে দাও।

ছোটবউ বিস্ময়ে আশ্চর্যে একেবারে ভরে গিয়েছিল, জায়েদের কাছে বলতে গেল সব কথা।

সরযূ হারানো স্বপ্নের খেই সকালের কাজের আড়ালে, দুপুরের স্তব্ধ অবসরে, এখন সন্ধ্যায় দৃষ্টিহীন অপরূপ অন্ধকারের বুকে ধ্যানের মধ্যে খুঁজে পেলে না। অন্ধকার বারান্দায় বসে শুধু রাশীকৃত কাটা সুপারিতে পেতেটি ভরে উঠতে লাগল।

বিচিত্রা, ভাদ্র ১৩৩৭

জননী

জাজ্জ্বল্যমান সংসার। চার ছেলে, দুই মেয়ে, পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রীতে সাজানো, সমৃদ্ধ। ছেলেরা কৃতী—একজন প্রফেসার, একজন ডাক্তার, দু'জন উকিল।

সংসার চলে স্বচ্ছন্দে সচ্ছলে; সময় কাটে কাজে কোলাহলে; সুতরাং সাংসারিক অশান্তি শুধু বাক্যের পথ দিয়েই উঁকি মেরে যায়।

মোটের ওপর সব ভাল।

কিন্তু একটি চিরন্তনী গোল ছিল, সেটা ছিল বড় ছেলের মাতৃহীন বালক যোগেনকে নিয়ে।

মায়ের অভাবটি পরিপূর্ণ করে দেবার প্রবল প্রচেষ্টাতে পিতামহী যে প্রচুর পরিমাণে প্রশ্রয় তাকে দিয়েছিলেন, সেইটেই পিতামহী আর পৌত্রের দুজনেরই কাল হয়েছিল। দ্বন্দ্ব, বিবাদ, বিরোধ, বচসা যা কিছু উঁকি মারত, তার যবনিকার অন্তরাল থেকে সপিতামহী যোগেনকে সকলেই চট করে আবিষ্কার করত।

মার পক্ষাপাতিত্ব বাড়ির কাকপক্ষীও দেখতে পায়, এইটে ছিল বাড়ির মতামত।

নানা পথ দিয়ে বিরক্তি আসে, বিরক্তির সঙ্গে বিঘ্নও আসে। মাসের পয়লা থেকে হিসাব-নিকাশের সময় মুদী, ময়রা, গয়লা, ধোপা, দর্জী তো আছেই, তার ওপর গলির মোড়ের 'সর্বভাণ্ডার' দোকানের চায়ের টিন, বিস্কুটের বাক্স, দেশলাই, মোজা, জামা, শাড়ি ধুতি, সাবান, কাপড়কাচা সাবান, কাগজ, পেন্সিল, কালি আদি নানাবিধ দ্রব্যের অনাদ্যন্ত বিল আসে। চার বউ চার বাবুর ইনিশিয়েল সই করে দেন। মুদী আসে, ময়রা আসে, সর্ব-ভাণ্ডার আসে সরবরাহ নিয়ে। দর্জী আসে গজ নিয়ে ছিট নিয়ে ইত্যাদি।

মাসকাবারি নানাবিধ বিল দেখতে দেখতে কারুকে দিয়ে কারুকে স্থগিত রেখে, কারুকে ভগ্নাংশ মাত্র দিয়ে, বিরক্ত মুখে বড় ছেলে উঠে এলেন, এই সেদিন আর বছর এত বিছানাপত্র করালে মা, আবার এবার?

অপ্রস্তুত মা বললেন, যশুর জন্যে করতে দিয়েছিলাম।

অপর ছেলেরাও এসে বসলেন।

সেদিনকার গুলো? বিরক্তি জিনিসটা সংক্রামক। বিরক্ত তৃতীয় পুত্র বললেন, সেগুলো কার?

সেগুলো অন্য পৌত্রদের, তৃতীয় পুত্রের মেয়ের, বড় ছেলের ছেলের ইত্যাদির।

জননী নাম করলেন না।

মধ্যম পুত্র বললেন, মা, তোমার কেমন যোগে-যোগে বাতিক। সেদিন তো যোগেরও কি একটা হল? আর লেপ?

জননী বললেন, সেটা বালিশ একটা যোগের! এবং একবার বলতে চাইলেন, সে লেপটা যোগেনের নয়, সেটা বিশুর; কিন্তু নিরর্থক হবে জেনে মৌন হয়ে রইলেন।

বড় খগেন্দ্র বললেন, দেখ না, এ মাসে দর্জীর বিলই কত হয়েছে! দুধের হিসেব

দিয়ে গেল মতি, চল্লিশ টাকা এবার দুধের। সবই মোটা অঙ্কে বেড়েছে রে। দশ টাকা করে প্রত্যেকটায় বেশি আছে, কম তো কোনটাতে নয়।

মধ্যম জগদিন্দ্র বললেন, হ্যাঁ, আমি তো দেখিছি, যেন কিছুরই মাত্রা নেই।

পাশের ঘরে বধূরা-কন্যারা ছিল, জননী ব্যাকুল হয়ে বললেন, ওরে এ মাসে যেসব তত্ত্ব-তালাস আনা-নেওয়া মেয়ে-বউমাদের করলাম, জামাইরা এলেন, ভাইদ্বিতীয়া গেল, ছেলেপিলে পাঁচটি এসেছে, খরচ তো হবেই, অত চেঁচাসনি।

আগে? এত কি তখনও খরচ হত?—কনিষ্ঠ পুত্র জিজ্ঞাসা করলে।

মা বললেন, ওরে, এখন যে সব মাগ্‌গিগণ্ডা হয়েছে। মুখে এল—তখন ছেলেপিলে সংসারে সকলের হয়নি; কিন্তু ষাট, সে তো মনেই আনতে নেই, মুখে তো দূরের কথা। তারপর হাসি-অশ্রুতে মিলিয়ে মনে এল তখনকার হিসাব।

কিন্তু তোমরা হিসেব বোঝ না।—তৃতীয় নরেন বললেন।

সকলেই বললেন, সেটা ঠিক।

মা অপ্রস্তুতভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

আর যোগেনের বজ্জাতির শেষ নেই, সে খবর তো মা রাখ না। পড়াশোনায় বাবু আজকাল বেজায় স্বাধীন, তুমি ওর মাথাটি চিবিয়ে খাচ্ছ মা।—কনিষ্ঠ পুত্র উষ্ণ সুরে বললেন।

ষাট ষাট, তোমাদের কি কথা বাবা! কথা কি কইলেই হল?—যশুর পিতামহী ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

কনিষ্ঠের কথায় যোগেনের পিতা বললেন, বটে! এদিকে ছোঁড়া বাড়ছে যেন তালগাছ। খাবে আর বজ্জাতি করবে।—বিরক্ত সুরে বলে আপনা হতেই যেন মার দিকে চাইলেন।

খাওয়ার কথায়ই জননীর মনটা পীড়িত হয়ে উঠল। যোগেনের সত্যই সুখাদ্যে আত্যন্তিক রকম রুচি ছিল। মাতৃহীন বালককে পিতামহী কোনদিন সে বিষয়ে কিছু বলেনওনি, এখন কিন্তু অন্যত্র তাকে সুখাদ্যের সঙ্গে খোঁটাও খেতে হত।

খরচপত্র, আয়ব্যয়, পূজার পর কোর্টের কাজ, বাকি টাকা ইত্যাদি, যোগেন এবং অন্য বালক বালিকা, নানাবিধ আলোচনার পর ছেলেরা কেউ ঘরে কেউ বাইরে গেলেন।

স্তিমিতপ্রদীপ আলো-আঁধারের আভাসে ভরা দালানে বসে হরিনামের মালাটি হাতে নিয়ে জননী মনে মনে হয়তো বেদনার মালা জপ করতে লাগলেন।

তা তুমি যতই বল সেজবউ, ওর দোষ উনি দেখতে পান না। ওই বুড়ো হাতী ছেলে কি রকম যে করে ছোটদের সঙ্গে, তা মা যদি একটি কথা ওকে বলেন।—মেজবউ বললেন, মেজবউয়ের ছেলের সঙ্গে সেদিন যোগেনের ঝগড়া হয়েছিল।

সেজবউ বললে, মা তো ভাই কারুকেই কিছু বলেন না। তা ছাড়া ওর মা নেই। প্রথমকার নাতি। তার নিজের জননীরও ওইরকম পৌত্রের উপর ঝোঁক ছিল।

নাতি তো সবাই।—মেজবউ গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে বলে আরব্ধ কাজে মন দিলে।

প্রতিবাদ জিনিসটা যতই জনান্তিকে হোক না, যার নামে হয় তার কাছে একদিন এসে পৌঁছয়ই এবং শুধু পৌঁছয় না—অলঙ্কৃত সুসজ্জিত হয়ে আসে।

মা যেন মাটি হয়ে গেলেন।

বার্ধক্য আসেনি, কিন্তু স্থবিরতা এল।

আস্তে আস্তে সংসারের সব কাজ এবং দায়িত্বভার ছেড়ে দিয়ে সকালে নিভৃত ঠাকুরঘরের কোণ, আর সন্ধ্যায় শিশুদের রূপকথার মণ্ডল সৃষ্টি করে, বহু যত্নে বহু আয়াসে পরম মমতায় গড়ে তোলা সংসারকে জননী ছেড়ে দিলেন।

বধূরা মাঝে মাঝে ডাকে, মা এইটে বলুন, এইটে করে দেবেন। মা মৃদু হাস্যে স্বীকার করে নেন, কিন্তু দরকারের সময় ঠাকুরঘরেই থাকেন।

হিসাব-নিকাশ, গৃহিণীপনার স্রোত তার নির্দিষ্ট পুরাতন প্রণালী না পেয়েও ছোট ছোট নতুন প্রণালী দিয়ে সহজেই বয়ে যায়।

মার দিকে চোখ পড়ল সকলের, কিন্তু ধরা গেল না। বুড়ো হয়েছেন? শরীর ভাল নেই? বাঁচবেন না আর? সবাই—ছেলেরা ভাবে নিজের মত করে। মাকে আবশ্যক না থাক, বেদনাবোধ তো আছে। বহুকালের পুরাতন প্রপিতামহীর প্রতিষ্ঠা করা দীঘি, গাছ হঠাৎ শুকিয়ে যেতে থাকে, মনের ভেতর কি যেন অভাব বোধ হয় হয়তো।

ছেলেরা বধূরা সব জিজ্ঞাসা করেন, মায়ের কি চাই? মায়ের যোগের কি চাই? অভিযোগের অনুযোগের ভাবে নয়—আন্তরিক।

যোগের? কি জানি, সবই তো আছে—দেখো'খন তোমরা। নিজের?—জননী মৃদু হাস্যে বলেন, না বাবা, নিজের আর কি চাই? সবই তো আছে।

সংসার সুনিয়মে চলে। অন্তরে বেদনা কারু বাজে, কারু বাজে না; সেটা আছে হয়তো।

কবে জ্বর হয়েছে জান না?—বিরক্ত বড় ছেলে স্ত্রীকে বললেন।

আমরা কি করে জানব? রোজ নেয়েছেন, পুজো করেছেন, খেতে পারেন না শুধু। আজ সকালে যোগেন এসে বললে, ঠাকুমা ডাকছেন, জ্বর হয়েছে। তাই টের পেলুম। আমাকে বললেন, ঠাকুররা উপোসী থাকবেন, তাই পুজো করতে।—যোগেনের বিমাতা উত্তর দিলেন।

চল, দেখে আসি, তোমরা আশ্চর্য মানুষ!—বড় ছেলে বেরিয়ে এলেন।

একে একে চার ছেলে সব এসে বললেন। জননী চুপ করে শুয়েছিলেন, যোগেন পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

বড় ছেলে মার মাথায় হাত দিলেন। ডাক্তার-ভাইকে ডেকে বললেন, সতু, দেখ, জ্বর বেশ।

জননী, ছেলের হাতখানি মাথায় সুশীতল মনে হওয়ায়, 'আঃ' বলে বললেন, না, জ্বর বেশ কোথায়? এই গায়ে কেমন বড্ড ব্যথা, তাই আর উঠিনি। তোরা মিছে হৈচৈ করছিস।

সকালবেলা হৈচৈ বলা সত্ত্বেও বিকালে চোখ আর মায়ের খুলতে চাইল না, আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে রইলেন।

দিন তিনেকের মধ্যে ওষুধে টিউবে ইন্‌জেক্‌শনের সাজ-সরঞ্জামে বিষে উত্তেজকে ঘরের টেবিল টুল ভরে গেল।

স্তব্ধ আচ্ছন্নমুখ জননীর মুখপানে চেয়ে ছেলেরা আসা-যাওয়া করেন, বার বার জিজ্ঞেস করেন, মাকে ওষুধ দিয়েছ? দুধ? আঙুরের রস? কতটুকু করে দাও? লেখ না কেন?

অর্থ, ব্যাকুলতা, সেবা নিরর্থক শত পথ দিয়ে বেরিয়ে যায় যাঁর জন্য, তিনি কিছুই জানতে পারেন না।

ও মা, মা? দিদিকে আজ আনতে পাঠাব? ছোড়দি এসেছে।

জননী একবার চোখ খুলে বললেন, আচ্ছা।

যগু ঘুরে-ফিরে আসে, সেই ঘরে বেড়ায়, তার আকুলতা কারুর চোখে লাগে না। রাত্রে সবাই বিশ্রামের জন্যে একটু শুলে সে পিতামহীর বুকের কাছে মাথাটা আনে, তিনি অজানতেই ক্ষণচেতনে একবার তার মাথার ওপর শীর্ণ হাতখানি রাখেন।

তারপরেই আবার চোখ বুজে নেন, নয়তো আপন মনে কি সব বলতে আরম্ভ করেন।

কর্ম-অবসরে ছেলেরা এসে বসে; মনের বিস্মৃত কোণ থেকে বাল্যকাল, জননী, খেলাধূলা, আবদার প্রশ্রয় থেকে আরম্ভ করে সেদিনের সম্প্রতির ছোট ছোট কথা বাদানুবাদ বিসর্পিতগতি বেদনার বার্তা বয়ে এসে দাঁড়ায়; আঘাত? মাকে? মন স্তব্ধ হয়ে থাকে, জবাব দেয় না। তর্ক? দুঃখ দেওয়া? যোগের জন্যে? কই, না তো। কিন্তু যোগের জন্যে মা তো আর কিছুই কোনদিন বলেননি। জননী কি আর সংসারের মাঝে ছিলেন না?

রোগিণীর ম্লান বিশীর্ণ মুখের পানে চেয়ে চোখ ভরে আসে, সকলেই আপনার কাছেই আপনার অন্তর গোপন করে নিতে চায়।

মাকে যত্ন করবার, জিজ্ঞাসা করবার, শুধু ডাকবার একটা আকাঙ্ক্ষা অন্তর মথিত করে ওঠে; কারণে অকারণে ছেলেদের আসা-যাওয়া জিজ্ঞাসার বিরাম নেই; শুধু জননীর চেতনা কখনও অল্পমাত্র সাড়া দেয়, কখনও দেয় না।

পিসীমাদের চতুর্থী সারা হতে না হতেই ছেলেদের মাতৃদায়ের আয়োজন শুরু হয়ে গেল।

খাট, পালঙ্ক, সাটিনের বালিশ, সুদৃশ্য ছিটের লেপ তোষক, নেটের মশারি, ঘড়া, গাড়ু, তৈজসপত্রে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ভ'রে গেল।

চার ছেলের চারটি, পৌত্রদের মধ্যে বড় এবং পিতামহী অত্যধিক ভালবাসতেন বলে যোগেনেরও একটা ষোড়শ।

পিসীমাদের, জননীদের, বাপ-কাকাদের নিরবসর দিন। জননীকে কেন্দ্র করে যে আয়োজন, তাতে জননীকে স্মরণ করবার অবসর নেই। শুধু ক্ষণে ক্ষণে অভ্যাগত কুটুম্ব সমাগমে সকলের মনের গোপন ব্যথিত অংশ একবার দেখা দিয়ে যায়।

যগু কি করে, খায়, না খায়, কোথায় থাকে, কি ভাবে থাকে লক্ষ্য করবার সময় কেউই পায় না। মাঝে মাঝে ছোটকাকা এক একবার তাকে ডাকে; ঝড়ো কাকের মতন রুক্ষ চুলে, দীর্ঘ শীর্ণ দেহে, সাদা উত্তরীয়ে থানে কিম্ভূত-কিমাকারদর্শন বালক;

আহ্বান করলে মুখে দীন ম্লান অপ্রতিভ হাসি ভেসে ওঠে একবার, চোখে জল এসে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

তৃতীয় প্রহর শেষ হয়ে এসেছে, ডাক পড়ল, যগু, ওরে যোগে, যোগে কোথা? ডাক ডাক, কাজ আরম্ভ করে দিক।

সুসজ্জিত সভামধ্যে কীর্তনের আসরে কুটুম্ব আত্মীয় বন্ধু স্বজনের সংখ্যা ছিল না।

কে এক ভৃত্য শীর্ণ, দীর্ঘকায়, তেরো বৎসরের বালককে ডেকে আনলে। কোথায় ছিলি? আয় আয়।—পিতা আহ্বান করলেন।

বিস্ফারিত চোখে বালক জিজ্ঞাসা করলে, কি?

আসনে বস।

পুরোহিত বললেন, এই যে এইখানে বাবা।

যগু বললে, কি করব?

তোকে যে ঠাকুমার দান উৎসর্গ করতে হবে—এই সব।—সুসজ্জিত দ্রব্যাদি দেখিয়ে পিতা বললেন।

বালক আশ্চর্য হয়ে বললে, কাকে?

আঃ বস না, ঐ মন্ত্র পড় না।

নির্বোধের মত খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে দু'একটা উৎসর্গের মন্ত্রপাঠের পর কুশের আংটি শ্বেত উত্তরীয় ফেলে লুটিয়ে পড়ে সে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, ওরে ঠাকুমারে, তোমাকে ওরা তখন কেন এইসব একটাও দেয়নি রে—

কীর্তনের আসরেই জনতা বেশি; দু-একজন এদিকেও ছিল, তারা আর তার বাপ-কাকারাও ছুটে এলেন, কি রে? কি হয়েছে কি? কাঁদিস কেন?

বালক ততক্ষণে চোখ মুছে স্তব্ধ হয়ে উঠে বসল।

কি হল কি? জবাব দেয় না। এই?—পিতা রেগে উঠলেন।

অন্য পাঁচজন বললে, আহা, ওর মন কেমন করছে। ছোটকাকা নীচু হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি রে যগু?

যগুর টপটপ করে ধারা বয়ে চোখ থেকে জল পড়তে লাগল, মৃদুস্বরে সে বললে, তখন তো কেউ তোমরা ঠাকুমাকে এইসব কিছুই দাওনি! খালি সবাই রাগ করতে।

বালক আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, আমি মরা ঠাকুমাকে দিতে চাই না।

ছোটকাকার চোখ ভিজে উঠল, চার ভাই স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

উত্তরা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

কর্ণ-কুন্তী কথা

মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় একেবারে ফার্স্ট হয়ে বেরিয়ে এল সুদেব সরকার। আগাগোড়া ভাল ছেলে সে ছিল, কিন্তু এবারকার চূড়ান্ত সফলতায় যত বা তার কাকার গর্ব-আনন্দ, তত তার মার গর্ব।

হাউস সার্জন হল, খ্যাতিও হল। আর বিয়ের সম্বন্ধও আসতে লাগল দেশ ও বিদেশ থেকে। সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের ছবি, অশিক্ষিতা প্রচুর সম্পত্তি-শালিনী মেয়ের খবর, উত্তরাধিকারিণী এক মেয়ের পিতার লোভনীয় প্রস্তাব, আর এমনি মেয়ের বাপ-মার আসা যাওয়ায় (যদি লেগে যায়) বাড়িতে যত বা লোকের ভিড় হয় তত বা চিঠি আসে।

গর্বিত ছেলে বলে, এখনি বিয়ে করব না কাকা, বিলেত যাই একবার।

কাকা বা মা বিয়ের প্রস্তাবে কিছুই বলেন না।

এই কথায় কাকা স্মিতমুখে চুপ করে থাকেন, মাও কিছু বলেন না। যেন আনন্দের বা গর্বের সঙ্গে ঐ বিয়ে করতে জোরজবরদস্তি না করাটা খাপ খায় না। লোকে বলে, বিদ্যে তো কিছু কম হয়নি—না হয় বিয়ে করেই বিলেতে যাবে। আর বাড়িতে ঐ তো একলা ছেলে, খেতে পরতে টাকা অঢেল। তারক সরকারের কাগজের ব্যবসাতে তো টাকা কম জমেনি। মারই বা কি আক্কেল, কবে বলতে কবে মরে যাবি, ছেলের বিয়ে দিয়ে নাতিপুতির মুখ দেখ। আর কাকাটাও তো বিয়ে করেনি, ওরও তো ছেলে বলতে ওই। এত লোককে ঘোরাচ্ছেই বা কেন। শেষে বিলেতে গিয়ে এক মেম বিয়ে করে ফিরবে সেই ঠিক হবে।

কিন্তু লোকের কথায় কে বা কান দেয়, আর সব কথা কানে পৌঁছয়ই বা কার।

শেষ অবধি সুদেব বিলেত গেল এবং বিলেত থেকে ফিরল মেম সঙ্গে না নিয়েই। লোক আশ্চর্য হয়ে যায়।

এবার আর মেয়ের বাপেদের ধৈর্য্য ও আগমন বাধা মানে না।

এখন মাঝে মাঝে ছবি আসে ছেলের নামেই, তারা ভাবে যদি কাকা বেটা না দেখায়, মেয়ের রূপগুণ দেখে ছেলে ঝুঁকে পড়ে তো কেল্লা ফতে আপনিই হবে।

ছবির প্যাকেট প্রায় সবই পড়ে থাকে, খোলা হয় না। হঠাৎ মাঝে মাঝে বন্ধুরা মিলে ছবি খোলে। হঠাৎ একটা ছবি দেখে তারা একেবারে মুগ্ধ হয়ে চুপ করে গেল, আর হাসাহাসি বা কোন কথা কারুরই মুখে এলো না। যদি রং থাকে ওর সঙ্গে তা হলে রূপ বটে। যেমন গড়ন, তেমনি মুখশ্রী, তেমনি মুখে নিজের অজানা আভিজাত্য। যেন তার নিজের অত রূপ সে জানে না। সরল সুন্দর মুখ। ডাক্তারও অবাক হয়েই দেখল।

বন্ধুরা চলে গেলে মেয়ের বাপের চিঠি পড়ল, বড়লোক নন তবে পড়তি বড় ঘর বটে, মেয়ে শিক্ষিতাও। লিখেছেন, কন্যার রূপ তো ইচ্ছে করলেই দেখতে পারেন, চিঠিতে ভূমিকা করে লাভ নেই।

সুদেব একটু ভাবলে, শেষে এক চিঠি লিখলে, আপনারা কাকা আর মাকে ছবি পাঠান, আমার অমত নেই যদি তাঁরা মত করেন।

কয়েকদিন পরে একদিন রাত্রে কাকার ঘরে ডাক পড়ল সুদেবের। দিনে অত সময় হয় না কথাবার্তার। চিরকাল সুদেব কাকার কাছে রাত্রেই খাওয়া-দাওয়ার পরে মাঝে মাঝে গল্পগুজব করত। কাকার টেবিলে কয়েকটা চিঠি আর দু'খানা ছবি।

কাকা দরজা বন্ধ করলেন। বললেন, বসো। একটু যেন চিন্তিত বিমনা ভাব।

কাকা বললেন, 'এই মেয়েটির বাপ ছবি পাঠিয়েছেন। তোমার নাকি এ বিয়েতে অমত নেই বলেছ তাই।'

সুদেব কাকার দরজা বন্ধ করা আর কথার মধ্যে কি একটা গাম্ভীর্য দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

বললে, 'হ্যাঁ, আমার কাছে ওই মেয়ের ছবি একটা এসেছিল। আমি আপনার কাছে লিখতে বলেছিলাম।' তারপর একটু দ্বিধাভরে বললে, 'আপনার কি মত নেই তা হলে?'

একটু চুপ করে থেকে কাকা বললেন, 'না, অমত আমার নেই। কিন্তু এ বিয়ে হতে পারবে না।'

আশ্চর্য হয়ে সুদেব তাঁর দিকে চেয়ে রইল। কি আপত্তি! একটু বিরক্তিও মনে এলো। তবু কেন জিজ্ঞাসা করতে পারল না। খানিকক্ষণ কাকাও টেবিলের ওপরের চিঠিপত্র কাগজপত্র দেখতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, 'ওরা কায়স্থ।'

ওরাও তো কায়স্থ। অবাক হওয়ার শেষ ছিল না সুদেবের। কাকার কি মাথা বেঠিক হয়ে গেল হঠাৎ?

কাকা এবারে আচমকা বললেন, 'তোমরা ব্রাহ্মণ।'

মানুষ আকাশ থেকে কি করে পড়ে জানা নেই সুদেবের। কিন্তু সে আকাশ থেকেই পড়ল। কিছুই জিজ্ঞাসা করতে না পেরে তাকিয়ে রইল।

কাকা বললেন, 'তোমার বাবার নাম শশাঙ্কমোহন চক্রবর্তী। পিতামহের নাম সূর্যমোহন চক্রবর্তী। আমি তোমাদের রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।'

সুদেব আর একবার আকাশ থেকে পড়ল। তার মুখটা একটু কি বলবার মত হাঁ হয়ে গেল। কিন্তু কিছুই বলতে পারল না।

কাকা বলতে লাগলেন,—তোমার এখন বয়স হবে তিরিশ। সে অনেক, প্রায় ২৭ বছর আগে তখন আমারও বয়স হবে ঐ ৩৫/৩৬। একদিন শীতের সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখি, একটি ছোট পাতলা জামা পরা একটি ছেলে আর সাদা শাড়িপরা একজন মেয়ে আমার বাড়ির রকের এক কোণে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। পৌষমাসের আকাশ অস্পষ্ট কুয়াশায় না মেঘে ভরা, নীচের কলকাতা ধোঁয়ায় অন্ধকার। শীতটাও কন্‌কনে ভাবের পড়েছে। বাড়ির ভেতরে চলে গেলাম। বসবার ঘরের দরজা জানলা খুলে নিজের কাজ করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরে একবার কি করতে বেরিয়েছি, দেখি তারা তেমনি বসে আছে।

মনে ভয় হল, অসুখ-বিসুখ কিছু নিয়ে বসে নেই তো। গিয়ে ডাকলাম, 'এই, বাড়ি যাও, এখানে কি করছো।'

মেয়েটি তার গায়ের কাপড় টেনে-টুনে ঢাকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল ছেলের হাত ধরে। পথের আলোয় মুখটা দেখতে পেলাম।

অবাক হয়ে দেখলাম, ভিখিরি নয়, রোগগ্রস্তও নয়, নিম্নশ্রেণীর মতও কেউ নয়। সেরকম অদ্ভুত সন্ধ্যায় ওরকম দেখতে মেয়ে, যেমন ভদ্র সুন্দর চেহারা, তেমনি ভদ্রমেয়ের মতই ভয় লজ্জাভরা মুখ—আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বয়সও বেশী নয়, হয়ত ২২/২৩।

ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে সে রক থেকে নামতে গেল। সঙ্কোচ লজ্জায় আর শীতে সে যেন কুঁকড়ে গেছে।

কি মনে হল যেতে বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনি কে?' আপনিই মুখে এলো, তুমি বলতে পারলাম না। 'আপনার কি অসুখ করেছে, না রাস্তা ভুলে গেছেন? বাড়িতে দিয়ে আসব? কোথায় বাড়িটা বলুন?'

মেয়েটি মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। তারপর বললে, 'বাড়ি চেতলায়, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তারা।'

চেতলা থেকে বউবাজার এসে পড়েছে? তাড়িয়ে দিয়েছে এই শীতের দিনে ঐ ছোট ছেলে নিয়ে?

বিরক্ত হলুম তাদের ওপর, আর মেয়েটির ওপরও। মুখে বললুম, 'সেইখানেই পড়ে থাকলেন না কেন? কি বলে রাস্তায় বেরিয়ে এতদূরে এসে পড়েছেন?' মনে মনে বললুম, 'এই এতখানি পথ চলে এতটা সময় ভদ্রলোকের মেয়ের একলা বাইরে থাকা এ যে কি তা কি বোঝবার বয়স ওঁর হয়নি!'

তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। এবারে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আশ্রয় ছাড়ার ভয়ঙ্কর দিকটা কেমন, তাঁর জানা ছিল না বুঝলাম। দয়া হল, বললাম, 'চলুন বাড়িতে দিয়ে আসছি আমি।'

তিনি রাজী হয়ে ঘাড় নাড়লেন। আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে এলাম। চেতলায় তাঁদের বাড়ি পৌঁছলাম। রাত্রি তখন প্রায় ৯টা। কয়েকবার কড়া নাড়তে একজন বেরিয়ে এলেন। মোটাসোটা ভদ্রলোক।

বললেন, 'কি মশাই?' তারপর মেয়েটিকে দেখেই চিনলেন। রূঢ়ভাবে তাঁকে বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে? এটি কে?' আমি বললাম সন্ধ্যার কাহিনীটা। ভদ্রলোক একটু অভদ্র নোংরা ধরনে হাসলেন মেয়েটির দিকে চেয়ে। তারপর বললেন, 'উনি তো চলেই গিয়েছিলেন ইচ্ছে করে। আর ট্যাক্সি ভাড়া করে এসে বড়লোকী দেখানোর দরকার ছিল না। আপনার কাছেই নিয়ে যান।'

রাগে আমার গা আগুন হয়ে উঠল। আমি গাড়িতে উঠলাম, বললাম, 'আমার সঙ্গে ওঁর কি সম্বন্ধ? বাড়িতে রাখুন বা যা খুশী করুন। আমি চললুম।'

ভদ্রলোক বিদ্রূপ করে বললেন, 'তা সম্বন্ধ না থাকে নেই, এখন তো চেনাশোনা হয়েছে। আমার বাড়িতে আর জায়গা নেই ওঁর।' বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

হতবুদ্ধি হয়ে নামলাম। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে 'ও মশাই ও মশাই' বলে ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া পেলাম না। শুধু বুঝলাম আশপাশের বাড়ির লোকেরা জানালা থেকে দেখছে।

তোমার মাকে বললুম, 'তা হলে আপনি এখানেই থাকুন, আমি যাচ্ছি।'

তিনি কিছু বলতে পারলেন না, কাঁদতে লাগলেন। শেষে বললেন 'ওরা দরজা খুলবে না, আমি খোকাকে নিয়ে এই শীতের রাত্রে কি করে রাস্তায় থাকব! নিয়ে চলুন আমাকে, কাল এসে পায়ে ধরে থাকব।'

নিরুপায় হয়ে, খুব বিরক্ত হয়ে তোমাদের নিয়ে বাড়িতে এলাম।

আমার বাড়িতে মেয়েমানুষ নেই। আমার মা বাপ নেই। ভাই বোন কেউ ছিলেন না। একটিমাত্র চাকর আমার। আমি রাত্রে বাড়ি ফিরে তাকে আমার কাগজের দোকানে শুতে পাঠাই। মহা ভাবনায় পড়লাম। যাই হোক, বাড়ি ফিরে চাকরটাকে বললুম, 'দেশ থেকে একজন আত্মীয়া এসেছেন, স্টেশন থেকে নিয়ে এলাম।'

তার পরদিন পত্রপাঠ আপদ বিদায় করব ঠিক করে শুয়ে পড়লাম।

তার পরদিন সকালবেলাই তোমাদের নিয়ে চেতলায় রাখতে গেলাম। সে যেমন হয়ে থাকে, লাঞ্ছনা খুব হল। তোমাদের হল, আমারও হল।

কাকা চুপ করলেন খানিকটা। তারপর বললেন, 'বুঝতেই পারছো, তারপর তোমরা আর কোথাও যেতে পারনি। একজন মেয়েমানুষের যতই রাগ হোক, লাঞ্ছনা হোক, একটা দিন বা রাত্রি বাইরে থাকা তার চূড়ান্ত অপরাধ।'

সেই অবধি তোমরা আমার কাছেই রয়ে গেলে।

সুদেবের নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অসংলগ্ন প্রশ্ন, প্রতি-প্রশ্নে, তার উত্তরে তার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সে মাথা নিচু করে বসেছিল।

তারপর কাকা বললেন, তোমার বোধহয় মনে হচ্ছে, আর কেউ তোমার আপনার লোক ছিল কিনা! ছিল না। তোমার মা মামার বাড়িতে মানুষ। বিয়ে দিয়ে তাঁরা দায়মুক্ত হয়েছিলেন। বিধবাকে বহন করার মত আত্মীয় কেউ ছিল না সেখানে। আর এখানে যিনি আত্মীয় তিনি তোমার বাবার কাকার ছেলে। যে কারণেই হোক, তোমার মা আর তাঁর স্ত্রীতে বনিবনাও ছিল না। পরে বুঝেছিলাম।'

সুদেব উঠে দাঁড়াল, বললে, 'আমি যাই কাকা।'

কাকাও বিচলিতভাবে বসেছিলেন। অসংখ্য নিঃশব্দ প্রশ্ন-উত্তরের যেন অদৃশ্য নীরব বিচারসভা বসেছিল ঘরে। কে বিচারকর্তা, সুদেব? কিসের বিচার? দয়া করার? কার বিচার? আশ্রিতা আর আশ্রয়দাতার?

কাকা উঠে দরজা খুললেন। সুদেব দাঁড়াল, সহসা জিজ্ঞাসা করল, 'তা আমার নামের পিছনে চক্রবর্তী না দিয়ে 'সরকার' কেন দিলেন?'

কাকা বললেন, 'সরকার দিতাম না—তোমার মা বললেন—তিন চার বছর নিজের ভাইপো ভাজ বলে পরিচয় ছিল। স্কুলে ভর্তির সময় চক্রবর্তী বললে হয়ত তোমার মাকে আর তোমাকে নতুন জবাবদিহির অসুবিধায় পড়তে হবে তোমার বন্ধুবান্ধবদের কাছে।'

কাকা থামলেন একটু, তারপর বললেন, 'তার বছর কয়েক পরেই আমি বুঝতে পারলাম সেই ছোট অসুবিধার চেয়ে ঢের বড় অসুবিধায় আমাকে পড়তে হবে। যা আজকে হচ্ছে।'

সুদেব চলে গেল।

তার আধুনিক শিক্ষিত মনের কাছে এ সমস্যা হয়তো কিছুই নয়, হয়ত অসবর্ণ

বিয়েই করবে কারুকে। হয়ত সকলকে বলতে পারবে সে সরকার বংশের সন্তান নয়—চক্রবর্তীর ছেলে। কিম্বা বিয়েই করবে না।

কিন্তু তার মন এসব কিছুই ভাবছিল না। সে লুকিয়ে লুকিয়ে ভাবছিল অন্য কথা...

মার কথা, কাকার কথা, কাকার অবিবাহিত থাকার কথা...মাকে এতদিন ধরে আশ্রয় দেওয়াতে ওঁর লাভ কি?...আর মা? মা কেন ছিলেন? কোথাও চলে যাননি কেন?...

সেই মনই আবার ভাবে, তার একথা ভাবার দরকার কি? অধিকার কি? মা বা কাকাই তো তাকে বড় করেছেন, দেখেছেন। অকৃতজ্ঞের মত আজ দোষ ছল খুঁজবে কেন?

আর দোষই বা কি ও দেখতে পেয়েছে? আশ্রয় না পেলে কোথায় যেতেন মা?...আরও খারাপ হতে পারত ঘটনা।

পুরাণের কথা ভাবে—কত কথা—ব্যাস-সত্যবতী, কর্ণ-কুন্তী, বৃহস্পতি-তারা, জবালা, অহল্যা। তবু মন নিষ্ঠুর হয়ে কেবলি সব কথা বিশ্লেষণ করে।

সারাদিন কাজকর্মে কাটে। বাড়ি এলেই তার কান কেমন জননীর সঙ্গে কাকার কথাবার্তায় উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। শুনতে যেন ভাল লাগে না।

শেষে কাকাকে একদিন বললে, 'আমি একটা ভাল চাকরি পাচ্ছি। সরকারী। বেশ উন্নতি আছে।'

তারক সরকার অবাক হলেন একটু। পরে বললেন, 'তোমার মা?'

সুদেব সহজভাবে বললে, 'মা থাকুন না এখানে।'

তারক চুপ করে রইলেন। বুঝতে পারলেন, ও এই সংসার থেকে পালাতে চায়।

চাকরি ভাল। ইচ্ছা করলে উদয়াস্ত খাটা যায় হাসপাতালে। উপরওয়ালারা মুগ্ধ হয়ে যায় এই ধরনের এমন কর্তব্যপরায়ণ জীবন, একটা আদর্শ।

রাত্রে পড়ে নিজেদের পুরাণ, ধর্ম, বিদেশের ইতিহাস। কেউ যদি তাকে সান্ত্বনা দেয়। নজীর বা দৃষ্টান্ত অনেক, কিন্তু নজীর তো সান্ত্বনা নয়। থেকে থেকে ছোটবেলা মনে পড়ে, রেখাছবির মত। অন্যমনে ভাবতে ভাবতে সে সেই ছবিতে অনেক রকম রং লাগায়, ফলায়।

মনে হয়, ব্যাস যেন সত্যবতীকে ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু কর্ণ কুন্তীকে সহ্য করেননি, ক্ষমাও করেননি, স্বীকারও করেননি। আর নিজের জীবনযাত্রাও স্বীকার করে নিতে পারেননি, মৃত্যু বরণ করেছিলেন। আর কুন্তী? কুন্তী রাজ্য পাওয়া ছেলেদের কাছে থাকেননি। বনে গিয়েছিলেন। দাবানলে পুড়ে মরেছিলেন। সে দাবানল কি মনের? কর্ণের ধিক্কারের?

একদিন খবর আসে কাকার খুব অসুখ। সুদেব গেল। কাকার সঙ্গে দেখা হল। কয়েকদিন পরে তার হাতের ওপর হাত রেখে তাঁর মৃত্যু হল।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্র দেখল। তাঁর ব্যবসা তাঁর বাড়ি সব তার নামে।

শোক তার হল না। কিন্তু কি এক অপরাধ-বোধ তার মনে ছুঁচ ফোটাতে লাগল। জীবনধারণের সমস্ত ঋণ প্রকাণ্ড হয়ে তার সামনে ফুটে উঠলো।

সুদেব কাছা গলায় দিল। একমাস ধরে নিয়ম করল। শ্রাদ্ধ করল সমারোহ করে।

কাজ শেষ হয়ে গেলে মাকে বললে এবারে সে চাকরির জায়গায় যাবে। সুদেব আর কাকার কোন কথাই মা শোনেননি বা জানতেন না। কিন্তু এতদিনে যেন বুঝেছিলেন সুদেব যেন অন্যরকম হয়েছে।

তিনি বললেন, 'আমি কোথায় থাকব?'

সুদেব বললে, 'এখানেই থাকবে। আর ইচ্ছে হয় কাশী গিয়ে থাকতে পার। ব্যবস্থা করে দেব।'

মা চুপ করে রইলেন একটু। তারপর সঙ্কুচিতভাবে বললেন, 'তুই বিয়ে-টিয়ে করবি না?'

সুদেবের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। মনে মনে বললে, 'বিয়ে? বিয়ের মত ব্যবস্থা রেখেছ!' মুখে সংক্ষেপে বললে, 'এখন তো নয়। আর সে কথা আমিই ভাবব।'

তার কঠিন মুখ, সংক্ষেপে উত্তর যেন জননীকে জানিয়ে দিল, এ বিষয়ে মার কিছু বলা বা ভাবা অনধিকার চর্চা।

মার কাশী যাবার ব্যবস্থা হল।

প্রচুর অর্থ, অজস্র অবসর, অপরিমেয় অবোধ্য অবসাদ আর সঙ্কুচিত অবজ্ঞাত অস্তিত্ব নিয়ে মা কাশী বাস করতে লাগলেন। টাকা নিয়মিত আসে। চিঠি কদাচ। দেখা! সুদেবের সময়াভাব।

বছর শেষ হয়ে গেল। সুদেব একসময় কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরেছে। সহসা সুদেব বিয়ে করল। রেজিস্ট্রি করে। নিমন্ত্রণ নয়, অনুষ্ঠান নয়, উৎসব নয়।

বন্ধুরা বললে, 'এ আবার কি? মাকে আনলে না কেন? একটু হৈ চৈ করা যেত। আর স্বজাত তো,—রেজিস্ট্রিই বা কেন?'

সুদেব বললে, 'এই তো ভাল। হিন্দু বিয়ের অনেক দায়। এ যখন ইচ্ছে স্বাধীন হতে পারা যাবে। মার কাছে যাব এক সময়। তিনি আবার এরকম বিয়ে পছন্দ করবেন না। সেকেলে মানুষ।'

স্ত্রীও মাঝে মাঝে বলে, 'চল না একবার দেখাই করে আসি। না হয় নিয়ে এসো না তাঁকে?'

সুদেব বলে, 'বড্ড কাজের ভিড়। আমরাই যাব। আশ্চর্য করে দোব।'

এতদিনে সুদেবের জীবনের গতি বদলেছে। প্রাচুর্য ও প্রমোদময় জীবন। স্ত্রী। সন্তান একটি।

কাজের আর নতুন নতুন প্রমোদের পরিকল্পনায় স্বামী-স্ত্রী ও বন্ধুবান্ধবদের নিরবসর দিনরাত্রি।

ছেলের ভাতের সময় স্ত্রী বললে, 'চল এবারে মাকে খোকাকে দেখিয়ে আনি।'

ছেলে কোলে নিয়ে সুদেব অন্যমন হয়ে গেল একটু। নিমেষের জন্য মনে পড়ে গেল, কাকার কাছে শোনা, একটি সাদাজামা পরা শিশু, একজন বিধবা জননী।

স্ত্রীকে বললে, 'হ্যাঁ, যাব এবার। আর একটু বড় হোক।'

ছেলে বড় হতে লাগল। আজ শীত, ঠাণ্ডা লাগবে খোকার। কাল বসন্ত, বসন্ত হচ্ছে দেশে। পরশু বেজায় গরম কাশীতে। বছর ঘুরে গেল আবার।

কাশী থেকে চিঠি এলো। মার অসুখ, খোকা যদি একবার আসে। দেখতে ইচ্ছে করে।

স্ত্রী বললে, 'দেখ তো, কি অন্যায়। চল সকলে যাই একসঙ্গে।'

সমারোহে জিনিসপত্র গোছানো হতে লাগল। ছেলের পোশাক-পরিচ্ছদ, ফুড, নিজেদের প্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য, বহু আয়োজন।

আবার ছেলের অসুখ হয় একটু, সুদেবের রোগী ছাড়ে না, দিন কাটতে থাকে।

চিঠিও আর আসে না। হয়ত মা ভাল আছেন। একটু কাজের ভিড় কমলে যাওয়া যাবে।

কিছুদিন পরে চিঠি এলো কাশীর বাড়ির লোকদের থেকে, সুদেবের জননী কাশীপ্রাপ্ত হয়েছেন।

স্ত্রী বললে, 'ছি ছি, কি করলে বল তো!' তার চোখে জল এলো। মৃত্যুকালেও দেখা হল না। সুদেব শুষ্কভাবে স্ত্রীর দিকে চাইল।

দিনটা গেল। তারপর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে যাওয়া ঠিক করব?'

স্ত্রী বললে, 'আমাদের যাবার আর দরকার নেই, যখন দেখাই হল না। তুমি একলাই যাও।'

সুদেব কাশী গেল। আবার নিয়ম করল, হবিষ্য করল, বাড়ির লোকেরা বললে, শেষ অবধি আপনার কথা, নাম বলেছেন।

শ্রাদ্ধ এসে পড়ল। গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ হবে। কিন্তু ডাক্তার সুদেব সরকারের নাম বা খ্যাতি তো কাশীতেও কম নেই। সমারোহ করে ব্রাহ্মণ ভোজন হবে।

একটি পুরোহিত ব্রাহ্মণ দিয়ে শ্রাদ্ধ বসল। গঙ্গাস্নান করে দশাশ্বমেধে কাজ আরম্ভ হল। মন্ত্র পড়া হতে লাগল।

পুরোহিত বললেন, 'নাম বলুন আপনার, আপনার পিতার।'

সুদেব বললে, 'শ্রীসুদেব চক্রবর্তী, পিতার নাম শশাঙ্কমোহন চক্রবর্তী, পিতামহের নাম সূর্যমোহন চক্রবর্তী।'

পুরোহিত অবাক হয়ে চেয়ে দ্বিধাভাবে বললেন, 'আপনার নাম কি ডাক্তার সুদেব সরকার নয়?'

সুদেব সরকার বললেন, 'সুদেব চক্রবর্তী।'

সুদেবের আঙুলে কুশের আংটির পাশে হীরার আংটি, পাশে চামড়ার অফিস ব্যাগে নোটের গোছা। সামিয়ানার তলায় সাজানো রূপার ষোড়শ, বস্ত্র, ভোজ্য, পালঙ্কে রেশমের শয্যা, গোদানের মূল্য। পুরোহিত একটু ভাবলেন। ভাবলেন হবে বা। তারপর মন্ত্র বলে বললেন, 'শ্রীসুদেব চক্রবর্তী, তস্য পিতা ঈশ্বর শশাঙ্কমোহন চক্রবর্তী, তস্য পিতা ঈশ্বর সূর্যমোহন চক্রবর্তী। পিতামহের পিতা ও পিতামহীর নাম?'

অসহিষ্ণুভাবে সুদেব সরকার বললেন, 'যথা নামে বলে দিন সব।'

সুদেব কলকাতায় ফিরল।

অগ্রাণের সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন অথবা মেঘাচ্ছন্ন কবে শোনা একদিনের মত। উপরে স্ত্রী ছেলে কোলে জলযোগের আয়োজন নিয়ে বসে আছে। বছর দেড়েকের চমৎকার সুন্দর শিশু। লোকে বলে, ঠিক বাপের মত দেখতে। ছেলে তাকে দেখে হাত বাড়িয়ে এলো। সে কোলে নিল। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল মৃদুস্বরে, 'মা কিছু বলতে পেরেছিলেন?'

সে মাথা নাড়ল শুধু। তার আকণ্ঠ কিসে ভারী হয়েছিল যেন। তার বুকের উপর আর একটি ছোট বুক স্পন্দিত হচ্ছিল, বহুদিন আগের একটি আশ্রয়চ্যুতা অনাথা মেয়ের বুকে আর একটি শিশুর মত।

গল্পভারতী, আশ্বিন ১৩৫৮

অজাত

গলদ্‌ঘর্ম হয়ে ঘুম ভেঙে গেল। ঘেমে যেন শরীরটা নেয়ে উঠেছে।

উঃ, কি দুঃস্বপ্ন! সতী উঠে বসল।

না। খোকা তো পাশে ঘুমোচ্ছে। মেয়েও ঘুমোচ্ছে তার এপাশে।

স্বামীও পাশের বিছানায় ঘুমোচ্ছেন। সবাই ভালোই তো আছে।

কিন্তু ভোরের স্বপন। কেন এমন স্বপন দেখল। খুব গরমের দিন তো নয়, তবে এত ঘামই বা কি করে হল।

সে আস্তে আস্তে উঠে বসল। জানালার ধারে। আকাশটা নীল হয়ে আসছে। তারাগুলোও মিলিয়ে আসছে। শুকতারাটা ঝকঝক করছে আকাশের গায়ে।

কিন্তু ভোরের স্বপন যে ফলে যায় লোকে বলে। কি হবে? কি করবে? এও লোকে বলে আবার ঘুমোলে ফলে না।

তাহলে আবার গিয়ে শোবে কি? কিন্তু আর কি ঘুম আসবে? বিছানাটা দেখতে ভয় করছে। যদি আবার ঐ স্বপ্নটাই দেখে! তাহলে কি হবে?

সে ঝরঝর কেঁদে ফেলল।

ঐরকম অন্যায় কাজ করেছে বলেই কি এই বিশ্রী ভয়ঙ্কর স্বপন্ দেখল!

কিন্তু ডাক্তার যে বললে ওতে দোষ হয় না।

ভয়ে ভয়ে ও বলেছিল, 'কিন্তু...ওর তো প্রাণ আছে। প্রাণ জন্মেছে। একি করতে আছে!'

উনি বললেন, 'ওতে দোষ হয় না। আমাদের তো আর ছেলেমেয়ে দরকার নেই।...'

ওর চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। দরকার নেই তো—হল কেন। এলো কেন?...নাই হত।

শক্ত করে চোখ বুজল ঘুমের জন্য। এখুনি ভোর হয়ে যাচ্ছে। তার আগে ঘুমোতে হবে। নইলে স্বপনটা ফলে যাবে।

বন্ধ করা চোখের সামনে ভেসে এলো সেই স্বপ্নটা....। সেই ছেলেটা। তার মুখ নেই।

কিন্তু যেন সেই ছেলেটাই, তার এই খোকাই। যে তার প্রথম সন্তান। তার অনিরুদ্ধ। বড় আদরের। যাকে জন্মের সম্ভাবনাতেই না দেখেই সে ভালবেসেছিল। কোলের মধ্যে

পেয়েছিল কি যেন অমূল্য জিনিস। রক্তমাংসের মধ্য দিয়ে অনুভব করা এক না জানা প্রাণবিন্দুকে দশ মাস ধরে যাকে না দেখেই ভালবেসে লালন করেছিল চুপি চুপি। মনে মনে তার আকার তার রূপ তার অস্তিত্ব কল্পনা করেছিল। প্রথম মা'রা যেমন না দেখেই ভালবাসে তেমনি করে। ক্রমে ক্রমে সে প্রাণবিন্দু তার দেহের মধ্যে নড়াচড়া করেছে, আকার নিয়েছে, কেমন করে তার কিছুই জানা ছিল না। জানে না কোনদিন। অথচ কি রকম এক মায়া-মমতাতে তার বুক ভরে উঠেছিল...। ভালবেসেছিল। কত সাবধানে থাকত। পাছে তার ক্ষতি হয়, কষ্ট হয়। পাছে সে নষ্ট হয়ে যায়। গুরুজনরা কত সাবধান করতেন। একে সে দেখেনি। কিন্তু কেন খোকার মুখটা দেখা গেল না? যে গেছে এর তো চেহারা জানা নেই। এর শরীরে খোকার মত দেখতে হয়ে সে এলো কেন? শরীরটা দেখা গেল। মুখটা ঝাপসা হয়ে গেল। তারপর শরীরটাও ঝাপসা হয়ে গেল। কিন্তু ওরা একে কেন নষ্ট করল? আর একটা হলে কি ক্ষতি হত। কিম্বা একেবারেই যদি না জন্মাত। ভাবে, এ কাকে সে—তারা সবাই নষ্ট করে ফেলল। যে হয়নি তাকে? না এই সন্তানকে?

সে বন্ধ চোখে আকুল হয়ে কেঁদে ফেলল। তাহলে কি এই পাপের জন্য এই খোকার ক্ষতি হবে? তাই খোকার মুখ দেখতে পেল না?

কেন সেই ঝাপসা খোকার শরীরে এ খোকার মুখ এলো! ঝাপসা হয়ে দেখা দিল!

ভোর হয়ে গেল। চোখ টিপে ভাবতে লাগল ঘুম আসছে। ভোর হয়নি এখনো। না ঘুমোলে ভোরের স্বপন যদি সত্যি হয়ে যায়! মন অবিশ্বাস করতে পারে না। ভয়ে-ভাবনায় সব সংস্কার সত্যি মনে হয়।

পাশে ছেলেমেয়ে জেগে উঠল। স্বামীও উঠলেন। ভোর হয়ে গেছে। পথে জল দিচ্ছে জমাদাররা। কাক আর কি যেন অন্য পাখিও ডাকছে।

ম্লান বিবর্ণ বিহ্বল মুখে সে উঠে বসল। ছেলের মাথায় হাত রাখল। ছেলে মাকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিল। মেয়ে এলো। চকিতের মত মনে হল যাকে বাঁচতে দেওয়া হল না, সেও কি এই খোকার মত হত? এমনি সুন্দর এমনি উজ্জ্বল চোখ, এমনি করে মা বলে জড়িয়ে ধরত! তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

তাড়াতাড়ি চোখ মুছল।

স্বামী বললেন, 'সকালবেলা চোখে কি হল। কাঁদছ নাকি?'

সে ম্লানভাবে হেসে বললে, 'না, কি জানি চোখটা করকর করছে কেন।'

২

কিন্তু আবার কয়েকদিন না কিছুদিন পরে ঐরকমের কি এক স্বপ্ন দেখল। কে আসে কাছে। আকার আছে মনে হয়, তারপরই মিলিয়ে যায়। কখনো মনে হয় খুকুর মত দেখতে।

কোঁকড়া চুল হাসি-দুষ্টুমিভরা মুখ। কিন্তু মুখটা মিলিয়ে যায়। দেখতে পায় না কার মত। খোকার মত, না খুকুর মত? না শুধু একটা পাখির ছানার মত। কি যেন!

নাঃ, ওর রাত্রের ঘুম গেল একেবারে। দিনে ঘুমোয় পড়ে পড়ে।

রাত্রে ঘুমোতে ভয় করে। বিছানাটা বদল করে নেয় অন্য জায়গায়।

স্বামী বলেন, 'তোমার হল কি? আজ এখানে কাল ওপাশে শুচ্ছ। মুখ-চোখ বসে গেছে। রাত্রে অর্ধেক রাত জেগে সেলাই কর। চোখ নষ্ট হয়ে যাবে যে।'

সে বলে, 'সেলাই জমেছে অনেক। শেষ করতে হবে তো।' মনে মনে ভাবে, স্বপ্নটা স্বামীকে বলবে কি! কিন্তু লোকে যে বলে বলতে নেই!

তার সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। তাহলে কি খোকারই ক্ষতি হবে। যাকে বাঁচতে দেওয়া হল না, সেকি তার দাদাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে স্বপ্নের মাঝ দিয়ে।

এখন যেন তার মনে উৎকট ভয় বাসা বেঁধেছে।

ক্রমে দিনেও স্বপ্ন দেখল। কি দেখল মনে পড়ে না। কিন্তু এলোমেলো স্বপ্ন।

দেখল যেন কেউ নেই বাড়িতে। বাড়ি খালি। কোথায় গেল ছেলে-মেয়েরা আর স্বামী?

ঘুম ভাঙল পড়ন্ত বেলায়। রোদ্দুরে ঘর ভরে গেছে, ঘেমে গা ভিজে গেছে।

ছেলেমেয়েরা বারান্দায় খেলা করছে একমনে। উনি আপিসে। মনে হয় কাকে যেন বলে সব কথা। মনে হয় ছেলেমেয়েকে জড়িয়ে ধরে কাঁদবে খানিকটা।

বুড়ো ঝি কলতলায় বাসন মাজছে। তাকে বলবে। বললে যদি সত্যি হয়ে যায়!

এখনকার সংসার, ঠাকুরঘর-টর নেই কিছু।

কিন্তু ক্যালেণ্ডারে তো ছবি আছে রামকৃষ্ণদেবের, মা দুর্গার—সেখানে লুটিয়ে পড়ে সে কেঁদে ফেলল।

৩

একদিন স্বামী বললেন, 'তোমার হয়েছে কি? অসুখ করল নাকি? ডাক্তার দেখাবে? রাত্তিরে মোটে ঘুমোতে পার না। জানালায় বসে থাক। কি হল কি?'

সে বললে, 'ডাক্তার কি হবে। তবে ঘুমটা একেবারে হয় না। কেবলি স্বপ্ন দেখি

খারাপ।'

'তা ওষুধ খাও কিছু ঘুমের—তাই ব্যবস্থা করি।'

সে ভাবে, 'তা খেলে হয়।'

ওষুধ এলো। ডাক্তারও এলেন।

ডাক্তার বললেন, 'একটা করেই খাবেন। বেশী খাবেন না, অভ্যেস হয়ে গেলে কাজ হবে না। শরীর কিছু খারাপ তো নয় দেখলাম। তবে চেহারা খারাপ হচ্ছে দেখছি। তা হোক, এতেই কাজ হবে।'

সে ওষুধ খায়। আর আকুল হয়ে ভাবে এবারে খুব ঘুমোবে। একেবারে গভীর ঘুম। যেমন প্রথম সন্তান হবার পর ঘুমোতো। বড়রা বলতেন, 'বাপরে, সতীর কি ঘুম। যেন কুম্ভকর্ণ।' হাসতেন। 'হয়তো আর স্বপ্ন দেখবে না তাহলে।'

ওষুধ খেয়ে ঘুমোলো। খুবই ঘুম হল। বেশ মাস দুই গেল। শরীর ভাল হচ্ছে বেশ। স্বামী খুব খুশী।। হঠাৎ ভয় হল। এবারে শরীর ভাল হচ্ছে, যদি আবার...আতঙ্কে কাঠ হয়ে যায় শরীর।

৪

ঘুম আসে। ঘুম ভাঙে। আবার স্বপ্ন দেখল। এবার দেখল সেই অজাত শিশু ওর বিছানার পাশে বড় ছেলের পাশে মূর্তিহীন ছায়াতনু নিয়ে খোকার গায়ে মিলিয়ে গেল।

ওষুধ খেয়ে গভীর ঘুম। চোখ খুলতে চায় না। কিন্তু স্বপ্ন দেখে কেন। চুপ করে উঠে বসে ভাবে। ছেলেমেয়েকে আদর করতে পারে না। ইচ্ছা হয় না। মন যেন অসাড় অবশ হয়ে গেছে। যেন মনে হয় ওরা থাকবে না। সে মা হয়ে জীবহত্যা প্রাণহত্যা করতে দিয়েছে শরীরের মধ্যের। ওরা বেঁচে থাকবে না। সেইজন্যেই থাকবে না।

স্বামীর কাছে যেতে ভয় হয়। সোহাগ আদরকে ভয় করে। উৎকট ভয় জাগে। কি করবে সে বেঁচে থেকে...।

আর ওষুধে কিন্তু কাজ হয় না! ঘুম ভেঙে যায় খালি। স্বপ্ন না দেখলেও ভয় হয়।

কিন্তু এমন করে কতদিন ভয় করে না ঘুমিয়ে থাকবে? তবে কি ঐ ওষুধটা আরো বেশী করে খেয়ে দেখবে? যাতে সমস্ত রাত মড়ার মত ঘুমোতে পারে। সেই প্রথম সন্তানের জন্মের পরের মত। আর ঘুম!... সে মনে মনে ম্লানভাবে হাসে।

এবারে সে ঘুমোলে।

সারারাত্রি। সারা সকাল অনেক বেলা অবধি। স্বামী ডাকলেন, 'সতী, বেলা হল। সতী ওঠো।' গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন। গা হিম।

ছেলেমেয়েরা 'মা জাগো' বলে কাছে এসে জাগাতে লাগল। কিন্তু সে খুব ঘুমিয়েছে। অনেকদিন অনেক বিনিদ্র রাত্রির পর। এবারে কোনোদিন আর স্বপ্ন দেখবে না।

পুত্রেষ্টি

যাচ্ছিলাম ট্রেনে অনেক দূরের পথ, ভিড়ও খুব, গাড়ুর মত বসে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় যে রাত্তিরের মধ্যে হবে, আশা ছিল না। প্রায় সকলেই নামবে আমারই সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে। ভিড় যখন চরম হয়ে গেছে,—আর নতুন লোক আসার উপায় নেই, দরজা আগলাবার দরকার নেই, কেননা দরজার সামনে বাক্স-বিছানা রেখে তার ওপর লোক বসে সেটাও আগল-বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন গাড়িসুদ্ধ লোকে কেমন ভাব হয়ে গেল। সকলে সকলের পাশের লোকের পরিচয় নিল। খবরাখবর জিজ্ঞাসা করল এবং গভীরভাবে সুখ-দুঃখের কথা কইতে আরম্ভ করল। যারা খানিক আগে সূচ্যগ্র জায়গা নিয়ে দুর্যোধনের মত ঝগড়া করেছিল।

মাঝখানের সামনের বেঞ্চি ঠাসা, আমি একটা পাশের বেঞ্চির কোণে বসতে পেরেছিলাম। গাড়ি পুরো জোরে চলেছে, একেবারে পরের বড় স্টেশনে গিয়ে থামবে।

সহসা কানে এলো—'ছেলেপিলে?' 'ছেলেপিলে নেই মশাই।' কি করা হয়?' তার পর কানে আসে—'কত পান?' এসব সমাজে পরিচয় করাতে লাগে না। এবং এই সব অভব্য, অসভ্য প্রশ্নও লোকে সরল মনেই জিজ্ঞাসা করে—আর শ্রোতাও বিরক্ত হয় না—সহজভাবেই উত্তর দেয়। তাই এসব জায়গায় প্রথমেই পৃথিবীর আদিম প্রশ্ন ওঠে খাদ্য-সংগ্রহের,—তারপর আসে সেই খাদ্য কাদের জন্য। কাজেই 'কত পান', 'কয়টি পুত্র', 'কোথায় থাকেন' কারুরই জানতেই ও জানাতে সংকোচ নেই।

শুনলাম নিঃসন্তান লোকটি বলছেন, 'বেশ আছি মশায়। যদিও বুড়ো বয়সের কথা ভাবি। তবে পরিবারের মনে সুখ নেই। তাঁর জন্যেই এই কলকাতায় যাওয়া। কে এক সাধু আছেন, তিনি নাকি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করান, যজ্ঞ সফল হয়।'

অন্য লোকটি অর্থাৎ প্রশ্নকর্তা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'ও!'

নিঃসন্তান ভদ্রলোকের কাছাকাছি আর একজন ছিলেন, হঠাৎ আক্রোশের সুরে বলে উঠলেন, —'ও ঝামেলা আবার লোকে সাধ করে চায়? কি করে জানবেন যে, ছেলেই হবে আর মেয়ে হবে না, আর মেয়েও একটিই হবে—সাত বা ন'টা মেয়ে হবে না। আর বুড়ো বয়সে? এক বেটা-বেটিও দেখে না মশায়। সব নিজের নিয়ে থাকে। এই আমার ছ'টা মেয়ে, তিন ছেলে। পাঁচটা মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, দুই ছেলেরও দিয়েছি। গত বছর থেকে স্ত্রী একেবারে 'চৌরঙ্গি' (চতুরঙ্গ?) বাতে শয্যাগত, তা এক বেটা জামাইও মেয়ে পাঠালে না। আর বৌমারাও তাঁদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ঘর-সংসার নিয়ে ছেলেদের কাছে। ছোট মেয়ে দু'বেলা রাঁধে—আমার আপিস, ভায়েদের ইস্কুলের ভাত দেয়, রুগীর সেবা করে। ধরুন, ওদেরও বিয়ে হয়ে গেছে, আর আমরা বুড়ো-বুড়ী দু'জনেই রোগে পড়িছি। তখন?' তিক্তভাবে চতুর্দিকের শ্রোতাদের দিকে চেয়ে আবার বললেন, 'তখন কি করবেন? আসল কথা থাকতো টাকা, সবাই পিঁপড়ের

মত আসতো সারি গেঁথে। তা ছেলেমেয়েই বলুন আর ভাইপো-ভাগ্নেই বলুন। কিন্তু তখন আমার আপনার লোকও লাগতো না! লোক রাখতে পারতাম! লোক রাখতাম মশাই! জানেন?'

নিজের সিদ্ধান্তে পরিতুষ্ট হয়ে দিগ্বিজয়ীর মত তিনি একবার সকলের দিকে বা গাড়ির চারধারে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

একজন ক্ষীণ কণ্ঠে একটু প্রতিবাদ করতে চাইল, 'আপনার ছেলেমেয়ে আর লোকজন তুলনা হয়? আর লোকজন যে চুরি করে খুন করে পালাবে না—তাই বা কে জানে?'

দিগ্বিজয়ী বললেন, 'তা করতে পারে চুরি, করবে হয়ত খুন, কিন্তু পাচ্ছি কোথায় আপনার ছেলেমেয়ে? বলুন?'

ওদিকের এক কোণ থেকে আর একজন বলতে চাইলেন, 'তা সব জায়গায় সমান হয় না। বেশীরভাগ জায়গায় ছেলেমেয়েরা সেবা-যত্ন করেই থাকে।'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে দিগ্বিজয়ী বললেন, 'আর অনেক সময় যে করে না, সেটা দেখতে পেয়েছেন নিশ্চয়?'

তর্কের আড়াল থেকে কানে এলো 'ও' বলে নীরব প্রশ্নকর্তা তাঁর পাশের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য ইচ্ছুক লোকটিকে পুরানো কথার সূত্র ধরে বললেন, 'আমি একটি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার কথা জানি।'

ভদ্রলোক আবার চুপ করলেন। তাঁর যেন খানিকটা বলার পর আর না বলা অভ্যাস। লোকে প্রশ্ন করুক, করলে বলবেন। সবাই ভাবছিলেন তিনি বলবেন। তাঁরা উৎসুকভাবে চুপ করে রইলেন।

ছেলেমেয়ের কর্তব্য আলাপনের বচসাটা তখন থেমে গেছে।

একজন সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে এখনও লোকে? রামায়ণেই পড়েছি দশরথ করেছিলেন। সে তো রাজা-রাজড়ার ব্যাপার।'

প্রথম ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, করে বৈ কি। রাজা-রাজড়ার মতই কতকটা ব্যাপার বটে। তবে খরচেরও কম-বেশী তো আছে সব জিনিসের। আমি সেই পুত্রেষ্টির ছেলেটিকে দেখেছি।' আবার চুপ করলেন। যেন মনে কি দ্বিধা হচ্ছিল বলা উচিত কি না! কিন্তু কোথা থেকে যেন রূপকথা না কথকতার গন্ধ এলো ভেসে। গাড়িসুদ্ধ সবাই চুপ করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন উৎসুকভাবে।

যিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য কলকাতায় যাচ্ছেন তিনি বললেন, 'দেখেছেন? তা হলে যজ্ঞ করলে ছেলে হয়?'

প্রথম ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, হয়েছিল তো।' তাঁর এ কথার মধ্যে যেন অর্ধেক বলার মত কি ধরন ছিল। প্রায় সকলেরই মনে হচ্ছিল, তারপর কি? ছেলে তো হয়েছিল, আর ছেলেই তো বটে, মেয়েও নয়। তবে কি? বেঁচে নেই? না, কি?

আর একজন একটু অসহিষ্ণুভাবে বললেন, 'হয়েছিল তো মানে? আছে তো? বলুন না মশাই, ব্যাপারটা শুনি।' একগাড়ি শ্রোতা অবহিত ও উন্মুখ হয়ে ঐ লোকটির পানে চেয়ে রইলেন।

ভদ্রলোক একটু বিচলিতভাবে পুত্রেষ্টির জন্য যিনি যাচ্ছেন তাঁর দিকে একবার চাইলেন। কিন্তু আর গল্পটা না বলে উপায় ছিল না, বলতে আরম্ভ করলেন :

'সে অনেক দিনের কথা, তখন আমারই বয়স এই সতেরো আঠারো বছর। আমার দূর-সম্পর্কের পিশেমশায়ই ছিলেন। কাজ করতেন বর্মা না কোথায়। অনেক সময় যেমন হয়, থাকতেন বিদেশে, উপায় করতেন প্রচুর, খরচও করতেন অনেক রকমে। স্ত্রী থাকতেন দেশে মা-বাবার কাছে। নিজে যেখানে থাকতেন ভীষ্মদেব বা শুকদেবের মতন নয়, বেশ খুশি মতই থাকতেন। মাঝে মাঝে দেশে আসতেন। দু'টি মেয়ে হয়েছিল, ছেলে হয়নি।

তারপর তাঁর বাবা মারা গেলেন, মাও কিছুদিন বাদেই গেলেন। নিজেরও বয়স পরিণত হয়েছে, মেয়েদের বিবাহ হয়েছে, আর স্ত্রীকে একলা ফেলে রাখা চলল না। ভদ্রলোক দেশে এলেন। সে একটা সমারোহ যেন। বর্মার সৌখীন জিনিসে সেই পাড়াগাঁর সেকেলে বাড়ির কাছারি-ঘর ভরে উঠল। ছোট ছোট কাঠের খেলনা, চমৎকার ছোট্ট প্যাগোডা, বুদ্ধমূর্তিই কত রকমের, মোমজমানো কাপড়, চীনদেশী পর্দা, জাপানী চিক, ফুলদানি, 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' জপের মালা, কাঠের হালকা চমৎকার বাক্স, বাসন—কি যে নয়! তার সঙ্গে এলো দুটো কুকুর, দুটি হরিণ, একটি ময়ূর, তিনটি খাঁচাভরা ছোট্ট ছোট্ট পাখি ও লালচে রঙের কাকাতুয়া, আর একটি ছোট্ট বাচ্চা ভাল্লুক, তখনও বড় হয়নি। তার নাম ছিল টিপু।

আর বোধহয় অগাধ টাকা। টাকা কিরকম ভাবে অগাধ হয় তা তো বোঝবার সে বয়স নয়। পিসিমার গায়ে সোনার বোঝা, চাকর-বাকর-দাসীর ভিড়, গ্রামের সকলের ও-বাড়িতে আসা-বসাতে এখন বুঝতে পারি টাকা ছিল বেশ।

মেয়েদুটির বিয়ে আগেই হয়ে গিয়েছিল।

বছর খানেক কেটে গেল। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি গেছে। বাইরে পিশেমশাইয়ের দাবার ও গল্পের মজলিস আর ভেতরে পিসিমার তাসের আর তোশামোদের আসর—যেন আর জমাট বাঁধছিল না। বিদেশী জিনিস দেখে ও দেখিয়ে পুরানো হয়ে গেছে। সে দেশের গল্পও অনেকবার করে বলা হয়েছে। পিসিমার গহনার জৌলুসও বোধহয় পুরানো হয়ে এসেছিল। কি আর-কিছু কে জানে! যেন মনে কোনোখান একটু ফাঁকা ঠেকছিল।

তারপর দেখলাম, পিসিমার বাড়িতে গণৎকার, জ্যোতিষী, সাধু-সন্ন্যাসীর যাওয়া-আসা, ভিতরে-বাইরে কথাবার্তা-আলোচনা—এত বিষয় সম্পত্তি কে খাবে, কার ভোগে লাগবে, মেয়ে মানে তো পাথর-বাটি, মিথ্যে সন্তান। বাপ-পিতামহর জলপিণ্ড লোপ পাবে—এইসব।

মাদুলী, কবচে পিসিমার হাতের সোনার তাবিজ, গলার হার, কোমরের চন্দ্রহার আরো ভারী হয়ে উঠল। আর পিসেমশাইয়ের মুখের মসৃণতাতে রেখা দেখা দিতে লাগলো।

তারপর পিসিমার একদিন রাত্রে আবার একটি মেয়ে হল। পিসেমশাইয়ের মুখ

ভারী হয়ে উঠল। পিসিমার চোখ জলে ভেসে গেল। যদিও লোকেরা সকলে নানা রকম সান্ত্বনা দিতে লাগল। তবু তাদের মাঝ থেকে অবশেষে কে একজন বললে, 'ওঁর মেয়ে-নাড়ী। ছেলে হবে না। আবার বিয়ে করুন মুখুজ্জে মশাই।'

কথাটা অনেকের মনঃপূত হল। যাঁরা পিসিমার সুখ-ঐশ্বর্যে ঈর্ষাতুর ছিল তাদের—আর যারা পিশেমশাইয়ের জন্য সত্য বংশধর চাইত তাদেরও। আবার অনেকে দুঃখিত হল। মেয়ে-জামাইরা রেগে গেল। আর পিসিমার চোখের জলে বিয়ের কথাটাও তখনকার মত ভেসে গেল।

বছর খানেক বাদে শুনলাম, এক নাকি মহা তান্ত্রিক সাধু এসেছেন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাবেন। ছেলে হবেই, মেয়ে নয়।

যজ্ঞের ফর্দ হতে লাগল—অনুষ্ঠানের দিন দেখা, আয়োজন, যোগাড়-যন্ত্র সব হতে লাগল। আর মোটা-মোটা হলদে পুঁথি দেখে সন্ন্যাসী ঠাকুর মন্ত্র নির্বাচন করতে লাগলেন। সব ঠিকঠাক হলে তবে সূর্য-ঘড়িতে লগ্ন দেখে (বিলিতী ঘড়ি নয়) যজ্ঞ হবে। হোমে আহুতি দেওয়া হবে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর বহু পুঁথি ঘেঁটে দেখে একদিন সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় এসে বললেন—'সবই ঠিক হয়েছে, পুত্র আপনার হবে। দিনও খুব ভাল পাওয়া গেছে, ক্ষণও মাহেন্দ্র। কিন্তু একটা জিনিস প্রয়োজন হবে।'

শীতকাল। পিসেমশাই বৈঠকখানার গদীর ওপর পায়ের ওপর পশ্চিমী বালাপোশ ঢেকে কাত হয়ে শুয়ে দাবা খেলছিলেন। সাধুকে দেখে উঠে বসলেন সসম্ভ্রমে। সন্ন্যাসী ঠাকুর গালিচার ওপর আর একটি গালিচার আসনে বসলেন। সকলে উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলেন সাধুর দিকে।

পিসেমশাই বল্লেন, 'কি জিনিস?'

—'একটি জীবিত প্রাণী চাই।'

—'কি রকম? বলি দেবার মত পশু?'

—'হ্যাঁ, তাই অনেকটা। কিন্তু যে পশুটি উৎসর্গ করা হবে, শিশু খানিকটা তার মতই আকার পেতে পারে, সেইজন্য চতুষ্পদ বা খেচর জলচর জাতীয় জীব উৎসর্গ করা সমীচীন হবে না। শাস্ত্রে বলেছে নরাকার জীব অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকা চাই।'

পুরুত ঠাকুর ছিলেন, আমার বাবাও ছিলেন ঘরে, আমার তাঁদের কাছেই গল্প শোনা। তাঁরা অবাক হয়ে রইলেন, নরাকার জীব কি পাওয়া যাবে! পিসেমশাইও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

পুরুতমশাই একটু ইতস্তত করে বললেন, 'নরাকার অর্থাৎ দ্বিপদ জীব বলছেন?'

সন্ন্যাসী একটু হাসলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, এই বানর জাতীয় জীব আর কি! ভয় পাচ্ছেন কেন?'

পিশেমশাই নড়ে-চড়ে বসলেন। তারপর বললেন, 'সেই বা কোথায় পাই?'

এইবার পুরুত ঠাকুর বললেন, 'তার অভাব কি আছে? একটা বাঁদর বা হনুমান

কিনে আনলেই হবে।'

সন্ন্যাসী আবার একটু হাসলেন, বললেন, 'তার দরকার নেই, সেও আমার ঠিক করা হয়েছে। এখানেই আছে। শুধু আপনার ইচ্ছা হলেই সেটি নেওয়া যাবে।'

পিসেমশাই ব্যগ্রভাবে বললেন, 'নিশ্চয়। কোথায় আছে সেটি?'

—'আপনার ভল্লুক-শাবকটি গ্রহণ করব। দ্বিপদও বটে, নরাকারও বটে, অপ্রাপ্তবয়স্কও বটে। একেবারে সবই শাস্ত্রানুগত পাচ্ছি।'

ভালুক-ছানাটি পিসেমশাইয়ের খুবই প্রিয় বা আদুরে ছিল। সকাল-সন্ধ্যা তাকে নিয়ে তাঁর একটু খেলা করা চাই-ই।

পিসেমশাই একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, 'একটা না হয় কিনে আনাই কোনো জন্তু?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'না, সে হবে না, তত সময় নেই। শুভলগ্ন যেটি পেয়েছি, সেটি এক বছরের মধ্যে আর নেই। তাছাড়া আমি আপনার যজ্ঞটি করে দিয়েই চলে যাব কুমারিকায়। সেখানে ৺মার কাছে আমার বিশেষ পূজা আছে। যদি সেখানে আমার থাকা হয়ে যায়, আর না আসি, তবে আপনার কার্যোদ্ধার হওয়া শক্ত।'

পিসিমার কানে গেল। স্বামীর আবার বিয়ের ভয় তাঁর যায়নি। পুরুষরা যে সত্তর বছরেও বিয়ে করতে পারে, তা তাঁর জানা ছিল। একবার যে পুরুষ মানুষ নিমরাজী হয়েছিল বিয়েতে, তার বিয়ে করতে কতক্ষণ? সে পুত্রার্থেই হোক, আর ভার্যার্থেই হোক। ওঁর স্বামীর বয়স তো মাত্র পঞ্চাশ বছর।

তিনি স্বামীর অন্য জন্তু কিনে আনার কথা কানেই তুললেন না। সন্ন্যাসী ঠাকুরের সব প্রস্তাবেরই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করলেন। ভাল্লুক-বাচ্চা তো কিছুই নয়,—হতাশায়, ভয়ে তিনি একটি পুত্রসন্তানের জন্য যে কোনো জীবহত্যা করতেই রাজী হয়ে যেতেন, এমনি হয়ে উঠেছিলেন। এই মহেন্দ্রক্ষণ, এই তিথি, এই লগ্ন আর ঐ তান্ত্রিক সাধুর ক্রিয়া একটা গৃহপালিত জন্তুর জন্য খোয়াতে রাজী নন। তাঁর নিজেরও বয়স প্রায় চল্লিশ হয়েছে, যদি সাধুর ফিরে আসতে দেরি হয়, যদি না-ই আসেন? আর স্বামী যদি আবার বিবাহে সম্মতি দেন?

চার-পাঁচদিনের মধ্যেই চারিদিক ঘিরে হোগ্‌লার উঁচু চাল করে বিরাট যজ্ঞ-মণ্ডপ তৈরি হল। আশে-পাশে হাজার ব্রাহ্মণভোজনের জন্য ঘিরে জায়গা করা হল।

তিনদিন ধরে যজ্ঞ হবে। প্রথম দিন পিতৃলোককে জলপিণ্ডদান, আভ্যুদয়িক নান্দীমুখ কৃত্য। তার পরদিন অর্ধরাত্রে জীবিত পশু উৎসর্গ আর হোম। শেষ দিনে এক হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন।

কদিন ধরে আমরা আর বাড়ি যেতাম না। দ্বিতীয় দিনে রাত্রি বারোটা থেকে পূজা আরম্ভ হল।

বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কে জাগিয়ে দিল। দেখি পিসেমশাই, পিসিমা আর সন্ন্যাসী ঠাকুর তিনজনে হোমের কুণ্ডটির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। হোমের কুণ্ডটি

সাধারণ হোমকুণ্ডের মত নয়, একটা তিন-চার হাত গভীর গর্ত।

সেই গর্তটার মধ্যে সেই ভাল্লুক-ছানাটাকে কয়েকজনে এনে নামানো হল। সে প্রথমটা নামতে চায়নি। অবশেষে মস্ত একছড়া কলা হাতে নিয়ে পিসেমশাইয়ের একটা হাত ধরে নামল।

গর্তের একধারে পিসেমশাই পিসিমা পাশাপাশি দুটি আসনে বসলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর সামনে বসলেন তাঁদের। সন্ন্যাসী ঠাকুরের পাশে নতুন নতুন ঝুড়িভরা নানারকম ফল, নৈবেদ্য, একখানা পুষ্পপাত্র-ভরা ফুল-বেলপাতা, নতুন কাপড়, আরতির পঞ্চপ্রদীপ, পাণিশঙ্খ থেকে কাঁসর-ঘণ্টা, একটা পিলসুজ, একটা মঙ্গল-প্রদীপ, অর্থাৎ পূজার সব রকম যোগাড়ই ছিল। তারপর পূজা আরম্ভ হল।

সন্ন্যাসী মন্ত্র বলে একটা গাঁদাফুলের মালা নিয়ে পিসেমশাইয়ের হাত দিয়ে ভালুকটাকে পরিয়ে দিলেন। তারপর একটা একটা করে ফল মিষ্টিও গর্তের মাঝে তার হাতে দেওয়া হতে লাগল। নতুন কাপড়খানাও তার হাতে পিসেমশাই দিলেন। শেষকালে তার মাথায় একটি প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে কি একটা বলে সন্ন্যাসী ঠাকুর কাকে যেন ইশারা করলেন।

আর দেখি ঝুড়িভর্তি করে মাটি নিয়ে নিয়ে প্রায় দশ-বারোজন সেই গর্তয় ফেলতে লাগল। ভাল্লুকটা এতক্ষণ কি করছিল, ফলগুলো খাচ্ছিল কি না অত লক্ষ্য করিনি। এখন সে গাঁক-গাঁক করে চিৎকার করে লাফিয়ে ওঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু ঝুড়ির পর ঝুড়ি মাটি পড়ে সে দেখতেই না পাক, বা চাপাই পড়ুক, আমরা আর দেখতে পেলাম না।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গর্তটা ভরে গেল। পিসেমশাই আসনে বসে, তাঁর কপালে বিনবিন করে ঘাম ফুটে উঠেছে। যে হাতে ভাল্লুকটির হাত ধরেছিলেন সেটা মাটিতে মাখা। এলোমেলোভাবে ফ্যাল-ফ্যাল করে সেই গর্তটির দিকে তাকিয়ে তিনি বসেছিলেন। কোনোদিকে চাইছিলেন না।

ইতিমধ্যে ঐ জায়গাটায় হোমের জন্য যজ্ঞিডুমুরের কাঠ সাজানো হতে লাগল। হঠাৎ আমাদের মনে হল মাটিটা নড়ে উঠল। কাঠগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে গেল, না, কি যেন হল। কিন্তু বুঝতে পারলাম না। তখনি কাঠ আবার ঠিক করে দিয়ে আগুন জ্বেলে দেওয়া হল।

পিসেমশাই কিরকম ভাবে একবার চারিদিকে চাইলেন, যেন কি বলতে চাইলেন, কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না।

তাঁর চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। লোকে বললে, সে জল হোমের কাঠের ধোঁয়ার জন্য।

আগুন জ্বালার পরও হোমের কাঠ আবার নড়ে গেল দু-একবার আমাদের মনে হল।

'ওঁ স্বাহা স্বাহা' বলে আর মন্ত্র বলে সেই স্তূপ-করা বেলপাতা ফুল অর্ঘ্য মাটির মালসা-ভরা গাওয়া ঘিয়ে ডুবিয়ে হোম শুরু হয়ে গেল। কত হাজার তা আমি ঠিক

জানি না—এক হাজার আট বোধ হয়। রাত্রিও শেষ হল, হোমও শেষ হল।

লাল চেলী-পরা সাধু লাল চেলী-পরা পিসেমশাই আর পিসীমাকে নিয়ে হোমকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়ে হোমের ফোঁটা কপালে দিয়ে, শান্তিজল দিয়ে বাড়ির মধ্যে গেল।

তার পরদিন শুনলাম, পিসেমশাই-এর খুব শরীর খারাপ, লোক-জন খাওয়ানোতে এসে দাঁড়াতে পারবেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণভোজনের সময় দেখলাম এসেছেন মালা-চন্দন, দক্ষিণার ব্যবস্থা করতে।'

বক্তা চুপ করলেন।

ট্রেন-ভর্তি ঠেসাঠেসি শ্রোতারা নির্বাক্ হয়ে গল্প শুনছিল।

কাছের একজন বললেন, 'তারপর?'

'তারপর পিসেমশাইকে আর আমরা বড় একটা বাইরে দেখতে পেতাম না। জন্তুদের দিকেও নয়, বাগানেও নয়, যেদিকে যজ্ঞ হয়েছিল সেদিকেও নয়। লোকেরা বলাবলি করত, আহা, পোষা জীব, লোকটার মনে কষ্ট হয়েছে।

আমি তো তারপর পড়া-শোনার জন্য কলকাতায় চলে গেলাম। পরে শুনেছিলাম একটি ছেলে হয়েছে।'

সমবেতভাবে সকলে বললে, 'ছেলে হয়েছে তা হলে? আছে তো?'

বক্তা ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আছে।'

পাশের পুত্রেষ্টি-ইচ্ছুক লোকটি বললেন, 'তবে কি?'

বক্তা বললেন, 'এই এইবার গ্রামে গিয়েছিলাম এতদিন পরে, প্রায় ষোল বছর পরে। পিসিমা'র বাড়ি গেলাম দেখা করতে। পিসেমশাই নেই। পিসিমা আছেন, বুড়ো হয়েছেন। বসতে বললেন, জল খেতে দিলেন। পিসেমশাই-এর কথাও বলে দুঃখ করলেন। বাড়িতে একবাড়ি নাতি-নাতনী মেয়েজামাই সব। এমন সময় একটি চোদ্দ-পনের বছরের ছেলে একটি কাপড় কোমরে জড়িয়ে হাতে করে ধরে সামনে এলো। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার ছেলে কোথায়? কত বড় হল?' পিসিমা বললেন,—'এই তো ছেলে রে।' পিসিমা তাকে কাপড় পরিয়ে দিতে লাগলেন। অবাক হয়ে দেখলাম ছেলেটিকে। মাথাটি লম্বা মতন, হাতগুলো একটু বেশী লম্বা যেন, হাতে-পায়েও একটু বেশী লোম। চোখের দৃষ্টি বুদ্ধিহীনের মত। কথা অস্পষ্ট বলে। জিভটা খালি মুখের এপাশে ওপাশে নাড়ে। মানুষের মতই সব, অথচ যেন কি একটু অন্যরকম। অবশ্য হয়তো আমার ভ্রম সেটা। পিসেমশাই ওকে সাত-আট বছরের দেখে মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে মেয়ে-জামাইদেরই আবার এনে রাখলেন ওঁদের দেখবার জন্য। গাঁয়ের লোকে কেউ বললে, তিনি নাকি ছেলে হওয়ার আগে কয়েকবার ভাল্লুকটিকে স্বপ্ন দেখেছিলেন?'

মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৫৮

আগাছা

পিঁপড়ে, পতঙ্গ, মাছি, মশা, ছাগল, গরু, মুরগী, মানুষ, কুকুর, বেড়াল যেখানে এক জায়গায় একসঙ্গে বাস করে, মনোরমার ছেলে সেইরকম একটা জায়গায় ঘুঁটে, কাঠ, টিন, কয়লা ভাঙা হাঁড়ি, কলসীর টুকরো নিয়ে খেলা করছিল।

এক টুকরো ঘুঁটের একটুখানি মুখে পুরে সে ফেলে দিলে, তারপর হাত বাড়িয়ে একটা পিঁপড়ে ধ'রে মুখে পুরলে এবং তারপরেই কাঁদলে।

এবারে শশীর মা এল। মুখ থেকে পিঁপড়েটা টেনে বার করে ফেলে দিয়ে একবার কোলে তুলে নিলে। তারপর সামনের ঘরের একটি মেয়েকে ডেকে বললে, 'একটু দেখিস তো মা একে, একবার ঘুরে আসি মনিব-বাড়ি।'

খোকা একলা ব'সে একটুকরো মিছরি চুষতে থাকে, নয়তো একখানা বাতাসা, তারপর আপনি ঢুলতে থাকে। তখন শশী বা অন্য কেউ কোন ঘরে তাকে তার মাদুরের ওপর একটা কাঁথা বালিশ দিয়ে শুইয়ে দেয়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে ঠোঁট চুষতে থাকে আস্তে আস্তে, যেন মায়ের কোলে ঘুমোচ্ছে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ঘরে ঘরে কেরোসিনের ডিবিতে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলে ওঠে। শশীর মা কাজ থেকে ফেরে এক বাটি দুধ হাতে, ছেলেটাকে খাওয়ায়। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁরে, কেঁদেছিল?' নয়তো 'দুষ্টুমি করেছিল?' ওর যেন মায়া হয়।

তারপর কোলে করে দুধ খাওয়ায়, কখনও বা আদর করে 'যাদু সোনা দুধ খা' বলে।

কিন্তু শশীর মা মনোরমা নয় ; মনোরমা বা ছেলেটার মা একজন ছিল।

পিতৃ-পরিচয়? সে কথা থাক।

তার মার বা মনোরমার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু সে বিয়ের ঠিক কোন ইতিহাস জানা নেই। সম্ভবত তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে বিবাহ তার হয়। সে বিবাহের আধিভৌতিক প্রয়োজন তার বরপক্ষে ছিল না, যেহেতু তাঁর সগৃহস্থালী একটি গৃহিণী ছিলেন। কন্যাপক্ষেও বিবাহের দায়িত্ব ছিল না, তাকে শুধু কন্যকা নাম থেকে নামান্তরিত করা হয়েছিল।

সুতরাং বিয়ের আগেও সে যেখানে ছিল, সেখানেই রয়ে গেল—তার মার কাছে। মা ছিল কোন দূর এক আত্মীয়ের বাড়ি রাঁধুনী। ওরা ছিল দুটি বোন, বড়র বিয়ে আগেই হয়েছিল, সে স্বামীর ঘরে থাকত। ছোটর জন্য মার চিন্তার সীমা ছিল না, বিবাহ দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

ব্রাহ্মণের মেয়ে, বিবাহ-সংস্কার না হলে সে ব্রাহ্মণই নয়, তার হাতের অন্নজল কে গ্রহণ করবে? অতএব বিবাহ তার হয়েইছিল, এবং সেই বিয়ের চিহ্ন ছিল—তার কপালে সিঁদুর।

মা যথাকালে স্বর্গারোহণ করেছিলেন, এবং নির্লিপ্ত নির্বন্ধন বিবাহিতা মেয়ে মায়ের রান্নাঘরের কাজের উত্তরাধিকার পেয়েছিল।

তারপর আশ্রয়দাতার বাড়িতে থাকতে থাকতে একদিন সেও যত কাঁদলে, বাড়ির গৃহিণীও ততই কাঁদলেন।

তারপর? তারপর অনেক কথা। সেই তারপরের একটা স্তরে দেখা গেল মনোরমার ঐ ছেলেকে। তার মাঝের, আগের এবং পরেরও ইতিহাস কেউই প্রায় জানে না, অতএব প্রায় অজ্ঞাতই আছে সেটা।

যা হোক, তার পরেও দেখা গেল, মনোরমার ছেলে, তার চাকরি আর আত্মমর্যাদা, তিনই পৃথক পৃথকভাবে একরকম করে টিকে আছে।

২

আগাছা যেমনভাবে সতেজ হয়ে বাড়তে থাকে, অযত্নে অশ্রদ্ধায়ও তাড়াতাড়ি পুষ্ট হতে থাকে—বাইরের স্নেহজল তার জন্যে না থাকলেও মাটির স্নেহস্তন্যসুধা টেনে নিয়ে ; মনোরমার ফেলা তেমনিভাবেই মাতৃস্তন্য আর মাতৃস্নেহহীন হয়েই শুধু অন্য দুটি জননীর অন্তরের করুণারস আকর্ষণ করে নিয়ে বড় হতে লাগল।

বাতাসা, খই, মিছরি, মুড়ি, ঘুঁটে, খোয়া, কাঁকর, কয়লা সবই তার সমান খাদ্য, শুধু কোনটা সে খায়, কোনটাকে মুখে দিয়ে ফেলে দেয়।

তাকে সশঙ্ক স্নেহে আগলাবার, মধুরসিদ্ধ আনন্দময় কৌতূহলে দেখবার, অথবা সেই আহার্যের কৌতুকলীলা দেখে হাসবার কেউ নেই।

বিশ্বপ্রকৃতির সন্তানের মত সে যেন প্রাকৃতিক নিয়মেই হাসে, কাঁদে, খায়, ঘুমোয়। সেই নিয়মেই কখনও বা সে পিঁপড়ে পোকা ধরে কামড় দেয়, কখনও বা পিঁপড়ে পোকারা তাকে কামড়ায়।

ধুলোমাখা দেহ, হৃষ্টপুষ্ট, ঈষৎ-মলিন গৌরবর্ণ ভদ্রঘরের ছেলেটি এই জীবনযাত্রার মধ্যে থেকেই একটির পর একটি করে বছর অতিক্রম করে পাঁচ বছরে পড়ল।

মনোরমার মনের কথা কেউ জানে না। সম্মান ও আশ্রয় তার বজায় ছিল, তারপরেও ছেলের কথা সে হয়তো ভাবেনি, অথবা ভেবেছিল গোপনে, তা জানা নেই। সে নির্বিঘ্নে রেঁধেছে, বেড়েছে, খেয়েছে, ঘুমিয়েছে।

বাড়ির যিনি গৃহিণী ছিলেন, তিনি সন্তানের জননী, কি ভেবে কি জানি, তিনি ওই মা ও স্বজন পরিত্যক্ত বঞ্চিতকে, ওঁরই ঘরের শিশু বলে ধরে নিয়েছিলেন।

মনোরমার ছেলে কর্পোরেশনের অবৈতনিক স্কুলে ভর্তি হল। জামাকাপড় তার জোটে। খাতাপত্র শ্লেট বইও পায়। আধা-ভদ্র আধা-বস্তিবাসী ধরনে সে পড়ে। তার পালিকা মা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বেলে পড়তে বসিয়ে দিয়ে মনিব-বাড়ি যায় কাজ করতে।

শশীর মার মেয়ে-জামাই ঘরে থাকে। শশীকে সে দিদি বলে। শশীর মাকে মাও বলে, মাসীও বলে।

৩

আপন সন্তান ও পরের সন্তান মানুষ করার যে প্রভেদ থাকে, এক্ষেত্রেও তার অভাব ছিল না। দয়া ও কর্তব্যের দায়ে যে মানুষ হয়, সে মাসীকে মা বললেও, জানতে

পারে তার জীবনযাত্রার ধরনটা। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পালিকা মাতার ভদ্রলোকের ছেলে মানুষ করার কর্তব্যের দায়ে, ফেলা দিনের বেলা ওই সব পল্লীর ছেলেদের মত সব সময় খেলা করতে পায় না, অশ্রাব্য অকথ্য কথা শুনতে পায়, কিন্তু বলতে পায় না ; গাল দেওয়া, মারামারি করায় এগোতে পায় না। নিজেদের মায়ের স্নেহসজাগ দৃষ্টিতে থেকে পাড়ার ছেলেরা যা খুশি তাই করে, বলে, কিন্তু মাসীর তীক্ষ্ণ সচেতন লক্ষ্যের মাঝে থেকে ফেলার লেখাপড়া, খেলার, শোয়ার সময়ের বেশি নড়চড় হয় না।

ফলে সকলেই জানতে পারলে, ও ওদের ছাড়া বিশেষ কেউ, হয়তো ভদ্রলোকের ছেলে। বোঝা যায়, ওর জন্যে খরচের টাকা আছে, খবর করার লোক আছে।

বয়স আস্তে আস্তে জ্ঞানের সীমায় এসে পৌঁছল।

সঙ্গী ছেলেগুলো কেউ কেউ বলে, 'তুই তো বড়লোক হবি। তুই ভদ্রলোকের ছেলে, পাস করবি।'

আর একটা ছেলে বলে, হ্যাঁরে, তোর মাসীর অনেক টাকা আছে, না? তোকে জামা কিনে দেয়, জুতো দিয়েছে সেদিন।'

আর একটা ছেলে বলে, 'করে তো ঐ গোঁসাইবাড়িতে কাজ, তা আর মাইনে কত! কি করে তোকে ওসব কিনে দেয় রে?'

ফেলা বড় হয়েছে, যেন একটু গর্বিত হয় মনে মনে, মুখে বলে, 'কেন? তোদেরও তো জামা আছে, জুতো আছে।'

'তোর মতন তো নয়।'

গর্বিতভাবে ফেলা চুপ করে রইল। হ্যাঁ, ওরই এই বস্তির মধ্যে অবস্থা ভাল, পয়সা আছে ওদের।

একটা ঘুঁটেওয়ালীর ষোল-সতের বছরের মেয়ে একটু দূরে দিনান্তের শুকনো ঘুঁটে জড় করতে দেওয়াল থেকে খুলছিল। সে একটু হাসলে, 'জানিসনি তোরা? ও যে শশীদের মার বাবুদের পুষ্যিপুত্তুর হয়।'

তার কথায় তার পাশের একটা মেয়ে একটু হাসলে।

ফেলা ওদের হাসি বা শ্লেষের অর্থ বুঝতে না পেরে অন্য ছেলেদের ডাণ্ডাগুলি মার্বেল খেলার দলের মধ্যে মিশে গেল। সন্ধ্যের আর দেরি নেই, তারপরেই বস্তির পথ ঘোর অন্ধকার। তখন খেলা তো দূরের কথা, পথের কিছুই দেখা যায় না।

কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যেই একটা ঘর থেকে ডাক এল, 'ফেলা, ও খোকা, ঘরে আয়।'

ফেলার জুতো-জামার ঐশ্বর্যে ঈর্ষাকাতর বালকেরা বললে, 'ওরে, ও ভদ্দরলোক হয়ে পড়া করতে গেল, খেলবে না।'

ক'বছর গেছে। ইতিমধ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সাঙ্গ করে, কেউ বা আগেই, ফেলার সব সঙ্গীরা—বস্তির ছেলেরা কলে, কারাখানায়, আপিসে, লোকের বাড়িতে মজুরিতে ঢুকেছে।

ফেলা সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে তাদের পুরনো সংশয় বাড়িয়ে দিয়ে হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছে।

এ স্কুলে মাইনে লাগে। মাইনে দিয়ে লেখাপড়া করে ও করবে কি? বস্তির মেয়েরা

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, 'হ্যাঁ মাসী, কত মাইনে লাগে?' মাসী হাসে, তার মানে, তা লাগুক। এবং এখন মাঝে মাঝে শশীর মা বলে, 'যা তো বাবা, ও-বাড়ির মাঠাকরুণের ঠেঁয়ে তোর ইস্কুলের মাইনেটা নিয়ে আয়। তেনাকে পেন্নাম করিস।'

চোদ্দ-পনেরো বছরের ফেলা গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ায়। কিন্তু গৃহিণী চোখ তুলে না চেয়েই টাকা দিয়ে দেন বা দিতে বলে দেন। মনে তাঁর অস্বস্তির সীমা থাকে না।

মনোরমা রান্নাঘরের দরজার পাশ থেকে একদিন মাত্র দেখেছিল। আর দেখতে সাহসই করেনি, কিংবা লজ্জায়ই দেখেনি, বলা যায় না। কিন্তু দুটি জননীরই যেন অস্বস্তির শেষ ছিল না।

ফেলার পড়া যে সময়ে অদৃশ্য রহস্যজগতের চাবিবন্ধ দরজা একটি একটি করে খুলে দেবার উদ্যোগ করছিল, আর এই স্কুলের সঙ্গ ও আবেষ্টন যখন ফলহরি দাসকে ভদ্রজীবনের ভদ্রসমাজের সামনের যাত্রাপথের দুরাকাঙ্ক্ষার দিক দেখিয়ে দিচ্ছিল, এমনতর সময় ও-বাড়ির গৃহিণী বিষম অসুখে পড়লেন এবং হাওয়া বদল করতে গেলেন তার কিছুদিন পরেই। তারপর আর ফিরলেন না।

তিনি ফিরলেন না বটে, কর্তা কিন্তু ফিরে এসে কিছুদিন পরেই তাঁর স্থান পূর্ণ করে নিলেন।

নতুন গৃহিণী এসে সংসারের হাল শক্ত হাতে ধরলেন। নতুন বাজেটে ব্যয়সঙ্কোচ-সমস্যা প্রথামত জাগল। ঝি-চাকরের খাটুনির ওপর বসল ট্যাক্স, অর্থাৎ তাদের কাজ বাড়ল, লোক কমল। খরচ বাঁচল তাতে কিছু, এবং স্বভাবতই মনোরমার ছেলের জন্যে যে খরচা সংসারে বরাদ্দ ছিল, সেটাও বাঁচানো হ'ল। ছোটলোকের ছেলের পড়ার জন্যে, বিশেষ করে ঝিয়ের বোনপোর জন্যে (ছেলে হলেও বা হত) এত শিরঃপীড়া কি জন্যে, মানেই হয় না।

সংসারের হিতৈষী-হিতৈষিণী দু-একজন ছিল, তারা বললে, 'ঐ রকম। তিনি কিছু বুঝে-সুঝে করেননি কখনও, করলে কলকাতায় বাড়ি হয়ে যেত।'

শশীর মা বাড়ি এসে বললেন, 'খোকা, আর পড়ো না। এবারে কাজকর্ম কর।'

ফেলা সবিস্ময়ে বললে, 'সে কি মা! আমি আর তিন বছর পড়লেই একটা পাস হয়ে ভাল কাজ পাব। ততদিন পড়ি।' স্কুলে পড়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষার মোহ ভদ্রলোকের ছেলের মত তাকেও আকৃষ্ট করেছিল।

দুঃখিতভাবে শশীর মা বললে, 'আমাদের ঘরে এইতেই কাজ হতে পারে। আমারই কাজ থাকে কি না ও-বাড়িতে গিন্নীমা গিয়ে!'

গিন্নীমার জন্য ফেলার দুর্ভাবনা ছিল না। সে শুধু বললে, 'তা হলে তোমাদের ঘরে আগে পড়িয়েছিলে কেন?'

ওর চোখে জল আসে। শশীর মারও কষ্ট হয়।

পড়ার নেশা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার দুরাশা ফেলাকে ছাড়ে না। ফেলা খুঁজে খুঁজে চাকরি নিলে।

এক চায়ের দোকানে দুবেলা বাটি-বাসন ধোয়া, চা দেওয়া, শরবত দেওয়া সকাল থেকে দশটা পর্যন্ত, বিকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত।

ইস্কুল ছাড়ার দরকারও হল না।

যে জ্ঞানের কুঞ্চিকা ওর মনের চোখের সমুখে কল্পলোকের দু-একটি দরজা একটু মাত্র ফাঁক করে দিয়েছিল, এবারে ওর প্রতি একেবারে অন্ধ, নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত আবেষ্টনে চায়ের দোকানের খদ্দেরদের আলাপ-আলোচনায় তার চেয়ে অনেক বেশি ওকে—ওর মনকে—ওর দুরাকাঙ্ক্ষাকে অভিভূত করে তুললে।

যারা চা খেতে আসে, তারা যেন ওর মনে বায়োস্কোপের মত কল্পনা জাগায়, রোমাঞ্চ জাগায়। ওরা কত রাত্রি অবাধ গল্প-আলোচনায় মজে ডুবে থাকে, মাঝে মাঝে একটা করে হাসির প্রবল উচ্ছ্বাস জেগে উঠে ফেটে পড়ে। তারপরেই ডাক আসে, 'ফলহরি, আর পাঁচ কাপ চা দাও, শিগগির।'

রূপকথার সঙ্গে ফেলার পরিচয় নেই, কিন্তু যা যার পক্ষে অসম্ভব, তাই তো তার কাছে রূপকথা। এই রূপকথা তার সর্বাঙ্গ শোনে। বাইরে প্রকাশ্যে সে শুধু চা করে, চা দিয়ে যায়, নিঃশব্দ নত মুখে। হাতকাটা জামা পরা, সাবানকাচা ধুতি কোমরে জড়ানো, আধ-ফরসা রং, অতি সাধারণ মুখ, নীচু মুখে শুধু কাজ করে যায়, সর্বাঙ্গ আর সব মন দিয়ে শোনে এবং ভাবে ওদের কথা।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য, মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগ, বাজার-দর, বেকারদের কথা, স্বর্ণমান-সমস্যা, নব্য রুশ, উদিত জাপান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, নূতন বিলিতী বই, ছিটকে ছিটকে ওর কানে আসে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে, ওর চারধারে হীরার মত, আলোর মত ঠিকরে পড়তে থাকে।

একটি কথাও দাঁড়িয়ে শোনবার জো নেই, কান পেতে শোনার ইচ্ছার সঙ্গেই হুকুম আসে, 'আর দু পেয়ালা চা। আচ্ছা, দু কাপ কোকো আরও।'

সূর্যাস্তের সময়ের ছেঁড়া রঙিন মেঘের মত ওর মনের আকাশে ছেঁড়া কথার টুকরোর ঐশ্বর্যমাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য জমা হয়। ওর মন সে ঐশ্বর্য কুড়িয়ে নিতে চায় বৃথাই। এই অসম্পূর্ণ কথা শোনার ফলে বালকের অর্ধেক শোনা রূপকথার বাকি অর্ধেকটা নিজেই রচনা করতে চায় বৃথাই। চা কোকো পৌঁছয়। কানে আসে, 'ছোকরাটি কাজের আছে হে।'

'হ্যাঁ, বেশ চটপটে।'—জবাব দেয় দোকানের কেউ।

চৌবাচ্চা থেকে বালতি করে জল তুলে ও এঁটো পেয়ালা-পিরিচগুলো ধুতে থাকে। তার অভিভূত বর্তমান তার অনাসক্ত ভবিষ্যৎকে জানে না, চেনে না, শুধু বীজমন্ত্রের মত সে নামগুলি জপ করে। কে গোর্কি, কে শেকভ, কে জওহরলাল, কে বিবেকানন্দ ও জানে না কাউকে—নামের পর নাম—মনের পথে শুধু নামের পায়ের চিহ্ন পড়ে; আর কোনও ঠিকানা জানা নেই। কঠিন উচ্চারণে অপরিচিত নাম, মহাত্মা, রবীন্দ্রনাথের মত অত্যন্ত বেশি শোনা নাম, শুধু নামই—নামেরই লেখা পড়ে, কাপ-সসারগুলো ধুয়ে ধুয়ে চৌবাচ্চার ধারে মিলিয়ে মিলিয়ে সাজায়। মনের নামের সঙ্গে যেন হাতের কাজের ছন্দ মিলে যায়।

যখন ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রায় একটা চরম সীমায় এসেছে, অর্থাৎ ও ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন বাড়ি গিয়ে ফেলা দেখলে, শশীর মারে ঘরে তার মনিববাড়ির রাঁধুনী-ঠাকরুণ এসে শুয়ে আছে।

রাঁধুনী-ঠাকরুণকে সে চিনতও না, শুনলে যে, সে-ই।

একে পড়ার জায়গা নেই, তাতে রাত্রের ঘুম ও পড়ার নিশ্চিন্ত নীরবতাকে একেবারে

নষ্ট করে দিয়ে তার স্বপ্নের ধ্যানের একটিমাত্র জায়গা—ঐ ঘরে মূর্তিমান বিঘ্নস্বরূপ মনোরমার বিছানা হয়েছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ও কে?'

শশীর মা বললে, 'ও-বাড়ির বামুন-মেয়ে। জ্বরে ধুঁকছিল, ওরা সব বাড়ি বন্ধ করে হাওয়া খেতে গেছে, বললে, তুমি অন্য কোনখানে যাও। কোথায় যাবে, কাঁদতে লাগল, তাই নিয়ে এলাম। বামুনের ঘরের ভদ্রলোকের মেয়ে।'

অতিশয় বিরক্ত মুখে ফেলা বললে, 'তা তো বুঝলাম, আমি পড়ব কোথায়?'

'ঐখানেই পড়িস না! কতটুকু বা থাকো বাছা ঘরে, ইস্কুলে আর কাজেই তো কাটে।'

'আমি তা হলে ওখানেই শোব'—ফেলা বললে।

তারপর বিরক্তভাবে বেরিয়ে গেল।

মনোরমা সব শুনতে পেল। লজ্জায় কাঠ হয়ে আচ্ছন্নের মত চোখ বুজে সে শুয়ে রইল। যতদিন বাড়িতে পুরনো গৃহিণী ছিলেন, ততদিন ডাক দিয়ে কাজ নিতেন, আগলাতেন, দয়া করতেন। তার জন্যে তাঁর থাকত ভাবনা দায়িত্ব, মনোরমার ছিল ভয় সঙ্কোচ। বাড়ির আশ্রিত মেয়ের মতই তার অবস্থা ছিল। নতুন গৃহিণীর তাকে আশ্রয় দিয়ে আগলাবার দরকারের কথা ভাবতে হয়নি, সেইজন্যে প্রচুর অবজ্ঞা নিয়ে তাকে দেখতেন। তারপর যখন শরীর তার মাঝে মাঝে খারাপ হত, তখন কর্মিষ্ঠা নতুন কর্ত্রী তাকে রাখার কোন দরকারই মনে করেননি। এমনতর সময়ে মনোরমারও অসুখ হল, ওদেরও বেড়াতে যাবার কথা উঠল ছুটিতে, তখন বন্ধ বাড়িতে মনোরমাই একমাত্র সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কর্তা প্রস্তাব করেছিলেন নিয়ে যাবার। আগের ছেলেমেয়েরাও বলেছিল, কিন্তু হঠাৎ নতুন কর্ত্রী কর্তার ওপর করলেন সকোপ শ্লেষাত্মক উক্তি প্রয়োগ, আর মনোরমাকে বললেন, 'তোমার তো রোজই অসুখ, তুমি দেশে তোমার বোনের কাছে চলে যাও, আমরা খরচ দিচ্ছি। আমার রাঁধার লোকের দরকার নেই।'

জবাবের অপেক্ষা না রেখে তিনি টাকা এনে হাতে দিলেন, উদারতা দেখিয়ে দুই-এক টাকা বেশিও দিলেন। সকালের গাড়িতে তাঁরা বিদেশযাত্রা করলেন, বিকালের লোকাল ট্রেনে ওকে চলে যেতে আদেশ দিলেন। বললেন, 'শশীর মা দেশে পৌঁছেও দেবে দরকার হলে।'

বিকালবেলার দিকে দুর্ভাবনায় ক্লান্তিতে জ্বরে অভিভূত হয়ে মনোরমা শশীর মার ঘরে এসে বিছানা নিলে। ওর দেশ, ওর দিদি, ওর স্বজন, ওর আত্মীয় বন্ধু কাউকেই ওর জানা নেই। পৃথিবীতে ওর কোনও কূল বা কিনারা নেই। উত্তরাধিকারে পাওয়া কাজ—রান্নাঘর, এই ওর সব। ওর মোহ, ওর দুর্বলতা, ওর ভয় আশ্রয় সমস্তই ওই বাড়িখানিকে, আর কোথায় ও যাবে? রোগের চেয়ে ভাবনায়, অপরিচিত পৃথিবীর ভয়ে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল দিনের পর দিন। ফেলার বিরক্তি সত্ত্বেও তার শিগগির সেরে ওঠবার বা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যাবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

উপরন্তু ফেলার দু-আনা এক আনা বকশিশ চায়ের দোকানের মাহিনার ওপর, যেটা সে শশীর মাকে দিত, তাও সব খরচ হয় ওই রোগীর জন্যে, শশীর মা চেয়ে নেয়। শশীর মার ওই বামুন-বোনের ওপর ফেলার বিতৃষ্ণার সীমা থাকে না।

সাত আট দিন ধৈর্য ধরে সে একদিন রাত্রে খাবার সময় শশীর মাকে বললে, 'ঘরটা জোড়া করে রেখেছ, পড়তে পাই না, শুতে পাই না, এগজামিন আসছে। খরচও বলছ কুলোচ্ছে না, আমার হাতে খাবার পয়সাটিও নেই। ও কবে যাবে? তুমিই তো ওর খরচ যোগাচ্ছ?'

শশীর মা বললে, 'তা কি করব, আর কে খরচ করবে, ওর নেই যখন? মানুষটা মরতে বসেছে—'

'তাই বলে আমরা করব কেন?'—ফেলা বিরক্ত হয়ে উঠল।

এবারে শশীর মাও বিরক্ত হয়ে উঠল, 'তা দয়া করে করলেই বা।'

'আমি করব না দয়া।'

'তোর মা, তুই করবি না দয়া, আমিই সব করব?'—বিরক্তিতে রাগে শশীর মার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

পাতের ভাত ডাল দিয়ে মাখতে মাখতে শশীর মার মুখের দিকে সে হতবুদ্ধিভাবে চাইলে, না, ঠাট্টা নয়, মিথ্যাও নয়, সত্য কথার সুর আলাদা হয়। পাতের ডাল ভাত মাছ সব একাকার হয়ে মিশে গেল ঝাপসা চোখের সামনে। আলোর কুপিটার শিখা যেন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে অনেক বড় হয়ে উঠল, চোখের সামনে অনেকখানি জায়গা রাঙা করে তুললে। এক নিমেষের মধ্যে বাড়িঘর, শশীর মা, মনোরমা, তার স্কুল, পড়ার খরচ, বাল্য-সঙ্গীর ঈর্ষা, আলোচনা সমস্ত যেন সেই শিখার আগুনে ধরে উঠে ওর মনের চারিদিকে আগুন জ্বেলে দিলে। সেই আগুনের আলোয় তার উনিশ বছরের জীবন, বস্তির পারিপার্শ্বিক-অভিজ্ঞ মনের চোখের আশেপাশে কত কি লেখা ফুটে উঠতে লাগল! ফেলা দেখতে পেল না, যেন দেখতে ভরসা হল না।

ব্যাকুল হয়ে সে জলের গ্লাসটা মুখে তুলতে গেল, গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেছে গলার কাছে কি জড় হয়ে। কিন্তু মুখ তুলতে গিয়ে পারলে না। হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'না না না, মিথ্যে কথা। তুমি মিথ্যে কথা বলছ, ও তো বামুনদের মেয়ে—।' কথাটা গলায় আটকে গেল।

হাতের জলের গ্লাসটি ভাতের থালার ওপর উপুড় করে দিয়ে ভাতমাখা হাতেই সে ঝাপসা চোখে উঠে দাঁড়াল। ঝরঝর করে কয় ফোঁটা জল চোখ থেকে পড়ল, 'তুমি যে বলতে মা মরে গেছে, মা নেই!'

ফেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

বাবুরা তখনও দোকানের বাইরের ঘরে কথা কইছিলেন।

ফেলা বিমূঢ়ভাবে ভেতরের চৌবাচ্চার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চৌবাচ্চার পাশে বালতির কাছে কয়েকটা চায়ের বাসন পড়ে ছিল। ধোয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পারলে না। দুটো ধুয়ে রেখে ক্রমাগত মুখ আর মাথায় জল দিতে লাগল। ছপছপ করে অঞ্জলি ভরে ভরে জল নিয়ে সে মুখে আর মাথায় দিতে লাগল। যেন পাগলের মত কি সব করতে যায়, ভুলে যেতে চায়, নাকি ধুয়ে ফেলতে চায়! কি যে তার দরকার! মাথাতেই শুধু জল দেয়—ছপ ছপ ছপ।

কতক্ষণ মনে নেই।

এদিকে লাইট জ্বেলে দোকানের বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করছ অত জল নিয়ে? আমরা দরজা দিচ্ছি।'

তার চমক ভাঙল। অপ্রস্তুত মুখে কি জবাব দিতে গেল, বলতে পারলে না। দরজা বন্ধ করে বাবুরা চলে গেলেন।

ফেলা ভিজে মাথায় ভিজে কাপড়ে স্থিরভাবে ভাবনাহীন, কল্পনাহীন, নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল সেইখানেই। যেন এক পা নড়লে, সরলে, এখনই সমস্ত স্থিরতা, মূঢ়তা, স্তব্ধতা চঞ্চল হয়ে উঠে বিশ্বের প্রশ্ন করবে তাকে।

কতক্ষণ গেল। শ্রান্তিতে শীতে যখন দেহ অবসন্ন হয়ে এল, কোনরকমে একটা শুকনো কাপড় টেনে নিয়ে পরে সে তার মাদুরে শুয়ে পড়ল।

মা! মৃদুস্বরে আপন মনে বলতে গিয়ে তার চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় আস্তে আস্তে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

তার তো কেউ ছিল না, সে তো জানত না, চিনত না কাউকে! তা হলে? তা হলে ওই তার—? আর একটি কথাও তার আলাদা করে ভাববার ছিল না। একসঙ্গে নাম স্থান জাত পরিচয়—অনেক কথা মনে পড়ে। তারপর?

তার আগে? তাই? তার চোখ দিয়ে খুব আস্তে আস্তে জল পড়তে লাগল।

সকাল গেল কাজের মধ্যে। সেই শান্ত স্থির অভিভূত মনেই দুপুর গেল, বিকেল গেল, গভীর রাত্রি কাটল।

তার পরদিন সকালে শশীর বর এল, কাজে যাবার সময়, 'যাওনি কেন? যেও। ওরা ভাত নিয়ে অনেক রাত অবধি বসেছিল।'

ফেলা সহজভাবে বললে, 'সময় পাইনি। যাব'খন।'

তার শান্ত মনের তলায় অনড় অচল হয়ে মনোরমার কথা গঙ্গায় ভাসা বয়ার মত জেগে ছিল ; ডুবে যায়নি, নড়েনি, সরেনি, ওর অস্তিত্বের সঙ্গে দৃঢ় শৃঙ্খলে বাঁধা সেটা। ও আর ভাবেনি, ভাবছিল না ; কিন্তু সেটা ছিলই।

রাত্রে শশীর বর খেতে ডাকতে এল। ও সহজভাবে খেতে গেল। হাতের খুচরো পয়সা শশীর মাকে দিয়ে এল।

৪

ক'দিন গেল ফেলা কালার মত আসে, বোবার মত বসে নীরবে খেয়ে চলে যায়।

শশীর মার অস্বস্তি বাড়ে। অনেক কথা কয়। একদিন হঠাৎ বললে, 'আহা, বামুন মেয়েটি এখনও জ্বরে ভুগছে!'

ফেলা কালার মতই চুপ করে খেয়ে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে মনোরমা ব্যাকুল হয়ে উঠল। 'ও দিদি, আর বলো না, তোমার পায়ে পড়ি। আমি একটু সারলেই এখান থেকে চলে যাব, দিদির কাছে দিয়ে এস। নয়তো কোনখানে কাজ দেখে দিও, করব। আর আমার নাম করো না।'

শশীর মা আশ্চর্য হয়ে যায়। অবাক হয়ে থেকে তারপর বলে, 'কেন, বললে হয়েছে কি আর? তুইও যেমন! রোগ না দেখালে যে মরে যাবি! কেন বলব না? হাজার হোক মা তো!'

বস্তিবাসিনীর আবেষ্টন-অভ্যস্ত অনুভূতিতে মনোরমার মনের সীমাহীন লজ্জার স্পর্শ ধরা পড়ে না।

মনোরমা শ্রান্তভাবে চুপ করে যায়। আবার চোখ বুজে শুয়ে থাকে। জিব নড়ে কি না নড়ে, সে আস্তে আস্তে আপন মনে প্রলাপের মত বিড়বিড় করে নিজের কাছেই যেন বলে, 'না না, আমার লজ্জার শেষ নেই, সীমা নেই, হে ঠাকুর, এ কি করলে?'

মনের সীমাহীন সাগরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ ওঠে ; পুরাতন কাহিনীর খণ্ডচিত্র তাতে ফুটে উঠে নতুনে মিশিয়ে যায়। পুরাতন গৃহিণীর মৃত্যু, তার অসুস্থতা, বাড়ির নূতনত্ব তাকে এই বিষম আবর্তের মধ্যে এনে ফেলেছে। তার চোখ থেকে জল পড়তে থাকে। নিজের মার কথা মনে পড়ে। তিনি কত কষ্টের মধ্যে তাদের লালন করেছেন। সে? সে কি করেছে তাঁর মতন? মা? মার মতন সে কি করেছে? অনেক জননীর চিত্র, এমন কি শশীর মার কথাও তার মনের চোখের সামনে ভাসে। তাদের সন্তানদের সঙ্গে সম্বন্ধ—তার আকর্ষণ, তার মধুরতা মনে পড়ে। ও বাড়ির গৃহিণীর কথা মনে হয়, তাঁর ছেলেমেয়েদের যত্নের কথাও মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়ির আরও অনেক কথা, নিজের কথা, দুর্ভাগ্যের লজ্জার কথা, তিক্ত লজ্জায় ঘৃণায় দুঃখে মনে হয়।

বিহ্বলভাবে তার মনে হয়, আর নয়, এবারে হয় মৃত্যু—নয় কোনখানে, একেবারে অজানা কোন জায়গায় পালিয়ে যাবে। মৃত্যু বোধহয় হল না, সে পালাবেই একদিন। চুপি চুপি চলে যাবে।

যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না, যে সম্বন্ধের দাবি সে কোনদিন স্বীকার করেনি, আজ তাকে—অজানা নিরপরাধ সেই বালককে এই আবর্তের মধ্যে টেনে আনবার কোন তো দরকার ছিল না ; সে একদিন বিনা পরিচয়ে নিঃশব্দে চলে যেতে পারত। যাকে কিছুই দেয়নি—মর্যাদা স্নেহ পরিচয় যত্ন, তাকে এই কষ্টের মধ্যেও রাখবে না আর। মুক্তি দেবেই। পৃথিবীর এক কোণে কি আর লুকিয়ে থাকবার জায়গা মিলবে না?—মনোরমা ভাবে।

সুযোগ এল দিনকতক পরে। মনেরমা তখনও তেমনি অসুস্থ। শশীর মা, শশী, তার বর, সকলে একটা বিয়ে-বাড়ির ফুলশয্যায় তত্ত্ব নিয়ে গেছে। অন্ধকার পৃথিবী। বস্তির নিরালোক জগৎকে যেন কোন্ অন্ধকারতম প্রদেশের একটা অংশ মনে হচ্ছে। মনোরমা ঘর থেকে বেরিয়ে তার মাঝে আস্তে আস্তে আঙিনা পার হয়ে দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল।

গলির শেষ প্রান্তে একটা মাঝারি রাস্তায় গ্যাসের আলো দেখা যায় মাত্র। কল্পনার চেয়ে পৃথিবী অনেক বড়। বিমূঢ়ভাবে মনোরমা চাইলে। তার তখনও জ্বর সারেনি, শরীর দুর্বলই, তার সমুখে পৃথিবীজোড়া অন্ধকার, অপরিচয়। বিরাট পৃথিবী যেন একসঙ্গে ওর দিকে ঘোমটা দেওয়া রহস্যময় বিভীষিকার মত ইঙ্গিতময়ভাবে চেয়ে রইল। মনোরমা মূঢ়ভাবে থমকে রইল, শশীর মার বস্তির ঘর তার কাছে পরম আশ্রয় মনে হতে লাগল। গলিতে ওদিকে পায়ের শব্দ হল। মনোরমার পা কাঁপতে লাগল, সে চুপ করে চৌকাঠ ধরে দাঁড়াল, তারপর বসে পড়ল। শশীর মার কথার চেয়ে পৃথিবীকে আরও বিভীষিকাময় মনে হল।

ফেলা বাড়ি ফিরছিল। মানুষ দেখে থমকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে?'

মনোরমা ভয়ে লজ্জায় অভিভূত হয়ে বসে রইল। জবাব দিতে পারল না।

ফেলা আবার বললে, 'কে?'

কম্পিতস্বরে এবার মনোরমা বললে, 'আমি।' উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে। ফেলা

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াল। বুঝতে পারলে কে। তার মন অকারণে নিষ্ঠুর তিক্ত-বিরক্তিতে ভরে উঠল। একটু থেমে নিষ্ঠুর শুষ্ক স্বরে বললে, 'এখানে কেন?'

মনোরমা অপ্রস্তুতভাবে ঘরে ফিরে যাবার চেষ্টা করলে। উঠান পার হয়ে সে রোয়াকে উঠল, ঘরের আলোতে তার কঙ্কালসার দেহকে দেখাচ্ছিল প্রেতের ছায়া। পৃথিবীর অধিবাসিনী বলে মনে হয় না। মনোরমা ঘরে ঢুকল।

ফেলা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপর একবার শশীর ঘরের দিকে, একবার শশীর মার ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখল। তারা কেউ নেই।

মনোরমা চুপ করে চোখ বুজে শুয়েছিল। তার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে জল পড়ছিল। উচ্ছ্বসিত কান্না নয়, অভিমানের ক্ষোভের আপনার প্রতি কারুণ্যের অশ্রু নয়।

ফেলা দোকানে ফিরে গেল। দোকানে তখনও লোক আছে। গল্প চলছে।

সে চায়ের বাটি, শরবতের গ্লাস ধুয়ে রাখলে। তারপর চুপ করে দাঁড়াল বারান্দায়, অন্য আদেশের অপেক্ষায়। কিন্তু বাড়ির তারা গেল কোথায়? মনোরমাই বা কোথায় যাচ্ছিল? হঠাৎ ফেলার বিষম ভয় হল, শশীর মা তাকে তার ঘাড়ে ফেলে চলে যাবে না তো? যায় যদি? তারপরেই মনে হল, শশীদিদি তার বরসুদ্ধ যাবে কোথায়? আর যায়ই যদি, সেও পালাবে ফেলে। আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ডাক এল, 'ফেলা, চারটে কমলালেবু নিয়ে এস তো।' শোনা গেল আদেশকর্তা কাকে বলছেন, 'হ্যাঁ, মার জ্বর কদিন।' তারপর আবার ফেলাকে বললেন, 'এই নাও পয়সা।' পয়সা দিলেন ফেলাকে।

ফেলা পয়সা নিয়ে রাস্তায় নেমে গেল।

লেবু কিনে ফেরবার মুখে কি মনে হল, সে ফিরল। ফিরে আরও দুটো লেবু কিনে নিলে।

৫

রাত্রি অনেক হয়েছে। ফেলা লেবু দুটো নিয়ে বাড়ির দিকে গেল। এতক্ষণে হয়তো শশীরা ফিরেছে, লেবু দুটো মাসীকে দিলেই হবে, সে দেবে'খন ওকে।

আঙিনা যেমন তেমনই অন্ধকার। ওদের ঘরের দিকেও আলো নেই। শশীর ঘর এখনও তালাবন্ধ। দরজার কাছে গিয়ে ফেলা দাঁড়াল। ঘরের কোণে কেরোসিনের ডিবেটা অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে অনেকখানি কালো ভুসোয় মোটা হয়ে সামান্য একটুখানি আগুনের মতো রয়েছে। শিখাটা নিবে গেছে মনে হচ্ছে। তবু কেমন করে যেন ঘরে একটুখানি আলো রয়েছে। ফেলা উঁকি মারলে। কঙ্কাল তেমনই শুয়ে আছে, মনে হল ঘুমোচ্ছে। এগিয়ে এসে সে আলোটা আস্তে আস্তে উস্কে দিলে। সেটা যেন মিটমিট করে ওর দিকে চেয়ে দেখলে। ঘরখানা আশ্চর্য নিস্তব্ধ।

ফেলা একটু চুপ করে দাঁড়াল। বড্ড ঘুমোচ্ছে, বুকের ওপর একটি হাত, আর একটি হাত পাশে আধকাত হয়ে পড়ে। ও চুপ করে দেখলে, আজ, হ্যাঁ, খুব বিশ্রী, মৃতের মত দেখাচ্ছে।

সামান্য অল্প একটু দয়ার মত ভাব তার মনে জাগল। লেবুটা দেবে? না, ঘুম থেকে উঠে আপনি খাবে।

আনন্দ দেবার আত্মপ্রসাদের ইচ্ছা মনের কোণ থেকে উঁকি মারে, জাগিয়েই দিক না, খায় তো এখনি খাবে'খন।

ফেলা এগিয়ে আসে। মুখের আধখানা দেখা যাচ্ছে।

দেখতে যেন ভাল লাগছে না। কিন্তু কি করে ডাকবে? 'শোন, এই লেবু—কমলালেবু খাবে একটা?' একটু থেমে আরও নীচু হয়ে, একটু জোরে বললে, 'ওঠ, একটা খেলে ভাল লাগবে।' না, বড্ড ঘুমোচ্ছে, পরেই খাবে।

সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঘর নিস্তব্ধ। ঘটি, বাটি, বাসন, চৌকি, প্রদীপ-পিলসুজ, বাক্স-পেটরা আবছা অন্ধকারে যেন কি রকম দেখাচ্ছে.

ফেলা ফিরে এল। কি মনে করে কেরোসিনের ডিবেটি হাতে নিয়ে মনোরমার মাথার কাছে নীচু হল। কি বিশ্রী গভীর ঘুম! এত গভীর!

আরও একটু নীচু হল, আলোটা মাথার কাছে রেখে হাতটা মাথায় রাখবার জন্যে এগিয়ে এনে মাথায় না রেখে নাকের কাছে নিয়ে গেল। নিঃশ্বাস কই?

এবারে ফেলা কপালে হাত রাখলে। কপাল হিম, স্যাঁতসেঁতে ঘরের মত কঠিন, ঠাণ্ডা, চটচটে একটু।

কতটুকু সময়, হয়ত মিনিটখানেক পরে ফেলা উঠে দাঁড়াল। মনের ভেতর আর সমস্ত কথা কেমন মিলিয়ে গিয়ে শুধু নির্লিপ্তভাবে জাগছিল, হ্যাঁ, মারা গেছে, মৃত্যু হয়েছে। চুপ করে একটুখানি কঙ্কালের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হঠাৎ কি মনে করে ফেলা চোখ ফিরিয়ে নিল। তার মনে হল, এই খানিকক্ষণ আগেই—হয়তো যে সময়ে তার মৃত্যু হয়েছে, ঠিক সেই সময়েই সে ভাবছিল, যদি শশীর মা তাকে ফেলে কোথাও চলে যায়! মনে হচ্ছে, সেই সময়েই মারা গেছে। ফেলা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মাথার কাছে কমলালেবু দুটো নিয়ে প্রদীপটা মনোরমার শবদেহ আগলে চেয়ে জেগে রইল।

বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৪১

একানড়ে

এক যে ছিল একানড়ে
গায়ে তার বোড়ে বোড়ে
মাথায় তার নুনের ঝুড়ি
হাতে তার চাকুছুরি...
যে ছেলেটি কাঁদে তার কানটি ধরে কাটে...ইত্যাদি।

এই ছড়ার গল্পের একানড়ে সে নয়, যে ছেলেদের কান কেটে নুন দিয়ে খায়। তবু কেমন করে যেন তার নামটা ঐ শিশুসমাজে একানড়েই হয়ে গিয়েছিল। সামনে অবশ্য কেউ বলত না। সবাই নিতাই বা নিতাইদাদাই বলত, কিন্তু আড়ালে ছেলেদের মাঝে পরস্পরকে ভয় দেখিয়ে ছেলেরাও বলত মায়েরাও বলত। ঐ দেখ একানড়ে, ঐ এলো একানড়ে। দেবে তোর পা-টা কেটে, নুন দিয়ে দিয়ে খাবে, তারপর আর কি, ওর সঙ্গেই থাকতে হবে। আর একানড়ে, খোঁড়া ছেলে নিয়ে ঘর করে। লেখাপড়া করছ না, রাতদিন খাই খাই, কেবল ঝগড়া, ঐরকম করেই তো ও একানড়ে হয়ে গেল।

আসলে কিন্তু তা তো নয়, এক তরুণী মা তার দুরন্ত ছেলের জন্য এমন ভয় কৌতূহল ভরা গল্প তৈরী করেছিল নিতাইকে নিয়ে।

প্রথম প্রথম নিতাই গ্রামে এসে গ্রামের ছেলেদের সামনে দাঁড়াল, সেদিন কেউ ভয় পায়নি। একটা পা তার জন্ম থেকেই ওল্টানো, কি করে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল কে জানে। মা নিতাইয়ের কোনদিন ছিল কিনা নিতাই জানত না। বাবাও ছিল না। ছিল এক ঠানদিদি, মার না বাবার পিসি। সে কোন্ ভিন গাঁ থেকে ওকে নিয়ে এসেছিল। কচি ছেলে তখন হাঁটতেও পারেনি, পথেও বেরোয়নি। যখন হাঁটতে গিয়ে কথা কইতে গিয়ে পথে বেরোয়, রোগা শ্যামবর্ণ ছেলেটিকে দেখে কারুরই ভয় হয়নি। ঐ একটা পা, 'কুশ পা' টেনে টেনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলত। ছেলেরা শুধু অবাক হয়ে একটু চেয়ে থাকত।

নিতাই যখন পাঁচ-ছ বছরের, হঠাৎ একটি মেয়ে তার মামার বাড়ী এলো একটি চার-পাঁচ বছরের ছেলে নিয়ে। দুরন্ত শহুরে ছেলে পাড়াগাঁয়ে তার সবই আশ্চর্য লাগে। গাছপালা ঝোপঝাড়, পুকুর-দীঘি, ঘাটপথ, মন্দির, ভাঙা-চোরা বাড়ী, তামাক খাওয়া খালিগায়ে মানুষ, লাঙ্গল কাঁধে চাষী, পাল্কী বেহারা, সবাই যেন নতুন নতুন, এরা যেন আরেক দেশের আরেক রকমের। বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দিয়ে সে দেখে আর প্রশ্ন করে থাকে, ওরা কে, কি করে, ওরা কারা।

নিতাইয়ের ঠানদিদি আসতো সব বাড়ীতে, এটাসেটা কাজও করত আর জামাটা জুতোটা (জুতো অবশ্য এক পাটিই কাজে লাগাত, অন্যটা পায়ে বেঁধে নিত। তবু সে দুটোই নিয়ে যেতে চাইত) লোকে খাবারদাবারও দিত।

হঠাৎ সেই দুরন্ত নির্ভয় ছেলেটি নিতাইকে দেখে থমকে গেল। মার আঁচল ধরে মার পিছনে লুকিয়ে সে নিতাইকে উঁকি মেরে দেখতে লাগল।

অবশেষে সভয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'মা, ও কে?' জননী ছেলের ভয় দেখে মহাখুশী। দস্যি ছেলে, আঁটতে পারে না, ভালই হয়েছে, ভয় পেয়েছে কিছুতে তবু।-

সেও চুপি চুপি বললে, 'একানড়ে। সেই ঠাকুরমার কাছে একানড়ের গল্প শুনেছিস, সেই একপায়ে রাত্রে ঠক্‌ঠক্ করে ঘুরে বেড়ায়, শুধু ছেলেদের খোঁজ নেয়, ঐ একানড়ে।'

নিতাইয়ের ঠানদিদি কলাটা, মুলোটা, সিকিটা, দুয়ানিটা, জামা-কাপড় চাল-খুদ যে যা দিল সব নিয়ে চলে গেল নিতাইকে নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের যে নতুন নামকরণ হয়ে গেল তা আর অবশ্য তাদের জানা হোল না।

২

আস্তে আস্তে গ্রামভরা কটি ছেলে আর দুষ্ট ছেলেরা সবাই জানল সত্যিকারের একটা একানড়ে আছে এ গাঁয়ে। সবাই সবাইকে চুপি চুপি বলে দেয়, ঐ দেখ, ওই একানড়ে যাচ্ছে।

যদিও বড়রা ভয় পায় না, তবু যেন গা শিরশির করে ঐ নামটা শুনলেই।

ক্রমে একানড়ে বড় হল। ঠানদিদি ওকে পাঠশালায় দেবার জন্য ব্যস্ত হল। ছেলেটার গানের গলার সুর খুব মিষ্টি। ঠানদিদির কাছে ঠাকুরের নাম শুনে বেশ গান শিখেছে। ঐ গানের সুরের জোরে আর ঠানদিদির বলা-কওয়ায় সে পাঠশালায় ভর্তি হয়ে গেল।

ছেলেদেরও ভয় কেটে গেল। এবারে বড় ছেলেরা ওর গান শুনে পাশে এসে দাঁড়ায়, ছোটরাও একটু দূরে দাঁড়ায় মুখে আঙুল দিয়ে, কেউবা দিদির হাত মুঠো করে ধরে।

নিতাই গায়—

"হরি, দিন তো গেল, সন্ধ্যে হল
পার কর আমারে
তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা
তাই ডাকি তোমারে।"
"তারা কোন অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে
সংসার গারদে থাকি মা বল।"
"মন তুমি কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।"

গান তার সবই ঠানদিদির ঠাকুরের নাম থেকে শেখা। ঐসব ধরনের গানই সে গায়, নিছক নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা তার। ঐসব গান গাইতে আর নিতাইয়ের কাছে শুনতে শুনতে ঠানদিদির চোখের জল পড়ে। তারও অকারণেই চোখ জলে ভরে যায়, তার জীবনের সকালই হয়নি, তা সন্ধ্যা।

পতিত জমিন আবাদের কথাও তার জানবার কথা নয়। তবু গাইতে গাইতে কেমন উদাস হয়ে যায় তার মন। আর আশপাশের ছেলেমেয়েরা গুরুমশায়ও শোনেন তার গান। তার ছেলেরা চুপি চুপি বলে, একানড়ে গান গাইছে। কেউ বলে, 'ওকি একানড়ে?' তারপর একে একে সবাই চুপি চুপি বলে।

একদিন নিতাইয়ের কানে গেল। সে গান থামিয়ে তাদের মুখের পানে চায়। তার মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল, সে বললে, 'কে একানড়ে? আমি?'

একটা ছোট ছেলে বললে, 'হ্যাঁ, আমার মা বলেছে।'

একজন বড় ছেলে বললে, 'চুপ কর না, আঃ—'

কিন্তু কেউ চুপ করে না। একে একে সবাই বলে, 'আমারো মা বলেছে অথবা দিদি বলেছে ও একানড়ে।'

এবার নিতাই হেসে ফেলে বললে, 'সকলের মা-ই "একানড়ে" বলে?'

ছেলেদের ভয় ভেঙ্গে গেল। তারা এক এক করে কাছে আসে, গায়ে হাত দেয়, পা দেখে হাত দিয়ে আঙ্গুল ঠেকিয়ে।

নিতাই গান শেষ করে এক পায়ে খুঁড়িয়ে 'একনড়ে' 'একানড়ে' খেলা করে, তাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতে পেরে সে যেন বেঁচে যায়। সঙ্গীরা আর কেউ নিতাইদাদা বা নিতাই বলে না, বলে, 'ও ভাই একানড়ে!'

৩

এমন সময় একদিন লোকের বাড়ী রান্না সেরে এসে ঠানদিদির খুব জ্বর হল। কদিন ধরে খুব ভুগল। তারপর একটু ভাল হল, আবার জ্বর হল। তারপর? কত ওষুধ খেল, কত ধার করল, কিন্তু অসুখ আর সারল না, আর লোকের বাড়ী কাজ করতে পারল না। আর নিজের বাড়ীর রান্নাবাড়াও আর পারল না। চুপ করে কাঁথা মুড়ি দিয়ে বসে থাকত। তারপর চুপ করে শুয়েই থাকত। গ্রামের লোকেরা কেউ পথ্য খাবার দিয়ে যেতে লাগল। গুরুমহাশয়ও এলেন নিতাই পাঠশালায় যায় না দেখে। নিতাই ভাতে ভাত রাঁধে, সাগু রাঁধে—বুড়ী সব শুয়ে দেখিয়ে দেয়। আর বুড়ীর পাশে বসে থাকে চুপ করে, সে ভাবতে জানে না, বলতেও পারে না কিছু।

নিতাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে থেকে শেষে একদিন ঠানদিদি মরে গেল।

গ্রামের লোকেরা মিলে তার সৎকার শ্রাদ্ধ সব করালো নিতাইকে দিয়ে। নিতাইকে কদিন খেতেটেতেও দিল। কিন্তু তারপর সবাই তার কথা ভুলে যেতে লাগল।

নিতাই একেবারে স্বাধীন হয়ে গেল। পাঠশালায় যেতে কেউ বলে না, কোন জিনিসটা আনতে নিতেও কেউ বলে না। আবার ক্ষিদে পেয়েছে কিনা, কিছু খা, তাও কেউ বলে না। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাঠশালায় যায়, লোকের বাড়ীতে যায়। কর্তৃমহলেও যায়, কারুর তামাক সেজে দেয়। লোকের বাড়ীর কারুর গরুর বিচালী কেটে দেয়, গুরুমশাইয়েরও কাজ করে দেয়, না বলে না, কেউ দুটো পয়সা কেউবা চারটা চিঁড়ে-মুড়কী দেয়। কেউবা একবেলা খেতে দেয়। রাত্রে সে নিজের ঘরখানিতে কাঁথা গায়ে দিয়ে শোয়, ঘুমোতে পারে না। হয় ভয় করে, নয়ত ক্ষিদে পায়। কেমন কান্না আসে। ভাবে কখন সকাল হবে।

৪

হঠাৎ একদিন বড়দিনের ছুটিতে গাঁয়ে কারা যেন বেড়াতে এলো। লম্বা লম্বা গরম জামা গায়ে। হাতে ঘড়ি বাঁধা, বুকে কলম গোঁজা। আর সঙ্গে বন্দুক নিয়ে আঁকড়ে

পাঁকড়ে পাখী মেরে বুনো হাঁস মেরে মেরে বেড়ায়। আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে নিতাইও যায় তাদের সঙ্গে। গুলি করে মারা হাঁস কুড়িয়ে আনে জলা থেকে, পাখী নিয়ে আসে বন থেকে।

নিতাই তাদের সঙ্গে ঘোরে। রাজপুত্র মনে হয় তাদের তার। নিতাইয়ের একানড়ে নাম সব তাদের খুব মজা লাগল। একানড়ের গল্প শহুরেই হোক আর গেঁয়োই হোক কোন্ ছেলে না শুনেছে! কিন্তু মানুষের নাম? কেউ শোনেনি বোধহয়। মানুষের নাম ভূতনাথ থেকে ভুতো হয় দেখেছে, কিন্তু একানড়ে? তারা একসঙ্গে হেসে ওঠে সকলে। তারপর হঠাৎ নিতাইকে কাছাকাছি দেখে অপ্রস্তুত হয়ে যায়। যাই হোক, নিতাইয়ের এখন অভ্যাস হয়ে গেছে যেন একানড়েই ওর নাম, নিতাই নাম নয়।

সহসা তাদের দলের একটি ছেলে বললে, 'আচ্ছা, ওকে কলকাতায় নিয়ে গেলে কেমন হয়?'

'কি করবি নিয়ে গিয়ে? কি হবে?' আরেকজন বললে।

'কি আর হবে, বেশ মজার নামটা।'

আর একজন বললে, 'তা ভালো। কিন্তু আমি যদি পাই তো স্কুলে ভর্তি করে দিই। পড়াশোনা করুক, হয়ত মানুষ হয়ে যাবে।' কত ভালো লোকের বড় বড় লোকের কথা তার মনে হয়, বিখ্যাত লোকদের কথাও। অন্য সকলে সমবেত উৎসাহিত হয়ে বললে, 'তা, চল না নিয়ে তুই, সে আরো ভালোই হবে।'

ভালো কাজ করার উৎসাহে আনন্দে তারা গ্রামের চাটুজ্জে, বাঁড়ুজ্জে, সেন, দত্ত, রায়, ঘোষ মহাশয়গণ ভরা এক চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় তাসের গল্পের মজলিসে গিয়ে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল নিতাইয়ের কথা। তার কে আছে, সে কি করে ইত্যাদি, তারপর যদি তাদের সঙ্গে যায় তো ওরা নিয়ে যাবে।

বয়োবৃদ্ধ চাটুজ্জে মশাই তো খুব খুশি, 'নিশ্চয়ই নিয়ে যেতে পার, বেশ বেশ' বলে একবার তাদের পিঠে হাত দেন, একবার মাথায় হাত দিয়ে চুল নষ্ট করে দেন আর কি।

বাঁড়ুজ্জে মশাই বললেন, 'এরকম শুধু শুনেছিলাম বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কথা। সে শোনবার মত কথা। ঐরকম একটা অনাথ ছেলে, মাসী না পিসী কার কাছে থাকত। একদিন দুপুরে বকুনি খেয়ে বাড়ী থেকে চলে গিয়েছিল। তারপর দূরে রাস্তার ধারে এক গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তার ঘুম ভাঙালো কে। দেখে এক ভদ্রলোক, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এমন করে রোদ্দুরের মাঝে ঘুমোচ্ছ কেন? সে কেঁদে ফেল্লে। তার গল্প শুনে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে এক দোকানে খাওয়ালেন। তারপর তাকে বাড়ীতে রেখে পড়াশোনা করে সে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিল। জানো, মানুষ হয়ে গিয়েছিল। আর সে ভদ্রলোক কে জানো? বিদ্যাসাগর মশাই। আমি তারই আপনার লোকের মুখে শুনেছি।'

'তা বাবা, তোমরা যদি ওর একটা গতি করতে পার তো ওরও ভাল হবে, তোমাদেরও মঙ্গল হবে। দুঃখী দরিদ্রের কথা আজকাল কে আর ভাবে! সে ছিলেন বিদ্যাসাগর মশাই।'

বিপুল উৎসাহে তারা কদিন বাদে নিতাইকে নিয়ে কলিকাতায় চলে গেল।

আর গ্রামের লোকেরা মাঝে মাঝে বলেন নিতাইয়ের কথা, ছেলেগুলির কথা!

তাদের মনে হয় কবে যেন একানড়ে নিতাই তাদের গ্রামে ফিরে আসবে ভালো করে লেখাপড়া শিখে কাজ শিখে মানুষ হয়ে। কেউ বলেন, আহা ঠানদিদিটা লোক ভাল ছিল, রাঁধত বেশ চমৎকার। কেউ বলেন, ছোঁড়া গান গায় ভালো। বায়স্কোপে দিলেও উপায় মন্দ করত না। তা ছোঁড়ার কপাল ভাল।

৫

বছর পাঁচ ছয় কেটেছে নিতাই চলে যাওয়ার পর।

গঙ্গার ঘাটে বেশ ভিড়, কি একটা যোগ পড়েছে।

একটা মোটর থেকে নামল কয়েকজন মেয়ে বৌ আর দু-একটি ছেলে। একজন মেয়ে বললেন, 'যা ভিখারীদের যা দিবি তা দিয়ে আয়। ওইদিকে সব বসে আছে।'

আর একজন বললে, 'একলা গিয়ে কাজ নেই। ভিড়ে ছিটকে যাবে। চল আমিও যাই।'

হঠাৎ একটা গানের সুর ভেসে এল ভিখারীদের দিক থেকে

"হরি, দিন তো গেল, সন্ধ্যে হল
পার কর আমারে
তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা
তাই ডাকি তোমারে।"

মেয়েরা গানের দিকে এগিয়ে এলো ভিক্ষে দিতে দিতে। কোনখানে বা একমুঠো চাল, কোনখানে একটা আধলা, কোথাও একটা পাই, যেখানে যা হাতে ওঠে, কোথাও বা এক পয়সা বা দু পয়সা, আর বিরক্ত হয়ে ওঠে সব, 'সর, সর, দাঁড়া কি জ্বালা'। ভিক্ষা যাত্রীরা এবার এসে পড়ল গানগাওয়া ভিখারীর কাছে। ভারী মিষ্টি গলা। অনেকেই চুপ করে দাঁড়িয়েছিল গানের কাছে। গানটা শেষ হলে যে যা পয়সা চাল দেবার দিয়ে স্নান করতে গেল। কিন্তু গাড়ি থেকে নামা এই দশ-বারো বছরের ছেলে আর তার মা আর দু-একজন একটু দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল হয়ত আরো গান গাইবে।

হঠাৎ ছেলেটি মাকে বলল, 'মা, ঐ দেখ সেই একানড়ে।' মা এগিয়ে এলো দেখবার জন্য। কি জিজ্ঞাসা করতে গেল। কিন্তু কি বলবে, তুমি একানড়ে কিনা সে কথা তো বলা যায় না। ছেলে কিন্তু আচম্‌কা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি একানড়ে?'

মা বকলে, বললে, 'ওকি খোকা?'

ভিখিরী চকিত হয়ে ছেলে ও মার দিকে চাইলে। তারপর চোখ নিচু করে নিলে। খোকা মার বকুনি খেয়ে আর কিছু বলতে পারলে না। মা জিজ্ঞাসা করলেন ভিখারীকে, 'তুমি এখানে কি করে এলে? তোমার নামটা কি যেন? মনে পড়ছে না।'

সে বললে, 'নিতাই।'

মার মনে কেমন করে এখানে এলো কবে এলো অনেক প্রশ্ন মনে হলো। ছেলে বললে, 'মা, ওকে আমাদের বাড়ী নিয়ে চল।'

সঙ্গিনীরা পাশে ছিলেন, বললেন, 'দূর, তা কি করে হবে? ভিখারীকে কে নিয়ে যাবে?'

ছেলে বললে, 'ও তো ভিখারী নয়, ও তো একানড়ে ছিল। মা জানেন সেই মামার বাড়ীতে ছিল, না মা?'

মা বললেন, 'হ্যাঁ', এখন মার বয়স আর একটু হয়েছে, ছেলেও বড় হয়েছে, নিতাই চুপ করে চেয়েছিল ওদের দিকে। অন্য ভিখারীরাও চেয়েছিল অবাক হয়ে ওদের কথাবার্তায়।

মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করে এখানে এলে নিতাই?'

নিতাইয়ের চোখে জল এসেছিল, ছোটবেলায় সুখ দুঃখ দারিদ্র্য কষ্টের স্মৃতিভরা ছোট গ্রামখানি, অনাথ জীবনের সম্বল ঠানদিদি, তাঁর মৃত্যু, আবার অনাথ হওয়া। সে বললে, 'ঠানদিদি মরে গেলো। কেউ আর তার ছিল না। গাঁয়ের লোকদের কিছু কিছু কাজ করতুম, তারা খেতেও দিত পয়সাও দিত। এমন সময় শীতকালে কজন বাবু কলকাতা থেকে দেশে গেল। তারাই নিয়ে এলো ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে বলে, আর ইস্কুলে ভর্তি করে দিলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন, সেই বাড়িতে তাদের কাছে ছিলাম বেশ, ভালো কাপড়চোপড় পরা এক বাবু এলেন। আমাকে দেখে কোথায় বাড়ি, কোন গাঁ, কে আছে, অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন, তারপর তাদের বললেন, উনি ভালো করে পড়াবেন। চাকরিও করে দেবেন। বলে সেখান থেকে নিয়ে এলেন, তারপর তাঁর দলের মধ্যে নিয়ে গেলেন, তারপর থেকে এই গান গাই।' নিতাই চোখটা মুছে ফেলে তারপর বললে, 'আর পয়সাকড়ি ভিক্ষে করে যা পাই বাবুটিকে এই সবারই মত দিয়ে দিই। আর আমি তো রাস্তা চিনি না, গাঁয়ের ঠিকানাও জানতাম না, ফিরে যেতে পারলাম না আর।'

ছেলেটার মা আর তার সঙ্গিনীরা অবাক হয়ে শুনছিলেন নিতাইয়ের কথা।

ছেলে বললে, 'চল না মা ওকে নিয়ে যাই বাড়ীতে। বেশ হবে, যাবে একানড়ে?'

নিতাই তার কোলের পয়সার সংগ্রহ ফেলে উঠে দাঁড়াল, 'যাব খোকাবাবু।' তার আশেপাশের অন্ধ খাঁদা বিকলাঙ্গ কুষ্ঠরোগী ময়লা নোংরা ছেঁড়া কাপড় পরা বিকৃত-দর্শন অপরিষ্কার ভিখারীর দল অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

মাও সেই অপরিচ্ছন্ন দলকে দেখলেন। ছেলেকে বললেন, 'দাঁড়া, বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করি, তাঁদের মতটা না নিয়ে কি করে নিয়ে যাই? যদি রাগ করেন সবাই! কাল এসে নিয়ে যাবে কেউ।' আর নিতাইকে বললেন, 'তুমি কাল নেয়ে পরিষ্কার হয়ে বসে থেকো, কেমন?'

নিতাই উৎসাহিতভাবে বললে, 'আজই চান করে নিই না, তা হলেই তো পরিষ্কার হয়ে যাব। গঙ্গায় চান করে আসি?'

মা বললেন, 'কালই লোক পাঠাব। জিজ্ঞাসা করে বাড়ীতে।'

একানড়ে বিমনাভাবে বসে পড়ে ঘাড় নাড়লে।

৬

দুদিন পরে অনেক তর্কবিতর্ক বাদবিতণ্ডার পর কর্তারা মত করলেন নিতাইকে বাসায় নিতে।

মার কথায় নয়, ছেলের বা খোকার একান্ত আগ্রহে।

বাপ জেঠা বললেন, 'আচ্ছা আন্। দেখি কেমন একানড়ে তোর মার মামার বাড়ীর দেশের।'

তাঁদেরও যে একটু কৌতূহল হয়। আর বাড়ীসুদ্ধু ছেলেমেয়ে একানড়েকে দেখতে আকুল হয়ে উঠল।

দুদিন বাদে সকালবেলা চাকর নিয়ে গাড়ি নিয়ে খোকা এলো গঙ্গার ঘাটে। ঘাটের পথ খালি। ভিড় নেই কিছুই।

দু-একটা ভিখারী বসে আছে। ছেলেটা চারধারে চায়, চাকরও সঙ্গে ঘোরে। অবশেষে খোকা ঘাটের কাউকে জিজ্ঞাসা করে, 'ভিখারীরা কোথায়? যে গান গায় সে কোথায় গেছে?' যে ঘাটে ফুল চন্দন তেল রাখে তাকেও জিজ্ঞাসা করে। কেউ বলতে পারে না। একটা বুড়ী ভিখিরী বসেছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, 'ও সেই কুশ-পা ছেলেটাকে খুঁজছ খোকাবাবু? তার বাবু সব জানতে পেরে তাকে কোথায় অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছে।'

চাকর আর খোকন জিজ্ঞাসা করল, 'সে কি?'

'হ্যাঁ গো বাবু, তিনি যে আমাদের ভিখিরীদের বাবু। তেনার তো এই ব্যবসা। এজনকে হেথা, ওজনকে সেথা, এই করে। আর নিতাই, সে গান করে ভালো। ওতেই ওর কোঁচড় ভরে পয়সা জমে। তেনাকে কি করে কেউ ছাড়ে? বাবু তাকে কাশীপুরে না কালীঘাটে কোথায় বদল করে দিয়েছে। এক জায়গায় রাখে না। আর এ তো তোমাদের চেনা লোক? ধরা পড়বে কি?'

খোকা বাড়ী ফিরে এলো, সব বললে, মাকে বললে, 'সেদিন যদি তুমি নিয়ে আসতে দিতে।' তার চোখে জল এলো।

৭

অনেকদিন কেটেছে। খোকা বা সুব্রত দত্ত ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলায় যাত্রীদের টীকা নেওয়া না-নেওয়ার খবর দেবার দায়িত্বভার পাওয়া, আরো কয়েকটি ডাক্তারের সঙ্গে কেউ ডাক্তার হয়ে এসে স্টীমার আর জাহাজের যাত্রী নিয়ন্ত্রণ করছে। সাগরসঙ্গমের মোহানায় জাহাজ এসে লাগল। সেখানে অগাধ জল। সাগরদ্বীপের দিক থেকে নৌকার পর নৌকা এসে জাহাজের কাছে কাছে দাঁড়াচ্ছে। এবং জাহাজ বা স্টীমার থেকে মই লাগিয়ে দিয়ে নৌকাতে যাত্রীদের নামানো হচ্ছে।

তাদের টিকিটও চেক হচ্ছে এবং কলেরা বসন্তের টীকা নেওয়া না-নেওয়া যাত্রীও চেক করা হচ্ছে।

টীকা না নেওয়া যাত্রী দেখলেই সরকারী ডাক্তাররা টীকা দিয়ে তবে নামতে দেবেন।

আমাদের সুব্রত দত্ত বা খোকা ডাক্তার এ জাহাজের ভার পেয়েছে। একতলার ডেকে অনেকগুলি টিকিটহীন এবং টীকাহীন যাত্রী ধরা পড়ল। তাদের কোন ডাক্তারী ছাড়পত্র বা টীকার সার্টিফিকেটও নেই দেখা গেল।

ডাক্তারের হুকুমে তারা জাহাজেই তখনকার মত আটক রইল। কানা খোঁড়া অন্ধ ভিখারী নরনারী থেকে ছেঁড়া ময়লা কাপড়জামা পরা নানা শ্রেণীর নানা জাতের লোক সেই সঙ্গে নজরবন্দী হয়েছে। জাহাজের ডাক্তার টীকা দিলে অথবা নীরোগ হলে নামতে

দেবেন। আর অনুমতি পাওয়া মাত্র সব যাত্রী নিয়ে নৌকার পর নৌকা দাঁড় বেয়ে সাগরদ্বীপে গিয়ে যাত্রী নামিয়ে নামিয়ে দিয়ে আসে। খোকা বা সুব্রত এবং টিকিটচেকার যাত্রী নামার সিঁড়ি আগলে দাঁড়িয়ে।

দেখতে দেখতে যাত্রী শেষ হয়ে এলো। এবার টিকিটহীন যাত্রীরা চঞ্চল হয়ে উঠল। সিঁড়ির কাছে ভিড়। নীচের ডেকে ময়লা ছেঁড়া পুঁটলি নিয়ে ভীত যাত্রীদের ভিড়। সহসা শোনা গেল অতি মধুর মৃদু কণ্ঠে কে গাইছে—

"তারা কোন অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে
থাকি মা বল্।"

কে গাইছে গান? নিঃশব্দ খালি জাহাজের অবশিষ্ট যাত্রী, সুব্রতের সহকর্মী আর জাহাজের কর্মচারী সকলে চকিত উৎকর্ণ হয়ে উঠল। বাঃ, বেশ গাইছে তো? কে গায়? নীচের তলার ডেকে? না কোথায়?

গানটা শেষ হয়ে আসে—

"হয়ে অর্থবিলাসী আনন্দেতে ভাসি
তারা সর্বনাশী জানিস্ কতই ছল।"

গান থামল। সুব্রতও শোনে। গলাটাও চমৎকার। অশিক্ষিত ভিখিরীর গলা। কিন্তু এত মিষ্টি গাইল! কিন্তু গলাটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। সিঁড়ির ভিড় করা যাত্রীরা গানের দলে ভিড়ছে এবার, 'ও ভাই, আর একটা গাও।' তার কোলের কাছে কিছু পয়সাও পড়েছে। এবার শোনা গেল আর একটা গান ধরেছে।

'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে।'

হ্যাঁ, সুব্রত চিনতে পেরেছে এবারে। এ গান আর ঐ গলা সে ভোলেনি। তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। এবং দেখতে পেল সেই কুশ-পা একানড়ে। নিতাই গান গাইল। ভিখিরীর চারিদিকে ভিড়। শ্রোতা ও শ্রোত্রীরা গান শুনছে দাঁড়িয়ে, জাহাজের নজরবন্দীর কথাও যেন ভুলে গেছে। সুব্রত চিনলও যেমন, খুশীও হল তেমন। গানের গলার সুর আর কুশ-পা তো আগের মতই আছে। গান শেষ হল।

ডাক্তার টিকিট কালেক্টার জাহাজের কর্মচারী কয়েকজন জাহাজী পুলিস নৌকার পুলিস ইত্যাদির তদারক যাত্রীদের ভিড় পাতলা হয়ে গেল। কয়েকটা টিকিটহীন এবং টিকিটবিহীন যাত্রী ছাড়া সব নেমে গেছে।

এবার ভিখারীদের টিকা দেওয়া হল। কিন্তু টিকিটের দাম দিতে পারল না কয়েকজন।

গায়ক ভিখারীর কিছু পয়সা জমেছিল হাতে, পুরো ভাড়া তাতে হয় না। সে সেই পয়সাগুলি নিয়ে মিনতি করে সামনে দাঁড়াল। বললে, 'নীচে নেমে আমি আরো পয়সা পেলে বাকিটা শোধ করে দেব বাবু।' হঠাৎ পুলিসকে সুব্রত বা ডাক্তার সাহেব ডাকল,

কি বলে দিল, অন্য ভিখারীরাও মিনতি করে। দেখতে দেখতে অবশিষ্ট ভিখারীর দলও নেমে যেতে লাগল। গায়ক ভিখারী পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে। পুলিস হাত ধরে বললে, 'তুমি ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে যাবে। হুকুম হয়েছে।'

৮

সাঁঝের বেলায় ডাক্তারদের জন্যও হোগলার পরিচ্ছন্ন কয়েকটি ঘরওয়ালা ক্যাম্প তৈরী হয়েছে। সবই আছে, চাকর রাঁধুনী লোকজন, তাদেরও হোগলার ঘর।

সুব্রত ভিখারীকে নিয়ে এসে পৌঁছল। গম্ভীরভাবে নিজের চাকরকে বললে, 'ওকে একটা নাপিতের কাছে নিয়ে গিয়ে চুলদাড়ি ছাঁটিয়ে কামিয়ে স্নান করিয়ে আন সাগর থেকে। ওর কাপড় সব কাচিয়ে দে। তোদের কারুর একটা জামাকাপড় পরতে দিস। আমি তোদের দেবো পরে।'

তারপর নিতাইকে (ভিখারী নিতাইকে সে চিনেছে, কিন্তু পরিচয় দিল না) আরো গম্ভীর সুরে বললে, 'ওর সঙ্গে গিয়ে স্নান করে এসে এখানে খাবে আর এখানে থাকবে। কোনখানে আর যাবার চেষ্টা করবে না। তোমার নামটা কি?'

নিতাই ভয়ে ভাবনায় আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। কি করবে ডাক্তারবাবু? পুলিসে দেবে? কিন্তু সে তো কিছু করেনি। শুধু বিনা টিকিটে তাদের দলের সঙ্গে এসেছে। তা ডাক্তারবাবু পয়সা নিক্ না ভাড়ার জন্য—যা আছে ওর কাছে সবই দেবে। তার চোখ দিয়ে জল পড়ে। গলা শুকিয়ে যায়। কি হবে তার? কি করবে ওরা?

শুকনো মুখে বললে, 'আমার নাম নিতাই দাস।'

গম্ভীর গলায় ডাক্তার বললে, 'শিগগীর আসবে।' মনে মনে বললে, তা হলে সব ঠিক মিলছে সত্যি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চুলদাড়ি ছাঁটা স্নান পরিচ্ছন্ন পোশাকে নিতাই ফিরল। ডাক্তার বললে, 'ওকে চা আর যা খাবার আছে তোদের দে। দুপুরেও এখানে খাবে আর থাকবে এখানে। কোথাও যাবে না।'

ডিউটি সেরে রাত্রে বন্ধুদের বললে, 'এসো এই ভিখারীর গান শোনা যাক। খুব ভাল গান গায়। সব সেকালের গান—গ্রামের। দেহতত্ত্ব, বাউল, আগমনী, শ্যামাবিষয় যা জান গাও, নিতাই।'

ভয়ে হতাশায় নিতাইয়ের গলা বসে যায়। চোখে জল আসে। সুর আসে না গলায়। কি গাইবে? শুধু মনে আসে—

'তারা কোন অপরাধে
এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে
থাকি মা বল্।'

গান গায়, আর চোখ জলে ভেসে যায়। গলা ধরে যায়। সত্যি কি ডাক্তার-বাবুরা ওকে গারদে—জেলে পাঠাবে!

অন্য ডাক্তাররা বলে—'বাঃ, বেশ গাইছে তো? তা কাঁদছ কেন? চোখ মোছ। একটা আগমনী গাও ভাল, নয়ত রামপ্রসাদী, কমলাকান্ত, নীলকণ্ঠ গাও।'

ফাঁসীর আসামীর মত ক্যাম্পে নজরবন্দী নিতাই চারবেলা জলখাবার ভাত রুটি খায় পেট ভরে। আর গান শোনায়।

সাগর মেলায় তিনদিন কেটে গেল। ডাক্তারের ডিউটি শেষ হল। নিজেদের জাহাজে উঠল। নিতাইও উঠল, তার চেনা অচেনা সঙ্গী বন্ধু ভিখিরীর দল কোথায় গেল কোন জাহাজে বা নৌকা স্টীমারে কিংবা হাঁটাপথে সে জানে না। কারুকেই জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয় না। ডাক্তারবাবু যদি রাগ করে! পুলিসে ধরিয়ে দেয়! পালিয়ে যাবার পথও জানে না, পয়সাও নেই।

৯

বিকাল হয়ে গেছে কলকাতায় সাগর থেকে ফেরা জাহাজ পৌঁছতে। ডাক্তারের গাড়ি এসেছে স্টীমারঘাটে। ডাক্তারের জিনিসপত্র চাকর ঠিক করল। নিতাইয়েরও হাতে কিছু দিল।

নিতাই চেনা কলকাতার পথঘাট দেখে ব্যাকুল হয়ে উঠল। নামলেই বন্ধু সঙ্গী চেনা আস্তানা আর চেনা অচেনা ভিখিরীর দলে ভরা পথঘাট।

ডাক্তার গাড়িতে উঠে বললে, 'ওঠো তোমরা।'

ব্যাকুল মুখে নিতাই বললে, 'বাবু—এবার আমাকে ছেড়ে দিন। আর কখনো বিনা টিকিটে কোথাও যাব না।'

ডাক্তার বললে, 'ওঠো ওঠো, দেরি ক'রো না।' সভয় নীরব নিতাইয়ের বহু পরিচিত পথ দিয়ে চলে গাড়ি। গাড়ি ডাক্তারের বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছল।

১০

ডাক্তার নামল। জিনিসপত্র সহ চাকর এবং নিতাইও নামল।

শীতের বিকাল।

বাড়িতে ঢুকে ডাকল, 'মা।' মা আর স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বিস্মিত প্রশ্ন তাঁদের চোখে। একটি ছোট ছেলেও বছর পাঁচের বেরিয়ে এলো সঙ্গে।

সুব্রত নিতাইকে বললে, 'প্রণাম করো। আমার মা।'

মা বললেন, 'কে এটি?'

সুব্রত বললে, 'চিনতে পারছ না? সেই একানড়ে, তোমার মামার বাড়ির দেশের, গঙ্গার ঘাটে গান গাওয়া হারানো একানড়ে নিতাই।'

মার চোখ পড়ল তার পায়ের দিকে। সেই ছোট উল্টানো পা। আশ্চর্য আনন্দে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় পেলি ওকে?'

ছেলে হাসল, বললে, 'গঙ্গার ঘাটে হারিয়েছিল। সাগরে পেলাম।' তারপর নিতাইকে বললে, 'এবার মনে পড়ছে তোমাদের একানড়ে দাদা, সেই খোকাকে?'

'একানড়ে' শুনেই নিতাইয়ের সব মনে পড়ে গিয়েছিল। তার সেই গঙ্গার ঘাটের কথা মনে পড়ে গেল ছবির মত সব। সেই অবধি ওদের বাড়ি যাবার আকাঙ্ক্ষা। তারপর?—তারপর?

এতদিন পরে সেই বাড়িতে হতবুদ্ধির মত বসে পড়ল। মনে পড়ে গেল সেই গ্রাম, ঠানদিদি, তার একানড়ে নামকরণ, অবশেষে ভিখারী-জীবন।

সুব্রত বললে, 'একানড়েদা, এই আমার ছেলে। তুমি ওরও একানড়ে দাদা

হলে।' ঘরে এসে মাকে বললে, 'গান শুনেই গলা চেনা মনে হয়েছিল, তারপর পা-টা দেখতে পেলাম। আর চোখছাড়া করিনি।'

মা অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে ছিলেন। এতক্ষণে বললেন, 'তোর কত দুঃখ তখন হয়েছিল। তাহলে এতদিনে ওকে পেলি? গ্রামের ছেলে, জীবনে আর ওকে পাওয়া যাবে সে আর কেই-বা ভেবেছিল', মার চোখ ছলছল করে এলো। একানড়ে যেন অভিভূত হয়ে সেই ছোটবেলার জীবনে ফিরে এলো।

মা বললেন, 'আয় তোরা কিছু খা। বৌমা ওদের খাবার দাও। তুই এখন আমাদের কাছেই থাকবি, কেমন?'

ঝকঝকে তকতকে মেঝের উপর একানড়ে বিমূঢ় বিভ্রান্ত হয়ে বসে রইল।

গল্পভারতী, ১৩৫৪

সন্ন্যাসী

দাউজীর (গোপাল-বলরামের) মন্দিরের প্রকাণ্ড চাতাল। যমুনার তীর থেকে বেশি দূর নয়। স্নানান্তে সকলেই উঠে আসে, প্রণাম করে শিবের মাথায় জল দিয়ে ফল ফুল পয়সা বাতাসা রেখে চলে যায়।

সেদিন মন্দিরের চাতালে একটি সাধু এসে বসলেন। পরিধানে গৈরিক, মাথাটি মুণ্ডিত, বয়স বোঝা যায় না, স্নিগ্ধ সহাস্য মুখ, মধুর মিষ্টি কথা।

গিরি, নদী, বন অরণ্যের সম্পর্কীয় কেউ কিনা কেউ জানতে পারে না, কিন্তু অরণ্য প্রান্তর সাগর ঘুরেছেন খুব—বোঝা যাচ্ছিল কথার ভাবে। মন্দিরের কর্মচারী চাকরের সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন।

মন্দিরের একপাশের দিকে বসে তিনি মৃদুস্বরে ভজন করছিলেন।

আস্তে আস্তে দুটি একটি করে মেয়েরা এসে দাঁড়াল, বর্ষীয়সীরা সস্নেহে 'বাবা' বলে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন।

একে একে পাঁচ-সাতজন নানা বয়সের মেয়েরা এসে দাঁড়াল। সবাই প্রণাম করে পয়সা রেখে ফল রেখে চলে গেল।

ভিড় হয় নারীরই বেশি। সকালে যারা আসে স্নান করতে, সন্ধ্যায় যারা আসে আরতি দেখতে, তারা সাধু মহাত্মা দেখলেই এসে দাঁড়ায়। কারুর ছেলে-মেয়ের অসুখ, কারুর ছেলের কাজ, কারুর বউ-মেয়ের বন্ধ্যতা, নানাবিধ দুর্ভাগ্যকে কোন মন্ত্রশক্তিতে সৌভাগ্য করা যায় কি না তারই আবেদন-নিবেদন আসে।

শূল-বেদনার কবচ, বন্ধ্যতার মাদুলি, চাকরির জন্য জপ ইত্যাদির আবেদন-নিবেদনে সাধুর ভজন-পূজা সংক্ষেপ হয়ে এল।

ভিড়ের শেষ থাকে না, ক্রমে পুরুষেরাও এসে দাঁড়াতে লাগল। কেউ বা 'ভভূত' বিভূতি, কেউ বা পায়ের ধুলো নিয়ে যায়। গুজরাটী, পাঞ্জাবী, শিখ, বেনিয়া, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, পর্দানশীন সব জাতীয় মেয়ে এসে করযোড়ে মহাৎমাকে দর্শন করে কথা শোনে। সাধু মহাৎমার কাছে পর্দা নেই।

দুটি পাঞ্জাবী মেয়ে এল। একটি বর্ষীয়সী, অপরা তার মেয়ে—অল্প বয়স, অতি ক্ষীণাঙ্গী সুন্দরী—যেন অপরূপ শ্রী-লেখা।

মা বললে, 'বাবা, এর জ্বর কাসি, ছাতিমে দরদ, এই ছ'মাস হয়েছে সারে না, আপনি একে ওষুধ দিন, যদি সারে। অনেক ইলাজ—চিকিৎসা করিয়েছি, কিন্তু সারে না, আপনার কৃপা হলেই আরাম হবে।'

মেয়েটির ক্ষীণ শীর্ণ স্বচ্ছ সৌন্দর্যে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, তার কি অসুখ। মহাত্মা শুধু তার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর যা বললেন, তার মর্ম এই, ওর অসুখ ভাল হবে না।

ব্যাকুল জননী তবু হাতজোড় করে পায়ের ওপর মাথা রাখে, মহারাজের কৃপায় কি না হয়, কি না হতে পারে। সে শুনবে না, তাকে ওষুধ কবচ যা হয় কিছু দিতেই হবে, একটিমাত্র মেয়ে তার, একটি ছেলে নিয়ে বিধবা হয়েছে, সে না বাঁচলে ও পাগল

হয়ে যাবে ইত্যাদি—চোখের জল কথার সুর দুইই সন্ন্যাসীর চরণ আর মনকে অভিষিক্ত করে তুলছিল।

মেয়েটি চুপ করে মন্দিরের থামে ঠেস দিয়ে বসেছিল চোখ বুজে, হয়তো তার জ্বরে চোখ জ্বালা করছিল, নয়তো ক্লান্তিতে।

সন্ন্যাসী বললেন, 'আচ্ছা মা, ওষুধ দেখব।'

মা মেয়ে চ'লে গেল।

সকাল সন্ধ্যা বিকাল রাত্রি সব সময়েই ভিড়ের শেষ নেই। সবাই আসে—পুরুষেরা আসে, মেয়েরা আসে। কারুর হাতে খাবারের থালা, কারুর হাতে ফুলের মালা, কারুর হাতে বা আতর-চন্দন, কেউ নববস্ত্র টাকাপয়সা, প্রণামী তো আছেই।

ভক্তেরা ক্রমশ মালা এনে পরিয়ে দেয়, আগে শুধু পায়ে ঠেকাত। চন্দন-সুগন্ধে মাথা কপাল চর্চিত করে দেয়।

সন্ন্যাসী যমুনার তীরে একটি পড়ো ধর্মশালায় আশ্রয় নিলেন। ওখানে ভিড় বেশি।

পীড়িত মেয়েটি এসে বিভূতির স্পর্শ নিয়ে যায়, আশীর্বাদ নিয়ে যায়। তার মার বিশ্বাস ওতেই ভাল হবে।

এসে আর ফিরে যেতে তখনই পারে না। চুপ করে ভিড় থেকে দূরে একপাশে বসে থাকে। প্রকাণ্ড অশ্বত্থতলায় বাঁধানো বেদীর ওপর বসে সে জীবন্-মৃত্যুর সেতুর ওপরের স্বপ্ন দেখে। হয়তো যাবে, নয়তো ভাল হবে।

চোখে পড়ে সন্ন্যাসীর ঘরখানি, জনে জনে প্রণাম করে প্রণামী রেখে ফিরে যাচ্ছে।

বোধহয় এও চোখে পড়ে, সেবা কখন যত্নের আত্মীয়তার রূপ ধরে এসে দাঁড়িয়েছে।

কোন মেয়ে বলে, 'বাবা, পায়ের থোড়া দবা দে?'

কেউ বলে, 'বাবা, ভোজন করো?'

কেউ বলে, 'আপকো শয্যা বনা দে?'

নারীর স্নেহ সেবা, সন্ন্যাসীকে সবদিক দিয়ে শত বন্ধনে বাঁধে। কোনদিন হয়তো সে বন্ধন ছিল, যাকে মনে পড়ে, নয়তো পড়ে না। আজ সবদিক দিয়ে সেই বাঁধনই তাঁকে নাগপাশের মতন বেঁধে নিচ্ছে যেন। সন্ন্যাসী হয়তো ভাবেন, সে অন্য, এ অন্য। নারীরা ভাবে, আহা, কেউ নেই যত্ন করবার!

রাত্রি হয়। সে ওঠে, এসে দাঁড়ায়, বলে, 'বাবা, অব যা রহেঁ।'

'আচ্ছা বেটী, যাও।'—সন্ন্যাসী কোমল স্নেহে তার পানে চান। সে উপেক্ষাভরে চলে যায়।

উদ্ধত, পীড়িত, তীক্ষ্ণ নারীকে তাঁর ভালও লাগে, ভয়ও করে। সমস্ত লোকের মাঝ থেকে ওকে যেন তাঁর বেশি মনে জাগে।

কিন্তু পীড়িত অবস্থাতেও সে না এসে থাকতে পারে না, রোজই আসে। যেন একটা অন্যমুখীনতা, অন্যমনস্কতা। যে প্রাণ ক্রমশ নির্জীব হয়ে আসছে, সে যেন ওই জনতার মাঝে আপনার নির্জীবতাকে সজীব করে তোলে অথবা জীবনের বৈচিত্র্য দেখে।

সেদিন ভিড় কম। সন্ন্যাসী বললেন, 'বেটী, সবাই আসে, বসে, কত সেবা করে, তুমি কেন অত নির্লিপ্তভাবে থাক?'

সে চুপ করে রইল। তারপর একটু হাসলে, বললে, 'আপনাকে তো অনেকে সেবা করে, ত্রুটি তো হয় না।'

সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন—কি ভাবে কথাটি বললে, হয়তো জানবার জন্যে।

'সে কথা আমি বলছি না, আমি বলছি, তোমার তো সেবা করবার ইচ্ছে হতে পারে।'

সন্ন্যাসীর কথার উত্তর দেবার আগেই কয়েকজন নরনারী এসে দাঁড়াল।

সেবার আয়োজন পড়ে গেল, কেউ করে শয্যা, কেউ করে বাতাস, কেউ বা ফুলের মালা গুছিয়ে রাখে, কেউ বা আহারের অয়োজন করে।

সব কাজ সারা হলে যারা গেল, তারা গেল। যারা থাকে, তারা পায়ে হাত বুলোয়, বাতাস করে।

স্বামী স্ত্রী, মা মেয়ে, ভাই বোন কত সম্পর্কের কতজন আসে। সবাই সবচেয়ে আপনজন হয়ে সেবা করতে চায়।

প্রথম প্রথম সাধু ব্যাকুল হয়ে উঠতেন, 'পায়ে হাত দেবেন না, সেবা করবেন না,' ইত্যাদি।

মেয়েরা শোনে না, পুরুষরাও সবসময় শোনে না।

অনভ্যস্ত পরিচর্যায় ঘুম আসে না, অস্বাচ্ছন্দ্য আসে বোধ হয়। সন্ন্যাসীর ঘুম আসে না, চুপ করে শুয়ে থাকেন। মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে ; মনোহর পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে, শুধু বুঝি ঐ ঘরের প্রাণী কটি ছাড়া আর কেউ জেগে নেই। শুধু মাঠের গরম হাওয়া উড়ে আসে থেকে থেকে পাতার মর্মর সুর তুলে, কোথাকার কোন্ ঘুমের লোকের ওপারের—মনের ওপারের বার্তা বয়ে। কিন্তু পরিতৃপ্তি আসে না, কি যেন অবসাদ-বেদনা-শ্রান্তিতে অন্তর ভরে ওঠে।

সেবার কিন্তু ফাঁক পড়ে না, জনের পর জন কেউ না কেউ করেই।

সন্ন্যাসী বিনিদ্র অবস্থাতেই থেকে অবশেষে উঠে পড়েন।

মেয়েরা বলে, 'অওর নেহি লেটেঙ্গে বাবা?'

সন্ন্যাসী বলেন, 'নেহী বেটী, নিদ নেহি আয়া।'

রাত্রেও আসে জনে জনে। নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রীর দুজন এসে কতক্ষণ বসে থাকে।

সবাই ফিরে যায়, ওরা আর ওঠে না।

পীড়িত মেয়েটিও বসে থাকে।

তারা পায়ে হাত বুলোতে বসে।

নিয়মিত সেবা যেন সংস্কারকে সহজেই অতিক্রম করে সন্ন্যাসীকে বেষ্টন করেছে। সেবার ঠাসবুনুনি—পার হয়ে যাবার কোনও উপায় বা পথ পাওয়া যায় না যেন।

সন্ধ্যার আকাশে মেঘ গুমট হয়ে ছিল, যমুনায় সঙ্কীর্ণ প্রবাহিণীর জল স্থির কাজলচোখে আকাশকে দেখছিল,আকাশের মেঘের ছায়া জলের বুকে স্থির হয়ে পড়েছিল।

অনেকেই চলে গেছে, শুধু সেই পীড়িত মেয়েটি তার মা, আর দু-একজন আছে।

সেবার সমারোহে সাধুকে প্রসন্ন করে, কি ব্যাকুল করে কে জানে ; কিন্তু পীড়িত মেয়েটির মুখখানি বাইরের রকে যেন মৃদু হাসিতে ভরে ওঠে।

অবশেষে সেবিকার স্বামী বাতাস করছিল, সে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। তার বিধবা বোনও সাধুর পায়ের কাছে বসেছিল।

তার ইচ্ছে দুজনেই সেবা করে, অপরের ইচ্ছে সে একলাই করে। দুজনে কি কথা হয়, একজন উঠে যায়।

সাধু অপরকে বললেন, 'রাত হয়েছে, তুমিও যাও।'

যেন একের ক্ষুণ্নতা তাঁকে অপ্রস্তুত করছিল, শেষ সেবিকাও উঠে গেল।

সেবা-অভ্যস্ততা কদিনের মাত্র, কিন্তু সন্ন্যাসী যেন পুরাতন কাজের গতি ভুলে গেছেন, চুপ করে জেগে শুয়ে রইলেন। রুগ্ন মেয়েটি রকে শুয়েছিল।

সে উঠে এল, বললে, 'মহারাজ, একটু বসি?' অনুমতির অপেক্ষা না করেই মাথার কাছে বসল।

সাধু অবাক হয়ে বললেন, 'বস। কি, বলছ কিছু?'

সে চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই?'

সাধু আরও অবাক হয়ে বললেন, 'দাও। কিন্তু আজ কেন?'

মেয়েটি এবার অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু বললে, 'মহারাজ, আপনি এখানে কতদিন থাকবেন?'

'কেন?'— সবিস্ময়ে মহারাজ তার দিকে চাইলেন।

অপ্রস্তুত হয়েই সে বললে, 'আপনি দেখতে পান না, পেলেন না, ওরা সবাই কত ঝগড়া করে আপনার সেবা নিয়ে। আপনি সংসার ত্যাগ করেছিলেন কি সংসারে থাকবেন বলে? ওরা সবাই আপনাকে আপনার করতে চায়।' সে থেমে গেল।

সাধু চুপ করে রইলেন। আপনার কাছে লুকোনো মায়া, মোহ, আকর্ষণ বেদনা, অভিমান, তৃপ্তি সবগুলো স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল, রাগ বিরাগ আশার সঙ্গে সম্পর্ক তো অনেকদিন ফুরিয়েছে।

মেয়েটি বললে, 'আপনাদের শুনেছি তিন রাত্রির বেশি কোথাও আশ্রয় নিতে নেই।'

সাধু উঠে বললেন, 'তোমার কথা ঠিক, তুমি আজ আমায় মায়ের মত শিক্ষা দিলে।'

সে কি বলতে গেল, 'নেহি মহারাজ',—কিন্তু বলতে পারলে না। শুধু চুপ করে কোন্ অনাদি জননীর মতন সাধুর মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

রাত্রি গভীর হতে লাগল। ওর মা এসে ডাকলে, 'কেশর!'

সে উঠে প্রণাম করে বললে, 'আমার অপরাধ নেবেন না।'

সারারাত্রি ধরে বিনিদ্র সন্ন্যাসীর বেদনার ভাবনার অবধি রইল না। তন্দ্রার মাঝে যমুনা, সরযূ, সুনর, গোদাবরী—সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে কেশরকে, ঐ পীড়িতা মেয়েটিকে। ঘুম ভেঙে যায়, মোহ চোখের জলের আকারে চোখ বেয়ে গড়িয়ে আসে।

সকালে সবাই জানলে, সন্ন্যাসী তীর্থভ্রমণে যাচ্ছেন, হেঁটে হরিদ্বার যাবেন। তারপর? কিছু ঠিক নেই।

একে একে সকলে প্রণাম করে চলে গেল, দুঃখ করে ব্যথিত হয়ে। কেশরও প্রণাম করে চলে গেল।

উষর বন্ধুর উগ্র সৌন্দর্যে ভরা পথে সন্ন্যাসী নত মাথায় ভজন গাইতে গাইতে চলে যান। পথিক পথে যারা যায় প্রণাম করে, আহার্য দেয়, থাকতে বলে গ্রামে। সন্ন্যাসী

উদাসভাবে রাত্রের কয়েক দণ্ডের জন্য অতিথি হন। আগে সুখদুঃখে সমান উদাস ছিলেন, এখন যেন গভীর ভাবনায় উদাসীন থাকেন। মনে জাগে শীর্ণ ক্ষীণাঙ্গী-তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ঐ মেয়েটির কথা। জীবনের কতখানি সহজে অতিক্রম করে এসেছেন, নিজের দিকে বিশেষ না ভেবে সব গ্রহণ করেছেন সোজাভাবে ; হঠাৎ একি জাগরণ! এই প্রতিগ্রহ মায়া, মোহ, মমতা, তৃষ্ণা, ঈর্ষা, বেদনা কত কি সৃষ্টি করেছে! সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অতলস্পর্শ সাগরে জাগে একখানি ক্ষীণ তনুর ছায়া, উজ্জ্বল দুটি কালো চোখ, জ্বররক্ত গৌর মুখখানি, শীর্ণ ললিত তনুশ্রী।

পার্বতী, গঙ্গা, ভাগীরথী, যমুনা—সবাই, কতজন এসেছে, কত সেবা করেছে, পুরুষরা কতজন এসেছে, ভক্তি করেছে, সেবা করেছে ; কিন্তু কেশর কিছুই তো করেনি, তবু—

মাঠের মাঝের ছত্রিতে (সমাধি মন্দির) বিশ্রামের জন্যে বসে সন্ন্যাসী স্তব্ধ হয়ে রৌদ্রময়ী পৃথিবীর পানে চেয়ে থাকেন, ভাবেন, উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য কোথায় তাঁর? ছায়া পড়লে আবার উঠবেন। পথ শুধু, সুদূর দিগন্তসীমা ছাড়িয়েও বুঝি শুধু যাত্রা, মহাযাত্রা চিরন্তনী, তার শেষ নেই ; উনি যাত্রী, তাতে একলা, সাথী-হীন, সঙ্গীহীন।

আবার মনে হয়, উদ্দেশ্য? মনে পড়ল একটা ওঁদেরই উপমা, পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে কি থাকে? হাসতে গিয়ে চোখের পাশ থেকে জল গড়িয়ে আসে। চোখ খুলে দেখেন, মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে চাওয়া যায় না, চোখ বুজে শুয়ে থাকেন ; বহুদিনশ্রুত কবেকার গান মনের মাঝে গুঞ্জন করে—

'বৈরাগ যোগ অতি কঠিন উধো হাম না সাধব হো'

(বৈরাগ্য যোগ অতি কঠিন, হে উদ্ধব, আমি তার সাধনা করব না)। সুরের গুঞ্জনে কেবল ঐ লাইনটিই জাগে মনে।

ব্যাকুল বেদনায় হঠাৎ চমকে চোখ খুলে চান, বেলা আর নেই। উষর প্রান্তরের সীমান্তে রাঙা সূর্য অস্ত যাচ্ছেন। আপনার দুর্বলতায় বিরক্ত হয়ে সন্ন্যাসী তেমনই রক্তচোখে উষর জীবনের মনের প্রান্তরে চাইবার চেষ্টা করেন।

মাতা নয়, ভগিনী নয়, সম্পর্কীয়া কেউই নয়, তবু তাদের সেবাযত্নের মমতার মায়ার ছাপ মনে যা পড়েছে, কেশর যা ভাবতে শিখিয়েছে, সে আর মোছে না। অবাধ্য মনের কোণে জাগে, নিবিড় করে একান্ত করে স্বজন করে তিনি কারুকে পাননি। না, তিনি নেননি, সমস্ত ভুবনকে অবজ্ঞা করে ফিরিয়ে দিয়েছেন। মনে হয় ঠিক করেছেন, না ভুল করেছেন?

আবার চকিত ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, নিষিদ্ধ পরিত্যক্ত অতীতের ভাবনা আবার? বিরক্ত সন্ন্যাসী দ্রুত পায়ে আবার চলতে আরম্ভ করেন। যেন শিগগির চললেই পৃথিবীর সমস্ত পথ, আপনার অয়নচক্র, বর্ষ মাস ঋতুর সীমা অতিক্রম করে, অরণ্য প্রান্তর নগর সিন্ধু সাগর সব পার হয়ে যেতে পারবেন।

দুন্দুভি, ১৩৩৯

সি ব্লকের তেরো নম্বর ফ্ল্যাট

মা বললেন, 'কেমন বাড়ি? কটি ঘর?'

পিসিমা বললেন, 'কলজলের ব্যবস্থা কেমন?'

বড়দা বললেন, 'আলো বাতাস আছে তো? ভাড়া কত?'

আর খুকী মিনু বীণা রেণু সবাই ঘিরে, তারাও যেন জিজ্ঞাসুভাবে দাঁড়িয়েছিল তাদের ছোড়দাকে আর ছোটকাকে ওরফে সুধীরকে।

বিকেলবেলায় রোদ্দুর ভাদ্রমাসের শেষের।

নানাবিধ প্রশ্ন আর অতগুলি জিজ্ঞাসার চিহ্নসূচক দৃষ্টিতে—অন্য লোক হলে রেগে যেত। সুধীর এক মাস ধরে বাড়ি খুঁজে অন্ততঃ এটুকু শিখেছে যে, মেজাজ অল্প ভাড়া দিলে দেখানো যায় না এবং নিজের সেই ধৈর্যটা ওর কাছে এখন বেশ উপভোগ্যই মনে হয়। তাই এদের ওপরও রাগ না দেখিয়ে ঘরের পাখাটা খুলে দিয়ে বোনকে এক গ্লাস জল আনতে বলে শুধু বললে, 'উঃ কি গরম!'

হঠাৎ মা ও পিসিমার মনে পড়ল ও সারাদিন অর্থাৎ বারোটা থেকে বাড়ি ছাড়া, বোধহয় বাড়িই খুঁজেছে!

অপ্রস্তুত মুখে পিসিমা বললেন, 'আহা, ঘেমে ভিজে গেছিস্।'

মা বললেন, 'জলটা একটু জিরিয়ে খা।'

সুধীর এবারে বিনা ভূমিকায় বললে, 'বাড়ি ভালো, ঘর চারটে, রান্নাঘর একটা, বাথরুম একটা, কল তিনটে, সমস্তক্ষণ জল, আর (ভাইয়ের দিকে চেয়ে) ভাড়া পঁয়তাল্লিশ এবং ফ্ল্যাট।'

'কলকাতায় সমস্তক্ষণ জল? সে কিরে!' পিসিমা অত্যন্ত খুশিমুখে অবাক হয়ে গেলেন।

বড় ভাইপো সংক্ষেপে বললেন, 'জল ট্যাঙ্কে থাকে। টিউবওয়েল থেকে তোলে।'

সুধীর বললে, 'পরশু টাকা জমা দিয়ে আসতে হবে, এক মাসের ডিপোজিট। যেদিন ইচ্ছে যেয়ো। তবে এ বাড়ি তো আসছে হপ্তায় ছাড়তে হচ্ছে, আশ্বিনের প্রথমদিকেই চলো।'

ঘরের ভিড় আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল।

চারখানা ঘরওয়ালা, তিনটে কলযুক্ত চারতলার ওপর বাড়ি। যেন একটি গা-আলমারির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়া। তারপর সব নিজেদের।

এক মিনিট নিরিবিলি নেই, এতটুকু জায়গা নিষ্প্রয়োজনীয় নেই। সব কাজের, দরকারী, সব ওজন করা। ঘরের ওদিকে বারান্দা, কাপড় শুকোবে—হাওয়া আসবে, মাঝের ফালি জমি সার্বকর্মিক।

যাই হোক, দাদা অফিসে যান, সুধীর কলেজে যায়, মা রান্নাঘরে থাকেন, পিসিমাও থাকেন কাজে, মেয়েরা স্কুল কলেজে যায়। বৌদি ছোট ছেলে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বাড়ি থাকলে সমস্তক্ষণ সকলে সকলের অঙ্গাঙ্গী হয়েই থাকে যেন।

সকালবেলা সমস্তক্ষণই কড়া নড়ে।
'কে?'
'গোয়ালা, বাবু। দুধ লাগবে?'
'না, আমার দুধওয়ালা আছে।'
আবার কড়া নাড়ে।
'কে?'
'ডিম নেবেন?'
'না।'
'কে?'
'জমাদার।' পিসিমার উৎকর্ণে সবই পৌঁছয়।
'জমাদার! কড়া নেড়ে গেল! ওমা! কি বাড়ির ছিরি! ওরে দরজায় গোবর জল দে, ও মনুর মা।' মনুর মা বাসন মাজা ছেড়ে বালতি করে জল নেয়।
এরপর কিছুক্ষণ দরজা খোলা থাকে, কে আসে না আসে, জানা যায় না।
একে একে সব স্কুল কলেজ অফিস যায়। দরজা ভেজানো থাকে, আবার কড়া নড়ে, 'গুড় নেবেন মা, গুড়?'
'না'—পিসিমা জবাব দেন।
আবার খানিক পরে, 'ঘি নেবেন মা, ঘি?'
'নাগো'—খেতে খেতে পিসিমা বললেন,।
ঘিওয়ালা বলে, 'দেখাব মা?' কানে কম শোনে বোধহয়।
বাড়িতে কেউ নেই। খেতে বসে ওঠাও যায় না। ব্রাহ্মণের বিধবা।
এবারে রেগে বললেন, 'না, না, না।' অপ্রস্তুত ঘিওয়ালা চলে গেল।
পিসিমার খাওয়া প্রায় শেষ, মার হয়েছে। আবার কড়া নড়ল।
'কে রে, কে?'
মা বললেন, 'আমি উঠছি, দেখি।'
ওদিক থেকে জবাব এলো, 'চারটি চাল দেবেন মা?'
মা অপ্রস্তুত মুখে বললেন, 'খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল যে।'
ঘর থেকে পিসিমা বললেন, 'দুপুরবেলা কড়া নেড়ে ভিক্ষে চায়? এমন কথাও শুনিনি। সকাল করে আসতে হয়, খাওয়ার পর ভিক্ষে দেয় লোকে?'
মা বললেন, 'কাল আসিস।'
'একটি পয়সা দাও না মা। চাল নাই বা দিলে'—নাছোড়বান্দা ভিখারী বালিকা বললে।
নতুন বাড়িতে এসে এটা সেটা কাজ লেগেই আছে। ঝাড়া মোছা গোছানো।
বিকেলের দিকে ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজের ফেরত এল, একজন খাবার দিতে গেলেন, একজন রান্নাঘরের যোগাড়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, মিনুরা খাচ্ছে।
এবার আর কড়া নড়ল না। শুধু মনে হল কেউ যেন বাড়িতে এসেছে। পিছন ফিরে পিসিমা দেখলেন, একটি ভদ্রমহিলা ও একটি ছোট মেয়ে বছর তিনেকের। চোখাচোখি হতে তিনি একটু হাসলেন, বললেন, 'আলাপ করতে এলুম।'
পিসিমা ডাকলেন, 'ও বৌমা, একটা মাদুর পেতে ওঁকে বারান্দায় বসাও। চলুন, আমি এদের খাবার দিয়ে যাই।'

বৌমা এসে দাঁড়ালো। তিনি অমায়িকভাবে হেসে বললেন, 'মাদুর কি হবে, এমনই এইখানে বসি।'

খাবার ঘরের চৌকাঠের ওপর তিনি বসলেন। পিসিমা বিরক্ত ও হতবুদ্ধিভাবে এদিক ওদিক কাজ করতে লাগলেন। ছেলেমেয়েরা খাবার কোনরকমে গলাধঃকরণ প্রক্রিয়ায় সমাপ্ত করল। পিসিমা বললেন, 'আর নিবিনি? ওকি খেলি'—বলতে বলতেই শেষ করে উঠে পড়ল।

অভ্যাগতা তখন পাশে দাঁড়ানো বৌমার সঙ্গে গল্প করছেন।

এবারে পিসিমার দিকে মনোযোগ দিয়ে হাসলেন, বললেন, 'আপনার কাজ সারা হল?'

হাসির উত্তরে হাসা উচিত, নইলে অসৌজন্য হয়। কিন্তু পিসিমা হাসলেন না, ওঁর ছেলেদের খাওয়া না হওয়াতে খুব রাগ হয়েছিল। বললেন, 'চলুন, বারান্দায় বসি।'

পরিচয় শুরু হল। ওঁরা থাকেন পাঁচ নম্বর ঘরে। ছেলে মেয়ে, বিয়ে পড়া, বাড়ি দেশ, জাতি—পরস্পরের প্রশ্নোত্তর পালা শেষ হল। তারপর এলো ও-পক্ষের আত্মপরিচয় অর্থাৎ আত্মগরিমার পালা। এতক্ষণে পিসিমার পাশে মা এসে বসেছিলেন। এঁরা শ্রোত্রী, খুব ভালো বক্তা মোটেই নন।

বিকেল শেষ, সন্ধ্যা হয়ে এলো। পিসিমার কাপড় কাচা সন্ধ্যাহ্নিক অন্যান্য কাজ সব বাকি। আর মেয়েদের চুল বাঁধা, ঘর পরিষ্কার, ছেলেদের অফিসের ফেরত চা খাবার দেওয়া সব বাকি। প্রতিবেশীর অবসরও একান্তভাবেই নিরেট।

পিসিমা ইঙ্গিত করলেন, 'ছেলেরা রাত্রে কি খায়, কে করবে?'—'সে চাকর করবে। আমায় কিছু করতে হয় না, অসুখ কিনা। হার্টের অসুখ। আপনাদের কে করবে?'

—'আমরাই করব, এই কাপড় কাচি।'

পিসিমার আভাস ইঙ্গিত ব্যর্থ হল।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, কি বলছিলাম যে! আমার ছেলে কি করে? সে এই বি-এস-সি পড়ছে। ঐ যে খুব ভাল হকি খেলে মেঘু দত্ত, নাম শোনেননি? প্রায়ই তো কাগজে বেরোয়?'

মেঘু দত্ত হকি খেলে। কি খেলা! কি খেলা পিসিমা চুপ করে রইলেন। আলমারির মত বাড়ি, ছোট ছোট ইঁদুরেরা এ-তাক ও-তাক ঘুরে বেড়ানোর মত ছোট ছোট মেয়েছেলেরা ঐ চারটি ঘরে ঘুরছে আর সবই শুনতে দেখতে পাচ্ছে, মিনুর কানে গেল, সে উঁকি মেরে পিসিমার মুখটি দেখে নিল।

হ্যাঁ, আমরা ওকে 'মেঘা' 'মেঘু' বলেই ডাকি। আমার ভাসুর বলেন মেঘলা। তিনিই নাম রেখেছিলেন কিনা। ও যখন হয়েছিল এই পাঁচই ভাদ্র ওর জন্মদিন গেল—সেদিন সে কি বাদল বিষ্টি কি আর বলব। শাশুড়ী ওর নাম বাদল রাখতে চাইলেন। ভাসুর বললেন, 'না, ও একঘেয়ে নামে কাজ নেই। ওর নাম হোক মেঘরাজ।'

'ওর খেলার কথা শোনেননি? ও যে সাহেবদের সঙ্গে সমানে খেলে। ওকে যে কি ভালবাসে সাহেবরা, সে দেখলে লোকের হিংসে হবে। কিন্তু ওকে সবাই ভালবাসে। নিজের ছেলে বলে বলছি না, ওকে হিংসে করা যায় না ,এত ওর গুণ। শুধু তো খেলায় নয়, পড়ায় লেখায় লোকের সঙ্গে গল্পে আমোদে, গান বাজনায়, দয়ামায়ায়,

গরিব ভিখিরী পথে দেখলে শীতের দিনে গায়ের কাপড় তাকে দিয়ে আসবে ; ঝি চাকরদের খাবার দেখে সে খাবে—এমন ছেলে! সব বিষয়েই সে এমন! নিজের ছেলে বলে বলছি না, আমাদের আগের পাড়ায় সতীপতি সিংগী থাকতেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সেই রায়বাহাদুর সতীপতি সিংগী ওকে নিজের ছেলেদের চেয়ে ভালবাসতেন। তা তাঁর ছেলেরা একেবারে কিছু নয়, ভোঁতা। লেখাপড়ায় নয়, খেলায় নয়, দেখতে ছাই। আর মেঘা তাদের কাছে রাজপুত্তুর।'

সুধীর এসে পাশের ঘরে বসেছিল। চা পায়নি, খাবার খায়নি, স্নান করতে যেতে পারেনি। সামনের ঘরের বারান্দার সুমুখে উনি বসে। শুনতে শুনতে তার মনে হল পিসিমা নিটশের অলরাউণ্ড ম্যানের কথা শোনেননি তাহলে বুঝতেন ছেলেটির কৃতিত্ব।

পিসিমা ক্লান্তভাবে একবার রাস্তার দিকে একবার রান্নাঘরের দিকে চেয়ে একবার হাই তুললেন, তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন, যেমন করে মেরুদণ্ড সোজা করে পূজা করার সময় বসেন।

ঠুং করে আধঘণ্টা বাজল ঘরের ঘড়িতে। অকস্মাৎ চকিত হয়ে মেঘ দত্ত-জননী উঠে দাঁড়ালেন। 'এইবার সময় হল। আমার আবার হার্টের অসুখ কিনা, তাই সিঁড়ি ওঠা বারণ। আমি বাবু পারি না, লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াই-টেড়াই, জানতে পারলে যা বকা বকবেন বাপ-ছেলেতে।' পরম পরিতুষ্ট হাস্যে তিনি অগ্রসর হলেন ঘরের দিকে। তারপর বললেন, 'কাল আবার আসব। আমি খুব সব বাড়িতে বেড়াই।'

পিসিমা হতাশভাবে বসেছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন। কাল আসবার আশ্বাসে ভদ্রতা করেও খুশি মুখ দেখাতে পারলেন না। শুধু সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে এলেন। হয়ত ভেবেছিলেন এগারো নম্বরের কেউ বা এসে পড়েন।

ইতিমধ্যে নিজের বাড়িতে উনুন না জ্বললেও রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর ধূম্রলোক হয়ে রয়েছে অন্য বাড়ির উনুনের কৃপায়।

পিসিমা শুধু বললেন, 'ভাগ্যিস কলে জল থাকে, নইলে একটি কাজ করা হয়-নি, খাবার জল অবধি আমার তোলা নেই। কাপড় কাচা হয়নি। আগুন দেওয়া হয়েছে নাকি?'

মা বললেন, 'না তো, এইবার দেব!'

'তবে এত ধোঁয়া?'

মা বললেন, 'অন্যদের বাড়ির মনে হচ্ছে।'

প্রায় আটটা।

ইতিমধ্যে নীচের ফ্ল্যাটে রেডিওতে সান্ধ্য-সংগীত শুরু হয়ে গেছে আর ওপরের তলায় একটা ঘরে গ্রামোফোনে জন্মাষ্টমীর পালা শুরু হল।

মিনুর অঙ্ক অনার্স, সুধীরের ফিজিক্স অনার্স ফোর্থ ইয়ার এবার। মিনুর তবু থার্ড ইয়ার। ছোট-ছোটরা পরম আনন্দে রেডিওর দিকে মন দিলে, দাদা পড়তে বললেন।

তারা বললে, 'ভুল হয়ে যাচ্ছে যে, কি করে পড়ব।'

পিসিমা সন্ধ্যাহ্নিক করতে সন্তুষ্ট মনে কৃষ্ণকথা শুনছিলেন। একবার বললেন, 'বৌ শুনলে? বেশ গানটি দিয়েছে।'

মিনু বিরক্ত গম্ভীর মুখে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। বই মুখে নিয়ে মনের উপর এই অত্যাচার সহ্য করা যায় না। তার চেয়ে লোকজন গাড়ি বাড়ি দেখা ভালো।

অকস্মাৎ সুধীরও তরতর করে নীচে নেমে গেল। কোণের ঘরে মিনুর দাদা আর বৌদিরই কোন অসুবিধা হয়নি বোধহয়। তারা এদিকে মনোযোগ দেবার হয়তো অবসরও পায়নি। রাত্রি ন'টার পর কোনরকমে মার শোবার ঘরে গোল হয়ে বসে সংক্ষিপ্ত জায়গায় খাওয়া পর্বটা সেরে নিলে ছেলেমেয়েরা। রান্নাঘরের মধ্যে ছোট ছোট দুখানি পিঁড়ি নিয়ে বসে মা আর পিসিমাও কি খেলেন যেন।

রেডিওর সময় নির্ধারিত আছে—সে থামল ; কিন্তু গ্রামোফোন ও কণ্ঠসঙ্গীত? তার তো সময় বাঁধা নেই। যদি কেউ বধির না হন, তাহলে শুনতে হবে। পিসিমা মা মিনু সুধীর রেণু ইত্যাদি সবাই শুনতে লাগলেন। কেউ পড়তে পড়তে, কেউ ঘুমোবার জন্য শুয়ে থেকে, কেউ ঘুমিয়ে পুনশ্চ ঘুম ভেঙে সহিষ্ণুভাবে শুনতে বাধ্য হলেন। একতলায় চায়ের দোকানের পাশে তখন 'কলাবতী' সঙ্গীত আরম্ভ হয়েছে।

দু-একদিন গেলো। মেঘা দত্তর মা আর আসবার সময় পাননি বোধহয়। ইতিমধ্যে শুক্রবারে বিনাব্যয়ে রেডিওতে থিয়েটারপার্টির অভিনয় শোনা হল। সুবিধা ও অসুবিধা ক্রমে গা-সওয়া হয়ে এলো। সন্ধ্যাবেলার রান্নাঘরও বেশ গল্পে জমে উঠতে লাগল পুরানো বাড়ির মত। গান আর কানে ফোটে না, রেডিও যে খোলা আছে, মনেও থাকে না।

পিসিমা তরকারী কুটছেন, মা রান্না চড়িয়েছেন, বৌ ময়দা মাখছে, ছোট ও বড় ছেলেমেয়েরা পড়ছে, সঙ্গীতে শব্দে গোলমালে সকলেরই কান অভ্যস্ত হয়ে গেছে কলকারাখানার মজুরদের মত। দরজা খোলা। হঠাৎ তিনটি মহিলা চার-পাঁচটি ছোট-ছোট ছেলে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন মিনুর পড়বার ঘরের সামনে।

শশব্যস্তে মিনু ডাকল, 'মা, কে সব এসেছেন, বাইরে এসো।'

রান্নাঘর থেকে সে ঘর 'বাহির' বলার মত নয়। দু'পা এলেই মিনুদের শোবার, পড়বার, আর খাবারও ঘর।

মা এলেন, বৌ এল, পিসিমা এলেন, 'আসুন, আসুন' ইত্যাদি অভ্যর্থনার পর পরিচয় পাওয়া গেল, এগারো ও বারো নম্বরের অধিবাসিনীরা পরিচিতা হতে এসেছেন।

অভ্যাগতাদের একজন বললেন, 'আগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে খুব ভাব ছিল আমাদের। সমস্তক্ষণই আমাদের আসা যাওয়া গল্প চলত।'

পিসিমা বললেন, 'ও।' মা হাসলেন।

'তাই ভাবলাম আপনাদের কাছেও আসি, দেখে যাই। নতুন এসেছেন। বেশ করেছেন। সেদিন আর একজন এসেছিলেন।'

পিসিমা বললেন, 'কে?'

'ঐ পাঁচ নম্বরের একজন। নাম তো জানি না। কে মেঘরাজ দত্তর বুড়ি মা।'

নবাগতাদের চোখে চোখে ইঙ্গিতের বিদ্যুৎ খেলে গেল।

পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'চেনেন নাকি?'

'হ্যাঁ, চিনি বইকি। বড় বকেন, সময় নষ্ট করেন।'

এবার এঁরা হাসলেন, 'রোজই বেড়াতে আসেন যে!'

পিসিমা চুপ করে রইলেন।

মা বললেন, 'আগে কে ছিলেন এ বাড়িতে?'

'তাঁরা একঘর কায়স্থ ছিলেন। বেশ ভালো লোক ছিলেন, আহা, তাঁদের কর্তাটি

রোগে পড়লেন, তাই চলে গেলেন।'

পিসিমা বললেন, 'কি হয়েছিল?'

এবারে সকলেই চুপ করে রইলেন।

একজন একটু পরে বললেন, 'বুকের কি অসুখ।'

আর একজন বললেন, 'থাইসিস, না দিদি?'

প্রথমা বললেন, 'না না, অন্য কি অসুখ।'

তৃতীয়া বললেন, 'অনেকদিন ভুগলেন কিন্তু, না?'

পিসিমা বললেন, 'এখন কোথায় তাঁরা—সেরেছেন কর্তা? কত বয়স? বুড়ো মানুষ?'

'না বুড়ো কেন, এই পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। সেরেছেন কিনা জানি না তো। কোন দেশে গেছেন, না আছেন কলকাতাতে, কি শুনেছিলাম যেন।'

তাঁর সঙ্গিনীরা হাসলেন, 'কি শুনেছিলেন মনেও নেই তোমার, তা বলছ কেন?'

এবার ছোট ছোট দুটি ছেলে ওদের সঙ্গে কান্না ও আবদার শুরু করে দিলে। ওরা উঠলেন ও বললেন, 'সে বৌটি এত ভাল ছিল। কত যে কাজ করে দিত আমাদের। এই সেলাই-টেলাই। আপনাদের বৌমা সেলাই জানেন?'

পিসিমা সগর্বে বললেন, 'হ্যাঁ, কতরকমের জানে।'

'তা আজ আমরা আসি, আবার আসব।'

মিনু বললে, 'পিসিমা, তুমি যেন কি। দেখ না, সেলাই জানে সে কি বলতে হয়?'

'তাতে কি দোষ, ভালোই তো।'

'এই তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে যাবে, দেখো'খন।'

পিসিমা হাসতে লাগলেন।

মা বললেন, 'ঠাকুরঝি, অসুখের কথা শুনেছ আগের ভাড়াটেদের, একবার বাড়িওয়ালাদের জিজ্ঞাসা করলে হয়?'

সুধীর এসেছিল, সে বললে, 'বাজে কথা, ওসবে কান দিও না।'

মা বললেন, 'তবু জেনে নেওয়া ভাল।'

পরদিন দুপুরবেলা।

মা ওয়াড় সেলাই করছেন। বৌ সেমিজ, টেবিলক্লথ কি সেলাই করছে। পিসিমা দ্বিপ্রাহরিক তন্দ্রা উপভোগ করছেন।

কড়া নড়ল।

'কে?' যাহোক মা উঠে দরজা খুললেন।

'কদিন আসতে পারিনি,'—সহাস্যে পাঁচ নম্বর ঘরের মেঘ দত্ত-জননী প্রবেশ করলেন।

'আসুন' শুষ্ক মুখে হাসি এনে মা বললেন।

'আপনাদের এই বারান্দাটি বেশ। বেশ আলো বাতাস, রোদ্দুর পায় ঘরগুলো। আগের ভাড়াটেদের কাছেও আমি আসতাম রোজই প্রায়।'

পিসিমার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, উঠে এসে বসলেন।

'তারা কদিন গেছে?'

'এই মাস দেড়েক হবে।'

'কেন গেল তারা?'

'তাদের বাড়ির কর্তারই হঠাৎ অসুখ করল, আমার মত হার্টের দোষই হল। তা ওরা এখন একতলা খোলা জায়গায় কোথায় বাড়ি নিয়েছে। সিঁড়ি ওঠার পরিশ্রম সহ্য হয় না তো, এই আমারই দেখুন না।—'

পিছন দিকে এসে দাঁড়ালেন, কয়েকটি জামা ও টুকরা কাপড় নিয়ে—গতকালকার প্রতিবেশিনী। বললেন, 'ও, তাদের কর্তার তো আপনার চেয়ে ঢের বেশী অসুখ। শুইয়ে রেখেছিল ডাক্তাররা।'

বিরক্তভাবে পাঁচ নম্বর বললেন, 'হার্টের অসুখের কথা আর কে ঠিক করে বলতে পেরেছে। আমারও তো একেবারে চলাফেরা বারণ।'

এগারো নম্বর এসে বসলেন মার মাদুরের পাশে।

'বেশ সেলাই করেন তো আপনি। আমিও একা বসে থাকতে পারি না, এই এখানে এলুম, হাতাহাতি করে আপনার কাছে বসে হয়ে যাবে'খন। আমার আবার কল নেই কিনা।'

পাঁচ নম্বর বললেন, 'তোমার কলটা কি হল?'

'সে তো আমার নয়, বারো নম্বরের, ও দেয় না, ওর অনেক সেলাই আছে নাকি। তা ভাই, মানুষের কি রোজই সেলাই থাকে? মাঝে মাঝেও বাদ যায় না!'

মা ও পিসিমা নির্বাক হয়ে রইলেন।

পাঁচ নম্বর বললেন, 'তা ওর ঘরে নিয়ে করলেই তো পার।'

'ওর ঘর-করনাতে যা অগোছ, কে যাবে?'

'বাপ! সে তোমায়ও বলি, কি দুরন্ত ছেলেমেয়ে তোমার! আর কি অপরিষ্কার তোমার ঝি!'

বারো নম্বর এবারে রেগে গেলেন, 'ছোট ছেলেমেয়েরা আর কার দুরন্ত না হয়? বলুন তো দিদি? (পিসীমার দিকে চেয়ে) আর আপনার চাকরটিই কি কম অপরিষ্কার!'

পাঁচ নম্বর বললেন, 'সে বাপু জানিনে, তর্ক ঝগড়া করতে পারব না। তবে তোমার ছেলেমেয়েদের দুরন্তপনা ফ্ল্যাটের সবাই জানে।'—বলে তিনি উঠলেন, বললেন, 'আজ আসি, আবার আসব'খন।

এগারো নম্বর বিরক্ত রাগে বললেন, 'দেখলেন কি মানুষ, গায়ে পড়ে কথা শুনিয়ে গেল। আগেও এই করতেন।'

হতবুদ্ধি মা ও পিসীমা চুপ করে রইলেন।

সুধীর এসে সব গল্প শুনে বলল, 'দরজা বন্ধ করে ঘুমোতে পার না? খোল কেন? কেন যে তোমাদের পাড়া বেড়াতে ইচ্ছে করে?'

এবারে মা ও পিসীমা রেগে বললেন, 'হ্যাঁ, ইচ্ছে করে!'

মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'জিজ্ঞাসা করেছিলি কি অসুখ ভদ্রলোকের হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, তাঁর ব্লাড প্রেশার আছে। ওরা দিনকে রাত, তিলকে তাল বানাতে পারে।' ছেলেমেয়েরা সবাই অবাক হয়ে দুপুরবেলার কাহিনী শুনছিল। এবারে হাসলে। মা পিসিমাও হাসলেন।

এবারে দরজা সব সময়ে বন্ধ। বেড়ালের ভয়ে সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত ওঁরা সারা দুপুর নিঃশব্দে কাজ করেন। জোরে সেলাইয়ের কলটাও চালান না। কেউ ডাকলে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকেন।

কড়া নড়লে ভয়ে ভয়ে সাড়া দেন।

কদিন গেছে। একটা দুটো বেলা হবে। কড়া নড়ল।

'কে?' পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন।

জবাব নেই।

দেরি করে দরজা খুললেন, কেউ নেই।

পিসীমা ঘুমোলেন।

বিকালে সুধীর এলো। 'মা, আমার এক বন্ধু তার চাকর দিয়ে আমাকে কতকগুলো দরকারী বই পাঠিয়ে দিয়েছিল, সব ফেরত দিয়ে দিয়েছ! তোমরা যে কি কর!'

'কখন এসেছিল? ফেরত দেব কেন?' যুগপৎ মা ও পিসীমা বিস্মিত হলেন।

'এসেছিল, তোমরা দরজা খোলনি, অনেক ধাক্কা দিয়েছিল।'

এবারে পিসিমা বললেন, 'হ্যাঁ, ঠুকঠুক করে কড়ার শব্দ হল, আমি ভাবলাম পাঁচ নম্বরী এসেছে। তবু তারপর গেলাম, দরজা খুলে কারুকেই দেখতে পেলাম না তো। ভাবলাম সে-ই ফিরে গেছে।'

সুধীর রাগ করে বললে, 'আগে খুলে একবার দেখলে না কেন?'

পিসিমাও রাগ করে বললেন, 'খুলে দিলেই সব এসে বসবে! আগে দেখব কে এসেছে সেই জানালাই কি ছাই একটা আছে!'

মা বললেন, 'কদিন মাসের গেলে চল অন্য জায়গায়।'

সুধীর বললে, 'সে এখন দেরি আছে। ছয় মাসের চুক্তি লেখাপড়া করা হয়েছে।'

হতাশভাবে সকলে পরস্পরের দিকে চেয়ে সবাই হেসে ফেললেন।

যুগান্তর, শারদীয়া ১৩৪৬

সুমেরু রায়

সবে ভোর হয়েছে। শাশুড়ী মাটির ঘরের দাওয়ায় বসেছিল। বধূ উঠে গোয়ালের দিকে গেল গোয়াল পরিষ্কার করবার জন্য। আগলের কাছে দাঁড়িয়ে একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, 'মা, তুমি কাল রাত্রে গোয়ালঘরের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলে?'

শাশুড়ী উত্তর দেবার অগেই সে ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে ঘরের মধ্যে কে শুয়ে আছে!'

এবার শাশুড়ী বিরক্ত হয়ে উঠল। বললে, 'কি সকালে উঠে 'শোর' (গোলমাল) করছিস্। একবার বললি আগল বন্ধ করিনি, আবার বলছিস্ ঘরে কে, ক্ষেপে গেছিস?'

ততক্ষণে বধূর স্বামী আর দেবর উঠে এসেছে রকের উপর। বধূ বেরিয়ে এসেছিল ভীতভাবে, এখন স্বামীকে দেখে ওড়নার অবগুণ্ঠন দীর্ঘ করে উচ্চস্বরেই বললে, 'দেখ না কেন ঘরে এসে?'

এবারে দেবর, স্বামী, শাশুড়ী সব একে একে ঘরে ঢুকল—পিছনে পিছনে দুই বৌও ঢুকল।

সকলের সঙ্গে ঘরে আসায় এখন নির্ভয় কৌতূহলী বধূ এগিয়ে গিয়ে কোণ থেকে একটু উঁকি মেরে দেখে নিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, 'আরে, এ যে উম্‌দাবাঈ! উম্‌দা মানুষ হিসেবে মানে চমৎকারিণী, জিনিস হিসাবে ভালো।

গোয়ালের অন্যদিকে প্রকাণ্ড আটা-পেষা এক যাঁতার ঘেরা জায়গার একদিকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে আছে একটি তরুণী। মাথায় নীল ওড়নার অবগুণ্ঠন তাকে ঘিরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। লাল সুতা ও জরি জড়ানো দীর্ঘ বেণী যাঁতার তলায় লুটিয়ে রয়েছে। গায়ে লাল রংয়ের আঙ্‌রাখা (অঙ্গরক্ষা, অর্থাৎ জামা), আধময়লা পীত ঘাঘরা পা'দুখানি ঘিরে পড়েছে। গলায় রূপার হাঁসুলি, মাথায় রূপার সিঁথি, কানে সারি গাঁথা ছোট ছোট সোনার মাকড়ি, পায়ে রূপার মোটা মল, বেড়ার ফাঁকে আসা রৌদ্রে ঝকমক করছে। সেকালের কবি হলে তার রূপবর্ণনা করতে পারতেন হয়তো—'বান্ধুলী পুষ্পের' মত অধর, 'তিলফুল জিনি নাসা' 'দশন মুক্তার পাঁতি' 'হরিণ নয়ন' ইত্যাদি বলে। কিন্তু দেখবার রূপের সম্বন্ধ চোখের সঙ্গে, লেখবার রূপ দেখার বাইরে। সত্যিকারের রূপ লেখায় বোঝান যায় না বোধ হয়।

যাই হোক, বধূর কথায় কিম্বা সমবেত দলের উপস্থিতির জন্য তার ঘুমটা কেমন হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। সে উঠে পড়ল। তারপর অবাক হয়ে চেয়ে রইল। যেন তার মনে হচ্ছে না ঠিক—এটা জাগা না স্বপ্ন, অথবা কি। কি আর কোন জায়গা এটা!

এইবার তার বড়ভাই জিজ্ঞাসা করলে কঠোরভাবে, 'তুই কোত্থেকে এলি? কেন এলি?'

ততক্ষণে সে ভাল করে জেগেছে, সব মনেও পড়েছে। সে কিছু উত্তর দেবার আগেই তার মা জিজ্ঞাসা করলে, 'কার সঙ্গে এলি? কেন এলি?'

এতক্ষণে সে সোজা হয়ে বসে মাথায় ওড়না তুলে দিয়েছিল। এবারে দুষ্ট ঘোড়ার মত কারুর পানে না চেয়ে অন্য একদিকে তাকিয়ে মার কথার জবাব দিলে, 'একলা এসেছি।'

মা ভাইরা একসঙ্গে বলে উঠল, 'এই রাত্রে একলা এসেছিস?'

সে নির্বিকারভাবে গরুগুলোর দিকে চেয়ে রইল। অসহ্য রাগে বড়ভাই কটু একটা গালি দিয়ে বলে উঠল, 'তুই কি পাগল হয়ে গেছিস? লোকে আমাদের কি বলবে তা জানিস না? তোকে আজ আমি মেরে খুন করে ফেলব।'

সে চুপ করে একগুঁয়ের মত সেইদিকেই তাকিয়ে রইল। এবার ছোটভাই বললে, 'আচ্ছা, ওকে এই গোয়ালেই দরজা বন্ধ করে রেখে দাও, খেতে দিও না। যতদিন না ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এসে আবার নিয়ে যায়।'

এইবার সে মুখ তুললে, তারপর স্থিরভাবে বললে, 'আমি না খেয়ে মরে গেলেও সেখানে যাব না। সেখানে তারা মারে, গালাগাল দেয়। রাতদিন কাজ করায়, খেতে দেয় না ভাল করে। কক্ষনো যাব না। দাদা মেরেই ফেলুক।'

ওড়নার পাশ থেকে তার বাহুর ওপর মুচড়ে যাওয়া কালশিরে কালো কালো দাগ দেখা যাচ্ছিল। চোখে তার জল ছিল না, মিনতি বা বিনীত করুণা যাচ্ঞার ভাবও মুখে নেই। গৌরসুন্দর কিশোর তনু, আরও উজ্জ্বল চোখ, সুন্দর নিখুঁত মুখ ভোরের বেলায় অনুজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলোয় যেন গৌরীর মূর্তির মত দেখাচ্ছিল। সহসা বাইরে কে ডাকল, ভাইরা বেরিয়ে গেল। জননীও এগিয়ে গেল দরজার দিকেই।

বধূ ননদের কঠিন স্থির মুখের দিকে চেয়ে ভীতভাবে কিছু বা বলে গরুর দিক পরিষ্কার করতে লাগল। উম্‌দা এবারে ক্লান্তভাবে শুয়ে পড়ল। দুরাত্রি সে হেঁটেছে। খেতে পায়নি। দিনে হাঁটতে সাহস করেনি, পাছে কেউ দেখতে পেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। গোয়ালের দুটি গরু দুটি বাছুর চুপ করে চেয়েছিল শান্তভাবে উম্‌দার দিকে। যেন তারাও বুঝতে পারছিল—কি একটা হয়েছে, আর উম্‌দাকে চিনতে পেরেছিল।

২

ভাইরা বাইরে এলো।

হাতে মোটা একটা লাঠি, মাথায় সাদা আধময়লা পাগড়ি, গায়ে রেজীর (খদ্দর) মেরজাই, মোটা ধুতি, পায়ে রূপার কড়া (মল) পরা এক দীর্ঘকায় মস্ত গোঁফওয়ালা জাঠ চাষা দাঁড়িয়েছিল।

ভাইরা তটস্থ হয়ে বললে, 'এসো, এসো যমুনালালজী, খবর সব ভালো? এত সকালে?'

যমুনা সিং বললে, 'হ্যাঁ, সব ভালো। কিন্তু বৌকে কাল থেকে দেখতে পাচ্ছি না, এখানে এসেছে?'

বড়ভাই বললে, 'হ্যাঁ, এসেছে তো।'

আশ্চর্য হয়ে যমুনা সিং বললে, 'এসেছে! একলা চলে এসেছে পরশু রাত্রে। তা থাক ও এখানেই। আর ওকে নিয়ে যাব না। আমরা ভাইয়ের আবার বিয়ে দোব।'

যমুনা সিং উঠে দাঁড়াল।

এবার ছোটভাই বললে, 'না না, বসুন। আপনি রাগ করবেন না। ও বড়ই ছেলেমানুষ। আমার পিতামহ ওকে আদর দিয়ে 'উম্‌দা পরী' (সুন্দরী পরী) বলে ওর

মাথা খারাপ করে দিয়েছেন। আমরা ওকে বুঝিয়ে আবার পাঠিয়ে দোব।'

মাও এসে দাঁড়িয়েছিল, সে বললে, 'বেটা, আমিও ওকে নিয়ে বড়ই মুস্কিলে পড়েছি। মেয়েমানুষ, ওর সাহসও তো কম নয়! এই রাত্রে একলা পথ চলেছে! ওকে তোমাদেরই হাতে দিচ্ছি, তোমরাই মেরে বকে শাসন করো।'

যমুনা সিং বললে, 'ওকে শাসন করে আমরা কিছুই করতে পারি না। ও ভারী একজেদী। তাছাড়া ও কারুকে মানে না। সুন্দর বলে ভাইয়ের বিয়ে দিলাম। ঐ সুন্দর বলেই মুস্কিল হয়েছে। যত গাঁয়ের মেয়ে আর ছেলেদের সঙ্গে ও কথা কয় লুকিয়ে লুকিয়ে। আমাদের চাষার ঘরে ও মেয়ে চলবে না। সবাই নিন্দে করে, হাসে।'

ব্যাকুল হয়ে জননী বললে, 'তা হোক, ওকে তোমরা শাসন করো।'

ছোটভাই তামাক সাজতে বসলে কুটুম্বের জন্য। তারপর উম্‌দার বড় ভাই আর ভাসুর নীরবে বসে তামাক খেতে লাগল। মা ভেতরে গেল কুটুম্বের অভ্যর্থনার যোগাড়ের জন্য।

অনেকক্ষণ পরে উম্‌দার ভাসুর বললে, 'এক কাজ করা যায় ওকে শাসন করবার জন্য। আমাকে আমাদের গাঁয়ের একজন বলছিল।'

বড় ভাই বললে, 'কি কাজ?'

যমুনা সিং বললে, 'সে বললে, আগে আগে অনেক সময় দুরন্ত বৌ-মেয়েকে লোকে রাজবাড়িতে পাঠিয়ে ঝি করে রেখে দিত। একেবারে বন্দী হয়ে থাকত। তাতে বাইরে বেরুনো, কারুর সঙ্গে কথা কওয়া, বাজে গল্প—সব বন্ধ হয়ে যেত। তারপর সিধে হয়ে গেলে দু-তিন বছর পরে নিয়ে আসত।'

মা ফিরে এসেছিল। ভাইরা, মা চুপ করে রইল। ছোটভাই বললে, 'তারা কি সকলের মেয়ে নেয়?'

যমুনা সিং বললে, 'তা নেয় না। জানাশোনা লোক দিয়ে ঠিক করতে হয়।'

মা বললে, 'কতদিন রাখতে হবে?'

'তা জিজ্ঞাসা করে বলা কওয়া করে নেওয়া যাবে।'

বড় ভাই তেজ সিং বললে, 'তা গঙ্গা কি বলে?'

গঙ্গা সিং উম্‌দার বর।

যমুনা সিং আশ্চর্য হয়ে বললে, 'বাবা রয়েছেন, মা রয়েছেন, তাঁদের মত আছে, আমি বড় ভাই মত দিচ্ছি। ওর আবার মত কি?'

অতিশয় অপ্রস্তুত হয়ে তেজ সিং আর মা বলে উঠল, 'নিশ্চয়। তা তো বটেই।'

গোয়াল, গরু, গোবর ও যাঁতার ধুলোর পাশে নিদ্রিত ক্লান্ত উম্‌দাবাঈয়ের ভাগ্যলিপিকায়, তার জীবনের বিধাতাদের সর্বসম্মতিক্রমে নতুন এক রেখাপাত হয়ে গেল।

৩

উম্‌দার ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। সে আশ্চর্য হয়ে দেখলে, গোয়ালের দরজা খোলা, কেউ বন্ধ করে রাখেনি। সে বেরিয়ে এলো বাইরে। মা রান্নাঘরে রুটি করছে। মাও

কিছু বললে না। সে একটু ভয়ে ভয়ে মার কাছে খাবার চাইল। মা দিল। খাওয়ার সময় মা বললে, 'তোর ভাসুর এসেছে।'

চকিত হয়ে নিমেষে সে উঠে দাঁড়াল, বললে, 'আমি সেখানে যাব না। আমি পালিয়ে যাবো।'

মা একটু চুপ করে রইল, তারপর বললে, 'আচ্ছা যাসনি।'

বিচলিত চঞ্চল উম্‌দা বিকালের দিকে ভাজের কাছে শুনল, তাকে নিয়ে ওরা সব শহরে যাবে, রাজার বাড়িতে সে থাকবে এখন থেকে, সেখানে কাজ করবে। ভাসুর আর ভাইয়া এই বলেছে। উম্‌দা অবাক হয়ে গেল।

রাজার বাড়ি? রাজপ্রাসাদ! রানীরা? মহারাজা? সেখানে চাকরি করবে বা কি কাজ করবে, সেকথা উম্‌দার মনে এলো না। অবাক হয়ে সে শুধু ভাবতে লাগল, রাজার বাড়ির কথা, রানীদের কথা, তাদের ঐশ্বর্যের কথা। যে ঐশ্বর্য সে দেখেনি সেকথা তার কল্পনায় এলো না। সে স্বপ্ন, তার জানা ঐশ্বর্যের স্বপ্নের চাক্কি, চুল্লা (যাঁতা, উনান), পাকা বাড়ি, গহনা, কাপড় অতিক্রম করে যেতে পারে না। তবু সে ভাবতে থাকে, মুগ্ধভাবে ঘুরে ফিরে গহনা-কাপড় পরা অজানা রানীদের কথা, তার জানা দেখা বড় বাড়ির কথা।

৪

তারপর একদিন যাত্রার দিন এসে পড়ল। উম্‌দার রুক্ষ চুলে ঘি মাখিয়ে আঁচড়ে, মোম মাখিয়ে পেটি পেড়ে উঁচু খোঁপা রুক্ষ তালুর পিছনে বেঁধে, যথাসম্ভব গহনা পরিয়ে, পরিষ্কার ঘাগরা লুগড়ি কাঁচুলি ও জামা পরিয়ে মাথায় দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টেনে দিয়ে— তাকে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হওয়ার তাদের মতে উপযুক্ত সাজে সাজিয়ে তার ভাই, ভাসুর আর মা তাকে নিয়ে শহরের দিকে রওনা হল। আজ রাজপ্রাসাদের স্বপ্নমুগ্ধ কিশোরী উম্‌দা এই যাত্রায় কোনো বাধাও দিল না, প্রতিবাদও করল না।

নানা তদ্বির, নানা মানুষ, বহু দেখাসাক্ষাৎ করার পর একদিন সন্ধ্যায় তারা অন্তঃপুরে প্রবেশের অনুমতি পেল।

গ্রাম্য জাঠ চাষা উম্‌দার ভাই আর ভাসুর ধূলিমলিন জামা-কাপড় পাগড়ি ধুয়ে পরিধান করে, মোটা লাঠিটি হাতে নিয়ে সপ্ত-তোরণ প্রাসাদের প্রথম তোরণে বিনীতভাবে ওদের পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল এবং মা আর মেয়ে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে একজন খোজার সঙ্গে কোনো এক রানীর প্রধানা সখীর দরবারে গিয়ে পৌঁছল। উম্‌দার ধূলি-ধূসর মেহেদী-পরা দুখানি গাঢ় রক্তবর্ণ চরণকমল উঁচু ধরনের গ্রাম্য ঘাগরার তলা থেকে দেখা যাচ্ছিল। মেহেদী-আঁকা দুখানি করপল্লব জোড় করে উম্‌দা মার পাশে দাঁড়িয়েছিল।

প্রধান সখী একটু রূঢ়ভাবে বললে, 'অত ঘোমটা দিয়েছিস কেন? চল্ রানীজীর কাছে নিয়ে যাই, যদি রাখেন। যদি তোর কপালে থাকে।'

তারা রানী তোমরজীর (তোমর বংশের কন্যা) মহলের দুয়ারের একপাশে এসে দাঁড়াল।

উম্‌দা-জননী-বর্ণিত উম্‌দার অবাধ্যতা ও চঞ্চলতার সমস্ত কাহিনী রানীর কাছে

বর্ণনা করে বড়ারণজী (বড় সখী) তাকে ডেকে নিয়ে বললে, 'এই, মুখ তোল্। এমনি করে কুর্নিশ কর্।'

কুর্নিশ করা দেখবার জন্য মাথায় গুণ্ঠন সরিয়ে কুর্নিশ করে উম্‌দা বিনীতভাবে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। ঝাড়ের মোমবাতির স্নিগ্ধ আলোতে অলিন্দের পাখী, ফুল আঁকা রঞ্জিত দেওয়ালের এবং কক্ষতলে বিছানো সুন্দর গালিচার রংয়ের পরিপ্রেক্ষিতে রানী তার দিকে চেয়ে সেই গ্রাম্য কৃষক বালিকার রূপে অবাক হয়ে গেলেন। সখীরা এবং খোজাও আগে দেখেনি, তারাও আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

আর উম্‌দাও তার কল্পলোকের অজানা এই বিরাট প্রাসাদ এবং প্রাসাদ-বাসিনীদের অপূর্ব বেশভূষা দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তাকে দেখে যে তারাও অবাক হয়ে গেছে, সে কথা সে বুঝতেও পারল না।

৫

কয়েকটা বছর কেটে গেছে।

সহসা একদিন গঙ্গা সিং এসে দাঁড়াল তেজ সিংয়ের বাড়ি। শাশুড়ী আর তেজ সিংকে নিয়ে সে শহর থেকে উম্‌দাকে আনতে চায়। এতদিনে নিশ্চয় সে শান্ত হয়েছে। বড় হয়েছে। স্বামীর ঘর করবার মত তার বুদ্ধিও হয়েছে।

তেজ সিং চুপ করে রইল। তার কানে বোনের 'পদোন্নতি'র খবর, তার ওপর রাজনেত্রের 'নেক নজরে' পড়ার আভাসও একটু যেন পৌঁছেছিল। সেদিন সরল জাঠ কৃষক তাতে গর্বিত হয়েছিল কিনা কে জানে, আজ গঙ্গা সিংয়ের কথায় হঠাৎ সে যেন লজ্জিত আর দুঃখিত হল। তারা তো কিছুদিন পরে বোনকে স্বামীর ঘরে ফিরিয়ে আনবে ঠিক করেই ওখানে দিয়েছিল। কিন্তু আনা তো হয়নি।

তেজ সিং বললে, 'তুমি এতদিন আসনি কেন?'

গঙ্গা সিং বললে, 'মা মরে গেল, বাপ মরে গেল, ভাইয়ের অসুখ হল, অজন্মা হল—আমি ভাবলাম সে যদি আবার এসে চলে যায়। তারপর আমি পলটনে চাকরি নিলাম, ছুটি পাইনি। এখন ভাল কাজ করি, তাই এলাম।'

প্রকাণ্ড তলোয়ারখানি কোলে নিয়ে পিঙ্গলবর্ণ দীর্ঘদেহ, মস্ত-গোঁফওয়ালা, মস্ত-পাগড়ি-পরা জোয়ান গঙ্গা সিং স্ত্রীর কথা বলতে বলতে গ্রামের লোকের মত সরল লজ্জিতভাবে একটু হাসলে।

বৃদ্ধা শাশুড়ী গর্বিত স্নেহভরে তার দিকে চেয়েছিল, বললে, 'চল যাই, নিয়ে আসি তাকে।' এমন সিপাহী জামাতা, অমন সুন্দরী মেয়ে!... ভাবে।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, গুম্ফ-সুশোভিত রৌদ্রম্লান মুখ, দুটি জাঠ পুরুষ আর তাদের বৃদ্ধা জননী শহর অভিমুখে আবার যাত্রা করল।

সেবারের মতই তারা প্রাসাদের প্রথম তোরণে অপেক্ষা করতে লাগল, জননীকে অন্দরমহলের দেউড়ীর দিকে পাঠিয়ে।

প্রহরীমণ্ডলীর কাছে বৃদ্ধা দাঁড়াল। তারা জিজ্ঞাসা করে, 'কাকে চায়, কি আবেদন।'

উম্‌দাকে দেখতে চায়, নিয়ে যেতে চায়? কে উম্‌দা? কোনো উম্‌দাকে তারা চেনে

না। কোন্ রানীর দাসী?

'তোমরজীর? আচ্ছা খবর দিচ্ছি।'

'বড়ারণজী আর প্রধান খোজার কাছে যা কেউ, এত্তেলা দে।' বহু দর্শনার্থীর দলে বৃদ্ধাও অপেক্ষা করতে লাগল। দেখা হল। ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রধানা সখী বড়ারণজী চেয়ে রইল, 'কাকে চাও? কে তুমি?'

প্রধান খোজাও এসে দাঁড়াল। 'উম্‌দা! উম্‌দার মা তুমি? তাকে নিয়ে যেতে এসেছ? কোন্ উম্‌দা?'

বিনীতা বৃদ্ধা কন্যার পরিচয় জানায়। সহসা কি মনে পড়ে ঈষৎ হাসির একটা রেখা খোজার মুখে ফুটে উঠল।

বড়ারণজীর মুখে হাসি এবার স্পষ্ট ও উচ্চ হয়ে উঠল।

খোজা বললে, 'ওহো! তোমরা জানো না বুঝি? উম্‌দাবাঈ তাঁর নাম নেই আর। তাঁর নাম খেতাব শোনোনি? হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার মেয়ে তিনি জানি। কিন্তু তিনি এখন পর্দায়েত্। তাঁর মস্ত নাম, খেতাব সুমেরু রায়। মহারাজার কাছে পেয়েছেন। কি বললে? দেখা করবে? কি বল্‌ছিস তুই? তোর মেয়ে সে, তাকে দেখতে চাস্? কি বলছিস্, তার বর নিতে এসেছে? তুই পাগল হয়ে গেছিস? ওকথা আর মুখেও আনিসনি- শহরে দাঁড়িয়ে। তোর মেয়ে তিনি তা জানি। এখন আর তোর মেয়ে নেই, তিনি রানী। বুঝেছিস, রানী! পথে ঘাটে তাঁকে 'মেয়ে' 'মেয়ে' করলে তোর 'ফাটক' হয়ে যাবে। বুঝলি? একেবারে গেঁয়ো। যা, গাঁয়ে ফিরে যা।'

খোজা আর সখীরা উপহাসের হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠল।

৬

সুমেরু রায়ের কানে এ কাহিনী পৌঁছায় কিনা কে জানে। ঐশ্বর্য বিলাসময় নিরবকাশ দিনের মাঝে কে কার দুঃখময় পূর্ব জীবনের কথা বা দুঃখদাতা স্বজনের কথা মনে রাখে। কার এমন সাহস যে কোন গণ্ডগ্রামের গোঁয়ার চাষাকে আজ বলে, রাজ-প্রেয়সী সুমেরু রায়ের স্বামী। আর এক স্থবির গ্রাম্য বৃদ্ধাকে বলে তাঁর মা।

হয়ত শুনেছিলেন, নয়ত শোনেননি। যাক্। কিন্তু তাঁর যৌবন আর রূপ তো সীমাহীন নয়, আর প্রকৃতির মত নিত্য নূতনও হয় না এবং বিপুল পৃথিবীতে সুন্দরী নারীরও অভাব নেই।

অকস্মাৎ শহরের লোকেরা, ক্রমে গ্রামবাসিনী তার জননী তার ভাইয়েরাও শোনে, সুমেরু রায় বা উম্‌দাবাঈয়ের ওপর গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব হয়।

সহসা একদা এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে 'মছলী' ভবনের (স্নানাগারের) শ্বেত মর্মর কুট্টিমে শুভ্র সূক্ষ্ম বসনে প্রস্রবণের ধারাস্নাত তনু এখনো তন্বী রূপসী উম্‌দা-বাই ওরফে সুমেরু রায় রবিবর্মার গঙ্গাবতরণের ছবির মত গঙ্গাদেবীরূপে রাজগোচরে আবির্ভূত হয়েছেন।

মদিরামুগ্ধ রাজা মূঢ়ভাবে প্রেয়সী নারীর এই অপরূপ নবশোভাময় রূপের দিকে চেয়ে থেকে শুনলেন, গঙ্গাদেবীর আদেশে আজ এখন আর তিনি সুমেরু রায় নন— তাঁর ইষ্টদেবী গঙ্গাদেবীর অবতার।

তারপর কখনো জ্যোৎস্না রাত্রে, কখনো নক্ষত্র-খচিত চমৎকার তিমির রাত্রে দেবীর আবির্ভাব হয় তাঁর উপর।

রাজ্য সংক্রান্ত নানা সমস্যা, নানা কথা, ভবিষ্যৎ বর্তমান অতীতের মীমাংসা হয় সেদিন।

আর সঙ্গে সঙ্গে উম্‌দাবাঈয়ের বা পর্দায়েত সুমেরুবাঈয়েরও রাজার ওপর প্রভাব হ্রাস হয়ে যাবার আতঙ্ক থাকে না। ধর্মের মোহময় ভয় রাজার নানা নারীর মোহ বিলাসকে দেবীর কাছে অপরাধ ভয়াবিষ্ট করে রাখলে।

আর গঙ্গাদেবী আবিষ্ট সুমেরু রায় প্রত্যাদেশ পান এবং রাজাকে আদেশ দেন—কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিনী নারীকে 'কোতল' করতে, কখনো অন্য রানীদের অসম্মান করতে; কখনো রাজ্যে কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা ওলটপালট করতে। লোকে সভয়ে অনুভব করে, বলাবলি করে, জাহাঙ্গীরের নূরজাহানের মত সুমেরু রায়ই রাজা এখন।

তবু অবতারত্বের ইন্দ্রজালের মহিমা একদিন সহসা মিলিয়ে গেল রাজার মৃত্যুতে।

আর প্রত্যাদেশ পেলেও আদেশ শোনবার জন্য মুগ্ধ হয়ে কেউ বসে নেই এবং আর প্রত্যাদিষ্টও হন না সুমেরু রায়।

মানুষের বিশ্বাস এত টলমলে, কয়েক দিনেই শহরের গ্রামের সকলে বুঝতে পারল, সুমেরুবাঈয়ের ওপর যে 'ভর' হত গঙ্গাদেবীর—সব ছলনা, কিছুই নয়! যারা উৎপীড়িত হয়েছিল, যারা বঞ্চিত হয়েছিল, যারা লাঞ্ছিত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে সমস্ত রাজ্যের সকলেই অবিশ্বাসেও যেন এক হয়ে গেল।

রাজার মৃত্যুতে রানীদের রাজ্ঞীত্ব আর থাকে না বটে, পদেরও পরিবর্তন হয়, মর্যাদারও প্রকারভেদ হয়, কিন্তু তাঁদের মাজীসাহেব বা রাজমাতারূপে সম্মান প্রতাপ কিছু কম হয় না।

কিন্তু রাজ-অন্তঃপুরের প্রমোদ-প্রাসাদবাসিনী অসংখ্য বিলাস-ক্রীড়নক নারীদের সঙ্গে সুমেরুবাঈও এক নিমেষেই মূঢ় মর্যাদাহীন সাধারণ বার-নারীর পর্যায়ে মিশে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তেই ইঙ্গিতে অঙ্গুলি হেলনে রাজ্যের নানারকম বিপর্যয়, যথেচ্ছাচার ঘটাবার অধিকারও তার মিলিয়ে গেল।

প্রাসাদের বিরাট নারীশালায়, মহলে মহলে অন্য মেয়েদের মত তারও জীবনযাত্রা চিরকালের মত বন্দী হয়ে গেল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, তখনও রূপবতী, সুমেরুবাঈয়ের আশেপাশে আর স্তুতিবাদ-কারিণীদের ভিড় জমে না।

৭

এমন সময়ে একদিন এক সখীর মুখে শুনলেন বৃদ্ধা জননীর কথা, তার এখানে আসার কথা, আর ফিরে যাওয়ার কথা। বিস্মৃত শৈশবের কথা মনে পড়ে গেল। সুমেরুবাঈ ঈষৎ বিমনাভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাকে তোরা অন্দরে আনলিনি কেন? আমাকে এত্তেলাও (খবর) দিস্‌নি তো?'

এখন নির্ভয়ে সখী প্রগলভভাবে হেসে বললে, 'তার যা ময়লা গেঁয়ো কাপড়-চোপড় আর কথাবার্তা শুনে সে যে আপনার মা তাই বিশ্বাস হয়নি।' তারপর একটু

মুখ টিপে হেসে বললে, 'সে আবার বলছিল সঙ্গে আছে তার জামাই আর তার ছেলে, আপনাকে তারা দেখতে চায়। দেখা করতেও এসেছে, নিতেও এসেছে।'

সুমেরু রায় ভ্রূকুঞ্চিত করে তার দিকে চেয়েছিলেন, এখন আর ওরা তাঁকে আগের মত সম্ভ্রম করে কথা বলে না। সে যেন সমানে সমানে হাসছে গল্প করছে।

তাঁর ভ্রূকুটিতে ভ্রূক্ষেপ না করে সে আবার বললে, 'তা খোজাসাহেব আর বড়ারণজী হেসেই খুন। তাঁরা ওদের বললেন, যা পালা ছেড়ে, তোর মেয়ে এখন রানী হয়ে গেছে। ওই 'গাঁওয়ার'টাকে তার স্বামী বলে পরিচয় দিলে, তোদের ফাটক হয়ে যাবে।'

সুমেরুবাঈ চুপ করে রইলেন। মনে হতে লাগল—মা আছে না নেই? ভাইরা বেঁচে আছে নিশ্চয়। আর গ্রামের মুক্ত জীবন! রাজ-অন্তঃপুরের সুখবিলাসহীন ঐশ্বর্যহীন সে জীবন! সহসা আজকে এতদিন পরে বহু আকাঙ্ক্ষিত এই জীবনকে যেন বন্দীশালার জীবন মনে হতে লাগল। রত্ন-অলঙ্কার-ভূষিত দেহের পরিচর্যাকারিণী দাসী-সখী পরিবেষ্টিত বহু বিলাসময় প্রাসাদের মহিমা গৌরবের মোহ, রাজার মৃত্যুতে তাঁর ক্ষমতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

সখীটা বলতে থাকে, 'তারপর আবার সেদিনও এসেছিল তারা!' এবারে অপেক্ষা করে প্রশ্নের।

সুমেরুবাঈয়ের পদমর্যাদায় সম্ভ্রমের চেয়ে কৌতূহল বেশী হয়। বললেন, 'কে এসেছিল? মা? কেন?'

সখী হাসে একটু। তারপর বলে, 'আপনার মা ভাই আর তার জামাই আর ছেলে। আছে তারা শহরে।'

সুমেরুবাঈ জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা এসেছে? ছেলে কার?'

'ছেলে জামাইয়ের। সেপাইয়ের আর চৌকিদারের চাকরির জন্য এসেছে তারা। বড়ারণজী বলছিলেন। তা এখন তো আর আপনাকে বললে হবে না, এখন মহক্‌মা খাসের হুকুম লাগবে।'

সুমেরুবাঈ আবার ভ্রূকুঞ্চিত করে চুপ করে রইলেন। স্পর্ধা বেড়েছে ওদের! স্পষ্ট করে বলার এই সাহস হয় নইলে! কিন্তু চুপ করেই রইলেন। যেন কথা বললেই ওদের স্পর্ধা আর প্রগল্‌ভতা বেড়ে যাবে বুঝতে পারলেন।

কিন্তু তিনি না কথা বললেও সে আবার বললে, 'আর ছেলেটা নাকি এমন সুন্দর দেখতে। বারো-তেরো বছরের ছেলে, মস্ত তলোয়ার কোলে নিয়ে চুপ করে তার মামা আর বাপের পাশে বসেছিল। যেন মেওয়ারের গল্পের বীর বাদল। খাঁটি রাজপুতের বাচ্ছা, হাজার হোক।' স্পর্ধিত কৌতূহলে সে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, ওকি আপনার ছেলে?'

সুমেরুবাঈ গম্ভীরভাবে বললেন, 'যা খসখসের পর্দাগুলো ফেলে দিয়ে তাতে জল দিতে বল। আর পাখা টানতে বল। আমি শোব।'

তবু প্রতিদিনই নির্ভয়ে কোনো না কোনো গল্পগুজবের অবতারণা করে সখীরা কেউ না কেউ।

ক্রমে সুমেরু রায়ের সয়ে যায়। আর প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে। গ্রামের কথা মনে হয়, মায়ের কথা মনে হয়, পারিবারিক জীবন যে কেমন তাও মনে হয়। সঙ্গোপনে ভাবেন, তাহলে স্বামী বিবাহ করেছিল? সন্তানও হয়েছে? অমন সুন্দর সন্তান? সপত্নী নিশ্চয়ই রূপবতী।

কেমন কৌতূহল হয়। সব সময় মনে হয় কেবলি, একবার গ্রামে যেতে পারা যায় না? বৃদ্ধা জননী ও ভাইদের কাছে, তারপর রূপসী সতীনকে দেখে আসতে পারে। তার চেয়ে কি সুন্দরী সে হবে! আশ্চর্য, সপত্নীর সঙ্গে কিবা সম্বন্ধ, আর কিবা প্রয়োজন, তবু ঘুরেফিরে কিশোর-কুমার তার ছেলের কথা মনে হয়। কেমন দেখতে তারা—দেখতে কৌতূহল হয়। তার কি তাতে? তবু।

আস্তে আস্তে পদগৌরবের নীহারিকামণ্ডল মিলিয়ে আসে, সুমেরুবাঈ শহরের গল্প শোনেন, গ্রামের গল্প জানতে চান। সখীরা পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে চুল বেঁধে দিতে দিতে সব কথা বলে।

সবশেষে একদিন এক বিশ্বস্ত সখীর কাছে বলে ফেলেন, 'একবার গাঁয়ে যাওয়া যায় না?'

সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। গ্রামে—গাঁয়ে? বাঈসাহেবার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? মুখে বললে, 'সে হুকুম তো কারুর নেই। কেউই তো কখনো 'হারেম' ছেড়ে বেরুতে পারে না। শুনিনি তো!'

সুমেরুবাঈ নীরব হয়ে যান।

আবার কতদিন যায়। এবারে একদিন বলেন, 'আচ্ছা, চুপি চুপি বাসনমাজার দাসীর সঙ্গে চলে যাই যদি, আবার দু-চারদিন বাদে ফিরে আসব।'

দ্বিধাভরে সখী চুপ করে থাকে। এবারে বলেন, 'যদি সব গহনা টাকা নিয়ে তোকে নিয়ে দুজনেই চলে যাই! এখানে বন্দী থেকে আর কি সুখ?'

সুমেরুর সিন্দুকভরা ধনরত্ন, অলঙ্কার গহনা সে দেখেছে। লুব্ধভাবে সে চুপ করে থাকে, প্রতিবাদ করে না।

প্রতিদিন আলোচনা করতে করতে ভয় যায় ভেঙে। আশা হয় দুর্বার। অবশেষে ঠিক হল দুজনে যাবেন আগে পরে করে। প্রথমে ধন অলঙ্কার হস্তান্তর করবে আরো দু-একজন দাসীকে দলে নিয়ে, তারপর যেমন করে হোক চলে যাবেই।

মহলের পর মহল, তাতে প্রবেশের জন্য সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গপথ, প্রাসাদের মধ্যে মহলের আর বাড়ির সমুদ্র যেন। বিরাট কেল্লার মধ্যে প্রাসাদ, তার তোরণে প্রহরী, তাদের খবরদারী। বিপুল জনতা তার মাঝে আসে যায়। কিন্তু যারা কবে একদিন শৈশবে না কৈশোরে ঐ বিরাট অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিল, সেই নারীরা আর তো সেই ব্যূহ কখনো ভেদ করে বাইরে ফিরে আসেনি। তাদের পায়ে নেই সহজ গতি,

মনে নেই সহজ সাহস, চোখের সামনে নেই চেনা কোনো সহজ পথ।

এক মুহূর্তে সুমেরুবাঈ সখী ও সবসুদ্ধ আবার প্রাসাদে ফিরে এলেন। এবারে প্রহরী খোজার সঙ্গে।

এবারে মহলে বন্দীশালা আরও দৃঢ় হল। আর ধনরত্ন সব মহারানীর হুকুমে তাঁর কোষে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

সুমেরুবাঈ শুনতে পান, তাঁর ধন ঐশ্বর্য নিয়ে এক প্রকাণ্ড মন্দির গঠিত হচ্ছে, মহারানী করাচ্ছেন স্বামীর নামে।

অহঙ্কৃতভাবে ভাবেন তিনি, তাঁরও নাম থাকবে সেখানে, তাঁরই তো ঐশ্বর্য! তৈরী হলে দেখতে যাবেন—আগের মত সমারোহে পাল্কি-বন্ধ গাড়ি খোজা ও দাসী সমভিব্যাহারে।

মন্দির শেষ হয়ে যায়, দেবদর্শনে রানীরা যান, বাঁদীরা যায়, সাধারণ মেয়েরা যায়। কিন্তু সুমেরুবাঈয়ের কোন হুকুম পাওয়া যায় না।

প্রাসাদের ভিতরে সুরক্ষিত সুন্দর মহলে একদা প্রতাপান্বিতা রাজপ্রেয়সী গঙ্গাদেবীর অবতার সুন্দরী উম্‌দাবাঈ, পরে সুমেরুবাঈ, স্থবিরের মত বসে থাকেন, কিছুই ভাবতে পারেন না আর। শুধু অবশিষ্ট সামান্য সম্পদ আর মাসোহারা নিয়ে। আর তোশামোদ করে এবং পুরাতন প্রভাব দিয়ে সংগ্রহ করেন মদির পানীয়।

আচ্ছন্নমনে খাপছাড়াভাবে ভাবেন ভুলে যাওয়া গ্রাম্য জীবনের কথা, আর মাঝে মাঝে বৃদ্ধা জননীর কথা এবং না-দেখা কোন সুন্দর তনয়শালিনী অজানা এক সপত্নীর কথা।

ভারতবর্ষ, ১৩৫৪

শেঠানীজী

অবশেষে বহু আশা নিরাশার দ্বন্দ্বের পর শেঠানীজী রাজ-অন্তঃপুরে তৃতীয়া রানী চন্দাবৎজীর (চন্দাবৎবংশীয়া) মহলে কোন বড় জলসায় একটা নিমন্ত্রণ পেলেন। কবে একদিন কি এক সামান্য কারণে তাঁর পিতামহীর আমলে ঐ নিমন্ত্রণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা তাঁরা জানেন না। কিন্তু চার বছরের মেয়ে তিনি সেই শেষ জলসায় গিয়েছিলেন। তারপর বহুদিন ধরে তার বিবরণ শুনে শুনে তাঁর মনে এমনি এঁকে গিয়েছিল সেই কাহিনী যে, তাঁর মনে হত তাঁর সবই মনে আছে, ভোলেননি, শোনা কথা নয়, মনে থাকা ঘটনা।

সেই শোনা কথা-কাহিনীর মোহ তাঁকে একেবারে অধীর করে তুলেছিল, আবার কোনদিন ঐ আমন্ত্রণ পাবার আকাঙ্ক্ষায়। যেভাবেই হোক যেমন করেই হোক রাজ-অন্তঃপুর আর প্রাসাদ-বাসিনীদের দেখা তাঁর পাওয়া চাই-ই।

এবং যদি রাজার দৃষ্টিপথে পড়েন!

যে মোহ যে স্বপ্ন অকারণে তাঁকে ওড়নায় ঘাগরায় কাঁচুলিতে বর্ণবিন্যাস করিয়েছে—শ্রাবণে ঘন নীল মেঘের ছায়ায় পীত উত্তরী সবুজ কাঁচুলী পরিয়েছে, চোখে কাজল মাথায় মুক্তার সিঁথি 'বোরলায়' শোভিত করেছে। বসন্তে হালকা মতিয়া রংয়ের ওড়না নয়ত আস্‌মানী রংয়ের উত্তরীতে পীত কঞ্চুলিকায় সেজে অন্তঃপুরের উপবনে নয়ত ছাতে বেরিয়েছেন। প্রতিদিনই সৌখীন প্রসাধনের তাঁর শেষ ছিল না। যেন কি এক প্রতীক্ষা উৎকণ্ঠায় তাঁর দিন মাস ঋতু কেটে যেত।

তাই বলে যে তিনি কুমারী বা অবিবাহিতা ছিলেন তা নয়। স্বামী শ্যামনাথ শেঠ ছিলেন প্রচুর সম্পত্তিশালী ও প্রতিষ্ঠাবান—এক শেঠের একমাত্র বংশধর। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠীজন অনুচিত কুদর্শন খর্ব শীণ ক্ষীণ দেহ আর অতিশয় নিরীহ অপ্রতিভ ব্যক্তিত্বে নিতান্ত সাধারণেরও মনে হত যেন তিনি একজন পরিপূর্ণ মানুষ নন।

এক কথায়, স্ত্রী পুত্র কন্যা সত্ত্বেও তাঁকে ক্লীব বা অনতিপরিণত আধখানা মানুষ মনে হত।

২

জলসাটি ছিল তৃতীয়া রানীর মহলে। নাই বা হল মহারানীর প্রাসাদে। দেখতে তো সকলকেই পাবেন ; মহারানীও সৌজন্য রেখে আসবেন।

আনন্দিত শেঠানীজী সিন্দুকে আবদ্ধ পুরুষানুক্রমিক সঞ্চিত পূর্ব শ্বশ্রূমাতাদের আহরিত ভারী ভারী হীরা-মুক্তা-সোনা-জড়োয়ার নানা দেশের গহনা ছড়িয়ে নিয়ে বসলেন। মাথার মুকুট, সিঁথি, বোরলা, ঝাপটা,—কানের ঝুমকো, দুল, ফুল, জড়োয়া কান, মুক্তার পিপল পাতা,—গলার সাতনরী, পাঁচনরী, কণ্ঠশ্রী, সরস্বতী হার, হাঁসুলী, সোনার হার, মোতির মালা—বাহুর তাবিজ, জসম, বাজু, বাঁক,—হাতের নগা

আকারের কঙ্কন চুড়, পৌঁছি, মান্‌তাসা,—কটির নানা গড়নের মেখলা,—পায়ের চরণপদ্ম, পাঁয়জোর, মল মুরাঠা—সব রূপার থালায় করে সাজিয়ে ছড়িয়ে শেঠানীজী দেখতে লাগলেন।

চকচকে রূপার থালায় মুখের প্রতিবিম্ব পড়ল। শেঠানীজী সেটা হাতে তুলে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে তার দিকে চাইলেন।

সুন্দরী তিনি। নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে তিনি ভাবেন।

কিন্তু রাজপ্রাসাদের সকলের চেয়ে তো সুন্দরী তিনি নন! সেখানে সংগ্রহ করে আনা, চেয়ে আনা, ইচ্ছা করে আসা, ইচ্ছা করেই রাজ-অন্তঃপুরের জন্য দেওয়া মেয়েদের পাশে তিনি কি সুন্দরী বলে গণ্য হবেন! কারুর নজরে কি পড়বেন? রাজা কি দেখতে পাবেন? কয়েক বছর আগেও তিনি আরো ভালো ছিলেন দেখতে।

চোখের পাশে ও কি? রেখা পড়েছে? মাথার চুলও আগের চেয়ে পাতলা হয়ে গেছে কি? মুখের দিকে আবার দেখেন ভালো করে। নাঃ, তেমন কিছু মনে হয় না,—ভালোই দেখতে আছেন।

মন কিন্তু তবু বিমনা হয়ে যায়। আরো কয়েক বছর আগে এই নিমন্ত্রণ কেন এলো না? দীপ্ত কালো চোখ, মসৃণ ত্বক, ঘন নিবিড় কুন্তলা তখনকার তরুণী শেঠানীজীর কাছে।

দেরি হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে পড়ে যায়—, আরসি নয়, থালা ওটা। থালাখানি নামিয়ে রাখেন। আবার খানিক পরে তুলে নিয়ে দেখতে ইচ্ছা হয়। জানলা দিয়ে এসে পড়া দীপ্ত রৌদ্রে মুখ জ্বলজ্বল করে ওঠে এবার। মনে হয়—না, দেরি হয়নি। সেদিনের তন্বী তরুণী শেঠানী নেই বটে, আজকের শেঠানীজীর মুখের দীপ্তিও কম নেই।

সঙ্কুচিত অপ্রতিভ হাসি মুখে নিয়ে শেঠজী এসে দাঁড়ালেন। রূপবতী ও বুদ্ধিমতী স্ত্রীর বুদ্ধির উপর তাঁর ভরসা আর শ্রদ্ধার সীমা ছিল না।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'গহনা দেখছ? আরো কিছু এখনকার জিনিস আনাব কি?'

শেঠানীজী হাতের থালার আরশি স্বামীকে দেখে নামিয়ে রাখলেন ; বললেন, 'গহনা? দেখলাম। না, এই থেকেই বেছে পরব। তবে যদি এমন হত কোনো গহনা, যা রানীদের চোখেও সহজে পড়ে না!'

স্বামী বসলেন। কিশোর ছেলে আর তরুণী মেয়েও এসে দাঁড়িয়েছিল, বসল।

স্বামী বললেন, 'আমি সিন্দুকের সব গহনা দেখিনি। তবে দু'একটি গহনা নাকি আছে তেমন। আমার মা আমার বাবার কাছে শুনেছিলেন এক মুক্তার মালার কথা, আর তেমনি হাতের নীলার পৌঁছির কথা। আমার পিতামহী তাঁর বাপের কাছে যৌতুক পেয়েছিলেন। তিনি কাথিয়াওয়াড়ের এক বড় শেঠ ছিলেন। সেরকম গহনা নাকি এদিকে আর কোন শেঠের ঘরে নেই। খুঁজে দেখ না সেটা। সেইটে পরে দাদাজী কবে এক সময়ে রাজপ্রাসাদেও গেছেন।'

ছেলেমেয়েরা বললে, 'তবে তো সেও পুরোনো দেখা জিনিসই।'

শেঠজী আর শেঠানী একটার পর একটা মখমলের, হাতির দাঁতের, মীনার কাজ করা, সাদা পাথরের, ছোটবড় গহনা রাখা বাক্সগুলি খুঁজছিলেন। পুরোনো শুনে

শেঠানীজী একটু হাসলেন, তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, পুরোনো আর দেখা জিনিস বটে, কিন্তু যারা দেখেছিল তারা তো আর নেই, এখন আবার নতুন লোকে দেখবে।'

'এই যে, এইটে কি?'

একটি শ্বেতপাথরের বাক্স থেকে একটি চমৎকার মুক্তার মালা বেরিয়ে এলো। স্বামী মুগ্ধ চোখে হাতে নিলেন, দেখে বললেন, 'এই বোধহয়। আমাদের কাছে তো অনেক রকম আসে কিন্তু এরকম জিনিস আমিও দেখিনি।'

ছেলেমেয়েও দেখল।

শেঠানী গলার সেই মালা, চিক, কণ্ঠশ্রী, হাতের দিকে নীলার পৌঁছি, নির্মল উজ্জ্বল মুক্তার কঙ্কন, মাথায় জড়োয়া সিঁথি, আরো কয়েকটি হাতের পায়ের ও কটির কি কি বেছে বেছে দেখতে লাগলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে জলসা বসবে। মনে তাঁর উদ্বেগের সীমা নেই। না জানি সে কি রকম উৎসব! না জানি কত অপূর্ব রূপবতী সুন্দরীর সমাগম হবে সেখানে! রানীরাই বা কেমন সুন্দরী হবেন? দেখা যাবে কি সকলকে? শোনা যায়—ওখানে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে রাখাই নিয়ম। শুধু মহারানীরই মুখ দেখতে পাওয়া যায়।

তাঁকেও কি অতখানি ঘোমটা দিতে হবে?

তা হলে কিছুই দেখতে পাবে না। কিন্তু সখীরা 'পাত্রীরা' তো ঘোমটা দেয় না। উন্মনা উৎসুক শেঠানীজী প্রাসাদবাসিনীদের রূপ, তাদের জীবন, তাদের ঐশ্বর্যসুখ, তাদের বিলাস সাজ-সজ্জার কথা ভাবতে থাকেন।

৩

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে লাল কাপড়ের ঘেরাটোপ পরা রঞ্জিত তুঙ্গ-শৃঙ্গ, শুভ্র বলীবর্দবাহিত রাজ-রথ এলো আমন্ত্রিতার জন্য। শেঠানীজীর উৎসুক উৎসব-সজ্জা সন্ধ্যা থেকেই শুরু হয়েছিল। তিনি সঙ্গিনী ও পরিচারিণীদের সঙ্গে রাজ-রথে উঠলেন।

কানাত-ঘেরা অন্তঃপুর তোরণের সামনে রথ থামল। দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করে তিনি খোজা ও অন্যান্য অভ্যাগতদের সঙ্গে প্রাসাদের অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ, তারপর দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ ও মহলের পর মহল অতিক্রম করে গন্তব্য প্রাসাদে পৌছলেন। তাঁদের নির্দিষ্ট পদানুসারে বসবার জায়গায় খোজা আর দাসীরা বসিয়ে দিল।

নিঃস্তব্ধ সভা। মাঝে মাঝে মহারানী রাজা ছাড়া আর কেউ কোনো কথাই কইছে না। রানীদের সখীরা দলে দলে এক একদিকে বসে আছে। কোন দলের নীল ওড়না, কোন দলের গোলাপী, কারো বা বেগুনী, অথবা ফিকে সবুজ ওড়না। এক এক রানীর সখীর দলের এক এক বিশেষ রং এক এক উৎসবের দিনে।

ঘোমটার আড়াল থেকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে দিয়ে শেঠানী গল্পের স্বপ্নের মত সব দেখতে লাগলেন।

তারপর নজর ও পরিচয় আরম্ভ হল। পদ অনুসারে প্রধান খোজার সঙ্গে এক একজন এগিয়ে যায়। তিনবার নিচু হয়ে কুর্নিশ করে, রাজার সামনে গিয়ে নজর ভেট করে পিছিয়ে ফিরে যায় নিজের আসনে।

শেঠানীজীর আহ্বান এলো। খোজার নির্দেশ অনুসারে শেঠানীজীও নজর করলেন। রাজা তাঁর হাতে মুদ্রা তুলে নিলেন এবং খোজার মুখে পরিচয় শুনলেন।

সূক্ষ্ম নীল গুণ্ঠনের আড়াল থেকে তাঁর গলার মুক্তার মালা, মাথার সিঁথি, কানের ঝুমকো ঝলমল করে উঠলো। হাতের নীলার পৈঁছে ঝাড়ের আলোতে ঝিকমিক করতে লাগল। দুর্লভ ও বহুমূল্য স্বল্পাভরণে ভূষিত নবাগতার কুর্নিশ-অবনমিত দেহশ্রী রাজার চোখে পড়ল। রাজার পাশে মহারানীও ভ্রুকুঞ্চিত করে তাঁকে দেখলেন ও নজর গ্রহণ করলেন।

৪

না, শেঠানীজীর ভুল হয়নি। দেরি হয়নি। তরুণী নারীর সরল ব্রীড়া-স্নিগ্ধ রূপ আর তাঁর নেই বটে, কিন্তু পরিণত-যৌবনা নারীর ইচ্ছাকৃত লজ্জানত অর্ধাবগুণ্ঠিত মুখে, সুরমা-আঁকা নত চোখে, সুন্দর করে ঈষৎ হাসিতে লাস্যলীলার অভাব নেই।

জলসা উৎসব আর তাঁর বাদ পড়ে না। ক্রমশঃ মহারানীর জলসার উৎসবেও শেঠানীজীর আহ্বান আসে। না হলে চলে না আর। মহলে মহলে বহির্জগতের নানাবিধ খবর এনে দেন, যা সহজে অন্তঃপুরে পৌঁছায় না। অতিশয় মধুর নম্রভাবে সকলের সমান মনোরঞ্জন করেন। রানীদের জন্য ফুলের মালা গেঁথে বা গাঁথিয়ে নিয়ে আসেন, ফুলের তোড়া বাঁধিয়ে আনেন। গহনার নতুন গড়ন এনে দেখান, গড়িয়ে আনান। পাশাখেলায় তাসখেলায় সুবিবেচিতভাবে হেরে যান। কেউ অসুস্থ হলে পরম মাধুর্য-ভরা মুখে তার কাছে এসে বসে থাকেন। সখীদের জন্য, কন্যাদের (পাত্রীদের) জন্য নানাবিধ আচার, ঝালমশলা দেওয়া পকৌড়ি বড়া নিয়ে আসেন বাড়ি থেকে রথে করে।

আর ওড়না কাঁচুলি ঘাগরার রঙে, অবগুণ্ঠনের ছায়ায় কাজল আঁকা নত নেত্রে, মধুর হাসিতে তাঁর মুখ নিত্যই নূতনতর শ্রীতে মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

রাজাও মাঝে মাঝে শহরের খবর কাহিনীর কথা শেঠানীজীকে জিজ্ঞাসা করতে বলেন—বড় ঘরের, দরিদ্র ঘরের পারিবারিক কথা। তাদের সুখ দুঃখ স্বচ্ছন্দ সুন্দর মধুর জীবনের সে কথা; কতরকম গোপন দুর্বলতা কলঙ্কেরও কথা। শেঠানী তাঁর সুন্দর স্বল্প আভরণ, নিত্য নব নব রঙের সুন্দর আবরণ, বিনম্র মধুর হাসি, অকারণ করুণ ভঙ্গীতে মিশিয়ে যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় অস্তিত্ব দিয়ে গল্প করেন, সত্যকে রচনা করে, মিথ্যাকে কল্পনা করে ঘটনাকে রঞ্জিত করে তুলে। সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম ঘোমটার আড়ালে তাঁর কানের ভূষণ দুলে ওঠে। মেহেদীর ফুল কাজ আঁকা কর-পল্লব লীলায়িত হয়ে ওঠে। কখনো বা মাথার গুণ্ঠন অকারণেই টেনে দেন, কিন্তু নামে না, শুধু জরির পাড়টুকু নড়েচড়ে ওঠে। আর কখনো মহারানী, কখনো অন্য রানীদের মধ্যস্থতায় রাজাও গল্প শোনেন।

অসংখ্য নারীবেষ্টিত পরিবারসুখহীন রাজা-রানীদেরও যেন সেই গল্পে কিসের মোহময় নেশা হয়। রানীদের লাস্যছলাময়ী শেঠানীর ওপর ঈর্ষা হয়, বিতৃষ্ণার শেষ থাকে না। তবু বিপুল কৌতূহলভরে সেইসব নগর-জীবন কথা শোনেন। যা কোনোদিন

অন্তঃপুরে এসে পৌঁছতে পারে না।

ক্রমে শেঠানীজী রাজারই সখীর মত হয়ে ওঠেন। এবং দীর্ঘ অবগুণ্ঠন আর রানীদের মধ্যস্থতা অবান্তর হয়ে উঠলো সেদিন। রাজার প্রিয়তমাত্বের গৌরব বা গর্ব রানীদের নেই। তবু তাঁরা বিরক্ত হয়ে উঠলেন শেঠানীর উপর। এবং অবশ্য সকলেই বিরক্ত হলেন তৃতীয়া মহিষীর ওপর। সেই তো নিমন্ত্রণ করে এনেছে।

তৃতীয়া রাণীও তিক্ত-বিরক্ত হয়ে ওঠেন! কে জানত ওই নারী এমন! ওর স্বামী আছে, সেই বা কেমন? খোজার দ্বারা শেঠজীর কাছে ইঙ্গিত করে পাঠান। ক্লীবের মত শেঠ নির্বোধের মতই শুধু হাসে; গায়ে মাখে না। তার স্ত্রী রাজার মনোহারিণী—এ কি তার কম গৌরব!

সখীরাও অসুখী হয়ে ওঠে। তাদের আর রাজার মাঝখানে শেঠানী যেন একটা যবনিকা। রাজা কবে তাদের দিকে চাইবেন? তাদের জীবনে আর কি আশা?

৫

অকস্মাৎ তৃতীয়া রানীর প্রাসাদে একদিন এক বালিকা পাত্রী বললে, 'আপনার চুল বেঁধে দোব শেঠানীজী?' তারপর খেলাচ্ছলে মাথার ওড়না সরিয়ে দেয়। সোনার সিঁথি নামিয়ে রাখে। কানের গহনা আলগা করে দেয় চুল থেকে। জরি জড়ানো বেণীর জরি খোলে।

সোনার সিঁথি সরানো খালি জায়গায় কপালের পাশে কয়েক গাছি সরু সরু রুপালি চুল কালো চুলের মাঝে চিক্‌চিক্ করে ওঠে।

সরল হাস্যে উচ্চকণ্ঠে বালিকা বলে, 'ও শেঠানীজী, আপনার যে মাথায় পাকাচুল হয়েছে!'

শেঠানীজী ত্রস্তে অবগুণ্ঠন মাথায় তুলে দেন। তারপর অপ্রস্তুতভাবে নিজেই সিঁথি পরে নেন, কানের গহনা পরেন। আধ-বাঁধা বেণীতে জরি জড়িয়ে নেন।

সমুখের রৌদ্রোজ্জ্বল মুকুরে তাঁর অপ্রতিভ ত্রস্ত মুখের ছায়া পড়ে। চোখের পাশের সরু সরু রেখা স্পষ্টভাবে দেখতে পান।

ওদিকে রূপার খাটে বিশ্রামনিরতা অদূরবর্তিনী তৃতীয়া রানীর অধরে একটু সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়। আস্তে আস্তে প্রাসাদ-সমুদ্রে কথার তরঙ্গ ওঠে আর ভেঙ্গে পড়ে। ছোট ছোট কথা হাসির বুদ্‌বুদ্ ওঠে মহলে মহলে।

তারপর রাজার কাছে একদিন লজ্জিত আহত শেঠানীজীর দু ফোঁটা চোখের জল পড়ল। আর সে চোখের জল বৃথা পড়ল না। তুচ্ছ কারণে তৃতীয়া মহিষীর পানখাবার জায়গীর বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল রাজ সরকারে। এবং অপমানিতা রাজকন্যা ও রাজমহিষী নিঃশব্দে স্বামীর দেওয়া অন্য অন্য জায়গীরের আয়ও ছেড়ে দিলেন।

অভিমানিনী তেজস্বিনী রানী অবশেষে পীড়িত হয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন। মহারানী ও অন্যান্য সপত্নীরাও দেখতে এলেন। রাজার কানেও খবর পৌঁছল।

রাজা সমারোহে চিকিৎসা-পথ্যের ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রথামাফিক জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন খোজা পাঠিয়ে কিছু 'ফরমাশ' আছে কি না?

দৃপ্তা রাজবংশের দুহিতা খোজাকে বললেন, 'হুজুর সাহেবের অনেক মেহেরবানি। কিছুই দরকার নেই আমার। শুধু তাঁকে বলো তিনি 'বাঁদীদের বান্দা' হয়ে থাকুন।'

কিছুদিন পরে যথারীতি সমারোহে রানীর মৃত্যু হল। এবং তারও চেয়ে সমারোহে শোকযাত্রা ও শ্রাদ্ধ হয়ে গেল।

রাজার স্ত্রীর বা স্ত্রীলোকের কোনো অভাব নেই। কাজেই বিয়োগ বিরহের কথা ওঠেই না।

কিন্তু বাঁদীর বান্দা হওয়ার তিক্ত শ্লেষ তাঁর মনে ছিল। আর শেঠানীর চুল বাঁধার কাহিনীও তাঁর কানে পৌঁছেছিল।

এবারে রাজা মাঝে মাঝে চেয়ে দেখেন শেঠানীর পানে। বহু-নারী-বিলাসীর মোহ যেন কেটে এসেছিল।

সহসা একদিন জিজ্ঞাসা করলেন শেঠানীজীকে, 'তোমার কি ছেলে-মেয়ে আছে না? কত বড় তারা? মেয়েকে দেখতে কেমন? একদিন তাকে এনো।'

শেঠানী চকিত হয়ে উঠলেন। নিমেষের মধ্যে চটুল লঘু প্রকৃতি নারীত্বের আড়াল থেকে যেন কোন চিরকালের জননী জেগে উঠল। মেয়েকে এই জায়গায়?

একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'মেয়ে আমার ছোট। আর তার বিয়ে হয়ে গেছে।'

'ছোট! কত ছোট? কত বয়স?' ক্রূরভাবে কৌতূহলী রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

জননী শেঠানী নতমুখে বললেন, 'তা পনের-ষোল বছর হবে।'

'ও! তাহলে চন্দাবৎজীর পাত্রীরা তোমাকে ঠিকই বলেছিল বুড়ো হওয়ার কথা।' ওঁরই কথাতে চন্দাবৎজীর জায়গীর বাজেয়াপ্ত হয়, মনোমালিন্য হয়। তাই নিয়ে 'ভাঙ্গী' ঝাড়ুদারেরা চিরকালের প্রথামত গান বেঁধে গেয়ে বেড়ায়, শহর রটিয়ে।

কিন্তু বাজেয়াপ্ত জায়গীর তো ফিরিয়ে দেওয়া গেল না তাই বলে। দিলে তিনি নিতেনও না।

আরক্ত লজ্জিতমুখে শেঠানীজী অপমান গলাধঃকরণ করলেন।

রাজা বললেন, 'তোমার মেয়েকে আনতে রথ যাবে।'

সুসজ্জিত রথ গেলো কয়েকদিন পরে শেঠানীজীর বাড়ি এবং শুধু জননীকে নিয়েই ফিরে এলো।

খোজা গিয়ে জানালো রাজাকে। শেঠানীও করজোড়ে নিবেদন করলেন, কন্যাকে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে বিকানীরে নিয়ে গেছে। আজ আর তাঁর মুখে লঘু লাস্যলীলাময় মধুর হাসি নেই; অভ্যস্ত সুসজ্জিত বসনভূষণের শোভা ও অবগুণ্ঠনের আড়ালে যেন ভীত বিবর্ণমুখ এক জননীমূর্তির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। রাজা সখীদের নৃত্যগীতে নিমগ্নচিত্ত ছিলেন,—তাঁর দিকে চাইলেন না।

শুধু বাড়ি ফেরবার সময় খোজার মুখে হুকুম পেলেন শেঠানীজী, প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁকে আসতে হবে। জলসার উৎসবে আমন্ত্রণ নয়। প্রতিদিনের উপস্থিতি ও অপেক্ষা, তারপর আদেশ হলে ফিরতে পাবেন।

সখীদের মহলের একটা ঘরে দিনের পর দিন হাজিরা দিতে বসে থাকেন শেঠানী। রাজদর্শন কোনোদিন মেলে, কোনোদিন না। আর লাস্যসঙ্গিনীও নয়, প্রোষিত-ভর্তৃকাও নয়, বহু-বিলাসীর পরিত্যক্ত বিলাস-ক্রীড়নক যেন। হাসির দীপ্তিহীন মুখে, ম্লান অধরের পাশে, চোখের কোণে বলীরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চোখে কাজল আর সূক্ষ্ম হয়ে আঁকা

হয় না, নিত্য নূতন বসনভূষণের শোভা আর ফোটে না; করপল্লবে, চরণে মেহ্‌দীর নূতন নূতন ফুলকারী কাজ আর আঁকা থাকে না।

সখীরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। কি যেন জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও জিজ্ঞাসা করতে সাহস করে না, কয়েকদিন আগেও তিনি সম্মানিতা অতিথি ছিলেন। তাদের মনে হয় যেন কতদিন ধরে পীড়িত হয়েছেন তিনি।

অকস্মাৎ কার নিষ্ঠুর ইঙ্গিতে তাঁর ভান-করা যৌবনের দীপ্তি হেমন্তের আকস্মিক সন্ধ্যার মত ম্লান হয়ে গেছে যেন।

নিজেদের মধ্যে অন্তঃপুরবাসিনীরা প্রাসাদবাসিনীরা বলাবলি করে, শেঠানীজী পীড়িত।

রাজাদেশে একদিন খোজা আসে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করতে।

শেঠানী মিনতি করে বললেন, 'তাঁকে বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম করার হুকুম হোক, রাজার কাছে আবেদন জানাতে। তিনি অসুস্থতা বোধ করছেন।'

খোজা চলে যায়। তারপর ফিরে আসে হাতে রূপার থালার ওপরে একটি মদিরা পাত্র নিয়ে। বলে, 'এই ঔষধ আপনার জন্য মহারাজা পাঠালেন। আর বললেন আপনার ইলাজ (চিকিৎসা) ও বিশ্রাম এখন থেকে এখানেই হবে। সেরে উঠে বাড়ি ফিরবেন।'

শেঠানী অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন; জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে?' তারপর বললেন, 'কি ওষুধ?'

খোজা একটু চুপ করে থেকে তারপর বললে, 'তা তো জানি না।'

সখীদের মহলে একটা মহল শেঠানীজীর আরোগ্যশালা হল। প্রতিদিন সকালে রাজবৈদ্য আসেন, যবনিকার অন্তরাল থেকে নাড়ি দেখে যান। ঔষধের বিধান দিয়ে যান। আর সন্ধ্যায় আসে খোজার হাতে রূপার থালার উপরে এক গ্লাস ওষুধ। ঔষধ পান করা হলে দাসীরা পাত্র ধুয়ে নিয়ে আসে, তারপর খোজা ফিরে যায়।

দিনের পর দিন গেল। মাসও গেল। ম্লান আচ্ছন্নভাবে শেঠানীজী শুয়ে থাকেন। চলে যাবার কথা জিজ্ঞাসা করতে চান, সাহস হয় না। এখন আর পুরাতন ভরসা নেই। অবশেষে একদিন খোজাকে বললেন, 'আমি কবে যেতে পাব? এ ওষুধ কতদিন খেতে হবে? শরীর এতে যেন আরো খারাপ লাগছে। আর খাব না।'

খোজা নীরবে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, 'ওষুধ তো আপনাকে খেতেই হবে—মহারাজের হুকুম।' তারপর বলে ফেলে, 'চন্দাবৎজীও তো খেয়েছেন।'

শেঠানীজীর কোটরাবিষ্ট চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। রানী চন্দাবৎজীও খেয়েছিলেন?—ভাল তো হননি? চকিতে মনে পড়ে যায়—রাজ-অন্তঃপুরের নানাবিধ কাহিনী, নানা জনশ্রুতি...।

ভীত অস্ফুটস্বরে কি বলতে যান; ততক্ষণে খোজা অতর্কিত বলা কথা সামলে নিয়ে ইঙ্গিতে দাসীদের সামনে কথা কইতে নিষেধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অদ্ভুত ভাবনায়, ভয়ে, আচ্ছন্নভাবে শেঠানীজীর রাত্রি কেটে যায়। প্রভাত হয়, যথারীতি রাজবৈদ্য আসেন। দাসী, সখীরা কুশলপ্রশ্ন করে চলে যায়। উৎসুকমুখে উৎকণ্ঠিত শেঠানী কেবলি ভাবেন, কাকে তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, এ কি ঔষধ? কার

মুখে তিনি রাজার কাছে বাড়ি ফিরে যাবার আবেদন জানাবেন? কে তাঁর এমন আছে এখানে? সৌভাগ্যের দিনে তিনি তো কারও প্রিয় ছিলেন না।

দাসীরা আহার্য আনে, পথ্য আনে নানাবিধ পাত্রে প্রকাণ্ড থালায় সাজিয়ে, একটুও মুখে দিতে পারেন না।

নিঃশব্দ প্রাঙ্গণে নিঃস্তব্ধ রৌদ্রোজ্জ্বল দ্বিপ্রহর নেমে আসে। চুপ করে শুয়ে থেকে চোখ জলে ভেসে যায়। কুদর্শন নির্বোধ স্বামীর বিনীত নম্র সোহাগ, সমাদর, কিশোর-কুমার তনয়, তরুণী কন্যা, তাদের হাসি কথা আলাপে মুখরিত নিজের গৃহখানির কথা মনে পড়ে।

হয়ত আর কোনোদিন সেখানে ফিরে যাবেন না।

কখন মুদিত চোখের আড়ালে সন্ধ্যা নেমে এলো। প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে গেল দাসীরা।

আর খোজার হাতে রূপার থালায় করে নিয়মিত ঔষধও এলো।

ব্যাকুলভাবে শেঠানীজী উঠে বসলেন, চোখ জলে ভরে গেল। মিনতিভরা চোখে তিনি খোজার পানে চাইলেন, অস্ফুটস্বরে বললেন, 'এ ঔষধে তো ভাল হব না; আর খাব না।'

সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাঁর হাতে গ্লাসটা দিয়ে বললে, 'ভাল হবেন বৈকি। খেয়ে নিন। মহারাজার হুকুম।'

বিবর্ণ মুখে শেঠানীজী ওষুধ হাতে নিয়ে মুখে তুললেন। খোজা ফিরে গেল শূন্য পাত্র নিয়ে।

বাল্যকাল থেকে পরম আকাঙ্ক্ষিত প্রাসাদের অন্তঃপুরের কক্ষে হাতির দাঁতের কাজ করা চমৎকার পালঙ্কে সুন্দর শয্যায় দাসী-সখীদের দ্বারা সেবিতা শেঠানীজী আবার শুয়ে পড়েন। ভয় আছে অথবা নেই, ভালো হবেন কিনা, সব অনুভূতিই যেন অসাড় হয়ে গেছে। ভয়ে, ভাবনায় ও ঔষধের গুণে আচ্ছন্ন অভিভূত শেঠানীজীর মনের চোখের সামনে ভেসে আসে—তার পরদিন, তারও পরদিন,—রূপার থালায় ঔষধের গ্লাস রাখা আবর্তিত মালার মত শুধু এ একটি প্রতিদিন...। এর শেষ কবে? আচ্ছন্নতা ও বিস্মৃতির মাঝে শেঠানীজী আর ভাবতে পারেন না।

পরাগ, ১৩৫৪

সেপাই পিসিমা

চল্লিশ বছর আগের সেকাল। রাজস্থানের একটি শহর। সকালবেলা। একটি বাড়ির বাইরের আঙিনায় একটি পাথরের চৌকির ওপর বসে গৃহস্বামী সেকালের মতই 'বারদুয়ারে' বসেই দাঁতন করছেন, একপাশে নাপিত বসে আছে কামানোর সরঞ্জাম নিয়ে। দু-একজন ভৃত্য মুখ ধোবার জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সেকালের মতই আবেদন-নিবেদনের পসরা নিয়ে, ব্যক্তিগত প্রয়োজন নিয়ে দু-চারজন দাঁড়িয়ে আছে। কারো নিজের চাকরি, কারো পদোন্নতি, কারুর বা কোনো বিশেষ বক্তব্য আছে।

সহসা একটি নারী এসে নত হয়ে সেলাম করে দাঁড়াল। কালো রং, মুখে বসন্তের দাগ, সোজা শক্ত, লম্বা চোস্ত চেহারা, দেখলে মনে হয় যেন নারী নয়, একজন সেপাই। মাথায় পাগড়ি নেই, এবং ঘাগরা 'লুগড়ী' (ওড়না) পরা তাই মেয়ে বলে স্বীকার করে নিতে হয়। হাতে, গলায়, কানে, নাকে, মাথায় কোন গহনা নেই। শুধু পায়ে রূপার মোটা কড়া (মল) আছে (পুরুষের মতই)। মাথায় চুলগুলিও সৈন্যদের মত ছোট্ট করে ছাঁটা।

সঙ্গে একটি সুন্দর সুশ্রী দশ-বারো বছরের বালক। মস্ত পাগড়ি মাথায় আর প্রায় নিজের মতই দীর্ঘ প্রকাণ্ড একটি খাপেভরা তরোয়াল হাতে নিয়ে বিনীতভাবে দাঁড়াল।

গৃহস্বামী জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন। নারী আবার দীর্ঘ অভিবাদন করে দাঁড়াল এদিক-ওদিক চেয়ে। যেন এতলোকের সামনে সে নিজের বক্তব্য বলতে সঙ্কোচ বোধ করছে।

গৃহস্বামীর ইঙ্গিতে বাইরের যাচকরা সরে গেল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাই তোমার?'

সে ছেলেটির হাত ধরে এগিয়ে এলো, তারপর ছেলেটির মাথার পাগড়িটি মাথা থেকে নামিয়ে আর তরোয়ালখানির সঙ্গে গৃহকর্তার সামনে রেখে বললে, 'আমি এদের নিয়ে আজ আপনার শরণ নিলাম। এ আমার ভাইপো। আমার ভাজ ও তার আর দুটি ছেলেমেয়ে আপনার বাড়ির পিছনদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার ভাইয়ের তিন বছর হল মৃত্যু হয়েছে। ভাজের বয়স খুব কম। আমাদের আর কোনো নিকট আপনার লোক নেই। ভাই গ্রামের জমিদার ছিল। প্রায় তিনশো বিঘা ফসলের জমি ক্ষেত ও আটটা কুয়ো, কিছু প্রজা আমাদের আছে। কিন্তু এখন ভাইয়ের অবর্তমানে আমাদের জ্ঞাতিরা প্রজাদের দল বেঁধে আমাদের পিছনে লেগেছে। ফাঁকি দিয়ে নাবালক ভাইপোদের আশেপাশের জমি থেকে বঞ্চিত করার মতলবে আছে। আর...।'

তার সেপাইয়ের মত কঠিন চোখে জল এলো, একটু থেমে সামলে নিয়ে বললে, 'আর তাছাড়াও—ভাজের বয়স কম, তার পেছনে দুষ্টু লোক লাগিয়েছে আমার বাপের বংশের মান-ইজ্জত নষ্ট করার মতলবে। আমাদের গাঁ-দেশে তো মাটির ঘরে খড়ের চাল, দরজা বেড়াও শক্ত নয়—কোনদিন আগুন লাগিয়ে দেবে কিম্বা অন্য কিছু গোলমাল করবে।

'আমি কোন উপায় না পেয়ে আপনি বাঙালী সজ্জন আপনার কাছে এলাম। আপনাদের ঘরে আমি ভাজকে দাসী রেখে গেলেও জানব মান-ইজ্জত বজায় থাকবে। আমাদের ঠাকুর (জমিদার) লোকদের ঘরে আমি সে-ভরসা পাই না। আমি রাজপুতের পাগড়ি তরোয়াল রেখে তার ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে আপনার শরণ নিলাম। আমার দেশের বড়লোকদের ওপর আমার ভরসা নেই। শত্রুরা আমার বিপক্ষে বলে টাকা দিয়ে তাদের হাত করবে। ওদের এখানে রেখে দিয়ে আমি মামলার ব্যবস্থা করব আপনার পরামর্শ অনুসারে।' শান্তভাবে চোখ মুছে সে গৃহকর্তার দিকে চেয়ে রইল, কি তিনি বলেন।

সে আবার বললে, 'ওকে দাসী করে রাখুন। সব কাজই করবে, আটা পিষবে, আপনার ঘরে ছোট ছেলেমেয়েদের দেখবে, ঝাঁট মোছা ধোয়াও করতে পারবে—শুধু উচ্ছিষ্ট বাসন ধোবে না। কারুর সামনে বেরুবে না, বাইরে বেরুবে না। আর পুরুষ চাকরদের সঙ্গে কথা কইবে না। একটি পৃথক ঘর ওদের থাকবার জন্যে দেবেন, আর রাত্রিদিন ঘরের লোকের মতই সব কাজ করিয়ে নেবেন। যদিও পরের বাড়ির চাকরি আমাদের বংশের কেউ করেনি...।'

সে আবার চোখ নিচু করে নিলে। তারপরে বললে, 'তাদের এনে আপনাকে 'বন্দেগী' করিয়ে যাই?'

গৃহস্বামী বললেন, 'আনো।'

বাড়ির পিছনদিক থেকে সে তার ভাজ ও অন্য দুটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে এলো। দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আবৃত পরিষ্কার ঘোর রঙের ঘাগরা ও ওড়না পরিধানে ও হাতে পায়ে পৈঁছা কঙ্কন, তাবিজবাজু, রূপার ও সোনার পদক দেওয়া হার গলায়, কোমরে রূপার মেখলা—পায়ে তিনচার গাছা করে মোটা মলজাতীয় গহনা পরা একটি তন্বী নারী একটি বছর তিনের মেয়ে কোলে আর একটি বালকের হাত ধরে এসে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। হাতে পায়ে সধবার চিহ্ন মেহেদী পরা নেই।

গৃহস্বামী বললেন, 'আচ্ছা থাকবে আমার বাড়ির মেয়েদের দিকেই। কিন্তু মাহিনা কি নেবে যদি কাজ করতে দাও।'

ননদ অপ্রতিভ, বিব্রত মুখে বললে, 'যখন আপনার শরণাগত, দাসত্ব স্বীকার করেছি, তখন আপনি যা বিবেচনা করবেন, হুকুম করবেন, তাই আমায় তামিল করতে হবে, যতদিন আমার ভাইয়ের বিষয়-সম্পত্তি উদ্ধার না-হয়। চাকরি তো আমরা কখনো করিনি বাবুজী। আমাদেরই তো কত লোকজন ছিল। কিন্তু আমাদের ইজ্জত-মানের দায়ে আমরা আপনার তাঁবেদার খিদ্‌মৎগার হয়ে থাকব চিরদিন।'

গৃহস্বামী তাদের এক ভৃত্য দিয়ে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেন। আর নিজের পিছনের দিকের ঘরের জালির, জানলার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি কেউ এখানে আছ?'

জানলার কাছে স্ত্রী কন্যারা কেউ না কেউ মাঝে মাঝে সকালে বসে সেলাই বা পড়াশোনা করতেন।

কন্যা বললেন, 'আছি বাবা।'

পিতা বললেন, 'আচ্ছা এদের—ওই মেয়েটিকে ভিতরের দিকের আটা পেষার ঘরটার অন্য সব দিক—গরু, ঘোড়ার দানার দিক—খালি করিয়ে দাও। ও আজ থেকে এখানে রইল। আমি চা খেতে গিয়ে সব কথা বলছি।'

সেকালের চা খাওয়া, (টেবিল চেয়ার বয় বাবুর্চির যুগ তখনো চালু হয়নি) দালানে মাটিতে আসন পেতে বসে চায়ের ব্যাপার সমাধা হত। চা পাঁউরুটি, কিম্বা চায়ের সঙ্গে লুচি তরকারী নিমকি মিষ্টি যাই হোক।

কর্তা ভিতরে এলেন।

গৃহিণী একটি পিঁড়ি পেতে বসেছিলেন চায়ের দেশী আসরের সামনে। বিধবা কন্যা জলখাবার ও চায়ের কেতলী এনে রাখলেন। গৃহিণী চা পরিবেশন করলেন।

খেতে বসে কর্তা বললেন, 'মেয়েটি ভিতরে এসেছে?'

মেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, দানার কোঠ্যারে (ভাঁড়ার) বসতে বলেছি।'

গৃহস্বামী এবারে গৃহিণীর দিকে চেয়ে বললেন, 'একটি আশ্রিত তোমার হেফাজতে এলো! কাজকর্ম কিছু কিছু করবে বলেছে। বাসনটা মাজবে না, বাইরে বেরুবে না, বাজার পাঠানো চলবে না, এঁটো ছোঁবে না, ছাড়া কাপড়ও কাচবে না... অনেকটা 'দেবী-চৌধুরানী'র গোবরার মার মত মনে হচ্ছে।' কর্তা ঈষৎ হেসে স্ত্রী ও কন্যার দিকে চাইলেন।

তারপর কন্যাকে বললেন, 'তবে তোমার ছেলেমেয়েদের দেখবে, রান্নাঘরটাও ধোবে, আর বাড়ির সব আটা পিষবে। দেখো, যেন চাকররা কেউ ওর ঘরের দিকে না মাড়ায়। ওর ননদটি একেবারে সেপাই, কেউটে সাপও বলা যায়—ছোবলাবে তা হলে। তোমার ওপর ভার দিলাম ওর।' গৃহিণীকে বললেন, 'দেখেছো নাকি সেপাইটিকে?'

গৃহিণী বলেন, 'না, আমি ওদিকে ছিলাম, রমা বলছিল। তা চাকরি করতে এসে অত পর্দা করলে কি করে চলবে! চাকরবাকর তো সব জায়গায় ঘুরচে।'

কর্তা একটু হাসলেন, বললেন, 'চাকরি ঠিক নয়—গহনা দেখলে না? আর ঘোমটার বহর তো দেখলে, ও নিজেই নিজের পর্দা রাখবে।' কর্তার চা-পান হল, উঠে গেলেন।

গৃহিণী কন্যার দিকে চেয়ে বললেন, 'গয়না তো এদেশে অমনি করেই সবাই পরে। ঝি চাকরানী মেথরানী সকলেরই গা ভরা গহনা আছে! তা এত পর্দা নিয়ে কি আর চাকরি করা চলে! রকম দেখ! সব বাড়াবাড়ি।'

কন্যা বললেন, 'আবার সব কাজও করবে না!'

মোট কথা, একটি 'গোবরার মাকে' রাখা তো হল, আবার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে চাকরদের চোখ থেকে। এটা ভাল লাগছিল না ওঁদের। সেপাই ননদটিও আছে মিলিটারী মেজাজ নিয়ে।

রমা দানার ভাঁড়ারে এসে দেখলেন, মেয়েটি মুখ খুলেছে, সুন্দর দেখতে এবং তার সেপাই ঠাকুরঝির হাত ধরে তার চোখ থেকে জল পড়ছে। ঘরে একটি টিনের বাক্স, এক ঝুড়ি বাসন, একটা চট মোড়া বিছানা খুলে রাখা রয়েছে। ছেলেমেয়েগুলি তাতে বসে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তলোয়ারখানি একদিকে রেখেছে।

সেপাইয়েরও চোখ শুকনো নেই। সে বলছে, 'তুই ভাবিসনি, বাবুজীর বাড়িতে

তোর কোনো ভাবনা ভয় নেই। আর আমি তো আসা যাওয়া করবই। এখন যাই, দুশমনদের হাত থেকে আপনাদের জমি, ক্ষেত, কোঠি (কূয়া) বাঁচাই। এখন তো আর তোদের জন্য ভাবনা রইল না।'

সেপাইপিসি গৃহস্বামীর মেয়েকে দেখে হাত জোড় করলে। তারপর ভাইপো ভাইঝিদের একটু আদর করে বললে, 'কাঁদিসনি 'বিরা' (বাছা), আমি খুব শীগগীরই আসব।'

ভাজ আবার তার হাত ধরে বললে, 'খুব শীগগীরই এসো বাইজী (ঠাকুরঝি)।' ননদকে 'বাইজী' বলা হয় রাজস্থানে।

৩

ভাজের চাকরি শুরু হল। কি কি কাজ করতে হবে, কখন কখন করবে—তালিম চলল রমার সঙ্গে। কি কি করবে না—তাও সে বললে। চাকরদের দিয়ে কাজ শেখানো চলবে না, গৃহকর্তার আদেশ আছে। গৃহস্বামীর মেয়েই সব কাজ শেখাবেন ও করাবেন। কাজ করাতে গেলে একটি নাম বলে ডাকা চাই তো। কন্যা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি নাম তোমার?'

গলা অবধি ঘোমটা একটু কমিয়ে, কপাল অবধি তুলে সে রমার সঙ্গে ঘুরছিল।

'আমার নাম? আমার নামে কি হবে? আমাকে ধনজী—ধনপাল সিংয়ের মা বলে ডেকো।'

'কেন, তোমার নিজের নাম বল না?' কন্যা বললেন, 'ও যে বড্ড বড় নাম হল।'

সাধারণতঃ রাজপুতের মেয়ের নাম ধরে সবাই ডাকতে পারে না। বাপের বাড়িতে বলবে 'বাইজী' (কন্যা), শ্বশুরবাড়িতে বলবে 'ভাবী', 'ভৌজী,' 'বিন্দনী' (বউ), পরে বলবে সন্তানের নাম ধরে তার মা। নিজের নাম, সে তো খারাপ মেয়েদের থাকে! নাম ডাক তো তাদের নিজের নামে হয়। ভদ্রগৃহস্থ ঘরে আবার মেয়েমানুষের নাম ধরে ডাকে নাকি? এতখানি প্রথার খবর জানা ছিল না মেয়ের।

ধনজীর মা একটু চুপ করে থেকে বললে, 'আমার নাম কমলাবাঈ। কিন্তু আমার নাম ধরে ডাকলে তোমাদের সব চাকর দাসী আমার নাম জানতে পারবে। আর তারা নাম ধরে ডাকে যদি, সে বড় অপমান আমাদের বংশের। নাম ধরে ভদ্রলোকের মেয়েকে ডাকে না আমাদের।'

ঝিয়ের নাম আবার বাঈ! কন্যা শুনলেন নতুন কথা। ভাবলেন, তা তো ভালো, তা 'তুমি' 'তোমাদের' বলে কথা কও কেন? আপনি বলে কথা কওয়া উচিত তো! পিসি তো বেশ আদবকায়দামত কথা কইল দেখলাম।

'আচ্ছা। এসো ধনজীর মা, গম ওজন করে নিয়ে যাও। বাড়ির জন্য তিন সের গম দিন পিষবে, তিন সের যবও পিষবে চাকরদের রুটির ও কুকুরের রুটির জন্য। এই রান্নাঘরটা ধোবে, শোবার ঘরগুলো ঝাঁট দেবে, আর মুছবে ইত্যাদি।' ঘোমটা থেকে এক চোখ বার করে রাজপুতের মেয়েদের মতই সে এঘর ওঘর ঘুরে কাজ দেখতে লাগল। গায়ের গহনা ঝলমল করতে লাগল।

যেন রানী। যেন কেউ পরিদর্শিকা। যেন চাকরি করতে আসেনি, বাড়িতে বেড়াতে

এসেছে।

রমার মনে যেমন বিরক্তি জাগে, তেমনি কৌতুক বোধ হয় ওর ধরন রকমে। কিন্তু পিতার আদেশ, কাজ ওকে দেখাতে হবে।

ঘরের পরিষ্কারের কাজ শেষ হলে ধনজীর মা দৈনিক পেষবার জন্য গম আর যব নিজের ঘরে নিয়ে এলো। ঘরের মস্ত ভারী যাঁতা বা 'চাক্কি'র পাশে সে সব নামাল। তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমি কোথায় রুটি করব, কখন করব? আমার ছেলে-মেয়েরা কখন খাবে?'

রমা হেসে ফেলল, 'তুমি এইখানে রুটি করতে চাও, করো। না হয় রান্নাঘরের উনুন খালি হলে রুটি করে নিও। ওরা তখন খাবে। পাথর দিয়ে উনুন করে নাও।' আদেশ পালনে, দাসীবৃত্তিতে অনভ্যস্ত রাজপুতের মেয়ের মন যেন দাসীত্বের জীবন মানতে চায় না। হুকুম স্বীকার করতে রাজী নয়। কোঁচকানো ভ্রূর নীচে কালো চোখে আগুন না জল? ঝকঝক করে ওঠে। জল কি?

আহা! রমা কোমলভাবে বলে, 'আমি তোমায় তরকারী ডাল দিতে বলে যাচ্ছি। রুটি করো আগেই। আমাদের রান্নাঘরের তরকারী সবাই পায়, তুমিও নিও। রুটি করে নাও, নিয়ে তারপর ওদের খাওয়া হলে আটা পিষো। আমাদের তো রাত্রে রুটির দরকার।'

'কিন্তু এত গহনা পরে কাজ করবে কি করে, ভারী লাগবে না? ওগুলোর সব মিলিয়ে ওজন তো পাঁচ-সাত সের হবে।'

এবারে গহনার কথায় নারী কোমলভাবে বলে, 'বাইজি, অনেক গহনা গেছে— স্বামীর অসুখে, নানা বিপদে। এখন তো মাত্র এই কটাই আছে। কোথায় রাখব, চোরে নেবে, তাই ননদ বললে পরেই থাক। আজকে বাক্সতে তুলে রাখব।'

৪

কিন্তু ঝিকে দিয়ে কাজ করানো সোজা, ও যেন ঝি নয়, রানী। রানীর মত মেজাজওয়ালা কোনো ঘরের গৃহিণীকে দিয়ে কি কাজ করানো চলে!

তার পর্দা চাই—তার ছেলেমেয়ের নিয়মমত রক্ষণাবেক্ষণ চাই, খাদ্য চাই তাদের সুনিয়মে, তার বাড়ির কর্ত্রী ভাবের ধরনটা যায় না। কিছু আদেশ করলেই ভ্রূ কুঁচকে আদেশকারিণীর দিকে চায়। তারপর আবার নরম হয়ে যায়। দ্বিধাদ্বন্দ্বের শেষ নেই তার মনেও, বাড়ির লোকের মনেও। বেশ বিবেচনার বিষয় যেন। আর বিপদ আসে কোনো না কোনো পথে।

একদিন রাত্রে বাড়িতে জল্পনা হল বেশ রাত্রে সকলে ছেলেমেয়েরা মিলে কাছাকাছি এক আত্মীয়ের বাড়ি হেঁটে বেড়াতে যাওয়া হবে পিছনের গেট দিয়ে। কেননা সামনের দিকে গেটে বহু লোকজন, ঘোর পর্দার দেশ, সকলে দেখতে পাবে। হাঁটা চলার প্রথা তখন এখনকার মত চল ছিল না।

কন্যা এলেন, ধনজীর মার ঘরে। সে ছেলেমেয়েদের শুইয়ে কাঁথা সেলাই করছে তেলের কুপিটির পাশে বসে। আমাদের দেশের দেশী কাঁথা নয়—ওদের কাঁথা।

কন্যা বললেন, 'ধনজীর মা,—আমরা একটু বেড়াতে যাচ্ছি, আসতে রাত্রি এগারোটা

হবে, তুমি একটু আমার ছেলেমেয়েদের ঘরে বসবে? নাহলে কাঁদবে, জাগলে মুস্কিল হবে।'

ধনজীর মা আশ্চর্যভাবে মনিব-দুহিতার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে যাবে রাত্রে তার ঘর ছেড়ে! মনিবের মেয়ের আক্কেলটা কি। এই যেন ভাবটা।

উত্তরের অপেক্ষায় রমা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে বললেন, 'তাহলে এসো, আমি যাচ্ছি কাপড় বদলাতে।'

সে বললে, 'আর আমার ছেলেমেয়েরা একলা থাকবে এখানে?'

বিব্রত রমা বললেন, 'ওরা তো ঘুমিয়েছে, এক-আধবার না হয় দেখে যেও।'

সে বললে, 'তোমার ছেলেমেয়ে যদি একলা থাকতে না পারে, তাহলে আমার ছেলেমেয়েও পারবে না।'

একটি একটি করে সেকেণ্ড ও মিনিট তার হাতের কাঁথায় ছুঁচের ফোঁড় বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কেটে যেতে লাগল। রমা দাঁড়িয়ে নীরবে চেয়ে আছেন, সেও নিঃশব্দে সেলাই করে চলেছে। বেশ বোঝা গেল, সে উঠবে না। সেই মনিব কি বাড়ির লোকেরা মনিব তার ব্যবহারে বোঝা গেল না।

পরদিন কন্যা পিতার আহারের সময় বললেন ধনজীর মার উদ্ধত বাক্য ও স্পর্ধিত মেজাজের কথা।

গৃহিণীও বিরক্তভাবে বললেন, 'যদি রাতবিরেতে দরকার পড়লে কোনো কাজে না লাগে, তাহলে ও নবাব-নন্দিনী ঝি রেখে আমাদের কি উপকার! কাজ করতে এসে অত রানীগিরির মেজাজ দেখালে চলে না!'

কর্তার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল।

তিনি একটু হাসলেন।—'কি বলেছে? তোমার ছেলেমেয়েও যদি একলা থাকতে না পারে তার ছেলেরাও পারবে না? খাঁটি রাজপুতের ঘরের মেয়ে সিংহের বাচ্চা যে। দারোগা নয়—(সঙ্কর) আসল সিংহীর রক্ত শরীরে রয়েছে। সিংহীর বাচ্চার মতই কথা বল্‌চে তো। তোমরা রাগ করলে হবে কেন? ওকি আর ঝিয়ের মত ভয় পাবে, না কথা শুনবে? এত রাত্রে ওর ছেলেমেয়ে একলা রাখতে তাই চায়নি।'

কর্তার কথায় গৃহিণী ও কন্যা আশ্চর্য হলেন। কিন্তু রহস্য আছে নাকি ভিতরে? মৃদু হেসে গৃহিণী বললেন, 'এ যে প্রায় পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের গল্প দেখছি।'

'তাহলে একটি দ্রৌপদীর আগমন হয়েছে নাকি বাড়িতে?'

কর্তা অট্ট হেসে বললেন, 'প্রায় তাই। কীচকবধ না হলেই ভালো, ভীম নেই বটে, পঞ্চপাণ্ডবও নেই। কিন্তু যে সেপাই ঠাকুরঝি আছে, সে সব পারে। ও তোমাদের সব হুকুম না মানলেও কিছু বলো না--। আগে তো কখনো চাকরি করেনি, ব্যাপারটা কি ভাল করে জানে না।'

তবু ঘাত-সংঘাতে দিন আসে যায়।

সেপাই ঠাকুরঝি মাঝে মাঝে আসে ভাজের ভাইপোদের কাছে। ভাইপোটি আর একটি জায়গায় বালক ভৃত্যের কাজ করে।

বাড়ির ভৃত্য দাসদাসীরাও তাঁর নাম দিয়েছে সিপাহী বাঈজী। সকালে গৃহস্বামীর দাঁতনের মুখ ধোবার আসরে সে এসে নিজের মামলা বৈষয়িক ব্যাপারের কথা বলে যায়, জানিয়ে যায়—

ধনজীর মার মেজাজ আর পর্দা দুই একটু কমে গেছে।—বাঙালী বাড়ির জীবনে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। মানসম্ভ্রম যাবার ভয়, পুরুষকে ভয়-আতঙ্ক আর যেন নেই। চাকরিজীবনও কিছুটা আয়ত্ত করে নিয়েছে।

হেনকালে সহসা একদিন সকালবেলা গেটের বাইরে একটি পুরাতন রথ এলো। যেমন মহাভারতের রথের ছবি দেখা যায়—ঠিক তেমনি দেখতে, শুধু ঘোড়ায় টানা নয়, বলীবর্দবাহিত জীর্ণ বিবর্ণ ঘেরাটোপ ঢাকা একটি রথ এসে দাঁড়াল। এবং পিসী বা ঠাকুরঝি রথ থেকে নামল।

দ্বারবান ভৃত্যবর্গ আজ সহসা সেপাই ঠাকুরানীকে ঘেরাটোপ পরা পর্দানসীন রথ থেকে নামতে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এতদিন যাতায়াতে আর তাদের ভয় সমীহ ছিল না। দু-একজন এগিয়ে এল। কৌতুকভরে একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'বাঈজী, আজ একি ব্যাপার, পর্দানসীন সেজেছো?'

সেপাই বাঈজী শুধু হাসলে, কিছু বললে না।

তারপর গৃহস্বামীর মুখ ধোবার প্রাঙ্গণের দিকে এলো। আজ আর হাতজোড় করে নমস্কার বা সেলাম 'বন্দেগী' নয়, মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে 'ঢোক' (প্রণাম) জানিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কর্তা জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলেন।

সে বললে, 'আপনার কৃপায় আজ আমার পিতৃবংশের সম্পত্তি ও সম্মান উদ্ধার করতে ও রাখতে পেরেছি। ভাইবৌকে আর কার কাছে রাখতাম? তার ইজ্জত মান কে রাখত আপনার বাড়ির মত করে!—তাকে নিয়ে ঘুরলে আমার বিষয় উদ্ধারও হত না। আজ আপনার শরণ নিয়ে সব ফিরে পেয়েছে এরা। এখন তাদের নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম নিতে এসেছি। আপনার হুকুম হলে তাদের নিয়ে চলে যাই।'

সেপাই পিসিমার আর পুরুষোচিত সেই দৃঢ় বলিষ্ঠ চেহারা নেইও, রোগা হয়ে গেছে অনেক। চেহারাও কোমল হয়ে গেছে। ফিরে পাওয়া সম্পদ ও সম্মান তার মনকেও নরম করে দিয়েছে যেন। কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ছলছল করে এলো।

গৃহস্বামী খুশি মনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সব ফিরে পেয়েছ? সম্পত্তি জমিজমা?'

নারী বললে, 'হ্যাঁ, প্রায় সবই পেয়েছি। তবে ক্ষেতখামারে গরু মহিষ চরিয়ে নষ্ট করে দিয়েছে অনেক। ঘাসের গুদামে আগুন লাগিয়ে নষ্ট করেছে। তবু মামলায় তাদেরই হার হয়েছে। আমরা আমাদের 'বাপোতা' (রাজস্থানের পৈতৃক বিষয়ের নাম) বাপের ভিটে ফিরে পেয়েছি।'

নারী ভিতরে এলো, গৃহিণীকেও আজ প্রণাম জানাল। বললে, 'মাজী, আপনার বাড়িতে এত পুরুষের মাঝেও আমার ভাইয়ের বৌয়ের জন্য ভয় ছিল না।...অন্য জায়গায় আমি এত নিশ্চিন্ত হতে পারতাম না। আপনার কাছে ওরা সন্তানের মত ছিল। আজ আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাবার হুকুম দিন।'

ধনজীর মা উঠান ধোবার ঝাঁটা ফেলে ননদকে জড়িয়ে ধরল। তাদের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

তারপর আবার ঝাঁটা হাতে নিয়ে ঘর ধুয়ে কাজ সেরে নিয়ে স্নান সেরে রঙীন নতুন

ঘাগরা, জরি দেওয়া ওড়না, সূক্ষ্ম কাঁচুলির উপর হাতওয়ালা জামা পরে ছেলেমেয়েদের জরির জামা পাগড়ি পাজামা পরিয়ে সাজিয়ে এনে গৃহিণীকে প্রণাম করল। অন্য সকলকে নমস্কার করল। সে চাকরদের সঙ্গে কথা কইত না, রান্নাঘরের যে ব্রাহ্মণের কাছে ডাল তরকারী নিত, আজ অর্ধাবগুণ্ঠনে সজল চোখে সকলের কাছে বিদায় নিল করজোড়ে। কাপড় চোপড় গহনায় বিনীত নম্রতায় তাকে অভিজন দুহিতা বধূর মতই মনে হচ্ছিল আজ। কুল-পরিচয় আজ তার ঔদ্ধত্যের অর্থ বহন করে এনেছে।

অন্তঃপুরের ভৃত্যমহলে সাড়া পড়ে গেল ধনজীর মার জমিদারীর কথা। গহনার কথা, জমিদারীর আয়ের কথা, তার নিজের ঘরের রথ এসেছে তাকে নিয়ে যেতে। সে পর্দানসীন ঠুক্‌রাণী ('ঠাকুরানী', ঠাকুর অর্থে জমিদার) ছিল, বিপদে পড়ে ঝাঁটা ন্যাতা হাতে ধরেছে। চাকরি করে মাহিনা নিয়েছে এক হাতে করে, চোখ মুছেছে অন্য হাতে।

জমিদারী? জমিদারীর আয়? মুখে মুখে প্রশ্নে উত্তরে জমিদারীর আয় সম্পদে সমারোহের কাহিনী শত থেকে সহস্রের অঙ্ক বেড়ে যেতে লাগল।

কেউ বলে ওদের জায়গীরের জমিদারীর আয় দু হাজার। অন্যজন বলে পাঁচ হাজার, কেউ বলে আরো বেশী।—সন্দিগ্ধ সঙ্কীর্ণমনা লোকেরা চুপ করে থাকে, বিশ্বাস হয় না, তাদের ভালোও লাগে না। তারা বলে বাজে কথা, একেবারেই চাষা। জমিদারী না আরও কিছু।

সে যতই হোক বা যাই হোক, ধনজীর মা ও তার সেপাই ঠাকুরঝি ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছেলের হাতে তরোয়ালখানি দিয়ে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করে বাড়ির বহিঃপ্রাঙ্গণের সীমানার বাইরের পথে গিয়ে পূর্বপুরুষের রথের উপরে উঠে বসল। একদা মনিব। সেই মনিববাড়িতে রথে ওঠা তাঁদের অসম্মান প্রকাশ করে যদি।

গ্রামে যেতে বেলা অপরাহ্নে ঢলে পড়ল। রথ পিছনে জল্পনাপরায়ণ মানুষ রেখে আনন্দিত বালক শিশু, জননী, পিতৃষ্বসাকে নিয়ে চলে। ক্রমে শহরের পথ ছেড়ে গ্রামের বালিভরা ধূসর পথ ধরল আর খানিক দূরেই তাদের এলাকা সীমানা পড়ছে। বাতাসে আন্দোলিত লীলায়িত ভুট্টা বাজরা যবের ক্ষেতের আভাস সীমানা যেন চোখের সামনে ভেসে আসছে ঐ দূর দিগন্তের ক্ষেত্রে সীমান্তে!

রথের জালির জানালা দিয়ে ধনজীর মা ও পিসিমা পিতৃপুরুষের পদধূলিতে পবিত্র স্মৃতিপূত গ্রামের ক্ষেতখামার দেখতে দেখতে চলে। নষ্ট করেছে ক্ষেত? ঘাসের গোলায় আগুন দিয়ে দিয়েছিল? ক্ষতি করেছে অনেক?

কিন্তু কই? সে ক্ষতির ক্ষত মনে আর দাগ কাটতে পারছে না। কোথায় ক্ষত? কোথায় ক্ষতি? তার চিরকালের তাদের মাটির, তাদের মৃণ্ময়ী জননীর কোলে ফিরে এসেছে। যেন মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছে ফণিমনসার বেড়া দেওয়া উঁচু মাটির দেওয়াল-বেষ্টিত তাদের মৃণ্ময়ী অট্টালিকাখানি। কত যুগযুগান্তের জন্মমৃত্যু বিবাহ উৎসব শোকের স্মৃতি ভরা আছে যেখানে।

ভারতবর্ষ, ১৩৬১

আরাবল্লীর আড়ালে

রাজপুতনার ম্যাপ খুললে কিংবা ঐ লাইনের রেলওয়ের ম্যাপ দেখলে সেলাইয়ের ফুলকাটা কাজের মতন রেখাবলী এঁকেবেঁকে নগর, অরণ্য, নদী, বাঁধ, রেলপথ ঘিরে-ঘিরে চলেছে দেখতে পাওয়া যায়। সেই আরাবল্লীরই ছোট্ট কোলের শিশুর মত একটি গণ্ডশৈলের পাশের এক ক্ষুদ্র গ্রামে ধাপি জন্মেছিল।

বড় বোনের নাম ছিল মোহর, মেজো মেয়ের নাম হয়েছিল কেশর, সেজোর নামও ভালই রেখেছিল মা-বাপ—কস্তুরী; কিন্তু এর বেলায় আর ধৈর্য রইল না তাদের, জন্ম-মুহূর্তেই এর নামকরণ হয়ে গেল—ব্রাহ্মণ সজ্জন ছাড়াই। কে রাখল, কে বলল ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু নাম হয়ে গেল—ধাপি। ও-দেশে কোনো কিছু সুখ-দুঃখ যথেষ্ট হলে বা পেট ভরে গেলে, গ্রাম্যভাষায় ওরা বলে 'ধাপ গিয়া'। অর্থাৎ যথেষ্ট বা ঢের হয়েছে। এক কথায় 'আর না' থাক্; আমাদের আন্নাকালী থাকমণির মত আর কি।

দূরে দূরে নীল পাহাড়ের শ্রেণীর নীচে বাজরা, যব, গম ও ভুট্টার লীলায়িত ক্ষেত; ছোট ছোট বালির পাহাড় আর গণ্ডশৈলের পাশে, ধূ-ধূ করা বালির মাঝে গণ্ডগ্রামগুলি; কয়েক ঘর চাষী, কিছু অন্য জাতি—ক্ষত্রিয় রাজপুত নাপিত দারোগা কিছু বা ব্রাহ্মণ-বেনে; মাটির দেওয়াল-দেওয়া খড়ে-ছাওয়া ঘর, বলদে জল-টানা গভীর অতলস্পর্শী কয়েকটি কূয়া, সকাল-সন্ধ্যায় তারই পাশে, জলার্থিনী কলসী-মাথায় নারীর ভিড়, পুরুষের তারই একান্তে তাম্রকূট সেবন আর সুখ-দুঃখের আলোচনা,—এই নিয়ে গ্রাম। ব্রাহ্মণ-বেনের (বৈশ্যের) সাধারণ ঘরের মেয়েদের গোল ভাবের শান্ত মুখ, প্রায় ফরসা রং, ধীর চোখ, কোমল হাসি, অনতিদীর্ঘ দেহ; আর রাজপুত-ক্ষত্রিয়ানীদের অবনীবাবুর রেখাটানা শক্তিমূর্তির মত লম্বা ধরনের মুখের তীক্ষ্ণ গঠন, কালো দীপ্ত দৃষ্টি, পাতলা বাঁকা ঠোঁট, উজ্জ্বল গৌর এবং দীর্ঘ দেহ।

দারোগা জাতটা এদেরই ঘরের সঙ্কর। রাজপুত-ক্ষত্রিয় ঘরের দাস-দাসীর সন্তান অর্থাৎ ক্ষত্রিয় পিতার দাসীর সন্তান। এদের দারোগা বলে। বহুদিন ধরে ক্রমশঃ এরাই একটা জাত হয়ে গেছে।

ধাপি ছিল এই দারোগা ঘরের মেয়ে। "যৌবনে বহুপরিচর্যারত' ভর্তৃশালিনী কি ভর্তৃহীনা জানা নেই—এক পিতামহী বা মাতামহীর ক্রোড়ে যে ক্ষত্রিয় সন্তান জন্মলাভ করেছিল সে তার পৈতৃক রক্তধারার রূপের বৈশিষ্ট্য পুরো পেয়েছিল। ধাপিরাও তার প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয়নি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রসাদ পেয়েছিল ধাপি। কোনো পূর্ব-প্রপিতামহীর রূপের আলো তার তনুটিকে যে অপরূপ দীপ্তি দিয়েছিল, পাশাপাশি কাছাকাছি আর কোনো গ্রামে বৈশ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দারোগা-ঘরে তেমন সুন্দরী আর আর কেউ ছিল না।

জন্ম-মুহূর্তে ধাপি নাম হলেও আদর করে রাঙা আঙ্‌রাখা রঙীন ঘাগরা কপালে টিপ মাথায় লাল সুতো দিয়ে বিনানো চোটি (বেণী), পায়ে মুরাঠি (মেল), কানে পিপ্পল পাতার ঝুমকো, গলায় বলেওড়া (রূপার মোটা হার) হাতে পৈঁছাকঙ্কণে তার সাজে

ত্রুটি রাখেনি মা-বাপ বোনেরা।

কূয়ার পাশে বাঁধানো প্রণালী, তার পাশে খেলী (ছোট চৌবাচ্চা), প্রকাণ্ড চামড়ার চড়শ (থলে) করে জল উঠে আসছে, আর প্রণালী বয়ে খেলীতে পড়ছে, তারপর চাষীর কাটা মাটির আলবাঁধা পথে ক্ষেতে ক্ষেতে চলে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে গ্রামের মেয়েরা বাঁধানো প্রণালী থেকে মাটি বা পিতলের কলসে জল ধরে নিয়ে যাচ্ছে। অনেকে খাবার জল হাতে করেই ডোলে করে টেনে তুলে নিচ্ছে,—এই নিয়ম-বাঁধা দৈনিক কাজ।

কেশররা তিন বোন তিনটি চরি (পিতলের ও-দেশী কলসী) নিয়ে আসে। ছোট্ট একটি চরি-মাথায় ধাপিও তাদের সঙ্গে আসে। গ্রামের বয়স্কা, প্রৌঢ়া, বালিকা, তরুণী কলসী-মাথায় বাসন-হাতে সবাই আসে, শ্রেণী করেই দাঁড়ায় এখনকার 'কিউ'য়ের মতই। তার মাঝে গল্প হাসি কলহ কোলাহল সমানভাবে চল্‌তে থাকে। যাদের হাতে বাসন থাকে, তারা খেলির পাশে মাজতে বসে। যারা জল ভরে তারা জল নিয়ে চলে যায়। নানা রকমের হল্‌দে নীল গোলাপী রংয়ের ওড়না, খয়েরী রঙের মোটা রেজী-র (খদ্দরের) ওপর সাদা ফুল ছাপা ঘাগরা, গায়ে নানা টুকরাজোড়া রঙীন কাঁচুলি, মাথায় বোরলা (রূপার পুঁটে, নারীর ভূষণ—কুমারী ও সধবা পরে), সর্বাঙ্গে ভারি ভারি রূপার গহনা, কারো বা সোনারও একটি-আধটি আছে; মাথার বিঁড়েয় উপরি-উপরি কলসী বসিয়ে, লুগড়ি কোমরে গুঁজে অনায়াসে তারা আবার গল্প করতে করতে ঘরে চলে যায়।

সহসা একদিন গ্রামের টিমে তালের ছন্দ কেটে গেল। জল ভরতে গিয়ে মেয়েরা বেশী করে ঘোমটা টেনে দিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটি করে চোখ বার করে দেখতে পেলে, কূয়ার ধারের প্রকাণ্ড অশ্বত্থতলা, যেখানে পুরুষেরা তামাক খায়, বিশ্রাম করে, সেখানে লাল রংয়ের আচ্‌কান-পরা কোমরে তক্‌মা আঁটা, হাতে রূপার আশাসোটা, মাথায় শহুরে রঙীন লহরিয়া (ঢেউখেলান) রংয়ের সাফা (পাগ্‌ড়ি) পরা দু'-তিনজন লোক এসে বসে গল্প করছে। দু'জন বর্ষীয়সী নারীও রয়েছে একটু দূরে আর একটা গাছতলায়।

মেয়েদের দেখে মেয়েরা দু'জন এদিকে এগিয়ে এলো। তাদের শহুরে সভ্য পরিচ্ছদ,—মল্‌মলের রঙীন ঘাগরা, হাল্‌কা পাতলা কাপড়ের চওড়া জরিপাড় লুগ্‌ড়ি (ওড়না) গায়ে, কাঁচুলির উপর সদ্‌রি (হাতওলা জরির কাজ-করা জামা), সর্বাঙ্গে সোনা-রূপার বিপুল ওজনের গয়না ঝলমল্‌ করছে।

ঘোমটা যারা দিয়ে রইল তারা ঘোমটাও খুললো না, কথাও বললো না। কিন্তু তাদের আশপাশের বালক-বালিকা-শিশুর দল কয়েক মুহূর্তেই গ্রামে রটনা করে দিল—অজস্র গহনা-পরা, লহরিয়া রংয়ের পাগড়ি, লাল রংয়ের আচকান পরা নরনারী কারা এসেছে তাদের গ্রামে। তাদের সঙ্গে আশাসোটা শিঙাধারী চোপদার ও সঙীনধারী সেপাই এসেছে। মাঝে মাঝে তারা শিঙা বাজাচ্ছে। দেখতে দেখতে গ্রামের বর্ষীয়সী অর্ধবয়স্কা মেয়েদের সমাগম হতে লাগলো।

ধাপিরাও মাথার চরি হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালো। মলিন সবুজ আঙরাখি পরা, হলদে রংয়ের খদ্দরের ওপর সাদা বুটিদার মোটা ঘাগরা পরা ধাপিকে দেখা গেল। গ্রামে জল্পনা-কল্পনার আর শেষ রইল না। মেয়েরা বলাবলি করে,—আগন্তুকদের ওড়না ঘাগরার বিচিত্র রংয়ের কথা, গহনার গুরুভারের কথা, কাচের চুড়ির বাহারের কথা। গ্রামের বর্ষীয়সীরা সেই নবাগতা বর্ষীয়সীদের কাছে শুনে আসে দূর শহরের অপরূপ কথা; রাজ-অন্তঃপুরের

ঐশ্বর্যের কথা, সোনা রূপা হীরা মুক্তার ঝলমলে বসন-ভূষণ পরা রানীদের কথা, তাদের সখীদের কথা এবং আরো কত কি রহস্যময় জীবন-মৃত্যু-প্রেমের কাহিনী। যার কিছুটা ওরা বুঝতে পারে, অনেকটাই বুঝতে পারে না, শুধু অভিভূত হয়ে শোনে। প্রকাণ্ড প্রাসাদের পর প্রাসাদ, অট্টালিকা সৌধময় জনাকীর্ণ অপরূপ নগরী; যার পথ বাঁধানো, পথে শ্রেণীবদ্ধ আলো; গাড়ি-ঘোড়া তাঞ্জাম রথের পালকির শেষ নেই; সেখানকার মেয়েরা চিত্র-বিচিত্র নানাবিধ বসন, অলঙ্কারের, বহুতর সুখের বিলাসের উপকরণে পরিপূর্ণ। সেখানে সব সময়ে সব পাওয়া যায়, দোকানে বাজারে সাজানো থাকে সব জিনিস, হাটের দিনের জন্য কারুকে অপেক্ষা করতে হয় না। পুরুষেরা কত রকমের কাজ করে। শুধু চাষ-বাস? ছিঃ! কত লেখা-পড়ার কাজ, কাছারী, আদালত, মহক্‌মা আম (মহকুমা) তাতে কত লোক, কত মানুষ, কত জাতি! ওরা ধবধবে সাদা রংয়ের সাহেব দেখেছে, ওরা ঘোড়া-গরুহীন হাওয়াগাড়িও দেখেছে, ওরা কতবার রেলগাড়িতে চলেছে। ওদের দেশে নাটকঘর আছে, সেখানে বিলিতী ছবির ছায়াবাজী দেখা যায়। সবাই দেখে টিকিট কিনে। মেয়েরা? শুধু জল তুলে গম পিষে রুটি গড়ে দিন কাটায় না। আটা কিনতে পাওয়া যায়। জল তোলার লোক আছে। মেয়েরা বড় বড় ঘরে সবাই বসেই থাকে। শুধু বসে থাকে? ইচ্ছা হলে গান গায়, পান খায়, শুয়ে থাকে, কিছু করে না, করতে হয় না। তারা নাটক দেখতে যায়, বেড়াতে যায়।

বিবরণের পর বিবরণ, কাহিনীর উজ্জ্বল বর্ণনা গ্রামটিকে কয়েক দিনের মধ্যেই মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল। শ্রোত্রীদলের বর্ষীয়সীরা বাড়ি এসে গল্প শেষ করে প্রতিদিনই নিঃশ্বাস ফেলে; বলে, 'তা আর কি আমাদের কখনও ও-সব দেখা হবে!' এবং বালিকা কিশোরী তরুণী সব বয়সের মেয়ে সকলেই সে কাহিনী আরব্য উপন্যাসের মত বারবার শুনতে চায়। তাদের কৌতূহলের সীমা থাকে না সব কথা শোনবার জন্য। আর? আর যদি কোনোদিন কেউ নিয়ে যায় সেই স্বপ্নের মত অপরূপ দেশে!

বড়রা বর্ষীয়সীরা গ্রাম্যবৃদ্ধারা অনুপস্থিত থাকলে, এরা বলে তাদের কাছে রাজ-অন্তঃপুরের কাহিনী, কত সখী, কত অপরূপ সুন্দরীর কথা—যারা কোনোদিন হয়ত রাণীদের অতিক্রম করে রাজার সুনজরে পড়বে। তারপর? রহস্যময়ভাবে চোখ টিপে বলে—রাণীরাও তাদের ভয় করেন! তারা রাজার প্রিয়পাত্রী পরম আদৃতা, তারা খোজাদেরও শাসন করে—কখনো কখনো। তাদের গায়ে রানীদের মতই গহনা, পায়ে সোনার মল, মুরাঠা, পাঁয়জোড়।

অবাক্-বিস্ময়ে শ্রোত্রীদের বাক্যস্ফূর্তি হয় না। সোনার মল, পাঁয়জোড়? সোনার জিনিস তো পায়ে পরে না কেউ। স্যাকরাদের মেয়ে মনফুলী বিজ্ঞভাবে বলে, 'কই, সোনা তো এখানে 'প্যাটেল'জীর বাড়ির মেয়েরাও পায়ে পরে না, তারা তো খুব বড়লোক! সোনা পায়ে পরতে নেই!'

শহরবাসিনীরা হেসে উঠে বিদ্রূপ করে বলে—'বড়লোক! পরতে নেই! পাটেলজী! চল না তোরা আমার সঙ্গে, আমি তোদেরই একদিন সোনার মল পরাব। তাজিমী দিয়ে রাজা নিজের হাতে সোনা পরিয়ে দেন তাদের পায়ে। কত সুন্দর মেয়ে আমরা নিয়ে গেছি। ঐ তো সরবতীবাঈ—সে পাত্রী থেকে পর্দায়েত হল আমাদেরই সামনে। এখন সোনার মল পায়নি? মহারাজা তাকে দেখে উঠে দাঁড়ান, রানীদেরও দাঁড়াতে হয়, দু'জন

লালজী সাহেবের মা সে! তার কত সম্মান, তাজিমী পেয়েছে, তার আলাদা রাওলা (মহল), গাড়ি পালকি রথ। ছিল্ তো তোদেরই মত গেঁয়ো মেয়ে। কপাল ফিরে গেল না তার? শহরের জান্তো কি?'

মনফুলী, ঘিসি, ধাপি, কেশর, কাবেরী সব অবাক হয়ে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। মৃদু হেসে একজন শহরবাসিনী বলে, 'তোরা যদি যাস তো আমি নিয়ে যাব।'

আশা আকাঙ্ক্ষা কৌতূহলে বালিকারা মূক মূঢ় হয়ে যায়। যদি? যদি যেতে দেয় মা-বাপ; উৎকণ্ঠিত বালিকারা জিজ্ঞাসা করে, 'কবে ফিরে আসতে পাবে যদি যেতে পায়?'

শহরবাসিনীরা অট্টহেসে ওঠে—'ফিরে? ফিরে এসে কি হবে? তখন রানীদের মত নিজের মহলে থাকবি, তোদের তালুক-মুলুক হবে, হুজুর সাহেব তোদের রাওলায় এসে বসবেন কতদিন, তোদের ছেলেমেয়ে হবে, ছেলে লালজী হবে, মেয়ে বাঈজীলাল হবে। ফিরবি কি জন্য এই ধূ-ধূ করা বালি ভরা পাহাড়ে মরুভূমির দেশে?'

কেশর কাবেরী নতমুখে বসে থাকে। তারা বড় হয়েছে। কিছু যেন বুঝতে পারে ভিতরের কথা। কিন্তু শহরবাসিনীরা ওদের দিকে চেয়ে বলে, 'ওদের নেব না। ওদের বিয়ে হয়ে গেছে যে। আমরা সুন্দরী কুমারী মেয়ে খুঁজছি।' তারা ধাপি, মনফুলী, ঘিসিদের দিকে চায়। 'আমরা বিয়ে হওয়া মেয়ে নিই না,' আবার বলে।

আশা-উৎকণ্ঠায় ধাপি মনফুলী চঞ্চল উদ্বেল হয়ে ওঠে। ওরা কুমারী, এখনো বিয়ে হয়নি সৌভাগ্যক্রমে।

আর কাবেরী কেশরও যেন মনে মনে একটু নিরাশ হয়ে যায়, কি আকাঙ্ক্ষা যেন কিসে প্রতিহত হয়ে গেল। সোনার মল? গহনা? অথবা অপরূপ না-দেখা শহরের জন্য? কিম্বা নাটকঘর, হাওয়া-গাড়ি?

সহসা একদিন গ্রামের লোকেরা শুনলে, যারা এসেছিল তাদের সঙ্গে গতরাত্রের শেষ প্রহরে যখন গ্রামের সকলে ঘুমোচ্ছিল তখন মনফুলী ধাপি আর মনফুলী-ধাপির বাপ শহরে চলে গেছে!

ধাপির মা-বোনেরা কিছুই জানে না, মনফুলীর বাড়ির কেউ জানে না।

সমস্ত গ্রাম যেন মূঢ় স্তব্ধ হয়ে গেল।

ধাপির মা হতবুদ্ধির মত কোলের ছেলেটিকে স্তন্যপান করায়, তার ওপরের মেয়েটিকে নিয়ে বসে থাকে। মেয়েরা,—কেশর মোহর রুটি গড়ে, ভাই-বোন মাকে খেতে দেয়। মা অন্যমনে একটু মুখে দেয় আর উন্মনাভাবে চারদিকে তাকায়, কি ভাবে মুখে কিছুই বলে না। কয়েকদিন পরে ধাপির ও মনফুলীর বাবা শহর থেকে ফিরে এলো। শহর দেখার গর্বে উৎফুল্ল এবং কন্যাদের ভাবী কালের সৌভাগ্য আশায় গর্বিত তাদের মুখে দরিদ্র গ্রামের কৌতূহলী সকলে ঈর্ষাকাতর হয়ে, বিতৃষ্ণাভরে উদাসীনভাবে শুনল, যারা এসেছিল তারা ধাপিকে রাজ-অন্তঃপুরের জন্য নিয়েছে, ওকে দু'শো টাকা দিয়েছে। আর মনফুলীর জন্য একশো টাকা দিয়েছে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে বললে, 'তুমি বেচে দিলে তোমার মেয়ে?'

ক'দিন শহরে থেকে, গতরাত্রে 'কলালে'র দোকানে পান আহার করে তাদের আমিরী

মেজাজ তিক্ত হয়ে উঠলো এ কথায়। মনফুলীর বাবা বললে, 'বেচব কেন? এতদিন মানুষ করিনি? তার তো খরচ লেগেছে! হুজুর সাহেব অমনি অমনি নেবেন কেন?'

কন্যা-গর্বে গর্বিত ধাপির বাপ বললে, 'গাঁয়ে তো কত মেয়ে রয়েছে, তা আর কারুকেই নিল না কেন?'

ঐশ্বর্য বিলাসহীন নিতান্ত দরিদ্র গ্রামের অধিবাসীরা ক্রমে ক্রমে ঘরে ফিরে গেল, আর বিশেষ কিছুই বললে না।

ছোট্ট পাহাড়ের পিছনদিকে সূর্য অস্ত গেল, সঙ্গে সঙ্গে শহরের দিকের রেলগাড়িখানা দূরের বড় গ্রামের স্টেশন পার হয়ে চলে যাবার ঝিক্‌ঝিক্ শব্দ মিলিয়ে গেল। গ্রামবিচ্ছিন্নাদের অনাগত ভাবীকালের ঐশ্বর্যময় বিলাসব্যসনময় দিনের আশার স্বপ্ন যেন ঐ শব্দে নিস্তব্ধ গ্রামের অন্তর মথিত করে তুলতে লাগল। যেন তা সুখ নয়, যেন তা দুঃখও নয়, তারও চেয়ে গভীর কিছু। যেন চিরন্তন মূঢ় শূন্যতাময় অন্ধ বিরহ-বেদনা। আর মাটির দেওয়ালে খড়ের চাল দেওয়া ছোট্ট ঘর দু'খানিতে মা-বাপের কাছে ভাইবোনের মাঝে শুধু দুটি ছোট জায়গা চিরদিনের মত নিশ্চিহ্নভাবে খালি হয়ে গেল; তাদের মূঢ় মূক জননীরা তাদের খাবার থালা পেড়ে নিয়ে আবার তুলে রাখে, শোবার জায়গা বাড়তি হয়, সেদিকে উন্মনা হয়ে চেয়ে থাকে। স্ত্রীর দিকে চেয়ে ধাপির বাবা বলে তামাক খেতে খেতে—'এখন তো পাত্রী হবে'; ব্যাখ্যা করল—'এই ছোট মেয়ে নাচ গান শিখলে তাদের পাত্রী বলে। তারপর চাই কি হুজুর সাহেবের নেকনজরে পড়লে পর্দায়েত হয়ে যাবে। তারপর জোর-কপাল হলে মেয়ে আমাদের পাশোয়ান হবে। পর্দায়েত হল পাশোয়ানের চেয়ে একটু নীচে, পাশোয়ান রানীর পরেই। সরবতীবাঈ এখন 'প্রেম-রায়' খেতাব পেয়েছে—পাশোয়ান হয়ে গেছে।'

ধাপির মার চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে আসে, সে কিছুই বলতে পারে না। ঐশ্বর্য-বিলাস-আকীর্ণ ওর একান্ত অজানা সেই সুখ-ব্যসনের কোনো কল্পনা তার মনে জাগে না, শুধু ধাপির মুখ, হাসি আর কথা তার মনে পড়ে।

বহু বৎসর কেটে গেছে—প্রায় দশ বছর। ছোট লাল কুর্তা আর লাল চুড়িদার পাজামার ওপর ওড়না পাত্রীদের নির্দিষ্ট পোশাক-পরা ধাপির বালিকা-তনুদেহ ক্রমে ক্রমে অপরূপ হয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে। মেয়েরা সখীরা দেখে মুগ্ধ হয়। সর্দার খোজা 'খুশ্‌নজরজী'র মনে একটা অপূর্ব স্নেহ আর অদ্ভুত ভয়ভাবনা জাগে তার জন্য। এত রূপ। রানীদের পাশোয়ানদের ঈর্ষাতিক্ত দৃষ্টি অতিক্রম করে যায়নি। সকলের চোখ পড়েছে সেদিকে, কেউ বা মুগ্ধ হয়ে দেখেছে, কত জন বা তিক্ত, কত জন ভীত-শঙ্কিত চোখে দেখে তাকে—পাছে রাজার মুগ্ধ দৃষ্টিও তার ওপর পড়ে কোনোদিন, আর তারা তাদের বহুমানসমাদৃত স্থানভ্রষ্ট হয়।

বিরাট অন্তঃপুর। জনাকীর্ণ। শুধু মেয়ে কিন্তু। দাসী, সখী, সেবিকা, সহচারিণী, প্রতিহারিণী, সব মেয়ে—যেন অসংখ্য। তিন রানী—তাঁদের এক একজনের এক এক প্রাসাদ। তাঁদের পিত্রালয়ের সখী দাসী; রানীত্ব লাভের পর পতিগৃহের সখী সেবিকাতে নিজ নিজ অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। এ ছাড়া পাশোয়ান পর্দায়েতদের রাওলা (মহল) ভরা দাসী সহচারিণী।

পুরুষ শুধু রাজা! এবং লালজী সাহেব দু'জন,—প্রেমরায়ের ছেলে। অবশ্য তাদের শুধু খুশনজরজীর অনুমতি নিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশের যাতায়াতের অধিকার আছে মাত্র।

মাঝে মাঝে জলসা হয়। উৎসব-প্রাঙ্গণে নাচ-গান-অভিনয় হয়। রাজার সুবর্ণখচিত আসন পড়ে,—তারপর পদানুসারে মহারানীর পর অন্য রানী, পাশোয়ান, পর্দায়েতদের আসন পড়ে। তারপর নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের, সমাগতদের আসন থাকে। একের পর এক নাচের দল, গান গেয়ে নেচে চলে যায়।

রাজার সামনে থাকে রূপার থালায় মধুর মদির পানীয়, তার জন্য ছোট ছোট কাচের গেলাস, সোনার তবকে মোড়া পান, লবঙ্গ, এলাচ।

কোন্ পুরাকালের প্রথামত মহারানী পানীয় প্রথমে ঢেলে দেন মহারাজার গ্লাসে, তারপর সেটা রাজার ওষ্ঠ-পৃষ্ঠ হয়ে রানীর অধর-স্পর্শ লাভ করে। তারপর একে একে অন্য রানী, পাশোয়ান, পর্দায়েতদের এবং লালজীদের মধ্যে ঘুরে আসে।

নাচের গানের—বারবার পুনরাবৃত্তি ও পানীয় পাত্রের একইভাবে মুখে মুখে আবর্তনে রাত্রির প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়।

সেদিন জলসা প্রেমরায়ের মহলে। প্রেমরায়ের পাত্রীর দলের মধ্যে সহসা দেখা যায় ধাপিকে। মদিরামুগ্ধ রাজা সখীদের দিকে চেয়েছিলেন। সহসা প্রেমরায় মহারানীর আসনের কাছে এসে নত হয়ে কুর্নিশ করে—কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র যাবার আবেদন জানালেন। নিয়মিত সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সখীর দলও চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল তাঁর অনুসরণ করার জন্য।

খুশ্‌নজরজী এসে দাঁড়ালেন প্রথানুসারে প্রত্যুদগমনের জন্য, তারপর মুহূর্তের জন্য তার মাঝে চকিতের মত ধাপিকে দাঁড়ানো দেখা গেল। চাঁপাফুলের মত উজ্জ্বল রং, কালো চুলে ঘেরা অপূর্ব সুন্দর মসৃণ পরিচ্ছন্ন কপাল, কালো সফরী-নেত্র, চমৎকার টুকটুকে দুখানি ওষ্ঠাধর সহসা যেন ঝকমক করে উঠল ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় এবং নিমেষের মধ্যেই আর তাকে দেখা গেল না। সকলের আড়ালে মিলিয়ে গেল। প্রেমরায়ও দেখতে পেলেন তাকে ঐ এক মুহূর্তেই।

মহলে এসে প্রেমরায় ডাকলেন, 'গোদাবরীবাঈ!'

ধাপি এসে কুর্নিশ করে সামনে দাঁড়াল। রাজ-অন্তঃপুরে এসে ধাপির নাম হয়েছিল, গোদাবরী। ধাপি নামটা গ্রাম্য।

'তোমাকে বারবার বলেছি না, তুমি হুজুর সাহেবের জলসায় যাবে না?' প্রেমরায় গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করলেন। ফর্সা রং আসব ও ক্রোধের উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে—মুখের ভাব তিক্ত বিরাগে হিংস্র ঘৃণায় ভরা!

'আমি চাই না, তোমাকে হুজুর সাহেব দেখতে পান।' তারপর খানিকক্ষণ কি ভেবে বললেন, 'আচ্ছা, আর তোমাকে দেখতে কখনো কেউ পাবে না।' প্রধান সখী বড়ারণজীর দিকে চেয়ে বললেন, 'ওকে বাঁদীকুইয়ের একটা ঘরে রাখগে।'

এক মুহূর্তের মধ্যে সব ঘরখানা আড়ষ্ট হয়ে গেল। দীর্ঘকালের মধ্যে কোনো বাঁদীর এমন শাস্তি ওরা দেখেনি। সহসা দ্বারের কাছে বৃদ্ধ খুশ্‌নজরজীকে দেখা গেল, তিনি অতর্কিতে নিয়মবিরুদ্ধভাবে 'কাকে?' জিজ্ঞাসা করেই কৌতূহল সম্বরণ করে জানালেন, 'হুজুর সাহেব সেলাম দিয়েছেন।'

প্রেমরায়ের কঠিন মুখ কঠিনই রইল। শুধু শান্তভাবে 'যো হুকুম' বলে তিনি খুশ্‌নজরজীর অনুগমন করলেন।

দুর্গ-পরিখার নাম 'তালকটোরা'। অর্থাৎ যে তটিনীর আকার বাটির মত। বহুকালের জমা জলে স্রোতহীন গভীরহ্রদ—নদী নয়। বর্ষায় কূলে কূলে পূর্ণ হয়ে ওঠে, গরমে শুকিয়ে কোথায় নেবে যায়, শীতে স্থির শীতল মুখে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে প্রাসাদের ছায়া বুকে নিয়ে। অসংখ্য কুমিরে সমাকুল। তারাও বর্ষায় ভেসে বেড়ায়, কখনো গরমে কাদার মধ্যে লুকিয়ে থাকে, শীতে পরিখা-কিনারে স্থিরভাবে রৌদ্রে শুয়ে থাকে।

দুর্গতল বর্ষায় পরিখার সঙ্গে প্রায় সমান সমতল হয়ে যায়। সেদিন প্রাসাদের নীচের ঘরগুলিতে জল ভরে যায়। বহু গ্রীষ্মের বিলাস-শয়নাগার, দাসী-বাঁদীর গ্রীষ্মের শোবার ঘর, থাকার ঘরও ঐ গৃহশ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

তারি মাঝে আছে বন্দিশালা। নিরপরাধ, নিরীহ অপরাধিনীদের নির্বিচার কারাগৃহ। প্রধান অপরাধ—যাদের রূপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা কণ্ঠের সুরের শ্রেষ্ঠতা; অথবা অকারণ বিঘ্নকারিতার অপরাধ তো আছেই। সলিটারি সেলের মত যেন!

এখনো লাল চুড়িদার কুর্তা ওড়না-পরা স্বল্পপরিণত কিশোর তনুশালিনী সামান্য পাত্রী মাত্র—সখীও নয়, বহু আকাঙ্ক্ষিত পর্দায়েত তো নয়ই,—ধাপি ওরফে গোদাবরীবাঈ প্রধানা সখীর হাত ধরে গ্রাম থেকে অজানা-পথে প্রাসাদে আসার পর আজ আবার নতুন করে আর এক না-জানা পথে ধীরে ধীরে নেমে গেল। সব সঙ্গিনী দাসীরা এক মুহূর্তেই ওদের দেখে সরে গেল। সমবেদনার সাহস তাদের নেই, কথা বলার ভরসা নেই, আতঙ্কে সকলে যেন ভোজবাজীর মত মিলিয়ে যেতে লাগল।

নির্জন অজানা গলি সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে যন্ত্রচালিতের মত কত সিঁড়ি কত নীচু গড়ানে পথ বেয়ে ধাপি নেবে এলো।

সারি সারি ঘর! দিনেও অন্ধকার যেন। উপরে অনেক উঁচুতে ছোট ছোট জানালার মত আছে। বর্ষায় সেখানে জল পৌঁছায় না।

ঠাণ্ডা ঘরের মেজেতে দু'খানা চট এবং একটা কম্বল পড়ে আছে। ধাপিকে সেখানে হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বড়ারণজী বললে, 'সন্ধ্যেবেলা আলো দিয়ে যাবে আর খাবারও পাবি ঠিক সময়ে।'

ফ্যালফেলে হতবুদ্ধি হরিণের মত কালো চোখদুটি মেলে সে চেয়ে রইল তার মুখপানে, কিছুই কথা বলতে পারল না। হয়ত বড়ারণের করুণা হল, তার মুখ দেখে বললে, 'ভয় নেই, আমি আসব আবার।'

সিঁড়ি দিয়ে সে ওপরে উঠে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অভিভূত ধাপি অশ্রুহীন চোখে শুয়ে থাকে। সহসা কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় তার। দেখে—সামনে দু'খানা রুটি, এক ঘড়া জল আর একটি প্রদীপ রেখে গেল একজন দাসী। চেয়ে দেখলে ওপরের আলোও আর নেই। অকস্মাৎ তার মনে পড়ে যায়, সে একেবারে একা। এই গৃহ-শ্রেণীর মাঝে কোথাও কেউ নেই। এবং বহু কাহিনী আশেপাশে থমথম করছে। একদা যারা এখানে ছিল আর কোনখানে যেতে পায়নি, তাদের কথা মনে করে তার সর্বাঙ্গে যেন কাঁটা দেয়। নিস্তব্ধ ঘরের আশেপাশে কোনখানে মানুষের সাড়া নেই, জীবিত জীবের সংস্পর্শ নেই।

ধাপি রুটি খেতে পারে না, গলা কাঠ হয়ে গেছে, জল খায় শুধু। তারপর প্রদীপটা বাড়িয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকে। পিঠে দেওয়াল থাকে আর আশপাশে সামনে

বারবার চায়। তার চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হয় কিন্তু কণ্ঠস্বর তার একেবারে বসে গেছে যেন।

সারারাত সে জেগে বসে থাকে। মাঝে মাঝে ঘরের পাশে পরিখায় জলের শব্দ হয় ছলাত ছলাত করে, তার মনে হয় যেন তালকটোরার জলটা তার জীবিত সঙ্গী।

সকালবেলা রুটি নিয়ে বড়ারণ এলো। ভয়ে অনাহারে অনিদ্রায় প্রেতের মত ধাপিকে দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে গেলো, বললে, 'তুই খাসনি কেন?' আজ এই সামান্য কথাই সহসা যেন ধাপিকে সাহস দিল। সে বড়ারণের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কাঙ্গালের মত বললে, 'আমাকে আমার মার কাছে পাঠিয়ে দাও বড়ারণজী। আমি আর কখনো এখানে আসব না, হুজুর সাহেবের সামনে বেরুব না।'

বড়ারণ বললে, 'তোকে পাঠালে যে আমার গর্দান যাবে, নইলে আমি কি মানুষ নই, তোর মত বাচ্চাকে এই কয়েদঘরে রাখি! আচ্ছা তুই খা তো, দেখি তোর মাপ হয় কিনা।'

ধাপি আকুল হয়ে কাঁদে শুধু। খাবারের দিকে ফিরে চায় না। যার কোনো সভ্য সমৃদ্ধ শোভা নেই, অলঙ্কার নেই, সেই ছোট গ্রাম আর জননীর শান্ত মুখ তার মনে পড়ে।

রাত্রির পর দিন আসে। কত দিন কত রাত্রি গেল, ধাপি জানে না। দিন দিন সে শীর্ণ হতে শীর্ণতর হয়ে যায়—দিনের বেলায়ও সে কোনোদিকে চায় না, ভয় করে। কোনোদিন একটুকরা রুটি খায়, কোনোদিন খায় না।

সহসা একদিন সকালে এলেন খুশ্‌নজরজী বড়ারণের সঙ্গে, ধাপিকে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। সে ঘুমোচ্ছিল—পাণ্ডাশ মুখ যেন মৃতের মত।

করুণাভরে ডাকলেন, 'বাঈ, গোদাবরীবাঈ!'

রাত্রির বিনিদ্র-ক্লান্ত আরক্ত চোখ মেলে সে বললে, 'জী।'

খুশ্‌নজর বললেন, 'আমার কাছে যাবে? আমি নিয়ে যেতে পারি, হুকুম পেয়েছি।'

সে চোখ বুজেছিল আবার, একটু হেসে চোখ বুজেই বললে, 'জী', অর্থাৎ আচ্ছা। বড়ারণ তাকে বললে, 'ওঠ্, সেলাম কর।' সে কথা কইলে না। খুশ্‌নজর ওপরে উঠে গেলেন, বললেন, 'কাল ওকে নিয়ে যাব।'

সকাল হল। সিঁড়ির মাথার লোহার দরজা খুলে গেল।

বহু মিনতি করে আজ মনফুলী ওদের সঙ্গে এসেছে। তিনজনে নেমে এলো। ধাপির ঘরে কাল আর প্রদীপ জ্বলেনি, যেমন তেমনি তেলে ভরা রয়েছে। রুটি পড়ে আছে, শুধু জলের ঘটিটা গড়িয়ে গেছে ঘরের একদিকে।

ধাপির আজ আর ঘুম ভাঙল না।

বসুমতী, ১৩৫২

পুণ্য পরিক্রমা

তখনো ভোরের আলো ফোটেনি। অন্ধকার রয়েছে ঘোর-ঘোর মত। শ্রাবণ মাস। বন পরিক্রমা শুরু হয়েছে।

শহরের গোপালজীর মন্দির থেকে পুণ্য পরিক্রমা দেবার বিরাট দল ভজন কীর্তন নাম করতে করতে বেরিয়েছে।

পান ফুলমে নারায়ণ। (জলে ফুলে নারায়ণ)
তুলসীপত্রে নারায়ণ। (তুলসী পাতায় নারায়ণ)
বোল্ বোল্ নারায়ণ। (বল বল নারায়ণ)
চাল কেঁউলি নারায়ণ। (চলনারে নারায়ণ) ধূয়া সহ।

পথে পথে প্রত্যেক গলির মুখ থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে আসা আবাল বৃদ্ধ বনিতার দলে জনতা-বিশাল হয়ে উঠছে।

আর রকম রকম সুরে নানা বাণী 'গোপাল গোবিন্দ বোল্, বোল রাম নারায়ণ।'

আবার 'মঁয়নে রাম রতন ধন পায়ো। পায়োরে রাম রতন ধন' একজন গান ধরে, আর সকলে ধূয়া ধরে আবার গায় কীর্তনের ধূয়ার মত। আকণ্ঠ অবগুণ্ঠনে আবৃত মুখ মেয়েদের দল কখনো শ্রাবণ সঙ্গীত ঝুলন কাজরী গায়। কখনো মীরাবাঈ সুরদাসের বিরহসঙ্গীত গায় 'মেরী রাধা প্যারী বোলো বংশী হমারি' 'মেরা লগন লগী হরি আওয়ান কী'।

ভোরের আলোয় ঠাণ্ডা ছায়া ভরা বড় বড় গাছওয়ালা পথ। পথে চলেছে নানা রংয়ের ঘাগড়া ওড়না জামা কাঁচুলি পরা ভারী ওজনের মোটা-মোটা গহনা পরা নানারকমের নারী ও বালক বালিকার দল। আর জামা ধুতি পাগড়ি রূপার বালা মল পরা পুরুষদের দল। হাতে লাঠি কাঁধে গামছা বাঁধা পূজার তুলসীপাতা ফলমূল অথবা পথের খাবার। আর সঙ্গে চলেছে বাঁশী বাজনা গান ও খেলনা-খাবারওয়ালার দল—যেন পার্বণ উৎসব মেলার প্রকাণ্ড একটি চলমান দল।

আর পল্লীতে পল্লীতে বড় বড় গাছে দোলনা টাঙানো হিন্দোলা রয়েছে। চেনা অচেনা ছেলেমেয়ের দল একবারটি দোলবার নাম করে দোলনায় চাপছে। আর নামবার নাম করছে না।

সঙ্গীরা বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা কমবয়সী নরনারী নিরুপায় হয়ে সেখানে দাঁড়াচ্ছে।

পথে আছে 'পিয়াউ'। জল দানশালা। পুণ্য জলদানের কুটির পুণ্যকামীদের দানে। সেখানে আছে কলসী কলসী ঠাণ্ডা জল, বিরাট এক থলে ভরা ছোলা ভাজা, এবং প্রকাণ্ড একটি চ্যাঙড় ভেলী গুড়। হাত পাতলেই সকলে পাবে।

আমাদের সুজনবাঈ বা সুজাবাঈও চলেছেন।

সহসা বাইয়ের আঁচল ধরে টানল।

কে ডাকলে, বললে, 'দাদী!'

সুজাবাঈয়ের হাতের জলের ঘটি ফুলের সাজি নড়ে উঠল। একটু জল চল্‌কে পড়ল।

অবাক হয়ে পিছন ফিরে চাইলেন। তাঁকে দাদী বলে কে ডাকল! তাঁর সঙ্গে কোনো নাতনী আসেনি। তাঁর তো নাতনী নেই। মিষ্ট কোমল কচি গলার মেয়ের ডাক।

জল চলকে লুগড়ীও ভিজে গেল একটু। একটু বিরক্ত ও অবাক হয়ে 'কে রে?' বলে পিছনে দেখলেন একটি ফুটফুটে সুন্দর সাত-আট বছরের মেয়ে তাঁর ওড়না ধরে রয়েছে। কিন্তু এ তো তার দাদী নয়। কে ও!

তাঁর বিরক্ত ও আশ্চর্য মুখ দেখে সে অপ্রস্তুত ও ভীত হয়ে ওড়নার আঁচল ছেড়ে দিল।

এবারে দাদী সম্বোধিতার অবাক হবার পালা।

এত সুন্দর মেয়ে এমন মিষ্ট গলার স্বর যেন তিনি, জীবনে দেখেননি বা শোনেননি। সমৃদ্ধ রাজপুত ঘরের মেয়ে তিনি, বৌও তেমনি, সম্পন্ন ঘরের আত্মীয়স্বজনও বহু। তবু তাঁর মনে হল এমন রূপ বুঝি কখনো চোখে পড়েনি।

তাঁর বিরক্ত দৃষ্টি কোমল হয়ে এলো। তিনি তাঁর আঁচল ছেড়ে দেওয়া ছোট্ট হাতখানি ধরে নিলেন।

বললেন, 'কাকে খুঁজছিস তুই? আমি তো তোর দাদী নই! দাদী কি এগিয়ে গেছে?'

ভোরের আকাশ নির্মল হয়ে আসছে। চারদিকে অচেনা চেনা যাত্রী যাত্রিনীরা চলেছে, হরিনাম ও গান চলেছে। পথ মুখর।

মেয়েটি হকচকিয়ে ভীতভাবে চারদিকে চাইতে লাগল। কোথায় তার ঠাকুমা!

সুজাবাঈয়ের ওড়নার রং তার দাদীর ওড়নার মত দেখে সে এসে লুগড়ী ধরেছিল। ভয় পেয়ে তার চোখ জলে ভরে গেল আশেপাশে ঠাকুমাকে দেখতে না পেয়ে।

বৃদ্ধা তার মুখটা দেখতে পেলেন, 'চল আমার সঙ্গে, তোর দাদীকে খুঁজে দোব। একলা যাসনি, হারিয়ে যাবি।'

এবং তাঁর লোল কুঞ্চিত চর্ম মুঠোয় ধরা ছোট কচি রাঙা হাতখানি আর ছাড়লেন না।

পরিক্রমা বাণী মুখে নারায়ণ নারায়ণ বলতে বলতে ও তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'থারি বাপ কি কাঁই নামছে? (তোর বাবার কি নাম?) তুই কাদের ঘরের মেয়ে? রাজপুত? সঙ্গে কে কে আছে দাদী ছাড়া? দাঁড়া, এখনো সকাল হয়নি, আলো হোক ভাল করে, তখন দেখতে পাওয়া যাবে। আমার মত লুগড়ি তো অনেক বুড়ী দাদীরই আছে। মুস্কিল তো তাই।'

আবার বললেন, 'নারায়ণ নারায়ণ, হরে রাম হরে রাম।' ঠাকুরের নামেও খেই ছেড়ে যাচ্ছে।

মনে হচ্ছে মেয়েটি যেমন সুন্দর তেমনি শান্ত। ভয় পেয়েছে বড়, কেমন হাত ধরে চলেছে।

আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'যদি ঠাকুমাকে না পাই? কোন গাঁ থেকে আসছিস—না শহর থেকে? গাঁয়ের লোক আরো সঙ্গে আছে তো? তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দোব।'

মেয়েটি বললে, 'শহর থেকে আসছি। গোপালজীর সড়ক থেকে।'

সুজাবাঈ বললেন, 'শহর থেকে? এখানে জয়পুরেই বাড়ি? কোন্ রাস্তায়? গোপালজীর সড়ক? আমার বাড়িও তো বিদ্যাধরজীর সড়ক। ওই কাছেই। দাদীকে ন পেলে বাড়ি চিনতে পারবি তো? বাপের নাম কি? ভাইবোন আছে? তোর নাম কি

এতক্ষণে মেয়েটি কাঁদতে ভুলে গেছে। বললে, 'বাবার নাম সমুদ্র সিং। আমার নাম কৃষণা। কিষণিবাঈ, লাড়লীবাঈও বলে। ভাইবোন আছে আরও তিনজন।'

লাড়লী হল আদরিণী। রাধিকার আর একটি নাম।

সকালের আলো হয়েছে। সুজাবাঈ তার মুখের দিতে চাইলেন। লাড়লীই বটে। বালিকা শ্রীরাধাই যেন তাঁর হাত ধরে চলেছেন।

বললেন, 'তোর ঠাকুমার নামটা বল, চেঁচিয়ে ডাকতে পারব। দেখতে পেলে দেখিয়ে দিস্।'

ঠাকুমার নাম তিজাবাঈ। 'তীজের' মেলার দিন জন্মেছিল কিনা।

কিষণি বা লাড়লীর আর ভয় নেই। বলতে শুরু করলে, 'আমি হারাই না কখনো। কত মেলায় গিয়েছি। মতিডুঙরিতে গণেশজীর মেলায় গিয়েছি। হঠাৎ এবার হারিয়ে গিয়েছি। এবারে দাদী কোথায় যে চলে গেল দেখতেই পেলাম না। ঠাকুমার লুগড়ীর মতই তো অনেক লোকের লুগড়ী। তাই বুঝতে পারিনি।'

লাড়লীর মিষ্টি মিষ্টি কথা আর হাসি বুড়ী সুজাবাইয়ের ভারি ভালো লাগছিল। ওঁদেরই ঘর, রাজপুতের মেয়ে। সব ঠাকুমা দিদিমার মতই বিয়ের সম্বন্ধ করতে ইচ্ছে হল।

তিজাবাইয়ের দলও 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' মুখে, তার মাঝে 'আরে কোড়ে গিয়ো ছোরী' কিম্বা 'দৌড়কে চাল নারে বাই অর্থাৎ কোথায় গেলিরে খুকি' বা শীগগীর চল্ নারে খুকী বলছে। আর চারিধারে গান বা ভজনও চলছে। খাদ্য বিক্রির ও জলপানশালাতেও ছোট ছোট ছেলেরা দাঁড়াচ্ছে।

দেখতে দেখতে এসে পড়ল একটি বিশেষ জাগ্রত মহাদেবের মন্দির। ধূলেশ্বরজীর মন্দির।

ইনি শিব স্বয়ম্ভূ। প্রতিষ্ঠা করা নয়। মস্ত বাগানের মাঝে সে মন্দিরের পথ। ধূসর পাথরের পাতাল ফোঁড়া শিব বলে লোকে।

পরিক্রমার দল, পথের সব মন্দির, সব দেবালয়, ঠাকুরের আস্তানা বা স্থানও পরিক্রমা করবে।

যারা সেইদিনেই পরিক্রমা শেষ করে বাড়ি ফিরবে তারা দাঁড়াবে না, ঠাকুর দর্শন করেই পথে চলবে। যারা তিনদিন বা সাতদিন কিম্বা একমাস ধরে পরিক্রমা করবে, তারা ঐসব নানা জায়গায় বনভোজন করবে। যদি কারুর আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি থাকে, রাত্রিবাস করবে। জমায়েত হয়ে গান গাইবে।

মীরাবাঈয়ের গান 'মেরী লগন লগি হরি আওয়নকী'। সুরদাসের ভক্তিমূলক গান 'নন্দলালা' ব্রজগোপালা, গিরধারজী নাগরের নামের সঙ্গীত।

তিজাবাঈ গানে গল্পে এবং ভজনে অন্যমন ছিলেন।

নাতনী যে আঁচল ছেড়ে কখন বিচ্ছিন্ন সঙ্গ হয়ে গেছে জানতে পারেননি।

অকস্মাৎ পিছন ফিরে দেখলেন কিষণি নেই।

চারিদিকে ভিড় আরো জমে উঠেছে, বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব পাড়া থেকেই আরো লোক বেরুচ্ছে। সামনে পিছনে অসংখ্য ছেলেমেয়ের দল ওড়নায় পাগড়িতে জামাতে নানা রংয়ের সমাবেশ। ছোট বড় বালকের ভিড়।

সঙ্গের লোকদের জিজ্ঞাসা করেন, কিষণি কই? কৃষ্ণা তাদের কাছে কি?

—না তো।

অচেনা ছোট ছোট মেয়ের হাত ধরে মুখ ফিরিয়ে দেখেন। ডাকেন, আরে কিষণিবাঈ। না, কিষণি নেই। সাড়া পান না কিষণির।

চেনা অচেনা সহযাত্রী পথিক সকলকে জিজ্ঞাসা করেন। না, তারা দেখেনি, ঠাকুরের নাম করতে করতে এগিয়ে যায়। বলে, না বাইজী, আমরা কিষণ-কুমারী বলে কারুকে দেখিনি। সহৃদয় কেউ বলে, আচ্ছা দেখতে পাই তো, পাঠিয়ে দোব। কি রকম ওড়না ঘাগরা পরে আছে, কেমন দেখতে বলো।

সজলনেত্রে বৃদ্ধা নাতনীর চেহারার বিবরণ দেন।

ক্রমাগত একে ওকে ধরেন। জিজ্ঞাসা করেন। কখনো বা কোনো ছোটো মেয়েকেই কিষণি বলে হাত ধরেন।

বুড়ী সহযাত্রিনীরা কেউ কেউ বলে, 'ছোকরী কাঁইনে লাই' (খুকীকে আন্‌লি কেন) যদি সামলাতে না পারবি!

কেউ বলে, এখনকার মেয়ে-ছেলেরা যা বজ্জাত। আনাই ভুল। সামলানো দায়। সবাই এগিয়ে যায়।

তিজাবাঈও সামনে পিছনে চাইতে চাইতে এগিয়ে যেতে থাকেন। দাঁড়ানোও চলে না, সে হয়তো এগিয়ে গেছে। পিছনেও ফিরে যেতে পারেন না।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে তিজাবাঈয়ের আশেপাশে গুটিকয়েক কৃষ্ণকুমারী বা কিষণির মত মেয়ে এসে জড় হল।

দু-তিনজনের নাম কিষণি। যাদের নাম কিষণি নয়—কিন্তু ওড়না তাদের কিষণির মত। অথবা কারুর ঘাগরা কিষণির মত।

দয়ালু সহৃদয় লোকেরা ধমকে বকে ধরে এনেছে বুড়ীর পাশে। দাদীকে (ঠাকুমাকে) জ্বালাচ্ছিস্‌ বলে, কিম্বা মিথ্যে কথা বলছিস্‌ কিষণি নাম নয় বলে।

কিন্তু তারা তো কিষণি নয় সত্যি! ফিরে যায় পথে।

এসে পড়ল কান্তিবাবুজীর গোপালজীর রাধাকৃষ্ণের মন্দির।

যাত্রীদল দর্শন করতে থামল।

তারপর আসবে বনের পথে নাগদেবজীর মন্দির। সেখানে কোনো কোনো দল জিরোবে হয়ত অনেকক্ষণ।

এর পরে আসবে বালানন্দজী পঞ্চমুখী হনুমানজীর থান। পথে মঙ্গলবার পড়লে মহাবীরভক্তরা সেখানে একদিন থাকবেন। মঙ্গলবার পড়লে মহাবীরের 'বার'। ব্রত উপবাস বা হনুমানজীর বার করবে অনেকে।

রাস্তায় রাস্তায় কুঁড়েঘর বেঁধে পিয়াউ বা পুণ্য জলদানশালা রয়েছে। একটি নারী বা পুরুষ সেই জলদানশালায় বসে থাকে যাত্রীদের জল দেবার জন্য। ঘটি করে জল ঢেলে দিচ্ছে—হাতের অঞ্জলি ভরে পান করছে লোকে।

কিছু যাত্রী বেরিয়ে গেছে মতিডুঙ্গরীর গণেশজীর মন্দিরপথে। ছোট এক পাহাড়ের কেল্লার ধারে পাহাড়ের গায়েই খোদানো প্রকাণ্ড গণেশ মূর্তির মন্দির। বিরাট গণেশজী।

কেউ বা ছেলেমেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে আসবে যাতে সুভালাভালি মঙ্গলকাজটি হয়ে যায় সিদ্ধিদাতার কৃপায়।

অবাধ্য বৌ, বিয়ে, চাকরি, ব্যবসা, অসুখ, সন্তান আকাঙ্ক্ষা, আধি-ব্যাধি-মামলা মোকর্দমা বিষয় সব কামনারই পূরণ-কর্তা তিনি সিদ্ধিদাতা। এবং গণেশজী আর হনুমানজীর কাছে সকলেরই আবেদন নিবেদন শরণ নেওয়া বেশী চলে। অতটা গোবিন্দজীর কাছেও নয়, অম্বরেশ্বরী কালীর কাছেও নয়।

সেখান থেকে যাবে তারা কেউ কেউ ঝোটওয়াড়া গ্রামের পথে। সেখানে আছেন টেঁড় কী বালাজী নামে মহাবীর। কেউ বলে তিনি নগরপাল ভৈরবও। লালমূর্তি, বিস্তৃত বদন, গদা এক হাতে, প্রসারিত অন্য হাতে লাড্ডু দেয় লোক।

পথ মুখর গল্পে গানে। সবাই দল বেঁধে যাচ্ছে—পুরুষ মেয়ে শিশু বালক বালিকারা। ভক্ত হনুমানেরও ভজন গান আছে, যিনি সাগর পার হয়ে সীতামায়ীর খবর এনে দিয়েছিলেন রামজীকে।

বুড়ী তিজাবাই রাগে আগুন হয়ে উঠছেন। ক্রমে রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আকুল হয়ে এক জায়গায় বসে পড়লেন।

এবারে রাগ কমে ভাবনা লজ্জা ভয় মনে এলো। বাড়িতে ছেলে-বৌয়ের কাছে কি বলবেন? সকলে কি বলবে? কত বকবে! সব ভাবনার সঙ্গে মনে হয় সত্যি কি মেয়েটা হারিয়েই যাবে চিরকালের মত? কে ধরে নিয়ে যাবে সুন্দর মেয়ে, বিক্রী করেও তো দেয় লোকে। এক কূয়ার ধারে বসে বুড়ী অঝোরঝরে কাঁদে।

বৃদ্ধ বয়সে বুড়ীর কলঙ্ক মেয়ে এনে হারিয়ে ফেলার। বাড়ির কলঙ্ক মেয়ে হারানোর। মেয়ের সাত বছর বয়স তো হয়েছে, ওঁদের বংশের মতে বিয়ের বয়স এসেছে।

বুড়ীর লজ্জা ভয়ের আর সীমা নেই। কে কি বলবে। আশেপাশে আরো সহযাত্রিনী সমব্যথিনী বুড়ী ও নরনারী জড় হয়ে নানা সান্ত্বনা বাক্য বলছে।

কেউ বলছে, 'পুজো মান্ মহাবীরের, সীতা উদ্ধার হয়েছিল আর তোর মেয়ে উদ্ধার করে দেবেন না!'

আবার বলে দেয়, 'হনুমানজীর দুহাতে দুটো আর মুখে একটা এক এক পোয়া ওজনের লাড্ডু দিস। দক্ষিণা দিস ভাল করে।'

কেউ বলে, 'মেয়ের গায়ে গহনা ছিল? কি ছিল বলেওড়া চাঁদির? কানে সোনার মাকড়ি নাকে নথ ছিল?'

'যাঃ, ওকি আর পাবি, মেয়েই চুরি হয়ে যাবে।'

ভীত বুড়ী আকুল হয়ে কাঁদে।

কেউ সান্ত্বনা দেয়, 'গণেশজীর মতিডুঙ্গরী ছাড়িয়ে এলি। গড় গণেশজীর কাছে আমেরএ (অম্বর) মানত কর। পাবি, ফিরে পাবি। কাঁদিসনি।'

এদিকে সুজাবাঈয়ের দল মাইল খানেক পথ এগিয়েই আছে। কাজেই কিষণি তাঁর সঙ্গেই চলছে। বুড়ীর ওড়না সে ছাড়েনি। বুড়ীও তার হাত ছাড়েনি।

হঠাৎ পিছন থেকে কারা ডাকল, 'কিষণি, আরে কিষণিবাই কার সঙ্গে যাচ্ছিস?

সুজাবাঈ থামলেন, কিষণির হাত ধরেই ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কে তোরা?'

কিষণিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ওরা চিনিস?'

কিষণি বললে, 'আমাদের পাড়ায় বামুনদের ছেলে, ওর বোনকে চিনি। আমাদের সঙ্গে খেলতে আসে।'

সুজাবাঈ বললেন, 'সে বোন আছে সঙ্গে? তোর ঠাকুমা চেনে ওদের?'

'কিষণি বললে, 'জানি না তো। বোন নেই।'

ছেলেগুলো তিন চারজন, চেনা অচেনা, ওদের ঘিরে দাঁড়াল। একটা বড় ছেলে বললে, 'কিষণি তোমার কে হয়? তোমার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছে?'

বৃদ্ধাও বললেন, 'তোরা ওর কেউ হোস কি?'

তারা বললে, 'না। আমরা ওদের পাড়ার লোক। কিন্তু তোমাকে তো কখনো দেখি-নি।'

আশেপাশে লোক জমতে লাগল।

একজন গিন্নী-বান্নি মত মেয়ে বললে, 'তোমার কেউ হয় নাকি মেয়েটা? ওকে নিয়ে যাচ্ছ যে? ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছ না তো?'

আর একজন বললে খুব চুপি চুপি, 'বুড়ী ডাইনী বোধহয়। 'তুক গুণ' করেছে। না হলে অচেনা মেয়ে ওর সঙ্গে চলে যাচ্ছে!'

কিষণির মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল, সুজাবাঈ রেগে উঠলেন। 'ডাইনী' কথার মানে ছোট হলেও কিষণি বোঝে। সুজাবাঈও ইঙ্গিত বুঝলেন। রেগে গম্ভীর মুখে বুড়ীকে যারা ডাইনী বলছিল তাদের বললেন, 'তোরা নিয়ে যাবি তোদের সঙ্গে? তা ডাইনি তো তোরাও হতে পারিস্।' আর কিষণিকে বললেন, 'যাবি ওদের সঙ্গে—চিনিস্? তাহলে যা। ওরাও তোকে রক্ত শুষে খেয়ে নিতে পারে—রাত্রির বেলা মশানে নিয়ে গিয়ে' এবং কিষণির হাত ছেড়ে দিলেন।

দেখতে দেখতে চারিদিকে লোক জমছে। কিছু লোক সুজাবাঈয়ের চেনা ও দলেরও। তারা ধমক দিয়ে আগন্তুকদের বললে, 'মেয়েটা তো তোদেরও কেউ নয়। যদি চিনিস্ই তো ওর নিজের দাদীকে খুঁজে বের করে আন। তার হাতেই ছেড়ে দোব। এমনি লোকের হাতে কেন দোব।'

কিষণি বিবর্ণ মুখে সুজাবাঈয়ের আঁচল ধরেছিল। ছাড়তে পারেনি। সুজাবাঈ তো তার হাত ছেড়ে দিয়েছিলেন আগেই রাগ করে।

জনতা গান গল্প নাম সঙ্কীর্তন করতে করতে চলল। সর্পদেবতা নাগদেবজীর মন্দির আসবে। তারপর পঞ্চমুখী হনুমান—বালানন্দজী নামের, তাঁকেও এক পলকের জন্য দর্শন করে নিতে হবে।

বুড়ী সুজাবাঈয়ের মনে ভাবনা তাড়া উদ্বেগ একসঙ্গে জমাট বেঁধেছে। পরিক্রমা মাথায় উঠেছে। দর্শন নামগানও বারে বারে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

কি জ্বালা। পরের লেঠা নিয়ে। অন্য মেয়ের হাতে ছেড়ে দিতেও পারবেন না। কাকে বিশ্বাস, কাকে ভরসা করবেন। সুন্দর মেয়ে চুরি কিম্বা বিক্রীর খবর কি তিনি কখনো এত বয়সে শোনেননি? সবই তো জানেন তিনিও। দুষ্টলোক কখনো কখনো এমন শিষ্ট লোক হয়ে সামনে দাঁড়ায়, তাও তো জানেন। এই তো রামবক্সা ছোঁড়া বলছিল, 'মাজী

আমার সঙ্গে দাও। গোপালজীর সড়ক আমি চিনি, ওর বাবার কাছে পৌঁছে দোব। তুমি মন্দির- টন্দির দেখেশুনে সন্ধ্যেবেলা যেও।'

ভ্রূ-কুঁচকে চেয়ে রইলেন তার দিকে।

মনে মনে বললেন, হ্যাঁ, পৌঁছে দেবে বললেই আমি বিশ্বাস করব আর কি? ও মেয়ের অত রূপ। আর ওর বড় হতে কতক্ষণ? কার কাছে কোন্ নাচনেওয়ালী বাঈজীর কাছে বেচে দেবে। কি কোন বড়মানুষ ঠাকুরলোকদের ঘরে বেশ মোটা টাকা দিয়ে বেচে দেবে। কে জানে। আর 'গুম' হয়ে যাবে।

ধর্ম? ধর্ম কি আর এই কলিযুগে কারুর আছে। তুই জোয়ান ছোঁড়া, তোকে বিশ্বাস করে মেয়ে দিই আর কি? আর মুখে বললেন, 'না বেটা। ও তো আমার লুগড়ীর পল্লা (খুঁট) আঁকড়ে ধরে আছে। আমার শরণ নিয়েছেও। 'বালছে' (শিশু), ওকে ছেড়ে দিতে পারব না। ওর বাপ মার কাছে কি দাদীর কাছেই দোব। নইলে আমার পাপ হবে।'

এইবার ফ্যালফ্যালে মুখ কিষণির হাতখানি নিজের হাতে কঠিন করে ধরে নিলেন।

এদিকে তিজাবাঈয়ের কাছে সেই বামুনদের ছেলেরা গোপ্যা, রামনাথ, গণেশো, নান্গাদের (মামার বাড়ীতে জন্মালে অনেক সময়ে নান্গা নাম ধরে ডাকে) দল পিছু হেঁটে তৎক্ষণাৎ খবরটা পৌঁছে দিল।

একসঙ্গে সবাই বলতে আরম্ভ করল, আরে ডোকরী, থারি ছোরিনে ঔর এক ডোকরিকে সাথ দেখা, কাঁই ঠিক কুনছে, মালুম ডাকন্ ইছে। চাইলাম দিলে না, ইত্যাদি।

যার মানে হল, ওরে বুড়ী, তোর মেয়েটাকে আর একটা বুড়ীর সঙ্গে যাচ্ছে দেখতে পেলাম। ডাকলাম, এলো না—কে জানে কোনো ডাইনীবুড়ীই ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হয়ত।

তিজাবাঈ এবারে একেবারে আশ্চর্য ও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কে বুড়ী আছে এপথে যাবার মত চেনা জানা—যাকে কিষণি চেনে? কই কারুকে তো মনে পড়ে না!

যাঃ, একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেল। কেউ ভুলিয়ে গুণ করে তুকতাক করে নিয়ে যাচ্ছে বুঝি।

হতবুদ্ধি বুড়ী গাছতলায় বসে পড়ল।

কেবল কাঁদে। কথা মুখে বেরোয় না।

শেষে বললে, 'তা তোরা ডাকলিনি? ধরে নিয়ে এলি না কেন?'

ছেলের দল বললে, 'সে এলো না। নিশ্চয় কিছু তুকতাক করেছে বুড়ীটা।'

তিজা বুড়ী উঠে দাঁড়াল। কত দূরে তারা আছে? যেতে পারব কি? পৌঁছতে পারব? না, তারা আরো এগিয়ে যাবে।

ছেলেরা বললে, 'তুই পারবিনি। ম্যোটার (পুরুষ) কেউ হলে অত হাঁটতে পারত। তোর সঙ্গে কে কে আছে?'

কেউ নেই। বুড়ী কেঁদে ফেললে।

একটা বড় ছেলে বললে, 'তাদের দলে অনেক লোক। তা আমরা একটু দূরে দূরে তাদের সঙ্গে যাই। মায়ি, তুমি পিছনে এসো। আমাদের দেখতে পেলে তারা ধমকে দেবে। তোমাকে দেখলে কিছু বলবে না।'

তিজাবাঈয়ের আশেপাশেও ডাইনীর ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার চমকপ্রদ গল্পে লোকের

গান ভজন কীর্তন গল্প গুজব পথ ভুলে থমকে গেল।

হ্যাঁ। তারা সকলেই ডাইনী ডাকিনীর কথা গল্প অনেক শুনেছে। কারুর ঠাকুমা, কারুর দিদিমা, মাসী, পিসি, সখি, সঙ্গিনী, কারুর কুটুম্ব আত্মীয় গ্রামের লোক পাড়ার লোকেরা বলেছে।

এমন অনেক গল্প তারা জানে। ডাইনী তাকালেই ছেলেমেয়েরা পোষমানা জন্তুর মত বোবা হয়ে তার সঙ্গে চলে যায়। অসুখে পড়ে যায়। আপনার লোকেদের চিনতে পারে না আর।

আর ডাইনীরা তাদের যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে না পারে তাহলে শুধু চোখের দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়েই তাদের সব রক্ত শুষে নেয়। রাত্তিরবেলা ঘরে বিছানাতে শুয়ে মরে যায়।

কেউ বললে, আমাদের সীতারামের ছেলের কথা শুনিসনি? ডাইনী মাগী আপনার লোক। বোনের শাশুড়ী। ছেলে খেলা করছে উঠানে, বাস্! যেমন দেখতে পাওয়া আর ছেলের সেদিন জ্বর। তারপর বিকার! কত ঝাড়ফুঁক করে বিকানের থেকে এক বড় গুণিন এনে তবে বাঁচল। তা তার টাকা আছে। আর একেবারে রক্ত চুষে নিতে পারেনি।

আর একজন বলে আর সেই নারঙ্গীবাঈয়ের—মেয়ের সঙ্গের কর্তা ধমক দিল, 'আরে, আরে গল্প করতে শুনতে বসলে আজ আর 'পরকম্মা' (পরিক্রমা) শেষ হবে না।'

'তাই তো।' দল ভেঙে কিছু লোক এগিয়ে চললো।

তিজাবাঈও উঠল। পা চলে না বয়সের জন্য ও মনের ভাবনার জন্য।

চলতে চলতে এলো নাহারগড়ের নীচের লোহার মস্ত দরজা—গণেশপোল যার নাম। সে পথ এখন অরণ্যে জঙ্গলে ঝোপেঝাড়ে কাঁটাবনে চিরকালের মতই প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। আগের দিনে ওসব দরজা খোলা হত। নাহারগড় কেল্লায় নানা প্রবেশপথের সেটাও একটা। এখন শহর নিচে নেমে এসেছে। এবং আরো বিস্তৃত হয়েছে। দিকে দিকে পাহাড়ে পাহাড়ে কেল্লাও আছে।

কোথাও কোষাগার আছে। সৈন্য সেপাই শান্ত্রীও আছে কিন্তু আর তো রাজায় রাজায় যুদ্ধ নেই। কাজেই তাদের তেমন দরকার হয় না। কেল্লায় রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া।

কেল্লার পিছনদিকে গণেশ মন্দির। কেল্লার নাম গণেশগড়। সাধারণ লোকের প্রায় অগম্য নিষিদ্ধও বটে।

নীল পাহাড়ের নিচে নিচে কাঁকর বিছানো সঙ্কীর্ণ রাজপথ। আবার বনময় সরু সরু চলনপথেও মানুষ চলে যাচ্ছে। সেগুলো শুঁড়িপথ।

এসে পড়ল একটা বাঁধ বা জলাশয়। বজাজোঁ কি বাউড়ী (ব্যবসায়ীদের বাঁধ), কবে কোন্ ব্যাপারীদের তৈরী বাঁধ। পাহাড়ের জল জমিয়ে জলাশয় একটি কুণ্ডের মতন। বর্ষায় ভরে যায়। যাত্রীরা জলের ধারে জিরোলো। জল খেল। হাতমুখ ধুলো। ঠাকুর মন্দিরও আছে গ্রামদেবতা মহাবীর বা ভৈরব।

তিজাবাঈয়ের জিরোবার সময় নেই। সব দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করছেন। আর মানসিকের অঙ্ক বেড়ে চলেছে পয়সা টাকা আনায়।

হঠাৎ এসে পড়ল বদরীনাথজীর মন্দির। পাহাড় দেশ তো। নাই-বা হল হিমালয়। নাই-বা হল সেই বদরিকাশ্রম। বদরীনাথজী তা বলে পাহাড় দেশের গ্রামে থাকবেন না!

কবেকার কে জানে মন্দির। কোন্ ভক্ত, কোনো সন্ন্যাসী বা রাজা জমিদার কে কবে একটি ডুঙ্গরীকে (ক্ষুদ্র গণ্ড-শৈল) বদরীনাথজী বলে গেছেন, আর বদরিকাশ্রমের নাম না জানে এমন হিন্দু কে আছে। সবাই দাঁড়াল জয়-বদরী বিশাল কি জয় বদরীনাথজী বলে।

তারপর গল্‌তা পাহাড়। পাথর বাঁধানো পরিষ্কার পথ। ওপরে সূর্যমন্দির। আবার খানিক নেবে সাদা গোমুখ। বাঁধানো ঝরনা থেকে পাহাড়ের ওপর থেকে অবিরাম জলধারা পড়ছে অনেক নিচে একটি কালো গভীর কুণ্ডে। কুণ্ডের পাশে সারি সারি নানা দেবতার মন্দির। দালান বাড়ির মত। লোকে বলে পুরাণের গালব মুনির আশ্রম ওটি। সে যাঁরই আশ্রম হোক। ওটি অনেকদিনের পবিত্র জলকুণ্ড দেবালয়গৃহ, একটি স্নানতীর্থ চিরকালের। গঙ্গাযমুনার মতই পাপহারিণী পাপনাশিনী। গোদাবরী নর্মদার মতই পুণ্য-তীর্থ-সলিলা।

তিজাবাঈ পাহাড়ের নীচে থেকেই নমস্কার করে বাহির দরজার হনুমানজীকে প্রণাম করে আবার একসেরী লাড্ডু মানসিক করে সূরযপোল গেট দিয়ে শহরে ঢুকলেন ব্রহ্মপুরী (বিরমপুরীর) পথে। পাহাড়ে উঠতে পারলেন না। কিছু ভাববার ক্ষমতা নেই। চোখেও জল নেই। পরনের বসন এলোমেলো। বার্ধক্যের শীর্ণ মুখ শুকিয়ে আরো তুবড়ে গেছে।

সঙ্গে অনেক চেনা-অচেনা সহযাত্রী। কিছু ছেলের দলও আছে। নাতনী-হারানো দাদী এতক্ষণে সকলেরই চেনা হয়ে গেছেন। যারা কিষণিকে খুঁজতে গিয়েছিল তারা অবশ্য ফিরে আসেনি তখনো।

শ্রাবণের সন্ধ্যে। তখনো ঘোর ঘোর হয়নি। গোপালজীর সড়কে এসে পৌছলেন। গোপাল মন্দিরের সামনে থমকে দাঁড়ালেন। চোখে জল নেমে এলো অজস্রধারায় দেবতার ওপর ক্ষোভের অভিমানের।

কি করে বাড়ি ঢুকবেন নাতনীকে হারিয়ে এসে!

লজ্জা ধিক্কারের ভয়ে ভাবনায় জটিল মন নিয়ে স্থাণুমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন। বাড়ির লোক পাড়ার লোকেরা কি বলবে। কি জবাব দেবেন।

সহসা কে ডাকল, 'আরে ডোকরী, থারি ছোরি তো আ গয়ি' (ও বুড়ী, খুকী এসে পড়েছে)। চমকে উঠলেন তিজাবাঈ।

কে হাত ধরল, বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল, তা তিনি জানেন না। বুঝতে পারলেন না। চোখের জলধারা তখনো শুকোয়নি।

দেখতে পেলেন ভিতরের সামনের তেবারাতে (দালানে) তাঁরই মত বেগুনী ঘাগরা পরা খয়েরী ওড়না গায়ে তাঁরই মত শীর্ণদেহ একটি বৃদ্ধা বসে। তাঁর চারদিকে তাঁর বাড়ির লোকেরা দাঁড়িয়ে বসে কথা কইছে।

এবং কিষণির হাতে হনুমানজীর প্রসাদের একটি বড়সড় লাড্ডু, সে অবাক হয়ে এক একবার খাচ্ছে আর চারদিকে তাকাচ্ছে।

লোকজনের কলরবসহ তিজাবাঈ ভেতরে ঢুকতেই সেই বুড়ীও মুখ ফেরালো সকলের সঙ্গে সেদিকে।

কাছে এসে তারপর দুজনেই অবাক।

আশ্চর্য হয়ে দুজনেই বলেন এক কথা, 'আরে ভাইলি, ভাইলি (আরে সই, সই)। একি রকম হল সই, তুমি এখানে এলে কি করে।'

দুজনের চোখের জল, আঁচলের মানসিকের পয়সা, আর সারাদিনের উদ্বেগের কাহিনী, আর সমবেত পরিজন পাড়ার লোক মিলে প্রায় একটি বিয়েবাড়ীর গোলমালে পরিণত হল ব্যাপারটা।

সেই সই-পাতানো কবেকার মানুষ বাল্যসঙ্গিনী মামার বাড়ির দেশের—কতবার দেখা হয়েছে। আবার কত দীর্ঘকাল দেখাশোনা নেই।

কি আশ্চর্য ঘটনা!

কেমন করে কখন মেয়ে হারালো, কি করে পথে আর দেখাও হল না, আর আশ্চর্য কেন যে দাদী বলে, দাদীর সইকেই ডাকল। একেবারে অবাক কাণ্ড।

আর দুজনেই বিদ্যাধরজীর রাস্তা আর গোপালজীর সড়কে এত কাছাকাছি রয়েছি।

দুই বুড়ীর মানতের পয়সা জমে পাল্লা (আঁচল) ভারি। দেবতাদের ঋণ, আবার কাছাকাছি নয়। সেই গলতা পাহাড়, গণেশগড়, টেঁড় কী বালাজী, হনুমানজী, সব পাহাড়ের, সব পথের সমতলের, পুণ্য জলকুণ্ডের কোন দেবতার কাছেই আর মানসিক করতে তাঁরা বাকি রাখেননি।

পৌষ, ১৩৭১

বেটী কা বাপ্

বিশাল এক অশ্বত্থ গাছের তলায় এক প্রকাণ্ড কুয়ো। কুয়োর মুখের বেড়টাই প্রায় সাত-আট হাত। আর গভীরতা প্রায় একশো হাত বা আরো বেশী।

রাজস্থানের সব কুয়োর মতই সে কুয়োর জলও বলদে টেনে তোলে। একটা চামড়ার থলে করে প্রকাণ্ড কাছি দিয়ে বেঁধে। গরু বা বলদ সেই দড়ি বাঁধা গলায় নিচু একটা ঢালু জমিতে নেমে যায় আর কুয়ো থেকে চামড়ার চড়স বা থলে ভর্তি জল উঠে এসে নালা প্রণালী বেয়ে ছোট চৌবাচ্চা ও ক্ষেতে ক্ষেতে চলে যায়। কুয়োর চারিদিকে লোকের ভিড়। জলের প্রয়োজন সকলেরই। মাথার উপর পিতল তামা-মাটির কলসী নিয়ে গ্রামের মেয়েরা এসেছে। পুরুষরা আল বেঁধে জল নিচ্ছে।

সারা গ্রামের সব অধিবাসীরই জন্য হল এই কুয়োতলা। কোনো গ্রামে দুটি-তিনটি কুয়ো, কোথাও আরও বেশী, যদি ধনীসম্প্রদায় থাকে অবশ্য।

ভোর থেকে কুয়ো-চালানোর গান শুরু হয়। 'আরে কীলো চলিও পানি ভরিও।' 'কুয়া চলিও' বলেও কেউ কেউ গান গায়। আরো গ্রামসঙ্গীত লোকসঙ্গীত গায় মেয়েরা-পুরুষরা। তবে গরু খেদিয়ে চড়স ভরার গান প্রায় দু'লাইনেই সারা, দুটি মানুষ গায়।

আর অশ্বত্থতলায় অন্যদিকে গল্প গান বচসা বাক্‌বিতণ্ডা নিয়ে বসে থাকে, জল ভরে নেওয়া নানা বয়সের মেয়ে।

জলের দরকারে সমস্ত সকাল আর বিকাল যেন সারা গ্রামটি জড় হয় ঐ কুয়োতলায়। চাষী কৃষক পুরুষও থাকে আশেপাশে। তাদের কাজের অবসরে তামাক খাওয়া, দু-চারটে কথা বলার চেষ্টা—অবসর নেই অবশ্য।

সেদিনও কোন মেয়ে বাসন মেজে নিচ্ছে 'শুক্‌মঞ্জন' (শুষ্ক মার্জনা) করে। জল পড়লেই অশুচি হয়ে যায় সে দেশে। জলে শুদ্ধ হয়ে না। শুকনো বালিতেই শুদ্ধ। কোনো মেয়ের দল জল ভরে তিনটে কলসী উপরি উপরি মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরছে।

সহসা দেখা গেল একটা দীর্ঘাঙ্গী প্রৌঢ়া নারী তিনটি বালিকার সঙ্গে আসছে।

কুয়োতলার কর্ম ও গল্পব্যস্ত সকলেরই সেদিকে চোখ পড়ল। তারা অবাক হয়ে চাইল।

শোনা গেল ঐ বৃদ্ধা রোজ কুয়োর পাড়ে আসে না। কুয়োর ধারে দু-একজন তার সমবয়সী নারী ছিল। নিজেদের মধ্যে তারা কি যেন বললে। একজনের মুখে যেন কুটিল দুষ্ট হাসির আভাস খেলে গেল।

তারপর সে এগিয়ে এসে তাকে বললে, 'কি ভাই, নাতি হয়েছে?'

প্রৌঢ়া ভ্রূকুঞ্চিত করে তার দিকে চাইল। তারপর বেশ বিরক্তভাবে বললে, 'কেন কি হয়েছে তা তো তুমি দেখেই এলে সকালে। আবার জিজ্ঞেস করছ কেন? তামাসা করছ?'

সে বললে, 'ওমা, আমি আবার কখন দেখলাম!'

প্রৌঢ়া বললে, 'কেন সবারি সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলে হাসছিলে। বলছিলে—এবারও

মেয়ে হয়েছে। ছটা মেয়ে হয়েছে। মজা বুঝবে। সবই আমার ছোট ছেলে শুনেছে। আমি "জাপায়" (আঁতুড়ঘর) ছিলাম। পরে শুনলাম। এখন নাইতে এলাম।'

অন্য বুড়ী গালে হাত দিল। গলার সুর উঁচু করল। উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে বললে, 'দেখ একবার! গায়ে পড়ে ঝগড়া করার রকম দেখ কুশল সিংয়ের মার! কি কাণ্ড! আমি তো বাড়ি থেকে সোজা কুয়োতেই আসছি। তা তোমার বাড়ি পথে পড়ে, একপলক মাত্র দাঁড়িয়েছিলাম। তার মাঝে অত কথা কখন বা বললাম, কার কাছেই বা বললাম? তোমার ছোট ছেলে সন্ত সিং তো দেখি খুব খারাপ লোক! আর ছেলে হয়েছে কি মেয়ে হয়েছে বললে দোষটাই বা কি?'

চারিদিকের মেয়েদের ততক্ষণে কুয়োর জল তোলা বন্ধ হয়ে গেছে। বেশি ঘোমটা দিয়ে কম ঘোমটা দিয়ে সবাই দুই বুড়ীকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

সন্ত সিংয়ের মা রাগে আগুন হয়ে গেছে। তার মুখে কথা বেরুচ্ছে না।

অন্য বুড়ীটি বিনিয়ে বিনিয়ে নানারকম কথা বলে চলেছে। যার প্রতিপাদ্য বিষয় হল, মেয়ে হয়েছে কি ছেলে হয়েছে লোকে দেখতেও যায়, মুখেও বলে থাকে। তাতে তো কোনো কেউই কখনো রাগ করে না। তুই বুড়ী বাতাসে দড়ি বেঁধে ঝগড়া করছিস কেন? কি ঝগড়াটে গো! বেশ হয়েছে, মেয়ে হয়েছে! রাজপুতের ঘরে গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে হওয়ার ফল ভোগ কর্ সবাই! মনে নেই, সেবার তোর মা আমার পিসিকে কি বলেছিল—চার মেয়ের মা হয়েছে বলে!

সন্ত সিংয়ের মা অবাক! মা কবে বলেছে তোর পিসিকে ওকথা? আমিই বা তাকে কবে দেখলাম? তুই তো কম মিথ্যাবাদী নস!

তুমুল বচসার মাঝে শোনা গেল। অন্য বুড়ীকে পাড়ার মোতিবাঈ সে কথা বলেছে। রাজপুতের ঘরের মেয়ে বেশী হবার খোঁটা আর টিটকারি বুঝি ওরাই কে কবে দিয়েছিল সন্ত সিংয়ের বাড়ি থেকে। ওর পিসির নাম করেনি বটে কিন্তু তাকে দেখেই বলেছিল, এবং সে কথা তো এ বুড়ী ভোলেনি—আজ পালটা টিটকিরি দিয়েছে তাই। মেয়ে হয়েছে জেনেও ছেলে হয়েছে বলে ন্যাকা সেজে আনন্দ জানিয়েছে বেশ বেশ বলে।

কুয়োর পাড়ের পুরুষেরা বিব্রত বিরক্ত হয়ে উঠল পাড়ার ঝগড়ায়। কিন্তু কেউই মেয়েলী ব্যক্তিগত ঝগড়ার মাঝে কথা কইতে চাইল না। তাতে আবার অন্য বুড়ী ভীম সিংয়ের মা প্রসিদ্ধ মুখরা। কিন্তু ঝগড়া, জলতোলা, জলভরা কিছুই থামল না। এবং ক্রমেই রোদ উঠল, বালি তাতল, বেলাও হল। বুড়ীর বাড়িতে আঁতুড়ঘরে কাজও আছে। তিনটি শিশু নাতনীও সঙ্গে, সুতরাং সন্ত সিংয়ের মা বাড়ি ফিরল রাগের আগুনে জ্বলতে জ্বলতেই।

২

বুড়ীর বড় ছেলে কুশল সিং সেপাইতে কাজ করে। তার দুই মেয়ে, এক ছেলে। ছোট ছেলে গ্রামের ক্ষেতখামার দেখে। শহর হাটবাজার যাওয়া আছে। তাও করে, আবার মামলাবাজিও মাঝে মাঝে করে।

বুড়ীই বাড়ির গিন্নী। দু বৌ আর নাতি-নাতনী নিয়ে। তা বড়ছেলের বৌর দুটো মেয়ে হলেও একটা ছেলে আছে। রাজপুতের ঘরের বংশধর। মুখ রেখেছে। ছোট বৌটির এবারে নিয়ে চারটে মেয়ে হল। সবাই ভেবেছিল এবার একটি ছেলেই হবে। তাই হিংসুটে জ্ঞাতিগোত্রের গ্রামের লোকের আনন্দের সীমা নেই।

সন্ত সিংয়ের মা ভূরিবাঈয়ের বড় ছেলে সেপাইতে 'অপসর', সামান্য উঁচু পদের (অফিসার)। ছোট ছেলে গাঁয়ের মোড়ল। সকলেরই বেজায় মেজাজ। আবার কুটুম্বরাও পাশের গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ। ছোটখাটো জমিদার বিশেষ।

জ্ঞাতিদের আর কত সয়। কুয়োপাড়ার অন্য বুড়ী গণেশীবাঈ ভূরিবাঈয়ের জ্ঞাতি ননদ।

মনে মনে রাগ আর নানারকমের কল্পনাভাবনা নিয়ে বুড়ী ভূরিবাঈ বাড়ি এসে আঁতুড়ের চালায় উঁকি মারল।

পোয়াতি ঘুমোচ্ছে। আর তার পাশে একরাশ ফুলের মত নতুন শিশুটিও ঘুমোচ্ছে।

হ্যাঁ, খুব সুন্দর হয়েছে। পাশ থেকে নাতনীরাও বলছে, 'দেখ দাদী, কি সুন্দর মেয়ে হয়েছে মার!'

বুড়ীর মুখে হাসি ফুটেছে। বুড়ী বললে, 'হ্যাঁ।'

তার এ নাতনীরাও সুন্দরী। আর সেইজন্যেই তো—কি সেইজন্যে? বুড়ী মনে মনে যেন কি বলল।

তারপর বড়বৌকে ডেকে বললে, ছোটি বিন্দনীকে চা পানি ঝাল গুঁড়ো সব দিয়েছিস? দাই এসেছিল, আবার কখন আসবে? সেঁক তাপ করবে তো?

বড়বৌ আধঘোমটা টেনে শাশুড়ীর কথায় উত্তর দিলে। পাঁচ নাতনী এক নাতি নিয়ে শাশুড়ী বসলে দাওয়ায়। বৌ রুটি করছে রান্নাঘরে। ছেলেরা দুজনেই বাড়ী নেই, কাজে বেরিয়েছে। বুড়ীর মনের মধ্যে কুয়োর পাড়ের রাগ ঝগড়া সত্ত্বেও বাইরে পাশে ফুট্‌ফুটে পাঁচটি রাজপুতকন্যা আর একটি সুন্দর কিশোর পৌত্র মনকে বারে বারে কোমল করে দিচ্ছে।

কিন্তু রাজপুতের ঘরে এত মেয়ে! গালাগালির মত ব্যাপার। একে তো তারা কথায় কথায় 'বেটী কা বাপ' বলে শ্লেষ করে কথা বলে। ভূরিবাঈ নাতনীদের চুল বেঁধে দিতে বসে বহু পুরানো বংশের খানদানী ঘরের অনেক কাহিনী মনে করতে লাগল।

সবই তো তার জানা আছে। লোকে বলে কাল বদলেছে, কই আর বদলেছে? তাহলে কি আর গণেশী মাগী গায়ে পড়ে কথা শুনিয়ে ঝগড়া বাধাতে পারে!

হোক সুন্দর মেয়ে...।

আজ ছেলেদের বলবে ঝগড়ার কথা—একটা বিহিত করতেই হবে।

বিকেলে বড়ছেলে বলে, 'কি বিহিত?'

মা বললে, 'সে যা-হয় করব কিছু তখন বলব। দাঁড়া, আগে কুয়োপুজোটা হয়ে যাক—আঁতুড় থেকে বৌ বেরিয়ে আসুক।'

৩

'কুয়োপুজো' ব্যাপারটা যেন অনেকটা আমাদের ষষ্ঠীপুজোর মত শুচিশুদ্ধ হওয়া। পাঁচ-সাত জন সধবা মেয়ে পোয়াতিকে ধরে উঠিয়ে কুয়োর ধারে আকণ্ঠ ঘোমটা টেনে আনে, তারপর শুভজন্মমঙ্গল সঙ্গীত গাইতে গাইতে তার ঘরে যায়। একজনের কোলে থাকে শিশুটি।

মা ও শিশুর সর্বাঙ্গ ঢাকা, কেউ যেন দেখতে না পায়। 'নজর' লাগবে 'সোঁদা' নতুন শরীরে। আর এই কুয়োপুজোটি করতে হয় শিশুজন্মের ছ'দিনের দিন। অনেকটা 'সেটেরাপূজা'র মত।

নবজাতকের জননী টলতে টলতে যাবে। গায়ে জোর নেই বটেও। আর সেটি দেখাতেও হবে। না হলেই পাড়াপড়শীতে 'ডাইনী' তো থাকতে পারে কেউ—সে ঠিক 'নজর' দিয়ে শিশুর রক্ত অদৃশ্য উপায়ে শোষণ করে নেবে। পোয়াতির ক্ষতি করে দেবে কোনো কিছু।

কুয়োপুজোও হয়ে গেল নিয়মমত।

নতুন শিশু শুয়ে থাকে ঘরের সামনের দাওয়াতে ছোট্ট খাটিয়ায়। আর রাজ্যের শিশু বালক বালিকা এসে তাকে ঘিরে বসে। কেউ বলে কি সুন্দর, কেউ বলে কোলে নেবে। কেউ একটি লাল ফুল নিয়ে আসে, ভাবে নবজাতক দেখবে। কেউ আবার বাতাসা মিষ্টিও আনে খাওয়াবে বলে।

বুড়ি ঠাকুমা ভুরিবাঈয়ের আর নড়বার উপায় নেই। পাছে সত্যিই ওরা মেয়ের মুখে বাতাসা পুরে দেয়। চোখে ফুল বুলিয়ে খোঁচা দেয়।

যদিও কিছুই মায়াদয়া নেই তার মেয়েটার ওপর। চার-পাঁচটা মেয়ের ওপর মেয়ে! দুই ভাইয়ের ঘরে ছ' মেয়ে। রাজপুতের ঘরে মেয়ের ব্যাপার তো সবাই জানে। আজই না হয় ওরা গেরস্থ। নইলে ওদের বংশ তো খুব বড়। বড়ঘরও বটে। তেমনি ঘরের সঙ্গেই তো কুটুম্বিতা করতে হবে। ছেলেদের অত ধন কোথায়? আর মনেও তো খাটো হয় মেয়ের বাপকে।

কুশল সিং এসে দাঁড়াল প্রাঙ্গণে।

খাটের ওপর এক মাসের মেয়ে ঘুমোচ্ছে।

ঘুমন্ত মেয়ের দিকে চেয়ে রইল জ্যেঠা। তার চোখ যেন ফেরে না। মাকে বললে, 'এই মেয়েটা সকলের চেয়ে সুন্দর হয়েছে। যেন পদ্মফুল। এর নাম রাখ পদ্মিনী।'

একটু দূরে বসে মা চরকা কাটছিল।

একটু বিরসভাবে ছেলেকে বললে, 'তুই তো সবগুলোকেই সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে বলেছিস ছোটবেলায়। আর সবাইকেই 'পদ্মিনী' বলতিস্। ছটা পদ্মিনীর জন্যে ছটা ভীম সিংয়ের যোগাড় তো করতে হবে। মাথা আর মান তাতে তো বিকিয়ে যাবে তোদের।'

ছোটছেলে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেও হেসে বললে, 'আর আলাউদ্দিনের ভয়ও আছে পদ্মিনীদের জন্যে।'

মেয়ে জেগে উঠেছিল। জ্যেঠা কোলে তুলে নিয়ে বললে, 'একালে আর আলাউদ্দিন নেই। তার ভয়ও নেই। হোক না ছটা মেয়ে। কেন অত বারবার ছটা মেয়ে বলছ!'

মা তিক্ত মুখে বললে, 'এখন আদর করতে ভাল লাগছে। পরে বুঝবি। এখনি

তো পাড়ার লোকে হাসি তামাসা করছে। সেদিন কুয়োতলায় ভীমের মা কত কথাই বললে! বলে, আমি বলি ছেলে হয়েছে। তা এবারেও মেয়ে!'

দুই ভাইয়ের মুখই গম্ভীর হয়ে গেল।

কুশল সিং শিশুকে বিছানায় নাবিয়ে বললে, 'একালে আর অত ভাবে না লোকে। তুমি কেন কথা বল ওদের সঙ্গে। আমাদের মেয়ে আমরা বুঝবো। লোকের 'পচাইয়ের' দরকার এত কিসের!'

জ্যেঠার পদ্মিনী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটু হাসল যেন। আবার ছোট্ট দুখানি টুকটুকে ঠোঁট দুধ খাবার মত চুষল।

মুগ্ধ জ্যেঠা রাগ ভুলে গেল প্রতিবেশীদের ওপর। আবার নীচু হয়ে মৃদু আঙুলে মেয়ের গালে হাত দিয়ে বললে, 'সত্যিই পদ্মিনীবাঈ আমাদের। রানী পদ্মিনীই হবে দেখিস্।'

৪

মেয়েটা দু'মাসের হয়ে গেল। যেমন শান্ত তেমনি সুন্দর আর মোটাসোটা বড় হয়ে উঠেছে।

গ্রামে, মোতি-জ্বরা (টাইফয়েড) লেগে গেল—ঘরে ঘরে কারুর অসুখ। আবার হাম বসন্ত দেখা দিল—মাতা, ফুলমাতা, ছোটিমাতা নানা নামে মায়ের দয়া দেবী শীতলা-রূপে।

না, ভূরিবাঈদের ঘরের চৌকাঠও কোনো অসুখ আর মাতা ফুলমাতা, কোনো মাতাদেবীই মাড়ালেন না।

ছ-ছটা মেয়ে কারুর গায়ে একটু আঁচড় লাগে না অসুখ-বিসুখের। যদিও প্রথম চারটে নাতনী ঠাকুমার ভারী আদরের। গোদাবরী গঙ্গা জানকী যমুনা আর গৌরীও। সবাইকেই ভূরিবাঈ ভালবাসে। মায়া পড়ে গেছে। মরে যাক্ সেটা খুব মনে হয় না। তবে এই নতুন ছোট্টটা, এটার কোন অসুখ হলে তার দুঃখ ছিল না...বরং সুবিধাই হত...। কি সুবিধা? সে ভূরিবাঈই জানে।

মেয়েটা যত সুন্দর হয়ে ওঠে তত জ্যেঠার আদরের হয়। আদিখ্যেতার হয়। মুখ এবং চেহারা যেন নিখুঁত 'গঙ্গোরের' (গণগৌরী দেবীর) মত।

ঠাকুমা নাতনীদের নিয়ে বসে সকলের চোটী বিনুনী বেঁধে দেয়। আঁচড়ে দেয় মাথায় ঘি মাখিয়ে। আর নানারকম রূপকথা বলে। সোনে কি মক্কী (সোনার ভুট্টা), রাজা কি কুমার ঔর জাঠকি ছোরীর, (রাজার ছেলে আর চাষার মেয়ে) চমকপ্রদ রূপকথা। আবার ইতিহাসের গল্পও বলে—রাজা হাম্বীর রানী কমলাবতী কর্ণাবতী রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারী। তাকে আফিমফুলের কুসুম্ভফুলের বিষ দুধের বাটিতে গুলে খাওয়ানো হল মেরে ফেলার জন্য।

নাতনী গোদাবরী বারো বছরের হয়েছে। আর সকলেও বড় হয়েছে।

তাদের যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। বিষ? কেন দাদী? মরে গেল কৃষ্ণকুমারী? সত্যি বিষ খাইয়ে দিল? কে দিল বাবা, কাকা? কেন দিল?

নির্লিপ্ত মুখে ঠাকুমা বলে, 'আর কেন। রাজপুতের মেয়ে। তারা রাজার মেয়ে হলেও

মেয়ের দায় তো। আর করম তো একটা আছে। করমফল আগের জন্মের ছিল তার।'

রাজপুতের ঘরে বেশী বেটী কা বাপ হওয়া কি কম অপমানের কথা...। তাতে রাজকন্যা? রাজা বাপকেও ছোট হতে হয় তো মেয়ের জন্যে!

নতুন খুকীর দিকে চোখ পড়ে বুড়ীর। সত্যি যেন কৃষ্ণকুমারী না পদ্মিনীর মতই সুন্দর মেয়েটা। কি সুন্দর যে হচ্ছে দিনে দিনে। ভাল লাগে দেখতে, কিন্তু তার মায়া হয় না। তবু দয়া হয় একটু যেন। থাকে থাক বেঁচে। যদি রামজীর তাই ইচ্ছে হয়।

গোদাবরী ভীতভাবে ঠাকুরমার ঐ কথাকাহিনী শোনে। কিন্তু তার মনে হয় এর চেয়ে আরব্য উপন্যাস রামায়ণ মহাভারতের গল্প ভালো! তাতে রমণীদের জহরব্রত কিম্বা বিষ খাওয়ানো, মেরে ফেলা, মরে যাওয়ার তো গল্প নেই। রানীরাও পুড়ে মরতেন? সভয়ে জিজ্ঞাসা করে।

৫

কুশল সিংয়ের শহরে ডাক পড়ছে কুচ্‌কাওয়াজের জন্য, শীতকাল তো। সে এসে বললে, 'জিজি, (মা), আমি কাল ভোরে শহরে যাব, ফিরে আসতে দিন দশ বারো হবে। আরো কোথায় পাঠায় কিনা কে জানে। আবার সন্তও যাবে একটা মামলা আছে। একটু হাটবাজারও আছে। এখন তো 'রবির' (রবিশস্য) দেরি আছে, ততদিন বাইরে ক্ষেতখামারে বেশী কাজ নেই। শুধু ঘর। আর এই তোর নাতি আর ছটা নাতনী। শীতকালে সাবধানে কাটাস।'

স্নেহশীল কুশল সিং মেয়েদের দিকে চাইল হাসিমুখে। আর ঘুমন্ত খুকীটাকে একবার কোলে তুলে নিল।

দুর্ধর্ষ অপসর (অফিসার), সেপাই জ্যেঠা বললে, এই পদ্মিনীটার জন্যেই আমার মন কেমন করবে খুব। আমি ফিরতে ফিরতে এটা আরো বড় হয়ে যাবে। আর সুন্দর হবে আরো। যদি দেরি হয় ফিরতে।

তার নিজের মেয়ে, অন্য ভাইঝিরা তাকে তখন ঘিরে দাঁড়িয়েছে। শহর থেকে বাবা কি কি আনবে তাদের জন্য। গুড়িয়া (নেকড়ার তৈরি পুতুল), কাঠের খেলনা, রান্নাবাড়ির সরঞ্জাম 'চাক্কি' 'চুলা' তাওয়া থালা সবসুদ্ধ হওয়া চাই খেলনাগুলি।

ছেলে বীর সিং বললে তার একটা হাওয়াগাড়ী চাই কলের।

৬

বড়ছেলে শহরে গেল। কয়েকদিন বাদে সন্ত সিংও মামলা করতে গেল।

দেশে রোগ নেই। শীতের হাওয়া নিমের বাতাস গরু মহিষের দুধ ঘি ছাচ (দই ঘোল) আর ঘরের গমের বেজড়ের রুটি (যব, ছোলা, গম মেশানো রুটি) বাজরার খিচুড়ি দলিয়া লৌজি (আচার) দিয়ে সামান্য ডাল তরকারী দিয়ে খেয়েও তাদের স্বাস্থ্য আর রং যেন ফেটে পড়েছে।

পাঁচটা মেয়ে যেন পাঁচটি গণগৌরী প্রতিমা। বৌদুটিরও রূপ ধরে না শরীরে।

রাজপুত ঘরের মত বুড়ীও সন্ধ্যেবেলা একবাটি আফিম-গোলা জল খায় আর ঝিমোয়। ঝিমোতে ঝিমোতে ওদের কাহিনী শোনায়।

আর ভাবে, না, কোনো মেয়েরই গা গরম হয় না শীতের ঠাণ্ডা লেগে।

সর্দিকাশি হয় না। কিছু হয় না।

তা কারুর না হোক, ছোট্ট ঐ সোঁদা নতুনটারও গায়ে ঠাণ্ডা লাগে না?

এদিকে ছেলেরা চলে গেছে। শাশুড়ী হুকুম করলে, এখন থেকে বিকালে ছোট বিন্দনী (বধূ) রান্নাঘরের কাজ করবে। ওর কাছে মেয়ে দিয়ে। সকালে বড়বউ রাঁধবে।

বুড়ী যেন কি ভাবছে। কি ভাবছে বুড়ী? বড়বৌ ভাবে শঙ্কিত মনে।

৭

ক'দিন গেল কুশল সিং আর সন্ত সিং একসঙ্গেই ফিরল।

ছেলেমেয়েরা সব প্রাঙ্গণে খেলা করছিল। এসে কাছে দাঁড়াল। কাকা ও বাপের হাতে মস্ত ঝোলা-ঝুলি। কিন্তু তারা চেঁচামেচি হৈচৈ কিছু না করে চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল।

পিতা হাসিমুখে ঝোলা থেকে এটা সেটা বার করতে লাগল। খেলনা, পুতুল, খেলার মোটরগাড়ি, একটা লাল ঝুম্‌ঝুমিও।

এবারে হঠাৎ চোখে পড়ল দাওয়ার উপর ছোট খাটুলীটা খালি। খুকীটা কই? পদ্মিনী কই তার!

জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় পদ্মিনী? ভেতরে?'

মা বসেছিল চুপ করে রোয়াকে। কেঁদে উঠল অস্ফুট চেঁচিয়ে মুখটা ঢেকে।

ছোট ছেলেরা খেলনায় হাত দিয়েই দাঁড়িয়েছিল। বড় মেয়েরা চোখ মুছতে লাগল। বৌ দুজন রান্নাঘরের দরজার কাছে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে কাঁদতে লাগল।

কুশল সিং উঠানের একটা খাটিয়ার ওপর বসে পড়ল। সন্ত সিং বিহ্বলভাবে রোয়াকে মার কাছে বসল।

কুশল সিংয়ের হাতে লাল ঝুমঝুমিটা। আর ওদিকে পদ্মিনীর খালি খাট বিছানা। স অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। চোখদুটো লাল হয়ে গেল। তার সেপাইয়ের চোস্ত দাড়ি গোঁফ বেয়ে টপটপ করে চোখের জল পড়তে লাগল।

তারপর চোখ মুছে সহসা গম্ভীর হয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'কব গুজরি বাই? ছোরী কব্ গুজ্‌রী (কবে মারা গেছে মেয়ে)?'

জননী বললে, 'এই পাঁচদিন হল—তোরা যাবার চারদিন পরে কাছে।'

ছেলে বললে, 'কি অসুখ হয়েছিল?'

'কিছুই না। একদিন একটু গা গরম হয়েছিল।'

ছেলেরা সন্দিগ্ধভাবে মার দিকে চাইল। 'ওষুধ এনেছিলে?'

'তোরা নেই। আর একটু জ্বর। ওষুধ কিছু আনিনি। কে আনে। হঠাৎই মরে গেল তা।'

হঠাৎ কুশল সিং গম্ভীর হয়ে গেল। যেন কি একটা কথা মনে হল, আর কিন্তু

কিছু বললে না। ঘরে উঠে গেল।

৮

দিনের কাজ, খাওয়াদাওয়া শেষ হল। সন্ধ্যাও শেষ হল। রাত্রি হল। অনেক রাত্রি।

ছেলেমেয়েরা সব শুয়েছে। ছোটবৌ বড়বৌ ঘরে। সন্ত সিংও শুতে গেছে। কুশল সিং মার ঘরে এসে বসল।

সহসা বললে, 'আর ছটি মেয়ের ভাবনা রইল না তোর।'

মা চকিত হয়ে উঠল। কিছু বলতে পারল না—যেন কি রকম হয়ে গেল মুখটা। তারপর বললে, 'তা রামজী দিয়েছিল। সেই আবার কেড়ে নিল।' বলে চোখদুটো একটু মোছবার মত করলে।

ছেলে কঠিন মুখে মার দিকে চেয়েছিল। 'হ্যাঁ, তা নিয়েছে। তুভি থোড়ি ঘনি অম্মল ঘালি ছি? (তুইও আফিম দিয়েছিস একটু বেশী করে) তাই ঠিক, না?'

মা চমকে উঠে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তারপর রেগে উঠল।

'আফিং কি আজ আমি নতুন দিচ্ছি ছেলেমেয়েদের? তোদের সব ছেলেমেয়েই তো আমার কাছেই অম্মল খেয়ে ঘুমিয়েছে। বারোমাসই তো আমি ঘুম পাড়িয়েছি।'

'হ্যাঁ, তা আমি জানি। তবে এবারে ছটি মেয়ে দেখে একটু বেশী অম্মল দিয়েছিস্। বেশী বেশী ভেবেছিলি কিনা। তাই মাত্রা বেশী হয়ে গেছে।'

কুশল সিং উঠে গেল ঘর থেকে।

মহিলা মহল, ১৩৭১

বিশাখা

পশ্চিমের ছোট শহর। রাধামোহনের প্রকাণ্ড মন্দিরের সংলগ্ন প্রকাণ্ড হাবেলী অথবা বাড়ি। চতুর্দিকে বাগান। তার মাঝে একদিকে কূয়া, তারই কাছে গোশালা। তার ওপাশে কিছু দূরে একটা হাতী চৌবাচ্চা ভরা জল থেকে শুঁড়ে করে জল নিয়ে নিজের মাথায় আর চারধারে ছিটিয়ে খেলা করছে। তার গলার ঘণ্টাটা সঙ্গে সঙ্গে বাজছে টং টং। তার নাম মোহনদাস।

মন্দিরের সামনে দেউড়িতে শুভ্র গুম্ফশ্মশ্রুসমন্বিত গুরুগম্ভীর মূর্তি একটি দারোয়ান বসেছিল। মন্দিরের ভিতরে ভাগবত পাঠ হচ্ছিল।

এমন সময় ঘড় ঘড় শব্দে একটি টাঙ্গা এসে দাঁড়াল, এবং টাঙ্গা থেকে ধূলি-ধূসরিত ঘর্মাক্ত কলেবর একটি যুবক তার বাক্স নিয়ে নামল।

চতুর্দিকে তাকিয়ে বাঙালী কারুকে না দেখে সে দরোয়ানকেই অপূর্ব হিন্দীতে বললে, 'এ জী, ভিতর খবর দেও, শান্তিপুর সে হাম আয়া।'

দরোয়ান বললে, 'তুম কোন হ্যায়? সামান হিঁয়া উতারো, বয়ঠো। দু' বাজে পরসাদ মিল যায় গা, মুসাফির কো মিলতা হায়।'

বিব্রত যুবক মুসাফিরভাবে অভ্যর্থিত হতে প্রস্তুত না হয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হয়েই দেখতে পেলে তার ভগিনীপতি গোঁসাইজী মন্দিরের মধ্যে ঠাকুরের সামনে বসে ভাগবত পাঠ শুনছেন।

সে গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি শশব্যস্তে বললেন, 'আরে—এখানে ঠাকুরের সামনে আমাকে প্রণাম কি করে? তারপর তুমি এখানে হঠাৎ? এসো, এসো ভিতরে চল।'

মন্দিরের পাশের এক গলিপথ দিয়ে অন্তঃপুর সীমানায় যাওয়া যায়।

গোঁসাইজী ডাকলেন, 'এই গোবিন্দ, তোর মাকে ডাক্। তোর বড়মামা এসেছেন।' সেকেলে ধরনের প্রকাণ্ড অদ্ভুত গড়নের বাড়ির কোন একদিক দিয়ে একটি পরম সুন্দর বালক ছুটে বেরিয়ে এলো, তার পেছনে ঘোমটা ঢাকা মুখে বিশাখা এসে ভাইকে প্রণাম করলে।

গোঁসাইজী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ওকে প্রণাম করলে যে?'

বিশাখা হাসলে, মৃদুস্বরে বললে, 'ও যে বড় দাদা।'

'ও তো আমাকে প্রণাম করলে, না হে কিশোর?'

কিশোরও হাসলে, বললে, 'আপনিও যে বড়।'

'তারপর তুমি কি করে এসে পড়লে?' বিশাখা ভাইয়ের পানে চাইল।

'তোকে দেখতে এলাম। কত বছর পরে দেখলাম রে? প্রায় ছ-সাত বছর, না? আচ্ছা আপনাদের দূর দেশ, বাবা।'

গোঁসাইজী হাসলেন, স্ত্রীকে বললেন, 'এখন ওকে জল খাওয়াও, তারপর গল্প

কোরো।'

গোবিন্দর হাত ধরে কিশোর বিশাখার সঙ্গে অন্তঃপুরে চল্‌ল।

বিশাখার মুখের ঘোমটা কমে গেল। দীর্ঘদিন পরে ছবির মত ঘটনার সারি সব তার মনে পড়ল ; চৌদ্দ বছরে বিবাহ হয়ে সে এখানে এসেছিল, পিত্রালয়ে যাওয়া হয়নি। এই সাত বছরের জীবনে তার নিজের নামও যেন সে ভুলে গেছে!

২

দীর্ঘ সাত বছর আগে মাঘ মাসের এক সন্ধ্যায় স্কুলের প্রাইজে হাত ভরে নিয়ে বিশাখা বাড়ি এসেই শুনলে, 'শীগ্‌গির করে ওসব রেখে হাত মুখ ধুয়ে নে সাবান দিয়ে।'

হতবুদ্ধি তার হাত থেকে প্রাইজগুলো মা নিলেন, আর পিসিমা মার হাত থেকে নিয়ে রেখে দিলেন কোথায় কে জানে কোন চৌকির ওপর, অথবা আলমারির মাথায়, কিম্বা লোহার সিন্দুকের তলায়। সে আর কোনোদিন সেগুলো সব ফিরেও পায়নি, দেখেও-নি। সেলাইয়ের প্রাইজ ছিল চমৎকার একটি বাক্স, ইংরাজী বাংলার ফার্স্ট প্রাইজ ভাল ভাল বই ছিল। সারাদিন গান অভিনয় খেলা করে যেমন ক্লান্ত ছিল তেমনি ক্ষুধার্ত ছিল, তার চোখে জল এসে গেল। মাকে বললে, 'বড় খিদে পেয়েছে।'

পিসিমা বললেন, 'ওরে ওরা অনেকক্ষণ বসে বসে আছে, আগে সেজে নে। একটু পরে খাবার খাস না।'

কারা বসে আছে, তা বোঝবার আগেই বাবা এসে ডাকলেন, 'কই তোমাদের হল?'

আর মা পিসিমা সবাই মিলে তাকে সাবান মাখিয়ে চুল আঁচড়ে গহনা কাপড় পরালেন। তারপর বাইরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল, খানিক পরেই ফিরিয়ে আনা হল।

ও তখন প্রাইজগুলো খুঁজে দেখতে গেল রাত্রে। পিসিমা বললেন, 'আর প্রাইজ নিয়ে কি করবি? ওরা মস্ত বড় গোঁসাই, তোকে খুব পছন্দ হয়েছে। কাল সকালে আশীর্বাদ করে যাবে। কিছু নেবে না। সতেরোই মাঘ বিয়ের দিন ঠিক করে গেল।'

খুড়িমা বললেন, 'ওদের হাতী আছে দোরে'—

বিশাখা প্রাইজগুলো খুঁজেই পেল না—মাকে জিজ্ঞেস করলে, বললে, 'মা, ফার্স্ট প্রাইজ ছিল, তুমি দেখলেও না। সব কোথায় গেল খুঁজে পেলাম না!'

মাও বললেন, 'আর প্রাইজ না পেলি খুঁজে,—নেব। কত বড়লোকের ঘরে পড়েছিস, ওদের ঘরে তোর ঐ বই আর সেলাইয়ের কিবা দাম।'

পিসিমা বললেন, 'পাগলী, নাই দেখলাম তোর জিনিস। কাল ওরা রাধারানীর সিঁথি পৈঁছে দিয়ে আশীর্বাদ করবে। সেই তখন দেখবে লোকে দেখিস্।'

পরদিন আশীর্বাদ, তার দুদিন বাদে গায়ে-হলুদ। তারপর তিনদিনের মধ্যে বিবাহ হয়ে গেল। সাতটি দিন কি রকম হৈ চৈ উৎসব সমারোহের মাঝে ফুলঝুরির মত দীপ্ত ও দ্রুতভাবে কোথায় ঝরে গেল।

আঠারোই মাঘ সন্ধ্যায় ট্রেনে সে এসেছিল সেখান থেকে। আর যাওয়া হয়নি। সেই প্রকাণ্ড পুরীর অন্তঃপুরে ছিলেন এক বৃদ্ধা পিসশাশুড়ী, দু-চারজন আশ্রিতা মহিলা আর তার স্বামী ও সে।

বাহিরে মন্দিরে রাধামোহনের নিত্য ভোগ-রাগ উৎসবময় সেবা আর অন্তঃপুরে তার অবগুণ্ঠিত নিঃসংঘাত গুরুজনের সেবাপরায়ণ আদেশপালক দিনযাত্রা। এর মাঝে তার বোন ললিতার বিবাহ হয়েছে, গোবিন্দের জন্ম হয়েছে। বারবার পিত্রালয় থেকে আহ্বান এসেছে কিন্তু তার যাওয়া হয়নি।

দীর্ঘ সাত বছর পরে সে ভাইকে দেখল। পরস্পর অবাক হয়ে চেয়েছিল দুজনে। দু বছরের ছোট ছিল বিশাখা। তখন চৌদ্দ বছরের। কত বড় আর কত সুন্দর হয়েছে বিশাখা! বিশাখাও দাদাকে চিনতে পারত না কেউ বলে না দিলে।

আসন পেতে দাদাকে বসিয়ে সে ভাঁড়ার থেকে এক রেকাবি প্রসাদ আর এক গ্লাস সরবত এনে রাখলো ভাইয়ের সামনে।

কিশোর একটু হাসলে, তারপর বললে, 'একটু চা দিবিনি? অপ্রস্তুত বিশাখা বললে, 'দেখেছ, ভুলে গেছি সব। কিন্তু—।' কিন্তু অর্থাৎ চা দেবে কি করে। যদি বা কবে কার জন্য চা এনেছিল, সে চা ভাঁড়ারের প্রত্যন্ত সীমায় কোনো অস্পৃশ্যালোকে ছিল। কিন্তু পুরানো আমলের কেনা এনামেলের চটা-ওঠা পেয়ালাদুটোর কোনো সন্ধানই আর পাওয়া গেল না। অগত্যা পাথরবাটির পেয়ালাতে করে বিশাখা চা এনে দিল। এবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি, সত্যি দাদা নিতে এসেছ?'

'হ্যাঁরে, নইলে কি শুধু শুধু এই হাজার মাইল ধুলোয় রোদ্দুরের আরাম খেতে আসি? আমার বিয়ে যে!' কিশোর হাসলে।

'সত্যি? তোমার বিয়ে? মিছে করে বলছ না?' বিশাখা উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

'হ্যাঁরে, বিয়ে সত্যিই। বাবা বললেন নিজে গিয়ে না আনলে যদি এবারেও ওরা না পাঠায়। তাই এলাম।'

দীর্ঘকাল পরে আনন্দ অভিমান হাসি কান্নার মাঝখানে থেকে যেন বিশাখা আজ হঠাৎ জেগে উঠল।

ভাইবোন মা-বাপ-সখি-বন্ধু কার কথা যে জিজ্ঞাসা করবে সে ভেবেই পায় না। আর সব কথার মাঝে মনে হয়, দাদার এখানে কত কষ্ট হবে। কত অসুবিধা হতে পারে। এলোমেলো অপ্রস্তুতভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'যেতে যদি দেরি হয় দাদা, তোমার কষ্ট হবে তো এখানে থাকতে? আচ্ছা লতির বর কেমন হয়েছে? খুব বিদ্বান নাকি? দাদা, তুমি কি করছ ভাই? বৌ কোথাকার মেয়ে ভাই?'

দাদা হেসে উঠে দাঁড়াল, বললে, 'আপাততঃ স্নান না করে কষ্ট সত্যি হচ্ছে। তোর ঐ প্রশ্নটির জবাব দিলাম। নেয়ে এলে পরে বাকি জবাবগুলো দেবার চেষ্টা করব।'

'ওমা, দেখেছ—কিছু খ্যালই করিনি!' বিশাখাও উঠে দাঁড়াল অপ্রস্তুতভাবে।

'খ্যাল কিরে?' দাদা হেসে জিজ্ঞেসা করল।

অপ্রতিভ বিশাখা বললে, 'খেয়াল করিনি।'

ছোট ছোট নীচু নীচু ঘরের সামনে সরু থাম দেওয়া দালান পার হয়ে গোবিন্দর হাত ধরে কিশোর প্রকাণ্ড ইঁদারার পাশে পৌঁছল। বিশাখা তেল আর নিজের গামছা এনে দেয়ালে রাখল, বললে, 'দাদা ওঁর কাপড় দোব? পরবে?'

দাদা হাসলে, বললে, 'না, তোর গামছাও লাগবে না। আমার কাপড় তোয়ালে বের করে দে না সুটকেস থেকে।'

রাধামোহনের প্রতিদিনের ভোগের প্রসাদ আর অতিথির জন্য বিশেষ করে বিশাখার রান্না তরকারী দিয়ে হৃষ্টপুষ্ট আনন্দময় পরিতুষ্ট গোঁসাইজী, কিশোর আর গোবিন্দ খেতে বসলেন। বিশাখা তার ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে অল্প ঘোমটা দিয়ে ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে লাগল।

গোঁসাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিশোর কি আমাদের দেশে বেড়াতে এলে? কেমন লাগছে?'

একটু হেসে কিশোর বললে, 'বেড়াতে আসিনি, আপনাদের আমাদের দেশে বেড়াতে নিয়ে যেতে এসেছি।'

গোঁসাই হাসলেন, 'বটে। কবে?'

'কাল যাব ভাবছি, যদি আপনাদের সুবিধা হয়।'

'সত্যি নিয়ে যাবে? কিরে গোবিন্দ, যাবি?'

গোবিন্দ উজ্জ্বল চোখে বললে, 'হ্যাঁ বাবুজী, কলকত্তা যাব মামাজীর সঙ্গে।'

গোবিন্দর হিন্দীসুর মিশানো কথাতে গোঁসাইজীর কিছুই ভাবান্তর হল না। তিনি অন্নব্যঞ্জন দেবতার উদ্দেশে দিয়ে পরিতুষ্ট চিত্তে আহারে মন দিয়েছিলেন।

এতদিন পরে আজ বিশাখার হঠাৎ মনে হলো, গোবিন্দর কথার সুর তো হিন্দীই, কথাও হিন্দীতে বলে প্রায় সব সময়েই।

গোঁসাইজী বললেন, 'আচ্ছা, তুমি ওদের নিয়ে যাও কালকে, আমি তো যেতে পারব না। এখানে অসুবিধা হবে।'

অনুমতি-প্রাপ্ত বিশাখার বিবাহের সময়ের বাক্সটি খুলে তাতে কাপড় জামা গহনা গুছিয়ে নিতে সারাদিন কেটে গেল। তার বিবাহের সময়ের যে ফ্যাসানের জিনিস তার সঙ্গে ছিল তাই তার আজো সঙ্গী হল। বডিস্ ব্লাউস্ সায়া তার এখানে কোনোদিন কাজে লাগেনি, সবই পড়ে ছিল। পাউডার সেন্টও লাগেনি। শুধু সাবান তেল আল্‌তা সিন্দূরই ওর কাজে লেগেছিল। উপরন্তু ছেলেমেয়েদের রঙীন আঙরাখা চুড়িদার পাজামা আর নিজের ওড়নাদুটাও বাক্সে নিল।

তার পরদিন চুড়িদার পাজামা আর লাল জামা পরে গোবিন্দ, আর হলদে ওড়না জড়ানো বৃন্দাবনী পাড় সাড়ি পরা বিশাখা দীর্ঘ সাত বছর পরে বাংলাদেশের অভিমুখে ট্রেনে ওঠবার জন্য স্টেশনে এলো। রঙীন ফুলদেওয়া কালো বনাতের টুপি মাথায় তসরের লম্বা কোটের ওপর গায়ে সাদা চাদর জড়িয়ে খাটো লালপাড় ধুতি পরা গোঁসাইজী প্রসন্ন হাসিমুখে ওদের ট্রেনে তুলে দিয়ে চলে গেলেন।

কিশোরের মনে হতে লাগল, কোথায় যেন ওদের অমিল রয়েছে, ভাষা, স্থান অথবা আচার-ব্যবহারে কে জানে!

বিবাহ বাড়ির উৎসব সমারোহের মাঝে অকস্মাৎ জননী ডাকলেন, 'ওরে ও শাখু, শাখু একবার বাইরে আয় ; তোর পুজো হয়েছে? তোর সঙ্গে জামাইরা দেখা করতে চাইছেন।'

বহুদিন পরে বিশাখা এসেছে পিত্রালয়ে, তারও সব নতুন লাগছে। দেশের লোকের আত্মীয়স্বজনেরও নতুন লাগছে তাকে, সে যেন কোন অচেনা মানুষ।

রাধিকার অষ্টসখির নামে তাদের বোনদের নাম রেখেছিলেন পিতামহ। খুড়তুতো জ্যেঠতুতো নিয়ে ছয়-সাত বোন। চারজনের বিবাহ হয়েছে। সকলেই বাংলা দেশের ছেলে। বহুশ্রুত নাম বিশাখার রূপের কথা, ধনের ঐশ্বর্যের কাহিনী বহুদিন যাবৎ দূরবর্তিত্ব তাদের সকলের মনেও কম কৌতূহল সৃষ্টি করেনি।

বিশাখা বেরিয়ে এলো ঠাকুরঘর থেকে। ছাপা পাড়ের গঙ্গাজলী সাড়ি সাদাসিধে-ভাবে পরা। হাতে মোটা মোটা দুটি বালা, গলায় রাধারানীর প্রসাদী কণ্ঠমালা, শান্ত অপ্রতিভ হাসি মুখ নিয়ে কপাল ঢাকা ঘোমটা মাথায় সে এসে দাঁড়াল জননীর পাশে।

ভগ্নীপতিরা একে একে প্রণাম করলেন।

ললিতা পিছন থেকে বললে, 'অত ঘোমটা দিয়েছিস কেন দিদি, ওরা কি তোর ভাসুর নাকি?'

বিশাখা অপ্রস্তুতভাবে মুখ তুলতেই ললিতা হেসে উঠল, 'মাগো, দিদি যেন সং হয়েছে—। নাকে তেলক দিয়েছিস কেন?'

ভগ্নীপতিরা একটু আশ্চর্য হয়েই ঐ তন্বী তরুণী পরম রূপবতী প্রবাসিনী মেয়েটির দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে ছিলেন।

সকলেই হেসে ফেললেন ললিতার কথায়।

বিশাখা অপ্রতিভ মুখে মৃদুস্বরে বললে, 'আমাদের যে তিলক সেবা করতেই হয়।'

মা বললেন, 'তা তো বটেই, গোঁসাইবাড়ির নিয়ম যে।'

লজ্জিত মুখ বিশাখার পানে চেয়ে ললিতার স্বামী শৈলেন বললেন, 'হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতেও আগে সকলের তিলক সেবা নিয়ম ছিল। মা মারা গেছেন তাই ওরা জানে না। আসুন বড়দি, আপনাদের দেশের গল্প শুনি আমরা।'

অনাধুনিক মন, লজ্জা নিয়ে—অতর্কিতে নবযুগের সংঘাতে এসে পড়া যেন পুরাকালের অপরূপ একান্ত অন্তঃপুরবাসিনী কন্যার মত বিশাখা অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়েই ভগ্নীপতিদের দিকে চাইল।

শৈলেনও গোস্বামী ঘরেরই ছেলে। সংস্কৃতে এম-এ পাস করে কোন কলেজে প্রফেসারী করে। আর তিনজন—সুরেশ, অজয়, রমেশ ওরাও সকলেই বিদ্বান, কেউ বি-এ, কেউ এম-এ। সকলের সঙ্গেই তীক্ষ্ণ কথাবার্তা হাসিতে আধুনিক, এমন কি ললিতা শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ম্যাট্রিক পাস করেছে। হয়ত আরো পড়বে।

বিশাখার জননী বললেন, 'তুই ওদের খাবার দে—ওরা গল্প করুক।'

বিশাখা কোন সেকালের মাঝ থেকে আসা লজ্জিত তরুণীর মত বললে, 'না মা, তুমিই খাবার দাও। আমি জানিনে কি করে দোব। আমি পান সাজি।'

ইতিমধ্যে বিশাখার ছেলেমেয়ে নিয়ে ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

আকর্ণমূলক রাঙা হয়ে বিশাখা শুনল গোবিন্দ বলছে, 'আমার নাম গোবিন্দ হচ্ছে—বহিনের নাম হচ্ছে যশোদা।'

মৃদু হেসে প্রশ্ন করল কে যেন, 'আর তোমার বাবার নামটি কি হচ্ছে?'

আর একজন কে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের বাড়িতে ক'টা হাতী আছে?'

গোবিন্দ অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বললে, 'হাঁথি? আমাদের দুটো হাঁথি আছে। বাবুজীর

নাম কিষণলালজী গোঁসাই হচ্ছে। একটা হাঁথি আমাদের হাবেলীতেই থাকে, একটা গাঁয়ে আছে।'

ললিতা আর অন্যসব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাসিতে ভেঙে পড়ল। বিশাখার ভগ্নীপতিরাও হেসে ফেললেন।

শৈলেন মৃদু হাসি চেপে বিশাখার পানে চাইতেই অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সে বললে; 'এই খাও না সব। হৈ হৈ করছ কেন?'

বিশাখা মুখ নিচু করে নিল, তার চোখ জলে ভরে গিয়েছিল।

শৈলেন চা খেয়ে বিশাখার কাছে গিয়ে বসল। তারপর কোন একটা মেয়ের কাছ থেকে তার খুকিকে নিয়ে বললে, 'দিদি, পান দিন। আর আপনার এই খুকিটা এত সুন্দর, এটিকে আমায় দিয়ে দিন না! ঠিক আপনার মতই হবে মনে হচ্ছে।'

কিশোর এসে দাঁড়িয়েছিল গায়ে হলুদের জন্য মাদুরের উপর। সে খুকীকে নিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, ঠিক শাখীর মতই হয়েছে।'

বিশাখা চোখ নিচু করেই পানে এলাচ দিতে লাগল। শৈলেনের সৌজন্য স্তুতিবাদ তাকে কোন সান্ত্বনা দিতে পারল না। যেন মনে হতে লাগল, সে কত যুগযুগান্তর দূরে রয়েছে এদের থেকে। এরা ওকে ভুলে গেছে, না ও-ই এদের থেকে বহু বহু দূরে চলে গেছে!

নতুন বৌ এলো। সেও আধুনিক মেয়ে, আই-এ পড়ছে। বরণের জন্য বিশাখারা গহনা কাপড় পরতে গেল।

বিশাখার মা এলেন ঘরে, একটু ইতস্তত করে বললেন, 'শাখু, তেলক না পরে কপালে ফোঁটা দে না চন্দনের? সে-ও তো দেয় লোকে।'

বিশাখা কালো শান্ত চোখদুটি তুলে মার পানে চাইল, তার মুখে এলো, 'এতে লজ্জার কি আছে মা?' কিন্তু মার অপ্রতিভ মুখ দেখে সে বললে, 'আমাদের যে দিতে হয় মা, আমি সাত বছর এক নিয়মে দিয়ে আসছি।'

আমন্ত্রিত নিমন্ত্রিত অভ্যাগত আধুনিক পুরাতন অতিথি আত্মীয়দের কয়েকদিন বিশাখার তিলক, গোবিন্দর কথা, গোবিন্দদের দুটি হাঁথি, একটা উহ্য হাসির উপাদান যোগাল। কখনো বাহিরে, কখনো অন্তঃপুরে অট্টহাসি উচ্চহাসির তরঙ্গ ভেঙে পড়ে।

নববধূ ফিরে যাওয়ার সঙ্গে বিশাখারও ফিরে যাওয়ার সময় এলো। মা বাপের ব্যাকুল বিদায় দান, পল্লীর পুরাতন আনন্দময় বহু স্মৃতির মাঝে এবারের বহু নতুন সঞ্চয় নিয়ে বিশাখা গাড়িতে উঠল সেই বাসন্তী রংয়ের চাদর, সেই সাদা বৃন্দাবনী শাড়ি পরে।

স্টেশনে এলো শৈলেন। মনের মাঝে কোনখানে তার কাঁটা ফোটে যেন। ঐ অপরূপ আধুনিক যুগের অথচ আত্মবিস্মৃত তরুণী নারীর কাছে তার বরাবরই কি জন্য যেন ত্রুটি স্বীকার করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। যেন তাকে অসম্মান করেছে ওরা সবাই মিলে।

কিন্তু সে ত্রুটির কথা মুখে বলতে গেলে কিছুই কথা আসে না যে। কিছু বলতে না পেরে অনেকক্ষণ ধরে শুধু শৈলেন খুকীকে নিয়ে আদর করতে লাগল আর গোবিন্দর গল্প শুনতে লাগল।

গাড়ি ছাড়বার সময় সহসা বিশাখাকে সে বললে, 'আমাদের মাপ করবেন দিদি। সাহেবরা চার্চে যায়, মুসলমান নমাজ পড়ে, তাতে তারাও হাসে না আমরাও হাসি না।

কিন্তু তিলক দেখে আমাদের হাসি পায়। বাঙালীর ঘরে ছোট ছেলে ইংরেজী মিশিয়ে কথা বললে হাসি না। কিন্তু গোবিন্দ হিন্দী কথা বললে সবাই হাসি।'

তারপর বিস্মিত বিশাখার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে, 'আমি আপনার চেয়ে অনেক বড়, প্রণাম করব না তাই। তবে আপনার বোনের হয়ে এই ক্ষমা চেয়ে নিলাম দিদি।'

দীপ্ত সুশ্রী মুখ শৈলেন সুন্দর মিষ্ট সৌজন্যময় ব্যবহারে যেন বিশাখাকে জাগিয়ে দিল আর এক জগতে।

দীর্ঘ পথের কষ্টের মাঝে বিশাখার শুধু মনে হচ্ছিল সে যেন কোন নির্বাসিত জগতে বাস করে। কই এতদিন তো একথা তার একবারও মনে হয়নি। বারবার অতিশয় লজ্জিতভাবে তার মনে হয় এ ভাবনা তার অন্যায়, বিশ্রী, অনুচিত। তবু কেন অচেতন মনে তার জাগে কত কি যেন সে পায়নি। কি তা আর তার মনে করতে ইচ্ছাই হয় না বা জানে না। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে বাইরের পানে চায়, রুক্ষ্ম উষর প্রান্তর ছুটে পিছিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু সম্মুখে এগিয়ে আসছে আবার তেমনি পিঙ্গল মরুক্ষেত্র। মাঝে মাঝে একটি একটি ভুট্টার ক্ষেত, কূয়া আসে আর চলে যায়।

সন্ধ্যার সময়ে বিশাখা পৌছল বাড়ি। গোঁসাইজী হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাল ছিলে?' গোবিন্দ পিতার প্রশ্নের জবাব দিল অত্যন্ত উৎসাহে।

অন্তঃপুরের পথ দিয়ে রাধামোহনকে ধুলো পায়ে প্রণাম করে বিশাখা নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পুরীর মধ্যে প্রবেশ করল।

যথানিয়মে দেবতার সন্ধ্যারতি হয়ে গেল। ভোগপ্রসাদ গ্রহ-। করলে সবাই। গোঁসাইজী অন্তঃপুরে এলেন শয়ন করতে।

বিশাখার যেন কাজ আর শেষ হয় না। ঘরের কোণের অল্প আলোতে এঘর ওঘর বড় দেখা যায় না। গোঁসাইজী স্ত্রীর অপেক্ষা করে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বিশাখা কত রাত্রে ছেলেমেয়েদের কাছে শুয়ে পড়ল নিজেও জানে না।

সহসা তার ঘুম ভেঙে গেল অত্যন্ত চেনা কি শব্দে। বাইরে মোহনদাস হাতী জেগে উঠেছে, তার গলায় ঘন্টা বাজছে টং টং।

তার মনে হল, বহু-শ্রুত কথা, তাদের দোরে হাতী আছে। বিশাখার আর ঘুম এলো না। মোহনদাসের গলার ঘন্টা থেকে থেকে একইভাবে বাজতে লাগল।

একটু পরেই কূয়ার লোকেরা কূয়ার বলদ কাজে জুড়ে সুর ধরল—'কীলো ভরিয়ো কূয়া চলিও।'

গোবিন্দর ও খুকুর ঘুম ভেঙে গেল, বিশাখা উন্মনভাবে ওদের পানে চাইল। হঠাৎ তার মনে হল, গোবিন্দকে খুব ভাল করে পড়াবে, খুব বিদ্বান হবে। খুকুকেও বাংলা শেখাবে, বাংলা দেশে বিয়ে দেবে ভালো ছেলের সঙ্গে। না হোক বড়লোক। মনে হয় যেন শৈলেনের মত। তার পরেই অকস্মাৎ অপরাধিনীর মত উঠে দাঁড়াল বিশাখা। পাশের ঘরে গিয়ে দেখলে, গোঁসাইজী গোবিন্দ নাম স্মরণ করে উঠেছেন। বিশাখা স্বামীর পায়ের ধুলো নিলে।

গোঁসাইজী 'গোবিন্দ পদে মতি থাক' বলে বললেন, 'হঠাৎ প্রণাম?' বিশাখা বললে, 'কাল এসে করিনি মনে হচ্ছে।'

শ্রীহর্ষ, ১৩৪৯

ললিতা সখী

সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ি থেকে নামল কিশোর, কিশোরের বৌ, ললিতা, তার বর শৈলেন আর ওদের দুটি ছেলেমেয়ে। স্টেশনে নিতে এসেছিল গোবিন্দ আর তাদের সরকার শিউপ্রসাদ।

সরু লালপাড় ধুতি, গলাবন্ধ তসরের কোট শুধু গায়ে, মাথায় কালো বনাতের টুপি রেশমের ফুলতোলা, পায়ে ওদেশী জরির নাগরা—আধা হিন্দুস্থানী আধা বাঙালী সাজে গোবিন্দ দাঁড়িয়েছিল। কিশোরের তাকে দেখে মনে পড়ল পাঁচ বছর আগের কথা, যেদিন সে বিশাখাকে নিয়ে গেল, স্টেশনে তুলে দিতে এসেছিলেন গোঁসাইজী অমনি ধরনের সাজে। আজ যেন গোবিন্দও তাঁর ক্ষুদ্র সংস্করণরূপে এসেছে।

একটু হেসে ফেলে কিশোর বললে, 'তুমি গোবিন্দ না? মস্তবড় হয়ে গেছ।'

খাকি সুটপরা ললিতার ছেলে সমীর, চমৎকার হালকা ফ্লানেলের ফ্রক-পরা কিশোরের মেয়ে শিপ্রা আর সুন্দর শাড়িপরা ললিতা আর কিশোরের বৌ অনিলা নেমে এসে গোবিন্দর কাছে দাঁড়াল।

নিজের জননী ও আত্মীয়াদের অভ্যস্ত সাজ-সজ্জা দেখে গোবিন্দর কাছে যেন এরা একেবারে অজানা বিভিন্ন রকমের মনে হল। হতবুদ্ধির মত অপ্রস্তুতভাবে গোবিন্দ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

এবারে জিনিস নামানোর পর শৈলেন এসে দাঁড়াল গোবিন্দর পাশে। তার পরই তার চোখে পড়ল ললিতার অনিলার সকৌতুক হাসি আর গোবিন্দর অপ্রস্তুত মুখ।

শৈলেন গোবিন্দর পিঠে হাত দিয়ে বললে, 'চল গোবিন্দবাবু, কোনদিকে যাব আমরা জানি না তো।'

শিউপ্রসাদ এগিয়ে এলো, আভূমি নত হয়ে সেলাম করে বললে, 'আসেন হুজুর—গাড়ি বাহার আছে।'

গাড়িতে উঠে শৈলেন জিজ্ঞাসা করলে, 'কৈ, তোমার বোনকে আনলে না যে?'

গোবিন্দ আরক্তিম হয়ে উত্তর দিলে, 'মা বললেন সে বাড়িতে থাক্, সে বাংলা ভালো জানে না।'

রাধামোহনের মন্দিরের সেই পুরানো-কালের তোরণের মধ্যে দিয়ে গাড়ি এসে দাঁড়াল। তোরণতলে সেই দারোয়ানের খাটিয়া পাতা বিছানা, চৌকির ওপর তুলসীদাসের রামায়ণ। গাড়ি দেখে তারা দু-তিনজন সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। মন্দিরের বিস্তৃত বহিঃপ্রাঙ্গণের একপাশে সেই মোহনদাস হাতী শুঁড়ে করে জল নিজের মাথায় আর গায়ে ছিটিয়ে স্নান করছে।

দেবতার সমীপে ভাগবত পাঠের কাছে গোঁসাইজীও তেমনি নিবিষ্ট মনে পাঠ শুনছেন।

দীর্ঘ ছয় বছর আগের চিত্র যেন হুবহু সেইভাবেই কিশোরের সামনে ফুটে উঠল।

গাড়ি থেকে অতিথিরা নামল। আঙরাখা ও ঘাগরা পরা বিশাখার মেয়ে যশোদা সামনের প্রাঙ্গণে খেলা করছিল, ছুটে গিয়ে পিতাকে বললে, 'বাবুজী, পাহুনা এসেছে।'

গোঁসাইজী হাসিমুখে নেমে এলেন মেয়ের হাত ধরে। বললেন, 'পাহুনা নয়—মামা মামী। গোবিন্দ, তোমার মাকে বলগে ওঁরা এসেছেন।'

ললিতা অনিলা এসে প্রণাম করল। ছোট ছেলে নারায়ণের হাত ধরে বিশাখা অন্তঃপুরের সীমানায় দাঁড়িয়েছিল, পরম আনন্দে উৎসাহে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। গোঁসাইজী সহাস্যে বললেন, 'তারপর, আমি তো কারুকে চিনি না, ললিতা সখী কোনটি?'

ললিতা ভ্রূ-ভঙ্গি করে বললে, 'থাক, আমার বুঝি তেমনি চেহারা, মাগো!'

কিশোর বললে, 'আপনি বুঝি জানেন না জামাইবাবু, আমাদের যে ওখানে সখীভাবে সাধনা করেন, একজন আছেন বেশ একটু গোঁপ-দাড়িওয়ালা। তাঁকে ললিতা সখী বলা হয়।'

গোঁসাইজী অবাক হয়ে বললেন, 'তাই নাকি? আমি শুনেছি অনেকের কাছে, সত্যি আছেন তবে? ভারী ভক্ত তো?'

কিশোর আর শৈলেন হাসলে। আসলে ভক্তি এবং বিশ্বাস দুই ওদের গোঁসাইজীর মত নয়। শৈলেন বললে, 'তা হতে পারেন। আমরা কিন্তু আপনার মত আর বিশ্বাসী ভক্ত কই হলাম। আর আপনার এই ললিতা সখীও মোটেই ওঁর দিদির মত নয়।'

গোঁসাই হাসলেন, বললেন, 'তাহলেও তোমাকে আমি ললিতা সখীই বলব।'

ললিতা বললে, 'বলুন না, কথার জবাব পাবেন না।'

এবারে শৈলেন বললে, 'চলুন দিদি, আপনার বোনের আর ললিতা সখীর গল্পে তো আমাদের ক্ষিদে তেষ্টা মিটবে না।'

স্নানাহার শেষে যশোদাকে নিয়ে ললিতা হেসেই আকুল, 'ভাই, নিজেও যেমন সং সেজে থাকিস, এমন সুন্দর মেয়েটাকেও কি তাই সাজিয়ে রাখতে হয়? কেন ফ্রক সেলাই করতেও ভুলে গেছিস?'

বিশাখা অপ্রস্তুত হয়ে হাসলে একটু।

শৈলেন ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বললে, 'কেন তোমাদের ফ্রকের চেয়ে এতে বেশী ভাল দেখাচ্ছে।'

ললিতা বললে, 'দিদি যা করবে তাই তোমার ভাল লাগবে, তা সং সাজানো হলেও।'

ললিতা মাথায় কাপড় দেয় কি না দেয়, সকলের সঙ্গেই সমান গল্প করে—হাসে, কথা কয়, বিশাখা অল্প ঘোমটা টেনে চুপ করে গল্প শোনে। বিশাখার অপ্রতিভ মুখের দিকে সকলেই চাইল। কিশোর বললে, 'কিন্তু যাই বলিস তুই, বেশ দেখাচ্ছে ওকে পুতুলের দেশের মেয়ের মত। আমাকে একটা ওইরকম করিয়ে দিস তো ভাই, আমার মেয়েটার জন্যে।'

অনিলা বলে, 'তা একদিনই ভালো লাগে ওরকম সাজ।'

কিন্তু কথাটার মোড় ফিরুক এ কথা যেন সকলেরই মনে হচ্ছিল—এমন কি কথাটা বলে ফেলে ললিতারও—এবারে শৈলেন বললে, 'এখানে কাছাকাছি আজকে দেখবার মত কি আছে?'

গোবিন্দ এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, এবার পরম উৎসাহে মেসোর কাছে এসে বসল। কোথায় রাজপ্রাসাদ কোন পাহাড়ের ওপর কি মন্দির ইত্যাদি—নানা জায়গার নাম বর্ণনা করতে আরম্ভ করল।

বিশাখা বললে, 'অন্য সব ঠাকুরদের মন্দিরও দেখতে যেও, অনেক ঠাকুর আছেন।'

ললিতা হাসলে, 'দিদি যেন তেরকেলে বুড়ী—ঠাকুর-দেবতার মন্দিরই তোর সব আগে মনে পড়ে।'

অনিলা বললে, 'আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন তো দিদি?'

বিশাখা বললে, 'না ভাই, আমার সময় হবে না, ঠাকুরঘরে কাজও আছে—এমনি কাজও আছে।'

শৈলেন বললে, 'তা হোক চলুন, একসঙ্গে বেড়াই, আপনি না হয় আগে চলে আসবেন। যান, আপনারা তৈরী হন সবাই।'

প্রসাধন শেষ হল, ললিতা অনিলা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

'কই দিদি—তোর হল?'

একখানি সাধারণ শাড়ি সেমিজ পরে একটি বৃন্দাবনী ছাপা চাদর গায়ে নিয়ে বিশাখা এসে দাঁড়াল। মেয়ের গায়ে একটি পুরাতন ছোট ফ্রক প্রায় না-হবার মত। বোধ হয় গত পূজার সময় বিশাখার মায়ের দেওয়া।

শিপ্রা সমীর তাদের পরিচ্ছন্ন সুশ্রী আধুনিক পোশাক পরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কিশোর, শৈলেন এসে জিজ্ঞাসা করল, 'হল? চল এবারে!'

ললিতা যশোদার দিকে চেয়ে হেসে ফেললে, 'ও কি সং সাজালি ওকে? ওর কি আর জামা নেই! ওটার পিঠে বোতামও দেওয়া যাচ্ছে না এত ছোট হয়ে গেছে। ও জামার চেয়ে তোর ঘাগরা আঙরাখা ভাল ছিল।'

গোবিন্দর মুখ একেবারে লজ্জায় কি রকম হয়ে উঠল। সত্যি তার মার কি কিছু বুদ্ধি নেই! এইসব সভ্য পরিচ্ছন্ন লোকদের সামনে ওই জামাকাপড় পরে নিজে না হয় বেরিয়েছেন, বোনটিকে কি বিশ্রী সাজিয়েছেন?

বিশাখার জবাব দেবার মত কথা ছিল না এক মুহূর্তেই বোঝা গেল। সে নির্বোধের মত মেয়ের পিঠের বোতাম লাগাতে লাগলো। ললিতার দিকে একবার তাকিয়ে শৈলেন বললে, 'কেন, বেশ হয়েছে, চল চল।' কিশোর যশোদার হাত ধরে এগিয়ে গেল।

বাইরের আঙিনায় গোঁসাইজী দাঁড়িয়েছিলেন। গাড়িতে উঠতে গিয়ে অনিলা বললে, 'দিদি, আপনি জুতো পরলেন না?'

'জুতো?' সকলের নজর পড়ল সকলের পায়ের দিকে।

গোঁসাইজী বললেন, 'জুতো? উনি পরেন কি? দেখিনি তো।'

'ওমা, তাহলে আমরাও খুলি', ললিতা অনিলা বলে উঠল।

'না না, সে কি, তোরা কেন খুলবি?' বিশাখা ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'আমি তো পরি না, আমার জুতো নেইও। আর মন্দিরে তো জুতো পরা চলবে না।'

'তা আমরাও তো মন্দিরে যাব', অনিলা বললে।

'তা তোমরা তখন কিশোরদের জুতোর কাছে খুলে রেখে যেতে পারবে', গোঁসাইজী বললেন, 'পরেই যাও। বাগানে বেড়াবে তো।'

দুটি আধুনিক সভ্য মহিলা, দুটি আধুনিক তরুণ, তাদের দুটি সুবেশ সন্তান—তার মাঝে বিশাখা গোবিন্দ যশোদা কেমন মানাল সেকথা কে কিভাবে ভাবল কে জানে। শুধু গোবিন্দর যেন কান মুখ লাল হয়েই রইল। তার সমস্ত উৎসাহ যেন কোথায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। মা বাক্সটা ভালো করে দেখতে পারতেন, বোনটির কি কোনো ভালো জামা নেই, ওই কি বলছিলেন মামীমা, ফ্রক না কি। আর মা? মার তো বারাণসী শাড়ি আছে, তাও তো পরতে পারতেন। কত জায়গায় তো সেসব পরে যান মা, আর তার মাকে কত ভাল দেখায় পরলে। মামী-মাসীর কাপড় আর অত ভাল কি? গাড়িতে বসে মার কানের কাছে মুখ রেখে গোবিন্দ বললে, 'মা, তুমি সেই লাল কাপড়টা পরলে না কেন?'

বিশাখা লাল হয়ে বললে, 'চুপ কর।' যশোদার মনে ওসব ভাববার অবসর ছিল না, ফ্রক পরে সে শিপ্রার পাশে বসে পরম উল্লসিত হয়েছিল, হয়ত ভেবেছে সে শিপ্রার মতই সেজেছে।

আমোদে আহ্লাদে হাসি পরিহাসে একপক্ষের শিক্ষা সভ্যতার গর্বের আমেজ মেশানো কথাবার্তায় অপরপক্ষের অপ্রতিভ সৌজন্য স্বীকারে কয়েকটি দিন জলস্রোতের মত বয়ে চলে গেল।

গোঁসাইজী স্নেহমুগ্ধ প্রশ্রয়ে ললিতার গল্প শুনতেন, গল্প করতেন। ফিরে যাবার দিন ঘনিয়ে এলো।

গল্প করতে করতে সহসা ললিতা বললে, 'নামটা কিন্তু বদলান জামাইবাবু যশোদার। ছোটবেলায় একটা ছবি দেখেছিলাম কোন এক ক্যালেণ্ডারে। মা যশোদা গাই দুইছেন আর শ্রীকৃষ্ণ পিছন থেকে মার গলা জড়িয়ে ধরে দুধ দোয়া দেখছেন। যশোদা বললে ওই একটি ছবিই মনে পড়ে যায়। অমন সুন্দর মেয়ে আর ওইটুকু বয়সে ওই নাম মোটেই মানায় না। ও যখন বড় হবে দিদির মত, তখন ওর ও নাম মানাবে।'

শৈলেন বললে, 'তোমার দেখছি আর কিছু সংস্কারই বাকি রইল না দিদির সংসারের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টায়। ফ্রক পরানো থেকে নাম বদলানো অবধি।'

কিন্তু গোঁসাইজী হেসে বললেন, 'তা আমার তো ছোট মা যশোদাই ও। তা হোক, কি নাম রাখতে হবে বল তুমি, না হয় ললিতা সখীর কথাটাই থাক।'

ললিতা বললে, 'একটা খুব ভাল নাম আছে, সেটার সঙ্গে যশোদার নামের মিলও আছে। যশোধরা রাখুন। বেশ আধুনিকও হবে।'

গোঁসাই একটু হেসে বললেন, 'কিন্তু ততো আধুনিক হল না—'

'আজকাল যে এইরকম নাম রাখাই ধরন হয়েছে—ওদেশে তো যাবেন না, কিছুই

জানলেন না।'

'তা বটে', গোঁসাই হাসলেন, 'কিছু দেখাই হল না, কি বল গো?' বিশাখা কিছু বললেন না, শুধু হাসলেন।

ললিতা বললে, 'কিন্তু আর এক বছর পরে খুকী তো আট বছরের হবে, আমি ওকে নিয়ে গিয়ে পড়াব ইস্কুলে, কি বলিস দিদি? নইলে একেবারে হিন্দুস্থানী হয়ে যাবে, এখুনি তো বাংলা বলতে পারে না। তুই ছেড়ে থাকতে পারবি তো?'

একটু হেসে বিশাখা বললে, 'কিন্তু আমি ছেড়ে থাকলেই তো হবে না।'

'অর্থাৎ আমি? তা মা যশোদা একদিন তো শ্বশুরবাড়িও যাবে, তার আগে না হয় মাসীর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার অভ্যাস আমার হোক, কি বলিস?'

খুকী উৎসাহিত হয়ে বলে, 'হ্যাঁ বাবুজী, যাব মাসীমার বাড়ি।' গোবিন্দ-যশোদার বালক চিত্তকেও আগন্তুকদের অজানা উপকরণ-বহুল নানা প্রয়োজন, নানাপ্রকার প্রসাধন সামগ্রী, অনেক আয়োজন অনেকখানি আকৃষ্ট করেছিল। যশোদা বুঝেছিল কি না বোঝা গেল না, কিন্তু গোবিন্দ তাদের নিজেদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওদের অনেক প্রভেদ বুঝতে পেরেছিল। মোট কথা, ওরা যে অনেক রকমে ওদের চেয়ে বড় বা উন্নত এটা শিশুমনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। হংসশাবকের সাঁতার শিখতে হয় না। বিলাস প্রসাধন স্বাচ্ছন্দ্যের শিক্ষা অনভিজ্ঞেরও লাগে না, আপনিই মানুষ আকৃষ্ট হতে চায়। মাসীমা যে মার চেয়ে উন্নততর কেউ, মেসো ও মামা বাবার চেয়ে বেশীরকম কিছু, একথা বুঝতে গোবিন্দের দেরি লাগেনি।

গোবিন্দদের হাতী আছে, প্রকাণ্ড বড় মন্দির আছে, মস্তবড় বাগান আছে বটে। কিন্তু সেণ্ট, স্নো, ক্রীম, সুন্দর জুতো, ভাল জামাকাপড়—সুট, তার মার ভাল জামা-শাড়ি কিছুই নেই। গোবিন্দের অত বোঝবার মত বয়স নয়, কিন্তু তারতম্য যেন বোঝা যাচ্ছিল।

গোবিন্দ বললে, 'বাবা, আমিও যাব ওখানে পড়তে।'

গোঁসাইজী বললেন, 'দেখ ললিতা সখী, কি কাণ্ড তোমার। ছেলে নিজেই যেতে চায় যে। শেষটা আমিও না তোমার সঙ্গে যেতে চাই!' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন গোঁসাইজী।

একটু হেসে ললিতা বললে, 'চলুন না, মানুষ করে দোব আপনাকে। যেন দুশো বছর আগের যুগে রয়েছেন। মন্দির ভাগবত ভজন, হাতী সগ্‌গড় দারোয়ান—যেন ঘুমের পুরী।'

ফেরবার সময় এলো। ঘুমের পুরী কিন্তু কম ভাল লাগেনি জাগ্রত দেশের লোকের চোখে। আর জাগ্রত দেশের লোকেরা যেন সহসা ঘুমের দেশের লোকদের জাগিয়ে গেল। শান্ত নির্লিপ্ত গোঁসাইজীরও মন একটু বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ওদের গাড়ির কাছে সকলে এসে দাঁড়ালেন। শৈলেন কিশোর অনিলা ললিতা একে একে গোঁসাইজী বিশাখাকে প্রণাম করে গাড়িতে উঠল।

শৈলেন বললে, 'আমি এসে আর বছর গোবিন্দ আর খুকীকে নিয়ে যাব।'

কিশোর বললে, 'আপনি এবারে যাবেন একবার, জামাইবাবু।' গোঁসাইজী শুধু হাসলেন। বিশাখা গোবিন্দ ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে তখন বাড়ি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কদিনের নানা কর্তব্যের ব্যস্ত

সমারোহের দায় আজ আর নেই। বিশাখা অন্তঃপুরের অলিন্দে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মন্দিরে গোধূলি আরতির ঘন্টা বেজে উঠল। শুধু কর্পূর আরতি এ সময়ে। কয়েক মুহূর্তের মাঝেই আরতি শেষ হয়ে গেল। আবার পর্দা পড়ল দেবতার সুমুখে। বিশাখার আজ যেন আর কোনো কাজ নেই। মনে হয় এই পনেরো দিন আগেও তো অনেক কাজ করত এই সময়েই। অকস্মাৎ যেন সব দিকের কর্তব্য কি এক ক্লান্তিতে নিঃশেষ হয়ে গেছে—কি যে তার দরকার ছিল অথবা কি যে চাই এখন তা বিশাখা জানে না। অথবা ভাবে না, ভাবতেও চায় না। দাসী এসে ডাকল। সন্ধ্যারতির প্রদীপের ঘি চাই, আরও যেন কি কি দরকার, তার জন্য পূজক-গৃহিণীকে ডাকছেন।

বিশাখা নেমে গেল।

গোবিন্দ যশোদা নারায়ণ সন্ধ্যার পর একলা ঘুরে, খানিক ভাইবোনে ঝগড়া করে, মার কাছে ভর্ৎসিত হয়ে—অবশেষে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাত্রে ঠাকুরের শয়ন আরতির শেষে বিশাখা শোবার ঘরে গেল।

পাশের ঘরে প্রদীপের কাছে বসে গোঁসাইজী পুরাতন অভ্যস্তভাবেই শ্রীধর স্বামীর গীতার টীকার হিন্দী ভাষ্য লিখছেন। পনেরো দিন তাঁর কোনো কাজ নিয়মমত হয়নি।

বিশাখা এসে দাঁড়াল। গোঁসাইজী লেখাটা শেষ করে বালির পুঁটলি চাপা দিয়ে কালি শুকিয়ে নিতে লাগলেন। এবারে স্ত্রীর দিকে চাইলেন।

'বোসো।'

বিশাখা প্রদীপের ওপাশে বসল।

'বেশ ভাল লাগল কদিন। তোমার আজ বড় খালি লাগছে না? তা একটু লাগবে বৈ কি!'

বিশাখা প্রদীপটা উস্কে দিলে। জোর আলো হল। গোঁসাই হাসলেন, বললেন, 'ওকি? একটু কম করে দাও। তোমার বোনটি কিন্তু ভারী বুদ্ধিমতী—বেশ মেয়ে।'

বিশাখা প্রদীপটা কমিয়ে দিচ্ছিল, বললে, 'আমার বাবা বলতেন ওর বুদ্ধি সকলের চেয়ে বেশী আমাদের মধ্যে—একেবারে আলোর মত। আমি ওর মত মোটেই নই।'

গোঁসাই একটু হেসে বললেন, 'আমার ঘরে এই আলোই ভালো। বেশী আলো কি এসব ঘরে মানায়। শৈলেন ছেলেটিও বড় ভাল কিন্তু।'

এবারে প্রদীপের সলতেটা অনেকটা তেলের মধ্যে চলে গেল। নিবে যায় আর কি।

গোঁসাই সবিস্ময়ে স্ত্রীর দিকে চাইলেন, 'ওকি? আমার এখনো কাজ আছে, নিবিয়ো না।'

বিশাখা বললে, 'নেবাচ্ছি না, উস্কেই দিচ্ছি।'

খোলা জানালা দিয়ে হেমন্তের অন্ধকার পক্ষের রাত্রির আকাশভরা তারা দেখা যাচ্ছিল। বিশাখা জানালার কাছে দাঁড়াল। বললে, 'তোমার ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে না? জানালা খোলা থাকবে?'

গোঁসাই অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'রোজই তো খোলা থাকে, না?'

'আহা, এ কদিন এ ঘরে তুমি ছিলে নাকি? এ ঘরে তো তোমার ললিতা সখীরা থাকত।'

গোঁসাই হাসলেন, 'আমার ললিতা সখী? তা বটে, আমি ওঘরে শুচ্ছিলাম।' এবারে গোঁসাই পুঁথিপত্র মুড়ে ফেললেন, বললেন, 'আচ্ছা, আজ শুয়েই পড়ি।'

পাশাপাশি ঘরে স্বামী স্ত্রী নির্বাক হয়ে শুয়ে পড়লেন, অনেক রাত্রি অবধি ঘুম আর এলো না। খোলা জানালা দিয়ে অগোচর পৃথিবীর আকাশটুকুতে তারাগুলি ঝিক্‌মিক্‌ করছিল, গোঁসাইজীর মনে হল যেন ললিতা সখীর ঝিকমিকে হাসি।

স্বামীপুত্রকন্যা পরিবৃত দুর্ভাবনাহীন নিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্য ঐশ্বর্যময় অট্টালিকায় শুয়ে বিনিদ্র বিশাখার অগোচর মন কেবলি যেন বলতে লাগল, ভালো লাগে না, কিছু ভালো লাগে না। কিন্তু কি যে ভালো লাগে তাও যেন সে স্পষ্ট করে জানে না। কি ভালো লাগে না—তাও ঠিক করে বলতে পারে না।

শ্রীহর্ষ, ১৩৪৯

যশোধরা

পুত্রকন্যার আগমনের অপেক্ষায় পিতামাতা ঠাকুরদালানের সম্মুখের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছিলেন।

কয়েক বছর কেটে গেছে—গোবিন্দ, যশোধরার কলিকাতায় পড়ার জন্যে আসার পর। বৎসরান্তে ওরা গরমের বন্ধে আসে, আবার যায়।

গাড়ি এলো। ভাই বোন গাড়ি থেকে নামল। জননীকে প্রণাম করতে নত হতে মা বললেন, 'ওঁকে আগে কর।'

পিতা থামালেন, 'আগে রাধামোহনকে করে এসো প্রণাম।'

দুজনেই খুব বড় হয়ে গেছে—যেন চেনা যায় না। যশোধরা বিশাখার মতই সুন্দর হয়েছে। কিন্তু গোঁসাইজীর মনে হয় আরো অন্যরকম, বেশী উজ্জ্বল দীপ্ত। আবার ভাবেন, হয়ত বিশাখাও অমনি ছিল।

যাই হোক্, ছেলেকে পেয়ে নতুন কিছু মনে হয়নি। যতটা মা-বাপের কন্যাকে নিয়ে হল। সেটা কি গর্ব অথবা মুগ্ধ স্নেহ ঠিক বলা যায় না।

যশোধরা ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে, গোবিন্দ ম্যাট্রিক দিয়ে এসেছে। বিশাখা ভাবে মেয়ে পাস করবে। গোঁসাই ভাবেন যশোধরা আর নাই বা পড়ল। কেউ কিছু বলেন না মুখে।

দিনগুলি জলের মত বয়ে গেল। যাবার কদিন আগে কয়েকখানি ডাকের চিঠি নিয়ে পুলকিত মনে গোঁসাই ডাকলেন, 'তোমার মেয়ের যে বিয়ের সম্বন্ধ এলো।'

খাবার জায়গা হয়েছিল, ছেলেমেয়েরা খেতে বসেছিল, পিতাও এসে বসলেন আসনে।

বিশাখা ভ্রূকুঞ্চিত করে চাইল, প্রশ্ন করলে না কিছু।

গোঁসাই নিজের খুশিতে তার পানে না চেয়েই চিঠি তার দিকে দিলেন।

বিশাখা বললে, 'কার চিঠি?'

স্মিতমুখে গোঁসাই বললেন, 'রাধা পিসীমার। বৃন্দাবনের বড় গোঁসাইর নাতির সঙ্গে যশোদার বিয়ের কথা বলে লিখেছেন। এবার আর কলকাতাতে পাঠাতে বারণ করেছেন।'

বিশাখা অতর্কিতে কিছু তীক্ষ্ণ সুরেই বলে ফেললেন, 'সেই গোঁসাইঘরের মুখ্যু ছেলে তো—'

গোঁসাই একটু আশ্চর্য হয়ে গেলেন, তারপর বললেন, 'মুখ্যু কেন হবে? চিঠিটা পড় না। সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় পাস করেছে, ম্যাট্রিকও দিয়েছে এবারে।'

বিশাখা সম্বরণ করতে পারেনি, উষ্ণভাবেই বললে, 'চিঠি আর কি পড়ব,—ও কুড়ি বছরে ম্যাট্রিক দেওয়া মুখ্যুরই সামিল।'

মেঘ-ঘন অন্ধকার রাতে ঘরের আনাচকানাচের জিনিসও যেমন সহসা বিদ্যুৎচমকে দীপ্ত হয়ে ওঠে মুহূর্তের জন্য, বিশাখার তীক্ষ্ণ কথার সুরের আলোতে তার সঙ্গোপন অন্তরের অদৃশ্য কোণ কোন এক মুহূর্তেই যেন গোঁসাইয়ের কাছে স্পষ্ট ফুটে উঠল। অপ্রতিভ পিতার চোখ পড়ল ছেলেমেয়ের দিকে, তারা তাদের সুমুখে এই প্রথম জননীর

তীক্ষ্ণতা অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিল। গোঁসাই আর একটি কথাও বললেন না, মাথা নীচু করে খাবার আসনে বসলেন। গোঁসাইঘরের মূর্খ ছেলে তিনিও তো। তিনি ম্যাট্রিক পাসও করেননি।

বিশাখা সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারল। নিজের আকস্মিক কটু রূঢ় মন্তব্যে সব জিনিসটা বিশ্রী হয়ে গেল।

গোঁসাই নীরবেই আহার শেষ করে উঠলেন। ছেলেমেয়েরা কিম্বা জননী আর একটি কথাও বলতে পারল না কেউ।

ঐ কথাগুলি যেন একটি স্পষ্ট চিহ্নিত মন্তব্যের মত মা-বাপ ছেলে-মেয়ে সকলের মনেই নিজের নিজের মত ভাবে গভীর দাগ কেটে কেটে গেল।

২

কয়েকদিন পর সন্ধ্যারতি শেষের পর গোঁসাই ভজন শুনছিলেন, যশোধরা, গোবিন্দ দুজনে এসে বসল পায়ের কাছে। সেদিনের পর সকলেরই যেন মনে হঠাৎ একটা সঙ্কোচ এসে গিয়েছিল। পিতা যেন অনেক দূরে চলে গেছেন মনে হয়। বিশাখা আর একটি কথাও বলবার সুযোগ পায়নি ঐ সম্বন্ধে নিজের রূঢ়তার কৈফিয়ত স্বরূপ। যশোধরা বাপের কাছে এসে বসল। গোঁসাই শান্ত স্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু বলছ, যশোমা?'

যশোধরা আরক্ত হয়ে বললে, 'না, এমন কিছু না।'

ভজন শেষ হয়ে গেল, শয়ন আরতিও শেষ হল। এবার যশোদা বলে ফেললে, 'বাবা, তা হলে কি পড়তে পাঠাবে না?'

তিক্ততা রূঢ়তাতে অনভ্যস্ত গোঁসাই এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন, একবার মনে এলো, বলেন, তোমার মার মত নাও। কিন্তু তা বলতে পারলেন না। বললেন, 'আচ্ছা, যেও এবারে।'

রাত্রে বিশাখা এটা-সেটা করবার ছলে স্বামীর ঘরে এসে বসলেন। গোঁসাই গীতার টীকাভাষ্য নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। স্ত্রীকে বসতে দেখে বই মুড়ে জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন।

বিশাখা কিছু বলতে পারলে না। বললে, 'তুমি পড় না, আমি এমনিই বসে আছি।'

গোঁসাই হাসলেন। বললেন, 'আচ্ছা।'

গোঁসাই নিবিষ্ট মনে ভাষ্য লিখতে লাগলেন। রাত্রি গভীর হতে লাগল। বিশাখা এক একবার প্রদীপ উস্‌কে দেয়—তখন কোনো কোনো বার গোঁসাইয়ের চমক ভাঙে। এক একবার ওর পানে অপ্রতিভভাবে তাকান, ভাবটা কি বলবে, বল, আমি তো বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ বিশাখা বললে, 'ওরা যে চলে যাচ্ছে—তুমি কি যশিকে মত দিয়েছ?'

গোঁসাই বললেন, 'হ্যাঁ যাক্। ওদের অত ইচ্ছে। ক্ষুণ্ণ হবে।'

ক্ষুণ্ণতার কথায় বিশাখা যেন স্বামীর মনের অতলের কূল পেলো। যেন কোনখান থেকে একটা করুণার মমতার রশ্মি দেখা গেল। তাড়াতাড়ি বললে, 'যশি একটা পাশ করলেই বিয়ে দেবে তারা।'

কিন্তু সেটা স্বামীর মনের কূল নয়, ছোট্ট একটু চড়া বিশাখা বলেই বুঝতে পারলে।

গোঁসাই নত মুখে কাজ করতে করতেই শান্ত সহজভাবে বললেন, 'হ্যাঁ।'

কিন্তু কবে কোথায় কি ভাবে কথা কওয়া যাবে, কি বৃত্তান্ত তাদের বাড়ির, তারা নিজেরা কিছু বলছে কি না, অথবা তাঁর নিজের কি মত, কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য কিছুই করলেন না। অথবা মুখ্যু গোঁসাইঘরের ছেলের জায়গায়, এম-এ পাস দিচ্ছে ললিতার ভাসুরপো পাত্র, তাঁর মনে কোন উৎসাহ জাগালো কিনা তাও বোঝা গেল না।

ঠাকুরদালানের বাজা ঘড়িতে এগারটা বাজল। গোঁসাই পুঁথিপত্র গুছিয়ে রাখতে লাগলেন। বিশাখা অনেকক্ষণ শুধু শুধু বসে রইল চুপ করেই। কেবল মনে হতে লাগল স্বামীর মনে প্রবেশ করবার পথ যেন সে হারিয়ে ফেলেছে।

পর বৎসর গোবিন্দ একলাই ছুটিতে বাড়ি এলো।

বিশাখা উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কইরে, যশি এলো না?'

গোবিন্দ মাকে প্রণাম করে বললে, 'তার শরীরটা ভাল নেই, সে বন্ধুদের সঙ্গে দার্জিলিং গেছে।'

'শরীর ভাল নেই! তা এখানে তো সারাতে পারত।' মা বললে, 'তা আমাদের লিখলেও না যে সে যাচ্ছে!'

'না, এমন কিছু শরীর খারাপ নয়। তবে তার বন্ধুরা গেল, মাসীমার মেয়ে শিপ্রাও গেল, তাই তারও ইচ্ছে হল।'

বিশাখা বললে, 'কাদের সঙ্গে গেল? চেনাশোনা খুব বুঝি?'

গোবিন্দ বললে, 'হ্যাঁ, মাসীমার বাড়ি খুব যাওয়া-আসা আছে। স্বাহা পালিত, সংজ্ঞা পালিত দুই বোন ওর সঙ্গে এবার একসঙ্গে পরীক্ষা দিলে। তাদেরই নিজেদের বাড়ি দার্জিলিংয়ে আছে, তাদের মা আর ভাই গেলেন, ওদের সঙ্গেই গেল। ওদের বাবা নেই, ভাই আমার চেয়ে কিছু বড়, এবারে বি.এ. দিয়েছে। ওরা ব্রাহ্ম।' পিতা এসে দাঁড়িয়েছিলেন। গোবিন্দের সব কথা শুনলেন। গোবিন্দ তাঁকে প্রণাম করল।

ছেলের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে পিতা বললেন, 'তুমি স্নান করে নাও।'

মা অন্যমনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করল। মনের মধ্যে কোথায় কাঁটা ফোটার মত খচখচ্ করে যশোদার যাওয়াটা। তাঁদের এড়াতে চায়। আবার জননীর মন, ভাবেন, আহা ছেলেমানুষ, নতুন দেখবার শখ হয়েছে, তাই গেছে। কিন্তু জানাল না কেন? একটি চিঠিও দিল না। ললিতাও লিখতে পারত। আর বেশী ভাবতে মন চায় না। কিন্তু বহু ভাবনা জাগে, শুধু কারুকে বলতে পারেন না। স্বামীর কাছে একবার বললেন। তিনি হাসলেন, বললেন, 'সে কি আর কিছু ভেবেছে, বেড়াতে যাবার সুযোগ পেয়েছে, গেছে।'

৩

দার্জিলিং-এ থাকতেই তারা পরীক্ষার ফল জানতে পারলে। যশোধরা মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে পাস করেছে, স্কলারশিপ পাবে, কলেজেও ফ্রী হবে। কয়েকটি 'অক্ষর'ও নামের পাশে পেয়েছে সে। বিশাখার শঙ্কা সত্য, ভয়ে সে গোবিন্দের সঙ্গে যায়নি—মা, বাবার কাছে। পাছে তাঁরা আর পড়তে না পাঠান। এখন আর খরচের দিকে কোন বাধাই রইল না, যা অসুবিধা অনুমতি নিয়ে।

স্বাহা পালিত বললে, 'ভর্তি হয়ে যা, কিছু বলবেন না।'

সংজ্ঞা বললে, 'কি আর হবে ভেবে? নিজেরও পড়ারই তো তোর ইচ্ছে।'

যশোধরা বললে, 'কিন্তু বাবা ভারি দুঃখিত হবেন।'

স্বাহা একটু হাসলে, বললে, 'কিন্তু তাঁকে সন্তুষ্ট করতে গেলে তো সেই গোঁসাইগোবিন্দের নাতির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবেন।'

যশোধরা লাল হয়ে একটু হাসল। জননীর তীক্ষ্ণ মন্তব্য, বাবার ক্ষুব্ধ নীরবতা আজ সে স্পষ্ট বুঝেছে। কিন্তু তাই বলে সত্যি গোঁসাইঘরে—ঐরকম বিয়ে। বহু আত্মীয়াদের দেখা ঘর-সংসার যা আগে তেমন বোঝেনি, এখন সব স্পষ্ট হয়ে উঠল যেন। কলকাতায় সভ্য সমাজ শিক্ষিত আবেষ্টনীর আওতার প্রভাব ক'বছরেই যথেষ্ট হয়েছিল। নিজের আত্মীয়াদের তার করুণার পাত্রী মনে হত।

স্বাহাদের দাদা সুনন্দ এসে দাঁড়াল। 'আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যশোধরা। খুব আশ্চর্য করে দিয়েছো সবাইকে। সেই অজ পশ্চিমের গোঁড়া বৈষ্ণববাড়ির মেয়ে এমন করে ইংলিশে লেটার পেয়ে পাস করেছ—আশ্চর্য! তারপর কি পড়বে এবারে? কোথায় ভর্তি হবে?'

যশোধরা বললে, 'আমি তো এখনো মা-বাবার মত জানি না, কি করব ভাবছি।'

সুনন্দ বললে, 'কেন? তাঁরা মত করবেন না?'

স্বাহা বললে, 'না করাই সম্ভব, তাঁদের বাড়ির ধরনে।'

'তাই বুঝি? ও, তাহলে?'

'তাহলে আর কি! ওর বিয়ে হবে বৃন্দাবনের বড় গোঁসাইয়ের নাতির সঙ্গে', এবারে সংজ্ঞা মুখ টিপে হেসে বললে।

আরক্ত হয়ে যশোধরা বললে, 'থাম তোরা। বোধহয় তাঁরা পড়াটা পছন্দ করবেন না।'

সুনন্দ একটু চুপ করে থেকে ইংরেজীতে বললে, 'তাঁরা তাঁদের জীবন যাপন করেছেন। তোমার জীবনে তাঁদের অধিকার থাকা উচিত নয়। এটা আধুনিক যুগে অন্যায়।'

সুনন্দর মা ঘরে এসে খুব খুশি মনে যশোধরাকে বললেন, 'তুমি খুব আশ্চর্য করে দিয়েছ মা সবাইকে।'

যশোধরা একটু ইতস্তত করে তাঁকে প্রণাম করলে।

তিনি কায়স্থ, সে ব্রাহ্মণকন্যা তার মনে ছিল এতদিন। কোনোদিন প্রণাম বা নমস্কার করেনি।

সুনন্দর মা একটু আশ্চর্য হলেন, কিন্তু হেসে চিবুক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, 'এবারে তো তোমাদের দার্জিলিং থেকে নাববার সময় হল। কোথায় ভর্তি হবে, সব ঠিক করতে হবে। তুমি কোন্ কলেজে ভর্তি হবে যশোধরা?'

সংজ্ঞা বললে, 'সংসারযাত্রার কলেজে। তুমি বুঝি জান না মা, ওর বাবা যে বিয়ের সম্বন্ধ করেই রেখেছেন।'

সুনন্দর মা যশোধরার দিকে চেয়ে দেখলেন সে অপ্রতিভভাবে চুপ করে রয়েছে। তখন নিজের মেয়েদের দিকে চেয়ে বললেন, 'তা সে তো মন্দ নয় কিছু, ভালই তো।'

স্বাহা বললে, 'আগে পাত্রটি কেমন শোন, একেবারে তিলকমালা পরা গোঁসাই যে।'

যশোধরা আরক্তিম হয়ে উঠেছিল।

মা এবারে বললেন, 'তা ওঁরা গোঁসাই মানুষ, ওঁদের ছেলেমেয়ের বিয়ে গোঁসাইবাড়ি হবে না তো কি তোমাদের মতন ম্লেচ্ছবাড়ি হবে।'

স্বাহা একটু হাসলে, 'আমাদের মতন ম্লেচ্ছবাড়িই যে গোঁসাইদের মেয়ের ভালো লাগছে, তা তুমি দেখছ না?'

অকস্মাৎ যেন সকলেই চকিত হয়ে উঠল, কথাটি ছোট্ট কিন্তু তার ব্যঞ্জনার বিস্তৃতি আর গভীরতা যেন অনেকখানি। মাও অস্বস্তি বোধ করছিলেন। বললেন, 'বাজে বকিস্-নি তোরা, চুপ কর। খাবার দিয়েছে—আয়।'

৪

পত্রদ্বারা অনুমতি আকর্ষণ করে নিয়ে যশোধরা ভর্তি হল কলেজে। গোঁড়া গোঁসাইঘরের মেয়ের কলেজে পড়া, ব্রাহ্মবাড়ি মেশা, সকলের সঙ্গে মেলামেশা যেন হঠাৎ ভাল করে পাস করার গুণে ললিতার কাছে বেশ গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছিল। যশোধরার লজ্জার, সঙ্কোচের, ভয়ের, পিতা-মাতার অপছন্দর ভাবনার বাধা তার গর্বের ও প্রশ্রয়ের মাঝে যেন কখন মিলিয়ে আসছিল তা ললিতারও চোখে পড়েনি, কিশোরেরও মনে লাগেনি। যশোধরার তো অনুভবেই আসেনি।

শুধু শৈলেন, গোবিন্দের কি একটা অস্বস্তি ছিল। কিন্তু পরামর্শ করা বা আলোচনা করার সম্পর্ক বা দায়িত্ব তো তাদের নয়। যে সত্যি কর্তৃপক্ষ নয়, তার সামনে বসে কেউ কোন না কোন অবাঞ্ছিত বা অসঙ্গত কিছু করলেও যেমন তার শুধু চুপ করে দেখা ছাড়া গতি থাকে না, ঠিক তেমনিভাবে গোবিন্দ, শৈলেন শঙ্কিত ঔদাসীন্যে দূরে সরে থাকত।

পরের বছরে মা-বাবার সঙ্গে দেখা হল। যখন ফার্স্ট ইয়ার পড়া হয়েছে তখন যে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়তে বাধা পড়বে না, এ জানাই ছিল যশোধরার যেন।

বাড়িতে গোঁসাইর রাধা পিসিমা এসেছিলেন। মেয়ে দেখে একেবারে বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন। গোঁসাইকে বললেন, 'এমন মেয়ে! একেবারে যেন কিশোরী শ্রীমতী। এ আমরা ছাড়ব না, তুই যেন আর পড়াসনি। আমি আমাদের ঘরেই নিয়ে যাব, বেশী বয়স বলে

মনেও হয় না, হোকগে আঠার বছর। আহা! মেয়ের কি রূপ। এ ওরা ছাড়বে না।'

গোঁসাই হাসলেন। বিশাখা চুপ করে রইলেন। সম্মুখে উপবিষ্টা নাতনীকে লক্ষ্য করে পুনশ্চ রাধা পিসিমা বললেন, 'আর ছেলেও আই-এ না কি পাস দিয়েছে, চমৎকার গৌরগোবিন্দ চেহারা। আর কি ঐশ্বর্য! নাতনীর আমার কলসী থেকে জলও গড়িয়ে খেতে হবে না। চারটে করে ঝি একটা বৌয়ের জন্যে। পানের বাটাটি অবধি এগিয়ে দেয়। আর গহনাগাঁটি, সে আর কি বলব। এক একটি গহনাই কতরকমের। মুক্তোর পৈঁছে হীরের বেশর মোতির মালা পরে বসে থাকবি খাটের ওপর। বছরে কত গহনাই যে রাধারানী পান শেঠেদের কাছে। সব বড় গোঁসাইয়ের এস্টেটে জমা হয়। যত ইচ্ছে বৌরা পরে। এই সেদিনও দক্ষিণের কোন শেঠ রাধারানীকে দশ হাজার টাকা দামের নাকের বেশর দিয়ে গেল। বৌমা রেখে দিয়েছে, ছেলের বৌকে দেবে বলে।'

যশোধরা স্মিতমুখে সব শুনছিল, পিতামাতা কার্যান্তরে চলে গেলে হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'ঠাকুমা, ওরা তাহলে সারাদিন খাটেই বসে থাকে চারটে ঝি চারপাশে নিয়ে? মাগো, কি বিপদ! শুধু শুধু গহনা পরে বসে থেকে থেকে তারা পাগল হয়ে যায় না?'

ঠাকুমা বললেন, 'বিপদ কিসের! নড়ে বসতে হয় না—এত সুখ। বাইরে ছেলেদেরও চারটে করে চাকর তেল মাখাবে, পা টিপবে, পিকদানী এগিয়ে দেবে। তবে না এমন গজেন্দ্র আকার। তোদের মতন লেখাপড়া করে পাঁকাটি নয় তারা!'

যশোধরা হেসেই আকুল। গোবিন্দও ঠাকুমার গল্পের গন্ধে এসে বসেছিল। গোবিন্দ বললে, 'তা তুমি যে বলছ ঠাকুমা, ওদের ছেলেও পাস দিয়েছে এবারে? রোগা হয়নি পড়ে?'

ঠাকুমা ভ্রূভঙ্গি করে বললেন, 'রোগা হবে কি করে? তিনটে মাস্টার আছে, পড়িয়ে দিয়ে যায়। তা বড় ছেলের মতন অত ভারী শরীর এর নয়। এই তো পের্থম্ এদের বাড়ি থেকে ইংরিজী স্কুলে পাস দিলে।'

যশোধরা, গোবিন্দ হেসে বললে, 'মাস্টার এসে পড়িয়ে দিলেই বুঝি পড়া হয়ে যায় ঠাকুমা!'

গোবিন্দ বললে, 'কত বড় ছেলে ঠাকুমা? যশিও তো দুটো পাশের পড়া পড়ছে।'

ঠাকুমা বললেন, 'তা এই চব্বিশ বছর হবে।'

যশোধরা ফিক করে হেসে ফেললে, 'চব্বিশ বছরে আই-এ দেবে!'

গোবিন্দ চুপ করে রইল। বিশাখা সব দূর থেকে দেখছিলেন এবং শুনতে পাচ্ছিলেন। ডাকলেন, 'পিসিমা, তোমার ঠাকুরসেবার সময় হলো। এসো এবারে, যোগাড় করে দিয়েছি।'

পিসিমা বধূমাতার কাছে শ্বশুরালয়ের ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি আড়ম্বরের কাহিনী বলতে লাগলেন। তাদের বছরে কত লক্ষ টাকা আয়—কোনরকম ব্যয় নেই। আগেকার গোঁসাইদের কারো কারো স্বভাব চরিত্রের খুব অক্ষুণ্ণ সুনাম ছিল না, সেজন্যে কিছু অপব্যয় হত। এখনকার ছেলেরা আর সে রকম নয়, তাতে এ ছেলের তো তুলনাই হয় না,' বিদ্বান ছেলে। ওদের দোরে লক্ষ্মী বাঁধা পড়ে আছেন। সরস্বতীও এবার এলেন। 'আর

জানিস্ বৌমা, তোদের তো একটা হাতী, ওঁদের পাঁচটা হাতী। ওঁরা হোল বৃন্দাবনের রাজা। আর ওঁদের বংশ কি আজকের? কতকালের। যখন থেকে গোবিন্দজীর আবির্ভাব ততদিনের বংশধারা ওঁদের।' পিসিমা কত পুরাতন গরিমার কথা বলেন।

বিমনাভাবে বিশাখা, আগ্রহ সহকারে গোঁসাই রাধা পিসিমার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। ঐশ্বর্যের কাহিনী বিশাখার একটু মনোহরণ করেনি তা নয়। গোঁসাইর কাছে অবশ্য গোস্বামীদের ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি কিছু নতুন নয়, তাঁর কাছে বৃন্দাবনের বড় গোঁসাইবাড়ি এইটেই সবচেয়ে বড় কথা। অত বড় ভক্ত পুরাতন বংশের রক্তধারায় তাঁর বংশপ্রবাহ মিলিত হবে। তাছাড়া মেয়ে রাজরানীর মত ঐশ্বর্যশালিনী হবে। এবং ছেলে মুখ্যু নয়! তাঁর কাছে আঠারো বা চব্বিশ বছর বয়সে পাস করা বা না করা এমন কিছু বড় কথাও নয়, লজ্জার কথাই বা কি?—গোঁসাই ওসব ভাবনা কিছুই ভাবেন না।

অতঃপর রাধা পিসিমা সকলকে প্রচুর আশীর্বাদ করে—বহু শুভাকাঙ্ক্ষা জানিয়ে ভাবী পৌত্রবধূরূপে যশোধরাকে বহু স্নেহ সম্ভাষণ করে বৃন্দাবনে ফিরে গেলেন। নিঃসন্তান বিধবার নিজের পিতৃকুলের রক্তপ্রবাহকে পুনশ্চ বিখ্যাত শ্বশুরকুলের বংশস্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে এবারে সফল করার আগ্রহের উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না। আর আর এমন 'শ্রীমতী'র মত মেয়ে! তাঁর নাতনীর রূপ গর্ব করে বলার মত। সেও কম কথা নয়।

বিশাখার ছেলেমেয়েও ফিরে গেল কলকাতায়। রাধা পিসিমার শ্বশুরকুলের সমৃদ্ধি ঐশ্বর্য যশোধরাকে কতটা মুগ্ধ করেছিল, কিছুই জানা গেল না। ঐশ্বর্যের প্রকাশ আর তা ব্যবহারের প্রকার যে সেকালের চেয়ে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে—সেটা স্পষ্ট করে না হোক, অচেতন মনেই যশোধরার একটা ধারণার ভিত্তি বিস্তার করছিল। প্রচুর গহনা অলঙ্কার ভূষিত হয়ে দাসী পরিবেষ্টিত হয়ে রাত্রিদিন শুধু বিছানায় বসে থাকা পরম ঐশ্বর্যশালিত্বের পরিচয় বলে যশোধরার মনে হয়নি।

৫

চিঠিখানা হাতে নিয়ে গোবিন্দ আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল। বেশী কথা নেই, দু লাইন কালো অক্ষরের সারি। কিশোরের লেখা।

বহুক্ষণ কেটে গেল। বিশাখা এসে ডাকলেন, 'কইরে গোবিন্দ, নাইতে গেলি না? উনি যে খেয়ে চলে গেলেন, তোর ভাত পড়ে। আমি বলি নাইতে গেছিস। কি হয়েছে তোর? মুখটা অমন কেন? জ্বর হয়েছে নাকি?'

বিবর্ণ মুখে গোবিন্দ বলবার চেষ্টা করলে, 'কিছু হয়নি তো।' কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না, শুধু চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল ঝরে পড়ল। সে মাথাটা নিচু করে নিলে।

বিশাখা এসে কপালে হাত রাখলেন, 'কই জ্বর তো নয়? চিঠি কার রে তোর কোলে?' চিঠিটা খোলা পড়েছিল। গোবিন্দ মুখ নিচু করে বসে রইল। চিঠির সমস্ত লেখা সামান্য ক'লাইন। বিশাখা পড়লেন। কিশোরের লেখা স্পষ্ট গোটা গোটা বাংলায় লেখা। কোনো ভণিতা নেই, দুঃখ জ্ঞাপন নেই, মন্তব্য নেই। শুধু লেখা "গোবিন্দ, কাগজে দেখলাম

গত ১৭ই জুলাই সুনন্দ পালিতের সঙ্গে যশির বিয়ে হয়ে গেছে—ব্রাহ্ম বিবাহ আইন অনুসারে।"

ইতি—

বড়মামা।

ছুটিতে গোবিন্দ বাড়ি ফিরেছিল, যশোধরা ফেরেনি, পরীক্ষার ফল না দেখে ফিরবে না এই বলেছিল। কথা ছিল, এবারে কিশোর বা অন্য কারুর সঙ্গে আসবে। তারপর চিঠিপত্র বহুদিন আসেনি। বিশাখা উৎকণ্ঠিত ছিলেন কেমন আছে।

বিশাখার ঘরের সামনে দেবতা দর্শনের ঝরোকা, জালি কাজ করা ছোট ঢাকা বারান্দা-মত। হতবুদ্ধির মত বিশাখা সেইখানে বসে রইলেন।

দেবতার তখন মধ্যাহ্ন ভোগ আরতি শেষ হয়ে গেছে, দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের জন্য পর্দা পড়ল, দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল। শ্রাবণ মাস, রেশমী ঝালর দেওয়া টানাপাখার দড়ি মন্দিরের চত্বর থেকে টানা হতে লাগল। পুরোহিত, পূজক, সেবক, দাসদাসী সকলে প্রসাদের অন্ন নিয়ে নিজের নিজের ঘরে চলে গেল। দীর্ঘ দিনের প্রহর মুহূর্তগুলি কিভাবে বয়ে যেতে লাগল বিশাখা বুঝতে পারলেন না।

অপরাহ্ন বেলায় পুজোর আয়োজনের জন্য দাসী ডাকল, পূজক আহ্বান করলেন। হতবুদ্ধি বিশাখা কিছুই বললেন না, উঠলেনও না। স্বামী কোথায়, ছেলেরা কোথায়, কিছুই জানবার দরকার ছিল না তাঁর আজ। অদ্ভুত অপরিসীম লজ্জায় ধিক্কারে গ্লানিতে অভিভূত হয়ে বিশাখা বসে রইলেন। স্বামীর কাছে এ খবর পৌঁছেছে কি না, আর তা তাঁর কাছে কি রকম বেদনাদায়ক হবে বিশাখা ভাবতেও পারলেন না। সমস্ত ঘটনাটা যেন তাঁকে কেন্দ্র করেই হয়েছে—যশোদার কলকাতায় যাওয়া, পড়া, বিবাহ দিতে না দেওয়া,—সবই বিশাখার ইচ্ছানুসারে হয়েছে। গোঁসাই কোন কিছুতেই বাধা দেননি।

হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বিশাখা বসে রইলেন। কর্পূরবাসিত গোধূলি আরতি, দীপধূপ বস্ত্র সর্বোপচারে সন্ধ্যারতি হয়ে গেল। ভাগবত পাঠ আরম্ভ হল। গোঁসাই প্রসন্নমুখে ভাগবত শুনছেন, বিশাখা দেখতে পেলেন মুখ তুলে। গোবিন্দ, নারায়ণ কেউই পিতার কাছে নেই। গোঁসাইর কাছে এ খবর এখনো পৌঁছয়নি।

রাত্রি গভীর হয়ে এলো। ছেলেরা স্বামী আহার করলেন কি না তাও জানবার ইচ্ছা হল না। গোবিন্দ অভুক্ত ছিল, প্রাতে একবার মনে পড়ল। নিজেও অভুক্ত ছিলেন। কিন্তু সংসারের ভাবনা, ক্ষুধা তৃষ্ণা কর্তব্যের দায়িত্ব সবই যেন গ্লানি লজ্জা শ্রান্তিতে ডুবে গেছে।

স্বামীর কাছে পরিজনদের আত্মীয়স্বজনের কাছে কি করে আর কোনোদিন দাঁড়াবেন তা বিশাখা ভাবতেও পারলেন না। সমস্ত লজ্জা ধিক্কার সবই যেন ক্লেদের মত তাঁরই গায়ে ছিটিয়ে গেছে। এইখানেই যদি এই লজ্জা ধিক্কারের জীবনের তাঁর শেষ হয়ে যেত।

শয়ন আরতি আরম্ভ হয়ে গেল। 'শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্ধন' গাইতে গাইতে মন্দির পরিক্রমা দিয়ে শয়নের বিশেষ ভজন শেষ করে পূজারী ভজনকারী সকলে মন্দির

বন্ধ করে দিলেন। বিশাখা দেখতে পেলেন স্বামী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে অন্তঃপুরের দিকে চলে গেলেন। একটি প্রকাণ্ড প্রদীপ ছাড়া সমস্ত আলো ঝাড়বাতি নিবিয়ে দিয়ে গেল পরিচারকরা।

গোঁসাই আহারে বসে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মা আজ আসেননি যে!'

গোবিন্দ নতমুখে বললে, 'জানি না তো।'

স্বামীপুত্রের আহারের স্থানে বিশাখার অনুপস্থিতি, এমন দিন দীর্ঘকালের মধ্যে পিতাপুত্রের কারুরই মনে পড়ল না। অস্বস্তিকর নীরবতার মাঝে নারায়ণ, গোবিন্দ, গোঁসাইজী আহার সমাপ্ত করে উঠে গেলেন।

গোঁসাই নিজের ঘরে বসে গীতার টীকাভাষ্য খুলে বসলেন। গোবিন্দ এসে দাঁড়াল। দুর্মুখের কাজ তাকেই করতে হবে। মাকে সে দেখতে পেয়েছে, কিন্তু মার কাছে যেতে পারল না।

গোঁসাই আশ্চর্য হয়ে ছেলের দিকে চাইলেন।

গোবিন্দ আস্তে আস্তে চিঠিখানা রেখে বললে, 'একখানা চিঠি এসেছিল বড়মামার।' গোবিন্দ আর দাঁড়াল না।

৬

পুঁথিপত্র সব চতুর্দিকে ছড়ানো রইল। শ্রাবণের সিক্ত এলোমেলো বাতাসে প্রদীপ সারারাত্রি কেঁপে কেঁপে জ্বলতে লাগল, শয্যা যেমন তেমনি পাতা রইল, খানিক খানিক বর্ষণ, খানিক আকাশ মুক্ত দেখা গেল। জানালা দিয়ে বৃষ্টির সিক্ত জলকণাও থেকে থেকে পুঁথির ছড়ানো পাতা সেঁতিয়ে দিয়ে গেল। গোঁসাই ছোট্ট চিঠিখানা সামনে নিয়ে অভিভূতের মত স্থির নিস্পন্দ হয়ে প্রহরের পর প্রহর বসে রইলেন। রাত্রি শেষ হয়ে এলো, আকাশের অন্ধকার হালকা তরল হয়ে এলো ধূসর অবগুণ্ঠনের আড়ালে। নিঃশব্দ কান্নার মত আকাশের মেঘাচ্ছন্ন মুখ প্রত্যূষের নির্মল আলোকে আড়াল করে রেখেছে।

মন্দিরের নহবতখানায় ভোরের সুর বেজে উঠল। 'উঠরে নন্দলালা ভোর ভৈল' গান বহিঃপ্রাঙ্গণে দারোয়ানের মুখে শোনা গেল। গোঁসাই সচকিত হয়ে চিরাভ্যস্ত 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' 'গোপাল গদাধর' বলে উঠলেন, এবারে ঝরঝর করে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

'হে ঠাকুর, হে জনার্দন, হে গোবিন্দ, এ কী করলে,' অসম্বদ্ধ বিলাপে সমস্ত মন মথিত হতে লাগল গোঁসাইয়ের।

গোঁসাই চোখ মুছে পুঁথিপত্র গুছিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। গীতা উল্টে পড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন, যদি কোন সান্ত্বনা পান। যদি আশ্বাসের কিছু কথা পান। কিন্তু গীতা, টীকা, হিন্দী ভাষ্য, পুঁথি, সব একাকার হয়ে গেছে ঝাপসা চোখের সামনে, সব মিশে গেছে যেন, কোনও কিছু পৃথক করা গেল না।

হতবুদ্ধি গোঁসাই হাতড়ে হাতড়ে পুঁথি উল্টাতে লাগলেন, কি দিয়ে কি করে এই চোখের জল, এই উন্মত্ত বেদনাকে চাপা যায়। ঘরে আলো এসে পড়েছে সকালের,—

তবু প্রদীপ উস্কে নিয়ে গোঁসাই গীতা খুলে পাতা ওলটান। চোখে পড়ল, 'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।' 'যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।' চোখ ঝাপসা হয়ে গেল, আঙুল দিয়ে পুঁথির উপর চিহ্ন রেখে মূঢ়ের মত গোঁসাই বারবার শুধু বলতে লাগলেন, 'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।'

গোবিন্দ এসে দাঁড়াল, সারারাত্রি বিনিদ্র আরক্ত চোখে কালিমাঙ্কিত চোখের কোল পিতা বিমূঢ়ভাবে ঐ একটি শ্লোকের লাইন আবৃত্তি করছেন। পুত্রের দিকে হতবুদ্ধির মত দৃষ্টিতে চাইলেন। গোবিন্দ হেঁট হয়ে বসে বললে, 'আপনি উঠুন, বেলা হয়েছে, আমি পুঁথিপত্র গুছিয়ে দিচ্ছি।' গোঁসাইজীর সম্বিৎ ফিরে এলো। ধীরভাবে পুত্রের সঙ্গে উঠে ঘরের বাইরে এলেন। ঝরোকার পাথরের জালিতে মাথা রেখে কাত হয়ে বিশাখা ঘুমিয়ে পড়েছেন। গোঁসাই সেদিকে চেয়ে স্তব্ধভাবে থমকে দাঁড়ালেন। গোবিন্দ ডাকলে, 'মা, ঘরে শোওনি?'

বিশাখা ত্রস্তভাবে উঠে বসলেন। আত্মবিস্মৃত স্বপ্নাভিভূতের মত বললেন, 'ঘরে—? আরতি দেখতে বসেছিলাম।' সহসা সব মনে পড়ে গেল। এবারে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। নীরবে তিনজনে নেমে গেলেন।

শ্রীহর্ষ, ১৩৫০

গোবিন্দ

গোঁসাইজীর সংসারযাত্রায় শরীরে ও অন্তরে একটা বিশ্রী কাটা ক্ষতচিহ্নের মত যশোধরার বিবাহ ঘটনাটা গভীর সুপরিস্ফুট দাগ কেটে দিয়ে গেল। দীর্ঘদিন অবসাদে মূঢ়, বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে থেকে গোঁসাই ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক কাজকর্মের মাঝে আপনাকে নিযুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

গোবিন্দর এম-এ-র ফিফ্‌থ ইয়ার পড়া হয়েছিল, সে পিতা-মাতাকে ফেলে আর কলকাতায় ফিরে যেতে পারেনি। মনে মনে হয়ত তারও অনেক সংস্কারের 'স্কীম' কল্পনা ছিল, চিন্তার ধারাও ঠিক গোঁসাইবাড়ির ছেলেদের মত ছিল না, গোপন অন্তরে নানাবিধ অত্যাধুনিক, কমআধুনিক কল্পনার ধারা নানাদিকে প্রবাহিত হত। কিন্তু আকস্মিকভাবে নিজের বাড়িতেই এমনতর সংস্কৃতি শুরু হয়ে যাবে ঠিক বুঝতে গোবিন্দও পারেনি। সহসা এখন তার কাছে সংস্কারের অন্যদিকও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল।

এই ঘটনার পর পিতা নিরবচ্ছিন্ন নির্ভরতায় হঠাৎ যে তাকে কেমনভাবে আশ্রয় করে নিলেন সে তাও ভাল করে বুঝতে পারলে না। শুধু অপরিসীম সমবেদনায় ও করুণায় সে পিতার সহচর হয়ে উঠল যেন। তিলক গান্ধী অরবিন্দের আধুনিক গীতার নানাবিধ টীকাভাষ্য, পিতাকে পড়ে অনুবাদ করে শোনানো যেন তার কাজ হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পড়া ও নিজের ভাবনা যেন আয়ত্তের অনেক দূরে চলে গেল।

আস্তে আস্তে বৎসর শেষ হয়ে এলো প্রায়। গোঁসাই রাত্রে আর নিজের কাজ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। গোবিন্দের কাছে বইয়ের নানা অনুবাদ শুনতেন ও আলোচনা করতেন। বিশাখা চুপ করে বসে শুনতেন, অথবা হয়ত সুপারি কাটতেন, শলতে পাকাতেন।

সহসা একদিন গোবিন্দ বললে, 'বাবা, আমাদের মন্দিরের উঠানে একটা পাঠশালা করলে হয় না? আপনাদের আগে তো শুনেছি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী মত ছিল, না? উঠে গেল কেন?'

গোঁসাই আশ্বস্ত হয়ে উঠলেন যেন পুত্রের কথায়। বিশাখাও যেন স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠলেন মনের কোণে। বহুদিন ধরে জনক-জননীর মনে ভয় ছিল, যদি গোবিন্দ কলকাতায় ফিরে যেতে চায়! যদি তারও এই দেশ, এই দেবতা-সেবা, এই দেবত্র তদারক করার কাজ ভাল না লাগে!

গোঁসাই বললেন, বেশ তো, কর না। আমাদের চতুষ্পাঠী ছিল ঠাকুরদার আমলে, অনেকগুলি ব্রাহ্মণ ছাত্র থাকতেন বাড়িতে, আমি তখন খুব ছোট, অল্প অল্প মনে আছে। তারপর ঠাকুরদার মারা যাবার অল্পদিন পরেই বাবা মারা গেলেন, দেবত্র সম্পত্তি গেল মুন্সীরামের (রিসিভারের) হাতে, খরচপত্র কি হত না হত কিছুই জানি না। হয়ত দেনা ছিল, সেটা উঠে গেল, তারপর আমি বড় হলাম, তা আমি তো বেশী লেখাপড়া শিখিনি।'

গোঁসাই পুঁথির ওপর চোখ নিচু করে নিলেন। বিশাখা গোবিন্দ এতক্ষণ গোঁসাইয়ের

দিকে চেয়েছিলেন, অপ্রতিভ বিশাখা চোখ নামিয়ে নিলেন হাতের কাজের রাশীকৃত সলিতার তুলোর ওপর। গোবিন্দের বহুদিন আগের বিশাখার মুখে গোঁসাইঘরে যশোধরার বিবাহ নিয়ে 'মুখ্যু' ছেলের কথা বলার কথা মনে পড়ে গেল। একটু অপ্রস্তুতভাবে চুপ করে থেকে সে বইয়ের পাতা উলটাতে উলটাতে বললে, 'আপনি সংস্কৃত তো খুব ভাল জানেন—আমরা পাঠশালা করলে আপনাকে সংস্কৃত পড়িয়ে দিতে হবে তাদের।'

গোঁসাই চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'কি ভাবে করবে ভেবেছ?'

গোবিন্দ বললে, 'আমার মনে হচ্ছিল, আপনি তো আপনার মন্দিরে দেশ-বিদেশের লোকের কাছ থেকে এত পান, এত প্রসাদ আপনার বিক্রী হয়, এ তো সবই সকলের কাছে পাওয়া ; এই পাঠশালাতে সব জাতের গরিব ছেলেদের পড়াই, শুধু ব্রাহ্মণ নয়; আর সকলকে আপনি আপনার প্রসাদের খানিকটা করে দুপুরবেলা দিন। তাতে গরিব ছেলেরা খেতেও পাবে, পড়াতেও খানিকটা মন দিতে পারবে, খাবার জন্যে আর মজুরি করতে দৌড়বে না। আর আমাদের গোঁসাইঘরের ছেলেরা জড়ভরত হয়ে আছে, তারাও ভাল করে একটু লেখাপড়া শিখবে।' গোবিন্দ 'মুখ্যু' কথাটা উচ্চারণ করতে পারল না।

গোঁসাই বললেন, 'বেশ, তুমি কাজ আরম্ভ কর—আমি অর্ধেক প্রসাদ তোমাকে দোব। কে কে পড়াবে?'

গোবিন্দ বললে, 'এখন আমি, নারাণ আর আমাদের গোঁসাইদের জানা আর দু-একটি ছেলে মিলে আরম্ভ করব।'

২

কয়েকদিনের মধ্যেই রাধামোহনের নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণ পল্লীর সকল ঘরের শিশুদেবতার বালগোপালের প্রতিনিধিদের কল-কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠল। সকালে আটটা থেকে এগারটা অবধি তারা পড়ে, তারপর মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত করে প্রসাদ গ্রহণ করে বাড়ি ফেরে। দীনহীন অপ্রতিভ হাসিমুখ শিশু বালকে আঙিনা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। শুধুই পাঠশালা হলে হয়ত এত তাদের আনন্দময় মনে হত না। গোঁসাই ঠাকুর দালানে বসে, বিশাখা অন্তঃপুরের ঝরোকা থেকে এই নূতন ধরনের মহোৎসব দেখেন—তাদের পড়ার, প্রসাদ পাওয়ার। অন্য কোনো কোনো গোঁসাইবাড়ির কেউ বা মন্দিরের কর্মচারীরা বিরক্ত হয়, বলে, 'যত ছোট জাতের নোংরামি, অজাত-কুজাতের অপরিচ্ছন্ন কাণ্ড।'

গোবিন্দর কানে যায়, সে হাসে, 'তাহলে প্রসাদ বলছেন কেন? মন্দিরেরই বা মাহাত্ম্য কি? ওদের যদি মন্দিরেও আলাদা রাখবেন, তা হলে কোথায় এক হবে? প্রসাদ তো ওদেরই পাওনা, ওদের মুখের হাসির দিকে একবার চেয়ে দেখুন।'

গোঁসাইয়ের কানে বাদানুবাদ আলোচনা পৌঁছয়, গোবিন্দের মন্তব্যও পৌঁছয়, তিনি কিছুই বলেন না, প্রসন্ন হাসিতে অবাক হয়ে গোবিন্দের কথাই মেনে নেন। সত্যই ওদের মুখের হাসির দিকে চেয়ে দেখেন তিনিও।

তাঁর মনে হয় অনেক কথা। মনে হয় এই দৃষ্টিভঙ্গী, এই আনন্দলোক সৃজনের কল্পনা, গোবিন্দ কোথা পেল। যে অনায়াসে সঞ্চয়ের পুরুষানুক্রমিক মোহ থেকে মুক্তি

পেয়েছে, বিলাসের, ব্যসনের দুর্বার বাসনাকে অতিক্রম করে গেছে, এমন লোভহীন আনন্দময় পথের কর্মের প্রেরণা সে কোথা থেকে পেল।

পুরুষানুক্রমে তাঁরাও দেবতার নিত্য-নৈমিত্তিক সেবার, ভোগরাগের ঐশ্বর্যময় লীলাময় উৎসব করে এসেছেন। জনসাধারণ ধনী ও দরিদ্র, অট্টালিকা-প্রাসাদ থেকে পথবাসী সকলেই তাদের পূজাসম্ভার অলঙ্কারে ধনভারে নানা উপচারে, বিনা উপচারেও এনে সেই উৎসবে যোগ দিয়ে গেছে। বিনিময়ে ওঁরাও প্রসাদ দিয়েছেন তাদের, কিন্তু নামমাত্র। বহু শতাব্দী ধরে সেই সমস্ত উপাচার ধনভার দেবতার নামে তাঁর কোষাগারে জমেছে, আজো জমে আছে। আর সেই দেবতার নামে সঞ্চিত ধন সকলে কি ভাবে, কি অনাচারে, অমিতাচারে, বিলাসে, ব্যসনে ব্যয় করেছেন ও করে সেও তো জানেন, দেখেছেন!

কিন্তু সে কি দেবতার ভোগ? দেবতার কাজে ব্যয় হয়েছে?

আজ গোবিন্দ বলেছে, 'সকলের কাছে ঠাকুর পান'। সত্যই তো, এ তো সকলের কাছেই পাওয়া। তাঁদের আগে অবশ্য ছিল তীর্থে, দেবালয়ে, টোল, চতুষ্পাঠী, অন্নদান, অন্নসত্র। তবু মনে হয় এ যেন অন্য ধরনের দেখা। যারা পায় না, যারা পায়নি, যারা বঞ্চিত, যারা মূঢ়, ভীত ভীরু তাদের সেই ব্রাহ্মণেতর অতি নিম্নস্তরের সকলকেও গোবিন্দ মন্দিরের আঙিনায় এনেছে ; তাদের আসায় আজ আর প্রাঙ্গণ অশুচি হয়নি, এই কথা শ্রীচৈতন্যদেবের পর নূতন করে বলেছে। এর নামই কি চিরকালের 'সত্যের' নূতন করে প্রকাশ হওয়া?

গোঁসাই পরম শ্রদ্ধায় স্নেহে ভাবেন, এ কোন্ শিক্ষা? এ তো উনি শেখাননি। এই কি আধুনিক শিক্ষা?

অকস্মাৎ যশোধরার কথা মনে হয়, যেন তাঁর হৃৎস্পন্দন খানিকক্ষণের জন্য মূঢ় হয়ে যায়। বিচলিত হয়ে দেবতার দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর চোখে পড়ে, দেবদেউলের গায়ে আঁকা সমুদ্র মন্থনের ছবি, লক্ষ্মী অমৃত কলস নিয়ে উঠছেন। তারপর বাসুকির নিঃশ্বাসের বিষে সমস্ত চরাচর আচ্ছন্ন হয়ে গেল। শিব বিষের ভাগ গ্রহণ করলেন। মঙ্গল অমঙ্গলকে গ্রহণ করলেন।

৩

দিনে পাঠশালা বসে। রাত্রে মা বাপ ভাই সকলে মিলে সেই আলোচনা চলে।

গোবিন্দ বই আনায় পড়ায়, পড়া ধরার নানা রকম সংশোধন করে আলোচনা করে। খানিকটা পাঠশালা, খানিকটা স্কুল, কিছুটা মন-গড়া ধারায় ওদের পড়ানো চলে।

কাজের আনন্দে যেন মনের মরিচা-ধরা হাসিহীন আনন্দহীন জায়গাগুলোও মসৃণ হয়ে গেছে সকলের। বিশাখা পরম উৎসাহে প্রসাদের বিপুল ভাগ ভাণ্ডার থেকে বের করে দেন। গোঁসাই সামান্য কিছুক্ষণ বড় ছেলেদের পড়ান, তার স্মিতহাস্যে তাদের প্রসাদ গ্রহণ করা দেখে অন্তঃপুরে আসেন। নারায়ণ পরম উৎসাহে দাদার সঙ্গে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে পড়ানোর ভার নিয়েছে।

কোন্ ছেলে কেমন পড়ে, কেবা দুষ্টদুরন্ত, কেবা ভয়ার্ত সবই চোখে পড়ে সকলের।

গোঁসাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, ওই ছেলেটি খুব সুশ্রী দেখতে—চালাক চটপটে ভাব, ওটি কার ছেলে?'

বিশাখা বললেন, 'হ্যাঁ, বেশ ছেলেটি। নীল জরির টুপি পরে আসে, না?'

গোবিন্দ বললে, 'ওটি মাধব গোঁসাইর ছেলে। বেশ বুদ্ধিমান। এরি মধ্যে অনেক এগিয়ে গেছে ওর দলের চেয়ে।'

নারায়ণ বললে, 'ওর দলের মধ্যে সব চেয়ে চালাক ওই, ওকে আলাদা করে পড়াতে হয়।'

গোঁসাই বললেন, 'বাঃ! তা আর সব ছাত্র তোমাদের কেমন হচ্ছে? কত মোট ছাত্র যোগাড় হল?'

গোবিন্দ বললে, 'তা জন চল্লিশ হবে। ছেলে প্রায় সবই ভাল, তবে যে যেমনভাবে মানুষ হয় তার মত খানিকটা হয় তো। সেদিন একটি ছেলে, আমাদের নন্দরাম ছুতোরের ছেলে দেখলাম, কি পরিষ্কার মাথা অঙ্কে। পড়াতেও ভালো বেশ। কিন্তু বেচারা এমন ভীতু হয়ে গেছে, ভদ্রলোকের ভয়ে উঁচু জাতের আওতায়, যে প্রশ্নের উত্তর দিলে পাছে বামুন বেনে উঁচু জাতের কাছে অপরাধ হয় সেই ভয়ে চুপ করে থাকে। একদিন সকলের অঙ্ক ভুল হল, তারই ঠিক হল. তাই তাকে ধরতে পারলাম। এতদিনে তার একটু ভরসা হয়েছে কথা বলবার।'

গোঁসাই বললেন, 'বটে! তা ভালো তো।' আর কিছু বলেন না, বসে বসে পুঁথি দেখেন।

নারায়ণ গোবিন্দ কথা কয়, বিশাখা শোনেন।

খানিকক্ষণ পুঁথি দেখে সহসা গোঁসাই গোবিন্দকে বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছি।'

গোবিন্দ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসুভাবে পিতার দিকে চাইল। বিশাখা স্বামীর দিকে চেয়ে রইলেন।

গোঁসাই আবার পুঁথির দিকে চেয়েছিলেন, এবার মুখ তুলে বললেন, 'তোমার তো সংসারধর্ম করার বয়স হল।'

বিশাখার হাতের যাঁতি থেমে গেল। মন চঞ্চল উৎকর্ণ হয়ে উঠল। এই দীর্ঘদিন আনন্দহীন ভবিষ্যৎ উৎসাহহীন বাড়িতে যেন তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল গোবিন্দের বধূ, গোবিন্দের নির্লিপ্ত কাজের মাঝে তার আনন্দময় সংসারযাত্রা, তার সন্তান....তাদের নিয়ে তাঁদের আবার সংসারযাত্রা!

গোবিন্দ চুপ করে নিচু মুখে পিতার জন্য আনা মহাত্মা গান্ধীর গীতার ব্যাখ্যার পাতা ওলটাতে লাগল।

জনক-জননী উৎসুক হয়ে তার পানে চেয়েছিলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে গোবিন্দ দ্বিধাভরে বললে, 'আপনি নারাণের বিয়ে দিন না, বাবা।'.

গোঁসাই অবাক হয়ে গেলেন, বিশাখাও আশ্চর্য হয়ে গেলেন। গোঁসাই কিছু বলার আগেই তিনি বলে ফেললেন, 'সে কিরে? বড় থাকতে ছোটর বিয়ে কি করে হবে?'

গোবিন্দ মাথা নিচু করে বইয়ের দিকে চেয়েছিল। গোঁসাই যেন মৌনভাবে বিশাখার প্রশ্নেরই উত্তরের অপেক্ষা করছিলেন।

এবারে গোবিন্দ বললে, 'বিয়েতে আমার ইচ্ছে নেই মা।' কিছুক্ষণ ঘরটা স্তব্ধ হয়ে রইল—যেন অনেকক্ষণ।

তারপর সহসা গোঁসাই বল্‌লেন, 'তোমারো গোঁসাইঘরের মুখ্যু মেয়ে বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই?' প্রশ্নটা যেন শুধু প্রশ্ন নয়, যেন উত্তরও। বিশাখার হাতের কাজ, ছেলেদের হাতের বই, শ্রোতারা শ্রোত্রী সবই সমানভাবের জড়পদার্থের মত নিস্পন্দ হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পরে গোবিন্দ বললে, 'আমি শুতে যাই মা।'

৪

অবশেষে বিমনা জনক-জননী নারায়ণের বিবাহের আয়োজন করলেন। আধুনিক শিক্ষা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানুষের অধিকারতত্ত্ব—এসব বার্তা, নতুন জগতের পড়া-শোনার কথা কিছুই গোঁসাইয়ের জানা নেই, তবু কোন এক অজানা শিক্ষা, ভদ্র মন, শান্ত গাম্ভীর্য তাঁকে গোবিন্দর সঙ্গে বাদানুবাদ করতে প্রবৃত্তি দিল না। তিনি মাথা নিচু করে তাঁর ভাগ্যের অজানা কর্মের ফল মেনে নিলেন। কিন্তু কি ভেবে নারায়ণকে আর পড়ার দিকে দিলেন না।

এইবার গোবিন্দর পড়া-শোনার কৃতিত্বে ঈর্ষাতুর এখন বুদ্ধিদৃপ্ত হয়ে আত্মীয়-স্বজনরা বন্ধু প্রতিবেশীজন জনে জনে এসে প্রকাশ্যে, ইঙ্গিতে, আভাসে বলে গেল, 'লেখাপড়া শেখার, বিদেশী শিক্ষার এই ফল ; এই যশোধরার বিবাহ, এই গোবিন্দর স্বাধীন মতামত এবং এর পরিণাম মোটেই রমণীয় নয়, গোবিন্দও হয়ত কোন অন্য জাতের মেয়ে বিবাহ করে তোমার পবিত্র ঘরে আরো কালিমা লেপন করবে, এই তার অভিপ্রায় ইত্যাদি।'

সমবেত সংগৃহীত অভিমতের নির্গলিতার্থ এই যে, নারায়ণকে লেখাপড়ার দিকে বেশী দাওনি, ভাল করেছ,ওর বিবাহ দাও।

গোঁসাই নির্বাক হয়েই সব উপদেশ অভিমত গলাধঃকরণ করলেন। উদ্ধব গোঁসাইর ছোট মেয়ে রাইকিশোরীর সঙ্গে নারায়ণের বিবাহ স্থির হল। মেয়েটি দেখতে ভালো। সুশ্রী মুখ আঁটসাঁট ছোটখাটো গড়ন, গড়নের মতই কঠিন মুখ, হাসির মিত আভাসহীন টেপা ঠোঁট, ঈষৎ ধূসর তীক্ষ্ণদৃষ্টি, টানা চোখ, যে চোখ মানুষকে দেখে শুধু, যা হাসিতে মধুর হয় না, ভালবাসায় কোমল দেখায় না।

একটি পরমাত্মীয় বাদ গেল, অন্যটিও যেন সরে দাঁড়ালো ; তাহলেও বহু আত্মীয়-অনাত্মীয় জড় করে ব্যথাতুর সমারোহে ক্ষুব্ধ উৎসবে নারায়ণের বধূ ঘরে এলো।

গোবিন্দ পরম্ উৎসাহে বধূর জিনিসপত্র সংগ্রহ করেছিল, বিশাখা, গোঁসাইও বহু আশায় দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বহু অলঙ্কার গহনা, জরি জড়োয়া শাড়ি ওড়না, পিতল কাঁসা রূপার তৈজস-বাসন উজাড় করে বার করে দিলেন। আর কার জন্য? গোবিন্দ বিবাহ করবে না—যশোধরা দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কের বাইরে।

জিনিসপত্র দেখে রাইকিশোরীর বুদ্ধিমতী জননী মেয়েকে বলে দিয়েছিলেন, 'মা, মেলেচ্ছ বুদ্ধি ঘরে—মেয়ে পালানো ঘরে (তাঁদের মতে যশোধরার বিয়েটা পালানোরই মত) তোমায় দিলাম, শুধু এই জেনে যে সব তোমার হবে। রাধামোহনের অনেক বিষয়; এসব তোমার হল। ভাসুর যদি বিয়ে করত তো তার হত সব, বড়ই তো এখানের নিয়মে সব পায় কি না। তা ও তো বিয়ে করলে না, আর করে যদি তাহলেও আমাদের

ঘরে না হলে কিছুই পাবে না। শ্বশুর-শাশুড়ী গেলেই সব তোমার। সব 'উড়ন-চণ্ডে' কাণ্ড ওদের; তুমি বুঝে চলবে ; যা ভেবেছিলাম আছে—তার চেয়েও বেশী আছে। সব বুঝে নেবে।'

মেয়ে নির্বাক মুখে সব শুনল, একটি কথাও ভুলল না। 'সব তার' একথা মনে রইল তার।

বধূ বরণ করে এনে পরম বিস্ময়ে বিশাখা দেখলেন, ওই স্তব্ধ মুখ হাসিহীন তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেয়েটির কোনখানে যেন এতটুকু ফাঁক নেই, পথ নেই মনে প্রবেশ করবার। বসনে ভূষণে আহার্যে আদরে যত্নে সে ঘনিষ্ঠ হয় না ; তাকে সকলের ঘরের বধূর মত সাংসারিক প্রবহমান শিষ্টাচার শেখানো যায় না, পারিবারিক পুরুষপরম্পরাগত রীতিনীতির কথাও বলা যায় না, কিছু বললে মনে হয় সেও বলবে যেন কিছু—বলে না কিন্তু। তীব্র সমালোচকের দৃষ্টিতে সে শুধু নির্লিপ্তভাবে দেখে যেন।

গোঁসাই ভেবেছিলেন যশোধরার ফাঁকটা বুঝি খানিকটা পূর্ণ হবে বধূর দ্বারা—কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁরও মোহ ভাঙ্‌ল। গোবিন্দ জ্যেষ্ঠাধিকারে বহু কর্তৃত্ব আর বিষয়ের ব্যবস্থা করে। বহু শখের প্রয়োজনের জিনিস আনে নারায়ণের জন্য, বধূর জন্য। বধূ কঠিন নির্লিপ্ততায় গ্রহণ করে—যেন মনে হয় সে ভাবে সবই তো তার ! যেন ওদের হাতে আনা ওরই সব এবং তা দিয়ে তারাই কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছে, যারা দিচ্ছে।

কয়েক মাসের মধ্যেই সকলে বুঝতে পারলেন, বিশাখা গোঁসাই গোবিন্দ সবাই—হিমালয়ের যে তুষার না গলে কিম্বা গলতে আরম্ভ হয়েই আবার জমে যায়, রাইকিশোরী তেমনই কঠিন আর হিমশীতল। অত্যন্ত আনন্দিত মনে সমাদর স্নেহভরে তার কাছে আসার পর সহসা পরিজনরা যেন থমকে আড়ষ্ট হয়ে যায়। তার আড়ষ্ট নির্লিপ্ততার ছোঁয়াচ লেগে যায় যেন।

৫

তবু সকলে সত্য সত্যই একদিন কৃতার্থ হয়ে গেল।

রাইকিশোরী কি হেসেছিল? অথবা কথা কয়েছিল ভাল করে? কিম্বা তার জন্য আনা কোনো কিছু খুশী মনে গ্রহণ করছিল? না, সে সব কিছুই ঘটেনি। পিত্রালয় থেকে খবর এসেছিল রাইকিশোরীর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে।

গোবিন্দর আনন্দের সীমা রইল না যেন। গোঁসাই বিশাখা খুশী মনে পৌত্রীকে দেখে এলেন মোহর মালা দিয়ে, রূপার বাসন দিয়ে। পৌত্রীকে কোলে নিয়ে গোঁসাইয়ের চোখ সজল হয়ে এলো, যেন শিশু যশোধরা ফিরে এলো তাঁর ঘরে।

পরম সমাদরে পৌত্রীর নামকরণ হল, চন্দ্রাবলী। আর চন্দ্রাকে নিয়ে গোবিন্দর যেন নতুন পাঠশালা আরম্ভ হল আবার। কাঁথা-নেকড়া-জড়ানো চন্দ্রাকে সে দাসীর কোল থেকে নিয়ে আসে সকালে। সারা সকাল সে জ্যেষ্ঠতাত পিতামহ পিতার আশেপাশে শুয়ে থাকে, ঘুমায়, কাঁদে, খেলা করে। মাঝে মাঝে অন্তঃপুরে মায়ের কাছে নিয়ে যায় দাসী। গোবিন্দ আবার ফিরিয়ে আনে।

সহসা একদিন কানে পৌঁছয় তার, 'ছোট ছেলের গায়ে অত হাত দিলে নোনা লাগে আমার মা বলেন।'

অপ্রতিভ গোবিন্দ বলে দাসীকে, 'ওকে তো আমরা কোলে নিই না, শুইয়েই রাখি।'

তবু চন্দ্রাবলীকে নিয়ে আসার মোহ তার যায় না।

রাইকিশোরীর পিসিমা এলেন বৃন্দাবন থেকে। পরম গর্ব ও স্নেহ সহকারে চারদিক দেখে বেড়িয়ে রাইকিশোরীর ঘরে বসলেন।

বিশাখা এসে বসলেন কাছে।

পিসিমা বললেন, 'তা এইবার আমার রাইয়ের একটি খোকা হলেই বেশ হয়। বেশ বাড়ি-ঘর আমার রাইয়ের। বেশ বিয়ে হয়েছে। তা জামাই কোথা? একবার ডাক না?' রাইয়ের পানে চেয়েই বললেন। যেন বিশাখার উপস্থিতি তাঁর চোখে পড়েনি।

অপ্রতিভ বিশাখা নারায়ণকে অন্তঃপুরে আহ্বান করতে উঠে গেলেন।

নারায়ণ এসে প্রণাম করল। হিন্দী-মিশ্রিত বাংলায় পিসিমা আশীর্বাদ করলেন জামাতাকে, 'রাজা হও, রাজা বেটার বাপ হও। যা তোমার ভাই বোন বেটা, ভাগ্যে তুমি জন্মেছিলে, তাই বংশের সংসার-ধর্ম নাম বজায় রইল।'

রাইকিশোরীর পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে ননদটা কোথায়?' বিশাখা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন নারাণকে কি জিজ্ঞাসা করবার জন্য, তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। নারাণ অপ্রস্তুত বিরক্তিভরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

তখনো শোনা গেল, 'ভাসুরটা আবার বিয়ে করবে না তো? তুই আমার রাজমাতা হয়ে—রাজরাণী হয়ে থাক!'

৬

চন্দ্রাবলীর চার বৎসরের সময় রাইকিশোরীর বেণুগোপাল জন্মগ্রহণ করল। বংশধরের আগমনীর উৎসব চিরকালের প্রথানুযায়ী দানে অর্পণে বাদ্যভাণ্ডে মন্দিরের প্রাঙ্গণ কুলকোলাহলে ভরে দিল। পরম হর্ষে বিজয়িনীর মত রাইকিশোরীকে ও নবজাত শিশু উত্তরাধিকারীকে তার পিতামাতা দেখে গেলেন। যেন নিশ্চিন্ত হলেন। বিশাখা ও বিশাখার পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার যোগ্যতা এতদিনে রাইকিশোরী লাভ করেছে। ছেলে তো সকলেরই হয়। সব মেয়েরই—দরিদ্র ধনী সব ঘরেই। কিন্তু এ তো শুধু ছেলে নয়, বংশানুক্রমিক ধনাধিকার! পৌত্রলাভে আনন্দিত বিশাখা-গোবিন্দকে যেন কি রকম ভাবে উপেক্ষা করে রাইকিশোরীর স্বজনরা আসে-যায়। ভাবটা বিশাখার ওরা প্রতিদ্বন্দ্বী।

তাদের উপেক্ষায় আহত ব্যাকুল বিশাখা তত বুঝতে পারেন না। কিন্তু গোবিন্দ যেন একটু বোঝে, নারায়ণও বোঝে। তবে ঈর্ষাহীন স্পৃহাহীন নির্লিপ্ত গোবিন্দের মনে হাসি আসে। নারায়ণ যেন লজ্জা পায়।

বাইরে পাঠশালার কাজ—ছোট ক্লাসের স্কুলের মত খানিকটা হয়ে উঠেছে, পড়াশোনাও বেড়ে চলেছে, ছাত্র-ছাত্রীও বেড়ে চলেছে।

গোঁসাইয়ের মনের বেদনার ক্ষত মিলিয়ে এসেছে। চন্দ্রাকে নিয়েই তাঁর পাঠশালার প্রাত্যহিক আনন্দময় আরম্ভ। বালিকা ঐ বয়সের যশোধরাকে তাঁর মনে পড়ে যায় মাঝে

মাঝে, কিন্তু আর তাতে ব্যথার তীক্ষ্ণতা নেই যেন। মন ভোলাবার মায়াময় যেন যাদুময় নূতন উপকরণ সামনে এসে পড়েছে, চন্দ্রা আর বেণু-রূপে।

বেণুগোপালের অন্নপ্রাশনের উৎসবের দিন এসে পড়ল। বহু সম্পর্কীয় আত্মীয়-কুটুম্বতে অন্তঃপুর ভরে গেল।

উৎসবের কদিন পর আগন্তুক আমন্ত্রিত নিমন্ত্রিতের জনতা আস্তে আস্তে বিরল হয়ে এলো।

খেতে বসে গোবিন্দ চন্দ্রাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কদিন পড়তে যাসনি যে চন্দ্রা?'

পিতামহের পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়ে চন্দ্রা দেখছিল, তাঁর থালার আহার্য থেকে কি খাবে।

গোঁসাই বললেন, 'এসো, পাশে বসো। কি খাবে? সত্যি পড়তে ভুলে গেলে বুঝি?'

চন্দ্রা বসল না, কণ্ঠবেষ্টন করে বললে, 'ভুলে যাইনি, মনে আছে।'

গোঁসাই সহাস্যে বললেন, 'কই, বল তো?'

চন্দ্রা বললে, 'অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে,' দেখচ মনে আছে। তারপর 'লিচি (ঋষি) মছাই বছেন পুজোয়, না, দাদামশাই বছেন পুজোয়।' গোবিন্দর দিকে চেয়ে চন্দ্রা হাসে, তারই শেখানো 'দাদামশাই' বলা। সকলেই হাসলেন চন্দ্রার কথায়।

গোঁসাই বললেন, 'বাঃ, বেশ তো মনে রেখেছ, তা যাওনি কেন পড়তে?'

চন্দ্রা দাদার পাশে বসে কি একটা তুলে মুখে দিচ্ছিল, বললে, 'আল পলব না, দিদিমা বলেছে।'

গোবিন্দ ও নারায়ণ একটু আশ্চর্য হয়ে চাইল চন্দ্রার দিকে। গোঁসাই নতমুখে খাচ্ছিলেন, বললেন, 'কেন পড়বে না?'

চন্দ্রা ক্ষীরের বাটির মধ্যে হাত ডুবিয়ে মুখে একটু তুলে বললে, 'মাকে বলেছে, আল পলবে না, যছিপিচির মত পালিয়ে যাবে।'

বিশাখা প্রসাদের মিষ্টির আর ফলের থালা নিয়ে আসছিলেন। অতর্কিতে কথাটা কানে গেল, আস্তে আস্তে থালাখানি সেইখানেই নামিয়ে রেখে তিনি ভাঁড়ারঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন অভিভূতের মত, আর ফিরে এলেন না।

গোঁসাইয়ের হাতের গ্রাস পাতের ওপর পড়ে গেল। তিনি মাথা নীচু করে দৃষ্টিহীন চোখে থালার দিকে চেয়ে রইলেন। গোবিন্দ নারায়ণের আর মুখ তোলার শক্তি রইল না।

আকস্মিকভাবে আহত হলে কচ্ছপ যেমন তার মুখটা তার কঠিন দেহের আবরণীর মধ্যে লুকিয়ে নেয়, গোঁসাই যেন সহসা তেমনভাবেই নিজেকে একান্তভাবে মন্দিরের পূজা-পাঠের মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন। তাঁদের দীর্ঘদিনের লুকানো দুঃখ, সঙ্গোপন বেদনা, লজ্জা, শিশুমুখে এমন করে ধিক্কৃত হবে এমন কথা কারো মনে হয়নি, সকলে যেন সভয়ে নির্বাক হয়ে গেল।

চন্দ্রার কলকাকলী কথা, হাসির অমৃতধারা পান করবার ভরসা আর নেই যেন কারো।

গোঁসাইয়ের মন্দিরের পাঠ আর শেষ হয় না, বিশাখার দেবতার ভাঁড়ারের কাজের অন্ত হয় না, গোবিন্দ পাঠশালার কাজের পর মোটা মোটা বই নিয়ে পড়তে বসে ; নারায়ণ নীরবে ভাইয়ের কাছে বসে থাকে বা কর্মান্তরে নিযুক্ত থাকে—পরস্পরের কথা-আলাপও যেন আকস্মিক কি বিপর্যয়ে থমকে গেছে।

৭

কয়েক মাসের মধ্যেই গোঁসাইয়ের মৃত্যু হল। বাইরে বিমনা দুই ভাই সামাজিক শোক, আনুষ্ঠানিক শোক, আন্তরিক শোক নিয়ে লোকের সঙ্গে আলাপ করে, শ্রাদ্ধের আয়োজন করে। অন্তঃপুরে নিস্তব্ধ একপাশে বিশাখা বহু আত্মীয়া অনাত্মীয়ার মাঝে চুপ করে বসে থাকেন। নারায়ণের শ্বশুর উদ্ধব গোঁসাই এসে বসেন। সময়োচিত খানিক 'আহা, উহুর' পর বললেন, 'আর বাবা, এখন সোজা হয়ে ওঠ, শোক-দুঃখ-জন্ম-মৃত্যু সবই মিথ্যে বাবা, এই রকমই। তিনি মহাপুরুষ ছিলেন, স্বধামে গমন করেছেন। পুণ্যবান ব্যক্তি, এখন তাঁর উপযুক্তভাবে তোমরা সব ক্রিয়াকর্ম করে বিষয়সম্পত্তি রক্ষা কর।' গোবিন্দ ও নারায়ণ চুপ করে থাকে।

তারপর আবার উদ্ধব গোঁসাই বলেন, 'তা এদিকের কি সব ব্যবস্থা করছ?'

গোবিন্দ বললে, 'আপনারাই বলুন কি করা হয় না হয়?'

'তা তো বটেই, সে তো ঠিকই, তোমার উপযুক্ত কথা বলেছ—তা চিরকালের নিয়ম অনুসারেই সব করা উচিত। তা তোমার মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি একবার', এবারে উদ্ধব গোঁসাই দাঁড়ালেন। অকস্মাৎ চারদিক দেখে বললেন, 'তা বাবা, পাঠশালাটি কি তুলে দিলে? বেশ করেছ। অতি অপব্যয়, বৃথা শ্রম আর ভূত-ভোজন, ও উঠে যাওয়াই বেশ হয়েছে।'

গোবিন্দ বললে, 'না, তুলে তো দিইনি, অশৌচের পর আবার বসবে।'

উদ্ধব নারায়ণের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'না, না, না, আর নয়। তিনি প্রবীণ মানুষ ছিলেন, তাঁকে বলতে পারিনি। তোমরা এসব আর করো না। উঠিয়ে দাও।' যেন গোবিন্দ কেউই নয়।

নারায়ণ কি বলতে গেল, তিনি ততক্ষণ অন্তঃপুরের দিকে চলে গেলেন। নারায়ণ লজ্জিত মুখে চুপ করে মাথা নীচু করে রইল। কয়েকজন আত্মীয়-অনাত্মীয়াদের মাঝে বিশাখা চুপ করে বসেছিলেন, রাইকিশোরীর জননীও ছিলেন।

উদ্ধব গোস্বামী এসে বসলেন। তাঁকে দেখে কেউ কেউ উঠে গেলেন। গোস্বামী বল্‌লেন, 'আহা, কি কাণ্ড, অকস্মাৎ ঘটে গেল, বোঝাও গেল না। এমন সাবিত্রীতুল্য স্ত্রীলোকের ভাগ্যে এমন ঘটনা আমরা কল্পনাই করিনি। রাইয়ের আমার পিতৃবিয়োগ হল। আমি তো মিথ্যা পিতা। আপনারাই ছিলেন ওর মাতাপিতা সব। ওকে আপনাদের চরণে সমর্পণ করে যে কত নিশ্চিন্ত ছিলাম। এই দেখুন, এখন এই মহাগুরু নিপাত হল, কি ভাবে সম্বৎসর যাবে সেও ভাবনার কথা।'

বিশাখার সম্পর্কীয়া ননদ বসেছিলেন কাছে, তিনি বললেন, 'তাই তো।'

গোস্বামী এবারে শ্রোত্রী-হিসাবে তাঁকে পেয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, 'তাই নারায়ণ

বাবাজীকে বলছিলাম, এবার পাঠশালা ইস্কুল তুলে দাও—ওসব খরচ একেবারে বৃথা।'

ননদ বললেন, 'ও তো নারায়ণ করছে না, পাঠশালা তো গোবিন্দ করেছে।'

গোস্বামী বলেন, 'হ্যাঁ, তা তো জানি। তা এখন নারায়ণই সব দেখবেন শুনবেন, পরে তো সবই আমার বেণুগোপালের হবে। তাঁর তো দায়িত্ব আছে একটা। কয়েকটা অপোগণ্ডের পাঠশালা করে—বিষয়টা উড়িয়ে দেওয়া তো ঠিক নয়।'

আশ্চর্যভাবে গোবিন্দর পিসিমা এবারে বলেন, 'বিষয় তো এখনো নারাণের নয়—গোবিন্দর ; যদি বিয়ে না করে তবে নারাণের ছেলে সব পাবে।'

উদ্ধব বলেন, 'সে তো বটেই—তবে আমি ভাল ভেবেই পরামর্শ দিচ্ছিলাম। তা বেয়ান, গোবিন্দকে বলবেন বুঝিয়ে, তাহলেই সব ঠিক হবে।' নতমুখ বিশাখা চুপ করেই রইলেন, গোস্বামী আর খানিকটা কথাবার্তার পর উঠে গেলেন।

৮

অশৌচ গেল, শ্রাদ্ধের সমারোহ গেল। আগন্তুক জনতাও ফিরে গেল। পরামর্শদাতা উদ্ধব গোস্বামী প্রত্যহ আসেন। তার মাঝখানে ভাঙা হাটে বেচাকেনার মত পাঠশালা বসে, গোবিন্দ ছাত্রদের ক্ষুণ্ন করতে পারেনি। কতক বা পড়তে চায়, কতক-বা প্রসাদের আশায় পড়তে আসে, অনেকে দুই-ই চায়। গোবিন্দ বিমূঢ়ভাবে বিচ্ছিন্ন আগ্রহে তাদের নিয়ে বসে। প্রসাদ দেবার সময় হলে নারায়ণকে বলে, 'মার কাছ থেকে প্রসাদগুলো আনিয়ে ভাগ করিয়ে দে তো।'

নারায়ণ ভিতরে যায় ; প্রসাদের ভাণ্ডারের চাবি যে আর জননীর কাছে নেই সে তা জানে, এবং গোবিন্দও জানে। বিশাখার শোকের মূল্যবান অবসরে সমস্ত কর্তৃত্ব ও চাবির অধিকার রাইকিশোরীর হাতে গিয়েছিল। বিশাখা তখন জানেনওনি, খোঁজও রাখেননি। তারপর? হয়ত জেনেছিলেন সে কথা নিষ্প্রয়োজন।

তারপর থেকে নিয়মিত বিক্রির পর উদ্বৃত্ত প্রসাদ পাঠশালায় আসে। গোবিন্দ দেখে না, জানে যা এলো অতি পরিমিত, ক্ষুধিত শিশুদের তাতে কিছুই হবে না। গোবিন্দর মনে হয় গীতার একাদশ অধ্যায়ের সেই শ্লোকের কথা—"এই রাজা মহারাজা সৈন্য কেউই বেঁচে নেই"—তেমনি গোবিন্দও বেঁচে নেই—উদ্ধব গোস্বামী ও রাইকিশোরীর কাছে,—শুধু বেণুগোপালই মাত্র জননী-সহ সেই বহুদূর পশ্চাৎপটে বিরাজ করছে।

কয়েক মাসের মধ্যেই ক্ষুধিত শিশুদের পাঠশালার মোহ কেটে গেল। স্বল্পাবশিষ্ট ছাত্র নিয়ে গোবিন্দ বিমনাভাবে বসে থাকে। অবশেষে একদিন নারায়ণ রাগ করে স্ত্রীকে বলে, 'প্রসাদ বেচে তোমার কত টাকা হয় যে তুমি দিন দিন পাঠশালার ভাগ কমিয়ে দিচ্ছ!'

রাইকিশোরী সরোষে চুপ করে থাকে। জবাব দেয় না।

নারায়ণ তিক্তভাবে বলে, 'লেখাপড়ার ধার তো ধারলে না, তাই গরিবদের অনাথদের মর্মও বুঝলে না।'

এবারে বিদ্যুতের মত তীব্র হেসে রাইকিশোরী বলে, 'তোমাদের তো খুব মর্ম বোঝা

হয়েছে! অমন লেখাপড়া ভাগ্যিস শিখিনি!'

নারায়ণ রেগে গিয়ে মূঢ়ভাবে বলে, 'তার মানে? ও কথার মানে?'

রাইকিশোরীর তীক্ষ্ণ হাসির ফলা তখনো ঠোঁট থেকে মিলিয়ে যায়নি, একটু চুপ করে থেকে বললে, 'মানে দেশের সবাই জানে আর তুমি জানো না?' রাইকিশোরী আর দাঁড়াল না।

সহসা পাশের ঘরে কাঁচ ভাঙার শব্দ হল। নারায়ণ বেরিয়ে এলো দালানে। পাশের ঘরে দেখলে গোবিন্দ সাবানের ফেনা-মাখা মুখে তার দাড়ি কামানোর আরসির ভাঙা কাঁচগুলো একপাশে জড় করে দিচ্ছে। আর পাশে বসে চন্দ্রা অনর্গল কথা কয়ে যাচ্ছে। অপ্রতিভ নারায়ণ এগিয়ে এলো, মনে হলো, হয়ত দাদা শুনতে পাননি। সঙ্কুচিত অন্তরাত্মা বলে দিলে, দাদা সব শুনেছেন। হয়ত সেই সময়েই আরসি ভেঙেছে অন্যমনস্কতায়।

৯

রাত্রে গোবিন্দ-নারায়ণ জননীর কাছে এসে বসে।

কয়েকদিন পরে গোবিন্দ একদিন সহসাই বললে, 'মা, আমি কলকাতায় যাব ভাবছি।'

জননী আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কেন? কলকাতায় কিছু কাজ আছে?'

গোবিন্দ বলে, 'না কাজ নয়। ভাবছি এবারে গিয়ে এম-এ পরীক্ষা দিয়ে দিই। তা হলে কাজ-কর্মের একটু সুবিধা হবে।'

নারায়ণও আশ্চর্য হয়ে চেয়েছিল ভাইয়ের দিকে।

বিশাখা বললেন, 'কাজকর্মের সুবিধার তোর কি দরকার? এখানের সব দেখবে শুনবে কে? এ তো তোরই।'

গোবিন্দ হাসলে, বললে, 'পড়ে নিই, পড়াটা বাকি রয়েছে। এখানের সব নারাণ দেখবে।'

'পড়া শেষ করে আসতে কতদিন হবে?' মা জিজ্ঞাসা করলেন।

গোবিন্দ বলে, 'তা কি বলা যায়, পড়ে পাস করে যদি ভাল কাজকর্ম পাই তা হলে তো ভালই হবে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বিশাখা বলেন, 'সেকি? তা হলে ওখানেই থাকবি? এখানে থাকবি না?'

গোবিন্দ বলে, 'না না, আসব বৈকি তোমার কাছে মাঝে মাঝে।'

বিশাখা চুপ করে রইলেন। কিন্তু বিশাখার অন্তর যেন স্পষ্টই বুঝতে পারলে, গোবিন্দ সব ছেড়ে দিল। আসবে হয়ত কখনো। কিন্তু এই সংসার-যাত্রার মাঝে, এই কাজের আনন্দের কোলাহলের মাঝে আর ফিরবে না।

বিশাখা তবু বলেন, 'তা হলে পাঠশালার কি হবে?'

এবারে গোবিন্দ নারায়ণের দিকে চেয়ে বললে, 'নারাণ যদি চালাতে চায় চালাবে।'

বহু আশা কল্পনায় গড়া, গোঁসাই-বিশাখার মনে বহু সান্ত্বনা আনা, গোবিন্দর আনন্দময় নিজস্ব কর্মের কল্পনার লোক বাস্তবের লোভের চাকার তলায় গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে গেছে। কিন্তু গোবিন্দরও মন তার মোহমুক্ত হয়ে গেছে একেবারে।

নারায়ণ চোখ নীচু করে রইল। কাজের সঙ্গে দৃষ্টির প্রসারতা যেটুকু হয়েছিল সেটা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। যে অধিকার তার ছিল না, হতে পারত না,—একেবারে অপ্রত্যাশিত,

পাছে বিচ্যুত হয় তা থেকে—তাকে আয়ত্ত করবার রাইকিশোরীর ও তার মা-বাপের বিপুল চেষ্টার ছোঁয়াচ ক্রমশঃ তাকেও লাগছিল। যশোধরাকে ধিক্কার, গোবিন্দকে অকারণ অনাবশ্যক অস্তিত্ব মনে করা ভাল না লাগলেও প্রতিবাদ করবার মত মানসিক শক্তি নারায়ণের ছিল না।

ছেলেরা উঠে গেল। বিশাখা উন্মনাভাবে চুপ করে বসে রইলেন, হয়ত স্পষ্টভাবে তিনি জানেনও না, বুঝতেও পারেননি যে তাঁর অগোচর মনের অতল মন্থন করে তাঁর অতি প্রিয় যারা দুজন মূর্তি পরিগ্রহ করে দাঁড়াল তারা সংসারে বিষ আর অমৃত দুইই এনেছিল। বিষ তাঁর সমস্ত জীবনের ধারা নীল বিবর্ণ করে দিয়ে গেছে, আর আনন্দের অমৃতধারা লোভের মরুভূমির মাঝে পথ হারিয়ে ফেলল।

নারায়ণের পুত্র-কন্যা নিয়ে—পৌত্র-পৌত্রী পরিবেষ্টিত সংসারযাত্রা তাঁর রইল বটে, কিন্তু কোনো বন্ধনই যেন রইল না। নারায়ণ তাঁর সন্তান, কিন্তু গোবিন্দ যেন তাঁর শুধু সন্তান নয় ; সম্পদ, নির্ভর, আশ্রয়।

গোবিন্দ, নারায়ণ আহারান্তে শোবার জন্য উপরে এলো। নারায়ণ শুতে চলে গেল। গোবিন্দ জননীর কাছে দু-চারটি কথা বলে আপনার পড়াশোনা নিয়ে বসল। সব আলো নিবে গেল, দাস-দাসীরা শয়ন করতে গেল। বিশাখার মালা জপ আর শেষ হল না। তিনি চুপ করে অন্ধকার প্রাঙ্গণের দিকে চেয়ে রইলেন, যেখানে পাঠশালা এখনও বসে, যে পাঠশালা তাঁদের অবসন্ন মনে নতুন লোকের বার্তার, আশার, আনন্দের সন্ধান এনে দিয়েছিল, গোবিন্দর সুখে-দুঃখে মোহে-মমতায় যে পাঠশালা গড়ে উঠেছিল, কোন্ দেশের কোন্ কালের অনাগত দিনের আদর্শে অথবা কি অপরূপ আশায় তা তিনি জানেন না ; শুধু আজ যখন ভেঙে যাচ্ছে সেই আনন্দময় পাঠশালা, সেই খেলাঘর শিক্ষালয়,—তখন তাঁর মনে হল, এই মানুষের মনের অনির্বচনীয় ধ্রুবলোকের সন্ধান আর কোনোদিন তিনি পাবেন না। এ কোন্ সত্য তা বিশাখা জানেননি, কিন্তু সন্তানের চোখ দিয়ে সেই অপূর্ব দৃষ্টিশক্তি তিনি লাভ করছিলেন।

বিশাখা নিঃশব্দে বসে রইলেন। নিজের গড়া ঘর-করণার সামনে যেন আজ সহসা তাঁর নিজেকে দর্শক মনে হতে লাগল।

১০

বালিগঞ্জের একটি বাড়ির সামনে গোবিন্দ এসে দাঁড়াল। কড়া নাড়তে একটি চাকর এসে দরজা খুলে দিলে।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করলে, 'বাড়িতে কে আছে?'

ভৃত্য বললে, 'মা আছেন। আপনি বসুন।'

বাইরের বসবার ঘরে গোবিন্দ এসে বসল। আধুনিক ধরনের বসবার ঘর ; যেমন টেবিল-চেয়ার-কোচে সাজানো হয়। জানলা দিয়ে প্রচুর রৌদ্র বাতাস আসে, জানলায় দরজায় সুশ্রী পর্দা ফেলা। ছবি মূর্তি দামী বইতে ঘর সজ্জিত।

গোবিন্দর চোখে কিছু হয়ত পড়ল, হয়ত পড়ল না, জানা গেল না।

সহসা ভিতর দিকের পর্দা সরিয়ে যশোধরা এলো, 'দাদা!' সবিস্ময়ে যশোধরা থমকে দাঁড়াল, তারপর নত হয়ে প্রণাম করলে।

তাকে দেখে গোবিন্দর দীর্ঘকাল আগের জননীর কথা মনে পড়ল যেন। গোবিন্দ তার মাথায় হাত দিয়ে বললে, 'ভাল আছিস্, সুনন্দ ভাল আছে?'

যশোধরা ঘাড় নাড়লে। ভাই বোনের পুরাতন কথার উৎস যেন শুকিয়ে গেছে।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করলে, 'সুনন্দ কোথায়? কখন আসে?'

যশোধরা বললে, 'কোর্টে গেছেন। সন্ধ্যের পর ফেরেন ক্লাব থেকে।'

'তোর কি একটা বাচ্চা আছে না? তাকে আন্?'

যশোধরা ছেলেকে নিয়ে এলো। পরম সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট শিশু বছর তিনেকের। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মাতুলের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেল।

'কি নাম রেখেছিস রে? কে আছে এখানে? তোর শাশুড়ী কোথায়—আর ননদ?'

যশোধরা বললে, 'শাশুড়ী এখানে থাকেন না। নাম ওর এখনো কিছু হয়নি, তুমি বল না একটা। তুমি হঠাৎ এলে যে দাদা?'

'নাম তোরাই রাখ্, তোরা কত জানিস নাম। কিন্তু তিনি কোথায় থাকেন তাহলে— তোর শাশুড়ী? আমি এম-এ পরীক্ষা দেবো মনে করে এলাম।'

শাশুড়ীর কথায় যশোধরা অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'তিনি আলাদা থাকেন। আমাদের বিয়েতে তাঁর মত ছিল না, তাঁর ব্রাহ্মঘরের মেয়েতে ইচ্ছে ছিল। তাহলে তুমি পড়বে? বাবা মত করলেন?'

গোবিন্দ ভাগিনেয়কে নিয়ে খেলা দিচ্ছিল। কিছু বললে না।

এবারে সহসা যশোধরা বললে, 'দাদা, বাবা কেমন আছেন?'

এবারে গোবিন্দ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে, 'বাবা নেই।'

যশোধরা আস্তে আস্তে মাথাটি চেয়ারের হাতলের ওপর নীচু করে নিলে। তার চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে জল পড়তে লাগল।

গোবিন্দ নীরবে জানালার বাইরে চেয়ে রইল। সান্ত্বনার কথা, শোকের কথা, সমবেদনার কথা কিছুই সে বলতে পারল না। অনেকক্ষণ পরে যশোধরা মুখ তুলল। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'দাদা, বাবা আমার কথা কি বললেন?'

গোবিন্দ একটু থেমে বললে, 'তিনি তো কোনদিনই বেশি কথা বলতেন না। কিছুই বলেননি।'

সে যশোধরার ছেলেকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, বললে, 'আজকে যাই রে, আবার একদিন সুনন্দর সঙ্গে দেখা করতে আসব।'

দরজার কাছে খোকাকে কোল থেকে নামিয়ে গোবিন্দ রাস্তায় নেমে গেল।

যশোধরা উন্মন দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে রইল। জনক-জননী, গোবিন্দ-নারায়ণ সমস্ত সম্পর্ক সমস্ত অতীত যেন তার চোখের সামনে মুছে দিয়েছে কে। যেন সেদিকে কোনো পথ নেই—কোনক্রমেই আর কোনোদিন সেই পথে যাওয়া যাবে না। সে জননীর কথা, নারায়ণের কথা জিজ্ঞাসাও করতে পারল না—সে নিজের অতীতের কাছে যেন মৃত।

অনেক দূর গিয়ে সহসা পিছন ফিরে গোবিন্দ দেখল একবার—যশোধরা তেমনি চুপ করে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

উত্তরা, ১৩৫০

নারায়ণ, বেণু ও চন্দ্রা

দীর্ঘ কুড়ি বছর কেটে গেছে। নারায়ণ এখন প্রৌঢ়ত্ব পার হয়ে গেছেন, বেণুগোপালের কোনো ভাগীদার নেই। চন্দ্রাবলীর বিয়ে হয়ে গেছে। রাইকিশোরী নিশ্চিন্ত। বেণুগোপালের বিয়ের কথা হচ্ছে। তাহলেই সব হয়।

দ্বিপ্রহরে বাইরের আঙিনায় বুড়ো দ্বারবানের ঘরে এখনো 'রামচরিত-মানস' পড়া হয় তেমনি। বৈকালিক সিদ্ধি ঘোঁটা হতে থাকে। তার সঙ্গে প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড একটা শিলে বাটা হতে থাকে 'ঠাণ্ডাই' (বাদাম, পেস্তা, খরমুজের বিচি) দুধ দিয়ে, সিদ্ধিতে মিশিয়ে বেণুগোপাল কুস্তির শেষে সবান্ধবে খাবে।

গরমে জল ছিটোনো খসখসের টাটি দেওয়া ঘরে ঘুম, শরতে তাসপাশা খেলা, শীতে ঘুড়ি ওড়ানো ছাতে, কিম্বা খোস গল্প রৌদ্রে বসে, আবার বসন্তেও তাসপাশা। বছরের পর বছর একইভাবে ঘুরে যায়। মন্দির যতদিনের, ভাবধারাও যেন ততদিনেরই, একইভাবে চলেছে। আয় ব্যয় আহার বিলাস সবই পুরাতন প্রথায়। শুধু মাঝে কয়েক বছর মাত্র গোবিন্দের সময়ে অন্যরকম কিছু হয়েছিল।

পিয়ন এসে ডাকল, রেজেস্ট্রী আছে দুটো। সই করে নিতে হবে। রামচরিত ছেড়ে স্থবির দ্বারোয়ান উঠল। চিঠি? কার নামে? বেণুগোপাল গোঁসাই আর চন্দ্রা গোঁসাই! সই করে নিতে হবে? ঘুড়ি ছেড়ে বেণুগোপাল সবান্ধবে নেমে এলো।

নারায়ণের কাছে খবর গেল। রেজেস্ট্রী চিঠি বেণু-চন্দ্রার নামে! কে পাঠাল? সই করা হল।

চিঠি এসেছে এক এটর্নীর আপিস থেকে কলকাতা থেকে।

বেণু ও চন্দ্রাকে পৃথক চিঠিতে একই কথা লেখা, গোবিন্দ গোস্বামীর উইলের নির্দেশ অনুসারে তাঁর লাইফ ইন্‌শিওরের দশ হাজার টাকা শ্রীযুক্ত বেণুগোপাল গোস্বামী আর চন্দ্রাবলী দেবীকে দেওয়া যাবে পাঁচ হাজার করে। সে বিষয়ে এটর্নীর আপিসে খোঁজ করলেই সব খবর জানানো হবে।

বেণুগোপালের কষ্ট করে লেখাপড়া শেখবার কিছু দরকার নেই, তাকে তার বন্ধুবান্ধব-স্তাবকরা বুঝিয়েছিল। কষ্টেসৃষ্টে বাপের সাহায্যে তখনকার মত পাঠোদ্ধার হল চিঠির।

নারায়ণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। উইল! দাদার উইল? তাহলে দাদা নেই? স্থবির বিশাখা এখনো বেঁচে আছেন। যশোধরার চলে যাওয়া—স্বামীর মৃত্যু তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল মর্মান্তিক। গোবিন্দর চলে যাওয়ার পরও তাঁর শান্ত সংযম ও ধৈর্য নষ্ট হয়নি।

আগে দু'তিনবার বহু পরে পরে দু'একদিনের জন্যই গোবিন্দ এসেছে মাকে দেখতে, দেখা করতে। শেষদিকে কয়েক বৎসর সে আর আসেনি, যেন মনে হত সে এলে রাইকিশোরী ও নারায়ণ বিচলিত হয়ে উঠতেন। চিঠিপত্র দিত জননীকে। নিয়মমত জননীর নামে মাসের পর মাস টাকাও এসেছে। কিন্তু বছর দুইয়ের বেশী হবে জননী আর যেন তেমন প্রকৃতিস্থ নেই, কানেও কম শোনেন, বোঝেনও কম।

নারায়ণের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। যার সঙ্গে বসে একসঙ্গে গল্প করা—পিতার কাছে বসে কতরকম আলোচনা সব মনে পড়ে। তারপর? তারপর কি রকম অদ্ভুতভাবে সমস্ত ঘটনা মোড়ের পর মোড় নিল। যশোধরা গিয়েছিল সে আঘাত মা বাবার মনে কম লাগেনি। কিন্তু গোবিন্দের যাওয়ার কি দরকার ছিল...কেন গেল? স্পষ্ট কারণ ঘটেনি কিন্তু নিগূঢ় মর্মান্তিক দুঃখময় সঙ্কোচে নারায়ণ যেন নিজের মনের কাছেও লুকিয়ে লুকিয়ে ভাবেন সেদিনের কথা! দীর্ঘ সুন্দর দেহ, দীপ্ত হাসিমুখ দাদা কিছু না বলেই কারুকে কোনো অভিযোগ অনুযোগ না করেই পড়ার নাম করে চলে গেল, নিজের সম্পত্তিরই সমস্ত অধিকার ওকে ছেড়ে দিয়ে। তার নিজের দুর্বলতা—রাইকিশোরী ও তার বাপের প্রচণ্ড লোভ যেন দাদাকে নিরুপায় হয়ে ঘর ছাড়া করল। কিন্তু দাদা কেন জোর করল না? মা কেন বললেন না? দাদা বিয়ে করুক বা না করুক দাদার অধিকার সে কেন ছেড়ে চলে গেল? নারায়ণ আজো বুঝতে পারেন না সে কথা। গোবিন্দ চলে যাওয়াতে রাইকিশোরী খুশীই হয়েছিল। তার পিত্রালয়ের লোকেরা নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কিন্তু তিনি কেন আশ্বস্ত হয়েছিলেন?...নিজের ওপর এতদিন পরে যেন কেমন বিতৃষ্ণা হয়, ধিক্কার আসে। অবুঝের মত প্রতিকার খুঁজে বেড়াতে চায় মন। কোনোদিনই বেশি খুঁটিয়ে ভাববার ক্ষমতা তাঁর ছিল না, কিন্তু বেদনাবোধও ছিল না। আজ এক অদ্ভুত ব্যাকুল দুঃখ তাঁর অন্তর মথিত করে তুলতে থাকে।

সহসা স্তব্ধ হয়ে মনে হল, এই প্রথম সর্বপরামর্শদাত্রী রাইকিশোরীকে এই বিষয়ে তাঁর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করার বা বলার ইচ্ছে নেই! বেণুগোপালের কাছেও বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর এই শৈশবের বাল্যের যৌবনের সঙ্গী সাথীকে ওরা কেউ জানে না, চেনেনি। কিন্তু শুধু কি ওরা? তিনিও কি চিনেছিলেন? ভোগাসক্ত লুব্ধ দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে সহসা আজ নিরাসক্ত গোবিন্দর কাছে বিশাখার কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হল।

২

মাধব গোঁসাইয়ের ছেলে কৃষ্ণপদর সঙ্গে চন্দ্রাবলীর বিবাহ হয়েছিল। তারা এলো।

নারায়ণ জামাতার হাতে চিঠি দুখানা দিলেন।

চিঠি পড়া হলে সে রেখে দিলে। গোবিন্দকে সে দেখেছিল, তাঁর পাঠশালায় সেও ছাত্র ছিল। তার তাঁকে মনে আছে।

কিন্তু চিঠির এই খবর—এই পরিবারের কাছে,—তার কাছে, মৃত্যুর জন্য শোকের বা টাকার জন্য আনন্দের তা বোঝা গেল না। সে চুপ করে বসে রইল। ছোট সহরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ও পরিবারের সব পারিবারিক বড় বড় ঘটনাই প্রায় সকলের জানা হয়ে যায়। কৃষ্ণপদরও অনেক কথাই জানা ছিল—যশোধরার কথা, গোবিন্দর বিবাহ না করার কথা, তারপর গোবিন্দর চলে যাওয়া।

বেণু চুপ করেই বসেছিল, তার জ্যেঠাকে জানাই ছিল না। চন্দ্রাও নীরবে বসেছিল। সে যখন ছোট ছিল, তখনকার কথা পিতামহীর কাছে প্রতিবেশীদের কাছে শুনেছে।

আস্তে আস্তে পিতাকে সে বললে, 'তাহলে কি জ্যেঠামশাই বেঁচে নেই?'

নারায়ণ জামাতার দিকে চাইলেন। চিঠির অর্থ সে ভাল করে করতে পারবে। সে লেখাপড়া শিখেছে, পাশ করেছে, স্কুলে মাস্টারী করে।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি মনে হয়?'

সে বললে, 'আপনারা ওদের আপিসে চিঠি লিখুন। নেইই মনে হয়, নইলে তারা টাকার কথা লিখবে কেন?—আর কোনো চিঠি-পত্র কেউ লেখেনি?'

বেণুগোপাল জবাব দিলে, 'কে লিখবে? সেখানে আর তাঁর কে আছে?'

চন্দ্রাবলী বললে, 'কেন পিসিমা তো আছেন।'

রাইকিশোরী এসে দাঁড়ালেন, 'কার পিসিমা?'

বেণুগোপাল বললে, 'আমাদের পিসিমা।'

রাইকিশোরী জিজ্ঞাসুভাবে সকলের দিকে চাইলেন, তারপর বললেন, 'এতদিন পরে তাঁর নামে কি দরকার?'

আশ্চর্য, আজ আর বেণুগোপাল ভয় পেল না। নারায়ণও কিছু বললেন না। রাইকিশোরীর কথার জবাবে বেণুগোপাল শুধু বললে, 'দরকার একটু আছে।' জ্যেঠার উপর মমতা বোধ না থাক. আজকের এই চিঠি, তাঁর চলে যাওয়ার ইতিহাস তার কাছে অস্পষ্টভাবে কি ফুটিয়ে তুলেছিল যেন।

নারায়ণ ছেলের দিকে চেয়ে তারপর স্ত্রীর পানে চেয়ে শান্তভাবে বললেন, 'দাদার এটর্ণীর চিঠি এসেছে। বেণু আর চন্দ্রাকে দাদা কিছু টাকা দিয়ে গেছেন।'

'গেছেন' কথাটা মানেই যেন যে দিয়েছে সে নেই।

রাইকিশোরী আশ্চর্যভাবে চুপ করে গেলেন কিছুক্ষণের জন্য। তারপর বললেন, 'তিনি তাহলে মারাই' গেছেন?'

শোক নয়, শোচনা নয়,—বেদনাবোধ নয়। শুধু হয়ত তাঁর মনে হল লৌকিক কাজ, দায়, নিয়ম ; হয়ত একেবারে নিশ্চিন্ত হলেন বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে।

নারায়ণ ও বেণু সকলেই তাঁর দিকে চাইল, 'মারা গেছেন' কথাটা শুনে। নারায়ণ বললেন, 'ঠিক জানি না এখনো। মাকে জানাবার দরকার নেই।'

কৃষ্ণপদর পানে চেয়ে বললেন, 'তাহলে কি করা যায়?'

সে বললে, 'আপিসে লেখা হলে সব জবাবই পাওয়া যাবে।'

রাইকিশোরী অবাক হয়ে নির্বোধের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চির অনুগত স্বামী সন্তান আজ তাঁকে এবং তাঁর পরামর্শ ছাড়াই কাজ করছে!

চন্দ্রাবলী উঠে আসে পিতার ঘর থেকে। একবার দাঁড়ায় পিতামহীর কাছে গিয়ে। অদ্ভুত অব্যক্ত বেদনা তার গলার কাছে বাসা বেঁধে নেয়। যে দুঃখের ভাষা নেই, বিলাপ নেই, আলোচনা নেই। সবচেয়ে বড় দুঃখ এই একান্ত আপনার জন, সত্যিই মহৎ লোক, তাঁকে জানা হয়নি, চেনা হয়নি, কেউ তাঁর কথা বলেনি। পিতামহীর মুখেই বা সেই তাঁর কথা তারা কি বা শুনেছে!

বিশাখা বুদ্ধিহীন স্মৃতিহীন লোকের মত প্রসন্ন স্মিত মুখে ওর দিকে চাইলেন, যেন ও কি বলছে জানতে চাইলেন, আর তিনিও যেন সব বুঝতে পারবেন!

চন্দ্রার এবারে চোখে জল এলো। মনে হয়—লোকমুখে গল্পে শোনা, পিতামহীর

রূপের কথা, বুদ্ধির কথা, যশোধরার কথা, গোবিন্দর কথা। না, সাধারণ সকলের মত ওরা—মা বাবার কাছে কোনো পুরানো স্মৃতির মধুর কাহিনী পারিবারিক কথা শোনেনি। ওরা শুধু শুনেছিল তাদের পিসিমার অসামাজিক বিয়ের কথা, পড়াশোনার কথা। যার জন্য বিশেষভাবেই তাকে লেখাপড়া শিখতে বাধা দিয়েছিলেন জননী।

রাত্রে শ্বশুরবাড়ী ফিরে আসে সে উন্মনাভাবে। ব্যক্তিগত শোক নয়, জানা লোকের কথা নয়, অথচ স্বামী-স্ত্রী দুজনে ভাবে একই কথা। কেমন ছিলেন তিনি? কেন গেলেন? তাঁকে আঘাত করেছিল কেউ? না এমনি? তবে আর ফিরে আসেননি কেন? তাঁর জননীও তাঁর কথা কেন বলতেন না? তিনিও কি বিয়ে করেছিলেন যশোধরার মত? তাহলে এ টাকা তো দিতেন না, তারাই পেত!

সসঙ্কোচে চন্দ্রা কৃষ্ণপদকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার মনে আছে তাঁর কথা—এই জ্যেঠামশাইয়ের কথা?' তার জ্যেঠামশাইয়ের কথা সে জিজ্ঞাসা করছে অন্য লোককে! কৃষ্ণপদ বুঝতে পারে যেন তার মনের কথা। বলে, 'একটু একটু মনে পড়ে। স্পষ্ট নয়—। আমরা খুব ভালবাসতাম পাঠশালায় যেতে। অনেক ছেলেই প্রসাদ খেতে পাবার জন্যেই যেত। আমাদেরও বেশ লাগত।'

তারপর চুপ করে যায়। আরো অনেক কথা জানে, বড় হয়ে জেনেছে, চন্দ্রার সঙ্গে বিয়ে হবার আগে ও পরে। সেকথা রাইকিশোরীর ক্ষুদ্রতার, নারায়ণের দুর্বলতার কথা,—সেকথা বলা যায় না চন্দ্রাকে।

'কিন্তু পাঠশালা তো আমরা দেখিনি?'

'না, উঠে গিয়েছিল।'

'জ্যেঠামশাই উঠিয়ে দিয়েছিলেন?'

কৃষ্ণপদ বলে, 'ঠিক জানি না, আমরা তখন ছোট।'

৩

জবাব এলো চিঠির এটর্ণীর আপিস থেকে।

কৃষ্ণপদ চিঠি পড়ে খবর বলে শ্বশুরকে।

মৃত্যু তাঁর হয়েছে। এবং অশৌচ শ্রাদ্ধের দিনও কেটে গেছে। তাহলে কোনো দায়-কর্তব্যও নেই! নারায়ণ দুঃখিতভাবে চুপ করে থাকেন।

বেণুগোপাল বলে, 'কিন্তু আমাদের তো কিছু করা উচিত বাবা?'

নারায়ণ আশ্চর্য হয়ে চান তার দিকে। সে বলে, 'দিদি বলছিল সেদিন, আমরাই তো তাঁর ছেলেমেয়ের মত, তা আমরা কিছু করব না?'

নারায়ণ বললেন, 'বেশ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি, যা বলেন তাই হবে।'

আন্তরিক ও পরম শ্রদ্ধা সহকারে উত্তীর্ণ দিন শ্রাদ্ধের দিন দেখা হয়। নিয়ম সামগ্রী যোগাড় করা হয়।

রাত্রে বসে বাপের সঙ্গে সঙ্গে কথা কয় পরামর্শ করে ছেলেমেয়েরা। শোচনাময় বেদনায় তিনজন এক জায়গায় বসেন। হঠাৎ চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করে, 'জ্যেঠামশাইয়ের

পাঠশালা উঠে গেল কেন বাবা?' অতর্কিত আঘাত পেলে যেমন মানুষ কেমন যেন হয়ে ওঠে তেমনি নারায়ণের মুখটা ব্যাকুল হয়ে উঠল।

বেণুগোপাল বললে, 'আমার বন্ধুরাও ঐ কথা সেদিন বলছিল। তাদের কেউ কেউ ঐ পাঠশালায় পড়েছিল। কেন তুলে দিলে বাবা?'

সত্য কথা যদি সত্য করেই বলা যেত! কারুর দোষ না দিয়ে, কারুকে না বাঁচিয়ে নিজের দুর্বলতা দেখিয়ে! নারায়ণ বললেন, 'কি জানি, তখন বুঝতে পারলাম না। বাবা মারা যেতে তোমাদের মাতামহ এসে বারণ করলেন, বললেন অপব্যয় হচ্ছে বড়।'

বেণু চন্দ্রা একসঙ্গে বললে, 'তোমাদের বাড়ির অত ভাল কাজ দাদামশাই বারণ করলেন! তোমরা শুনলে কেন!' যুগধর্মে তাদেরও মনে শিক্ষা-অশিক্ষার ভালোমন্দ ভেদজ্ঞান জেগেছিল। তিনজনেই চুপ করে রইলেন।

বেণু জিজ্ঞাসা করলে, 'ইস্কুলটা কে করেছিল বাবা? জ্যেঠামশাই? তিনি অনেক লেখাপড়া জানতেন, না?'

নারায়ণ বললেন, 'হ্যাঁ, দাদাই করেছিলেন।'

'থাকলে ভাল হত, আমরাও তাহলে হয়ত লেখাপড়া শিখতাম। ওরা সবাই বলছিল, এই আমার বন্ধুরা,' একটু অপ্রস্তুতভাবে বেণু বললে।

নারায়ণও ঠিক ঐ কথাই বহুদিন ভেবেছিলেন, সত্যিই থাকলে ভাল হত। হয়ত বেণুগোপাল পড়া-শোনা করত। আজ মনে হয়—কিন্তু তাঁরা তো তা চাননি। ঐকান্তিকভাবে চেয়েছিলেন সম্পত্তিতে অধিকার ও সঞ্চয় ও একক ভোগবিলাস। বিদ্যা দান, ভোজ্য দান, প্রসাদ বিতরণের কথা তাঁরা ভাবেননি। গোবিন্দর কোনোরকম অধিকার থাক তা চাননি তাঁর অধিকার সত্ত্বেও। এতদিনের পর এই বিষয়ে কোনো কিছুই বলবার নেই। সবই স্পষ্ট হয়ে আছে সকলের কাছে। গোবিন্দ সেদিন কতখানি আঘাত পেয়েছিলেন, কেমন করে এমন নিরাসক্ত হয়ে চলে গিয়েছিলেন, সেকথা চুপি চুপি একাকী সঙ্গোপন মন তাঁর কখনো কখনো ভেবেছে—স্পষ্ট নয়—অস্পষ্ট ভাবে। সে মন প্রকাশ্যে এই বঞ্চনাকে অস্বীকার করেছে, বঞ্চিতকে অস্বীকার করেছে। এতদিন পরে সেই বঞ্চনা অন্যরূপে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। বেণু বঞ্চিত হয়েছে জীবনের এক মহৎ সম্পদে। সেকথা আজ সে ভেবেছে। বলে ফেলেছে।

'আর করা যায় না বাবা ইস্কুল?' চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করলে।

'ইস্কুল?' বলে নারায়ণ চুপ করে রইলেন।

বেণুও উৎসুক হয়ে চেয়েছিল। সে বললে, 'জ্যেঠামশায়ের নামে পাঠশালা একটা কর না বাবা?'

নারায়ণ অপ্রস্তুতভাবে বললেন, 'কে পড়াবে?'

বেণুর চোখ নীচু হয়ে গেল।

৪

শ্রাদ্ধ ও চতুর্থীর জন্য নির্ধারিত দিন এসে পড়ল।

বেণু ও চন্দ্রাবলী পিতাকে জিজ্ঞাসা করে, 'জ্যাঠামশাইয়ের ছবি আছে বাবা?'

'ছবি?' পিতা নির্বাক হয়ে ভাবেন।

'কোনো ছবি নেই?'

'ছোটবেলার তোলা বাবার সঙ্গে একটা ছিল মনে হচ্ছে, কিন্তু সেকি আর আছে?' গোবিন্দ যাঁদের আদরের ছিল তাঁরা একজন নেই, অন্যজন স্থবির অবস্থায়। তাঁর বিয়ে হলে সব থাকত। নারায়ণ চুপ করে ভাবেন।

চন্দ্রা বললে, 'ঠাকুমার ঘরের বাক্সে দেখব?'

'থাকতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে কি বলবে?'

'কিছু বলব না, পাই তো দেখতে চেয়ে নেব।'

খাটো ধুতি, কালো বনাতের কোট, রেশমের ফুলকাটা টুপী মাথায়, পায়ে মোজা ও নাগরা পরা, গায়ে রেশমী পাট করা চাদর দেওয়া পূর্বগোঁসাই, গোবিন্দদের পিতা আর তাঁর কোলে হাত রেখে দাঁড়ানো দু ভাইবোন যশোধরা আর গোবিন্দের একখানি ম্লান বিবর্ণ হলদে হয়ে আসা ছবি পাওয়া গেল।

বছর আটের গোবিন্দর মাথায় জরীর টুপী, জরীর কাজ-করা মখমলের জামা, চুড়ীদার পাঁজামা, আর নাগরা পরা, আর যশোধরার ঐ ধরণেই পোষাক পরা, তার উপর মাথায় বেণী, কপালে টিপ, চোখে কাজল, সর্বাঙ্গে গহনা, পায়ে জুতার উপর মল পাঁইজোড়।

এই ছবি দেখে তারা এখনকার ছেলেমেয়ে, গোঁসাইবাড়ির আবহাওয়ায় মানুষ হলেও কয়েকদিন আগে হলে হেসে ফেলত। আজ আর হাসি এলো না তাদের, গম্ভীর নির্বাক গভীর দৃষ্টিতে ভাইবোনে ছবির ভাইবোনকে দেখতে লাগল।

শিক্ষিতা স্বমত অনুসারিণী রূপবতী পিতৃষ্বসা, স্বেচ্ছায় অথবা অজানা কারণে দেশান্তরবাসী জ্যেষ্ঠতাত, যাঁদের ওরা দেখেনি বললেই ঠিক হয়। মনে নেই, শোনা নেই যাঁদের কথা, এই তাঁরা। অন্যের কাছে স্বল্প শ্রুত, জননীর কাছে তিক্ত মন্তব্যে শোনা, সহসা এতদিনের পর কৌতূহলে শ্রদ্ধায় প্রশ্নে জিজ্ঞাসায় খুঁজে ফেরা এই তাঁরা।

'বড় করা যাবে ছবিটা?' একজন জিজ্ঞাসা করে।

অন্যজন বলে, 'দেখা যাক দোকানে দিয়ে।'

মনে মনে কিন্তু যেন দুজনেই ভাবে, কি হবে, কি আর হবে! যারা নেই, যে নেই, এই তাদের সমাদর শ্রদ্ধা এ কি কোনোদিন তাদের কাছে পৌছবে! কেউ কি জানে! যদি জানানো যেত! যদি জীবিতকালে একবারও চেনা হত!

বাপের কাছে গেল, ছবি পাওয়া গেছে।

রাইকিশোরী ছিলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছবি কার?' তারপর দেখলেন, বললেন, 'কি হবে ছবি?'

বেণুগোপাল বললে, 'বড় করে বাঁধিয়ে রাখব, যদি করা যায়।'

রাইকিশোরী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, 'তোমাদের দেখছি—খুব ভক্তি হয়েছে!'

বেণু ও চন্দ্রার মুখ লাল হয়ে উঠল। নারায়ণের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, কি যেন বলতে গেলেন কিন্তু বলতে পারলেন না।

ক্ষুব্ধ ভর্ৎসনা-ভরা চোখে বেণুগোপাল জননীর দিকে চাইল।

রাইকিশোরী সেদিকে লক্ষ্যও করলেন না, বললেন, 'তা অত টাকা পেলে সকলেরই হয়।'

নারায়ণ একটু চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন, 'সকলের হয় না। অন্ততঃ আমার তো হয়নি। দাদারই তো সব, কই আমি তো কোনো ভক্তি বা কৃতজ্ঞতা দেখাইনি কখনো।'

নারায়ণ 'আমরা' বললেন না। কিন্তু এই প্রথম শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে 'দাদারই তো সব' বলে যা বললেন, রাইকিশোরী অবাক হয়ে গেলেন, রেগেও গেলেন। কিন্তু কোনো কথাই জবাবে তাঁর মুখে এলো না।

৫

বিবর্ণ অস্পষ্ট হয়ে আসা ছবি বড় করা গেল না। চন্দ্রার চতুর্থীর আর বেণুগোপালের শ্রাদ্ধের আয়োজনসম্ভারে সাজানো আঙিনায় একটি চৌকির উপর ফুলের মালা দিয়ে সাজানো সেই ছবিতে পিতার কোলে হাত রেখে দাঁড়ানো কৌতূহল-ভরা উজ্জ্বল চোখ বালক গোবিন্দ হয়ত চন্দ্রা ও বেণুগোপালের দেওয়া জলপিণ্ড দান দেখল। হয়ত শুনতে পেল মন্ত্র—

"ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা"—
"আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু।"

সেই মেয়েটি

জ্বর হয়েছিল। শুয়েছিলাম।

হঠাৎ দরজার কাছে থেকে কে ডাকল, বললে, 'কি করছ বাই (দিদি)?'

বললাম, 'আয়।'

অনেকদিনের পুরোনো ঝি। শুনেছি আমার ছোট বেলাতেও সে আমাদের ভাইবোনদের দেখাশোনা করেছে। তখন তার বয়স দশ-এগারো।

নামটা হচ্ছে মাঙ্গী। অর্থাৎ থাকমণি বা বেঁচে থাকো। মানে মায়ের আগের কোনো সন্তান বাঁচেনি তাই তাকে 'চাওয়া'—মাগিয়া নেওয়া, ভিক্ষা মেগে যাচ্ঞা করে নেওয়া হল বিধাতা বা যমের কাছ থেকে।

দেখতে মন্দ নয়। নাপিতের ঘরের মেয়ে। সে-দেশে তারা নাপিতানীর কাজ করে না। মানে আল্‌তা পরানোর কাজ জানে না। মেহেদী পরার দেশ। তবে অন্যরকম সেবা-যত্ন করে। ঝিয়ের কাজ, ছেলেমেয়েদের তেল-মাখানো, মালিস করা সব জানে। মেহেদী-পাতা বেটে হাতে পায়ে ফুলকারী কাজ এঁকে দেয়। সেটা আবার সধবার সৌভাগ্যের চিহ্নও তো বটে। রাজস্থানের রাজপুত ঘরের নিয়মে দাস-দাসীতে পাঁচটি বা আরো বেশী অবশ্য সেবক অঙ্গ-থাকা প্রথা ছিল সেকালে।

দু'জন ব্রাহ্মণ (কর্মচারী ও রান্নার জন্য), দু'জন সেবক ভৃত্য (অব্রাহ্মণ জাতি), দু-একজন রাজপুত (সেপাই প্রহরী দারোয়ান), এক নাপিত (উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করণের কাজ)। তাছাড়া মীনা ও বলাই, মালী, (গাড়ি-ঘোড়ার সহিস ও চালকের কাজ)। যদি গাড়ি-ঘোড়া থাকে আর বাগান-বাগিচা থাকে।

যেমন ব্রাহ্মণ খাবার জল এনে দেবে প্রভুকে, জল খাওয়া গেলাসটা কিন্তু নেবে 'দারোগা' জাতি বা নাপিত সন্তান। রাজপুত করবে সেপাই দরোয়ানের কাজ কিন্তু চাকরের কাজ কিছু করবে না।

চাকর ঘরের কাজ করবে, কিন্তু নাপিতের কাজ এঁটো উচ্ছিষ্ট ধোয়া-মোছার-কাচার কাজ করবে না।

সূক্ষ্ম চুলচেরা জাতিবর্ণ হিসাবের কর্মবিভাগ। একটি 'সর্বার্থসাধক' লোক রাখার প্রথা সেকালে চলত না। সেই হিসাবেই সে ছিল অন্তঃপুরের শিশু টহলনী। মানে শিশুরক্ষিণী 'ছেলেভোলানী'।

সে বসল আমার মাথার কাছে। মাথা টিপে দেবে, নয়ত হাত বুলিয়ে দেবে। খুব গল্পবাগীশ। আধ-অন্ধকার ঘর। গরমের দিনের বিকাল। এটা-সেটা গল্প করে। সম্প্রতি তীর্থ করতে গিয়েছিল। সে গল্পও করল।

জিজ্ঞাসা করি, 'কতদূর—কোথায় কোথায় গেলি?'

বললে, 'এই দ্বারকাজী মথুরা বিন্দ্রাবনজী (বৃন্দাবন) আর দিল্লী আগ্রা হয়ে এলাম।'

তার হাতটা খুব সুন্দর নরম। আমার মাথায় থামল হঠাৎ। যেন কি ভাবতে ভাবতে থেমে গেছে।

জিজ্ঞাসা করি, 'কিরে চুপ করে গেলি যে?'

সে আবার মাথায় বিলি কাটে চুলে।

জিজ্ঞাসা করি, 'তীর্থে কি সব দেখলি? কি আনলি? তোর ছেলেমেয়েদের কোথায় রেখে

গেলি? তাদের জন্যে কি আনলি? একটু গল্প বল। শুয়ে শুয়ে ভাল লাগছে না।'

সে চুপ করে যেন কি ভাবছিল।

বললে, 'ছেলেমেয়েদের ছোট দুজনকে তাদের মামার বাড়ি আমার মার কাছে রেখে গিয়েছিলাম, আনব আর কি—বেশী তো পয়সা ছিল না। এইসব দ্বারকানাথজীর গোবিন্দজীর ছবি আর প্রসাদ আর চন্দন তুলসী এইসব এনেছি। তোমার জন্যেও এনেছি।'

'তা দিস। এখন কি কি দেখলি গল্প বল।—কিছু নতুন আশ্চর্য দেখলি? কোথাও সাধু মহাত্মা?

এবারেও সে একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'হ্যাঁ, একটা ভারী আশ্চর্য মানুষ দেখলাম বাইজী। সাধুমহাত্মা কিন্তু নয়—একটা আশ্চয্যি মেয়ে।'

সাধু-মহাত্মা নয়! মেয়েমানুষ একটা! উঠে বসলাম। কৌতূহল হল একটু।

সে বললে, 'উঠলে কেন? শোও না। মাথাটা ছেড়েছে? অনেক বড় গল্প।'

বললাম, 'তোর হাতের গুণেই ছাড়ল। বসি একটু। গল্প বল্। শোব পরে।'

সে বলল, 'তবে আগে আমার বিয়ের গল্প বলি। আমাদের এদেশে নাপিতের ঘরের বিয়েতে বিয়ে হতে ছেলেদের মেয়েদের জন্যে বেশ পণ দিতে লাগে জান তো। বাবা-মা যত টাকা চাইছিল তেমন আর বর পাওয়া যায় না। আমিও বেশ বড়িসারি (বড়সড়) হয়ে উঠলাম। মা ব্যস্ত হয়। আর বাবা বেশী টাকার মতলবের তালে থাকে। এই হতে হতে একটা সম্বন্ধ আমার এলো। বরের টাকা আছে অনেক। বাবাকে পণ ভালো দেবে, সাধারণের চেয়ে বেশী। সেপাইতে কাজ করে টাকা জমিয়েছে। বিয়ে করতে সময় পায়নি।

ঘর বাড়ি ক্ষেত আছে। এখন বিয়ে করবে। বেশ বয়স হয়ে গেছে অর্থাৎ প্রায় পঁয়ত্রিশ। আরো একটা গুজব শোনা গেল। কিন্তু...

মাকে বাবা ধমক দিল, 'ওসব বিয়ে-না-করা পুরুষ মানুষরা অমন হয়ে থাকে।'...

বাবার মতে টাকাটা তো কম নয়। মার মতে তার কোনো কুলে কেউ নেই। মা বাবা মামা মাসী পিসি কাকা দেখবার জন্যে নিকটাত্মীয় কেউ নেই। সেটাও দেখতে হবে তো!

মা চিন্তিত। 'তবে বিয়ে দেবে কে? দিচ্ছে কে বিয়ে?'

বাবা বললে, 'সে আছে, আছে। ভাই বন্ধু-বেরাদার গুষ্টি গাঁয়ের তো আছে। তারপর একদিন ঘোড়ী-ডোলী (ঘোড়া-পালকি-ডুলি—পশ্চিম উত্তর ভারতের সব বিয়ের বরযাত্রার বিশেষ অঙ্গ অপরিহার্য নিয়ম) বাজনা করে লগ্ন দেখে—আমাদের ছিল দিনে লগ্ন,—বরিয়াত এলো। হলদে আর লাল রংয়ের আচ্‌কান ধুতি পাগড়িপরা বরের আধখানা মুখে জরির ঝালর ঢাকা বর এলো অনেক বন্ধুবান্ধব নিয়ে। সঙ্গে এলো গায়িকা 'ভক্তন্'দল,—কোন এক দূর সম্পর্কের বুড়ো কাকা না মামা এলো বরিয়াত নিয়ে। (ভক্তিনী অর্থাৎ নর্তকী কীর্তনী। হরিনাম গায়িকা। ভক্তের স্ত্রীলিঙ্গে ভক্তিনী)। কিন্তু তারা সেদিন ভক্তি সঙ্গীত গাইবে না মঙ্গল সঙ্গীত গাইবে, সীতা-রামের বিয়ের।

বাবা অনেক টাকা গুনে নিল। কত আমি জানিনে। লোকে বললে পয়সা আছে বরের।

সারাদিন ধরে ভিতরে বাড়ির মেয়েদের মঙ্গল গান, বাইরে ভক্তনদের গান, রাজোয়াড়ার মত (মদিরা পান) পানাহার করে বিয়ে শেষ হল।

তোমাদের দেশের মত শুধু রাত্রেই আমাদের বিয়ে হয় না (সে আমাদের বাংলা দেশের বিয়ে দেখেছে)। তবে মণ্ডপ করে বামুন পুরুত ডেকে কি-সব মন্ত্র বলে আমাদেরও বিয়ে হয়। যখন যেমন শুভলগ্ন পড়ে। তোমাদের মতন খাওয়ানোর ধরনও নয়।

তার পরদিন ভালো লগ্ন দেখে পাড়ার মেয়েরা আর মা মামী পিসির দল প্রথা নিয়মমত সবাই মিলে খুব ঘোমটার ভিতর থেকে চেঁচিয়ে কেঁদে-কেটে (আমাদের দেশে না কাঁদলে

নিন্দে করে। খুব কাঁদতে হয়) আমাকে পাঠিয়ে দিলে। শ্বশুরবাড়ি পাশের গাঁয়ে। খুব কাছেই।

সেখানেও মঙ্গল-গান করলে সে গাঁয়ের মেয়েরা সকলে মিলে।

ছোট একটা ডুঙ্গর (পাহাড়) আছে গাঁয়ে। বালির পাহাড় আর বাবলার জঙ্গল। একটা ঠাকুর লোগ (জমিদার) কিছু বামুন বেনে আর সব দারোগা মীনা বলাই ভীর (আভীর) গ্রামভরা।

সেদিনও তাদের বাড়িতে সারারাত মঙ্গল-গান, খাওয়া-দাওয়া সব করল। কেউ রইল রাত্রে, কেউ চলে গেল। কিন্তু কে তাদের আপনার, কে পর আমি আর কিছুই বুঝতে পারলাম না।

তারপর দিন সকালে দেখলাম, একে একে সবাই চলে যাচ্ছে।

বাড়িতে দু-একজন মাত্র মেয়ে আর দু-একজন কে রইল। তারা সারাদিন খাওয়ানো, কাজ-কর্ম, বাড়ি পরিষ্কার নিয়ে ব্যস্ত রইল।

আমার বরের কে তারা আমি জানি না। সে কারুকে বললে ভূয়া (পিসি) কারুকে ভেন (বোন) কারুদের বললে দাদী নানী।

আমাদের তো কারুর সঙ্গে কথা কওয়ার নিয়ম নয়। কনেবৌদের একেবারে ঘোমটা দিয়ে থাকতে হত সেকালে।

বিকেলের দিকে ঘরের কোণে একটা খাটিয়ায় চুপ করে বসে আছি। বর বাড়ি নেই। অন্য দাদী ভূয়ারা কোথায় আছে না গেছে, তাও জানি না।

হঠাৎ একটা মেয়ে এলো বাড়িতে। পরিষ্কার 'গোটা' (জরি)-দার নীল রংয়ের ওড়না গায়ে, জরিরই ঝলমলে হলদে রংয়ের মসলিনের ঘাগরা পরা, কাঁচুলির ওপর 'সদ্রি' হাতওয়ালা রেশমের জামা পরা। হাতে সোনার পৈঁছা কঙ্কণ চুড়ি, ওপর হাতে বাজু তাবিজ পরা, গলায় সোনার বলেওড়া (হাঁসুলী) আর কণ্ঠি (কণ্ঠমালা)। আর কোমরে রূপার মেখলা জিঞ্জির দার, পায়ে মল মুরাঠি পাঁয়জোড় পরা। হাতের পায়ের আঙুলে সোনা আর রূপার আংটি ঝিকমিক করছে।

পাতলা সুন্দর চেহারা। হাসিমুখে একমুখ পান। একেবারে 'গঙ্গোরে'র (গণগৌরী দেবী) মত সুন্দর দেখতে যেন।

তখন বাড়িতে বিয়েবাড়ির ভিড় নেই তো। হঠাৎ তাকে ঢুকতে দেখে বাড়ির ঐ দাদী নানী পিসিরা অবাক হয়ে গেল।

একজন দাদী জিজ্ঞেস করলে, 'কোত্থেকে এসেছ? বোসো। চিন্‌তে পারছি না তো? কুলদীপের কেউ হও কি?' নামটা ওরা বললে। তুমি তো ওর নামটা জানো।

বরের নাম তো করতে নেই তুমি তো জানো। আমি শুনতে পাচ্ছি, ঘোমটা থেকে দেখছিও।

মেয়েটি হাসল। বললে, 'না, কেউ হই না আমি তোমাদের। এই বিয়েবাড়ি দেখে ইচ্ছে হল বৌ দেখতে, তাই এসেছি। বৌ দেখতে লোকে যেমন আসে। বৌ ভালো হয়েছে, না?'

গিন্নিবান্নিরা একটু অবাক হয়ে চাইল। তারপরে বললে, 'বেশ বেশ। বসো। তা দেখ। বৌ দেখাচ্ছি।'

আমার মুখ ঘোমটায় ঢাকা। গায়ে রূপার কিছু গয়না। জরির ঘাগরা লুগড়ী পরা। আমাদের ঘরে আর সোনা হীরে মোতির গয়না কোথায় পাবে। তার গায়ের গয়না দেখে সাজ দেখে এই বুড়ীরা অবাক হয়ে গেছে।

একজন চুপি চুপি বললে আমার কানের কাছে, 'ভক্তন ছে মালুম, ঘর কি লুগাই কোনে। ঘোমটা নেই, অত গহনা, অত হাসি।' (কীর্তনী মেয়ে, গেরস্থঘরের মেয়ে নয় বোধ হচ্ছে)

স বেপরোয়াভাবে আমার কাছাকাছি বসল একটি খাটিয়ায়।

ওরা একজন আমার ঘোমটা তুলে মুখ দেখাল। আমি চোখ বুজে রইলাম তোমাদের দেশের মতনই।

সে বললে, 'বেশ বৌ হয়েছে তোমাদের কুলদীপের।'

ওরা বললে, 'তুমি কোথায় থাক?'

একলা মেয়েমানুষ, অত সোনা-রূপার গয়না পরে একলা পথে বেরিয়ে পরের অচেনা বাড়ি বৌ দেখতে এসেছে! তাদের সন্দেহ হচ্ছিল 'ভালো' মেয়ে নয়। একটু গুন্‌গুন্ সুরে গানও করছিল।

'দেখছি গান জানো!' এক দাদী বললে, 'বিয়েবাড়িতে এসেছ তা একটু গান গাও না।'

চমৎকার ঝকঝকে দাঁত, লাল টুকটুকে ঠোঁটে সে হাসল। বললে, 'আমার এমন কোনো পরিচয় নেই। এ গাঁয়ে বেড়াতে এসেছিলাম, চল, তোমাদের বাড়ি দেখি। আচ্ছা আগে একটা গান শোনাই। বলছ যখন।'

এ দেশের মেয়েদের মতই সে খাটিয়ায় বসেছিল। আরম্ভ করল। 'হে গোবিন্দ রাখু শরণ অবত জীবন হারে।....' রক্ষা করো হে গোবিন্দ শরণাগতকে।...ভক্তের আহ্বানে বৈকুণ্ঠে 'শোর' (গোলমাল) পড়ে গেল....। (সুরদাসের গান)।

কি গলা আর গান! গানের গলার সুরে আমার ঘোমটা কখন সরে গেছে।

আর দাদী নানীরা অবাক হয়ে যেমন তেমনি বসে আছে। কতক্ষণ ধরে সে ঘুরেফিরে গানটি গাইল জানি না। দেখলাম তার ঠোঁটটি শুকিয়ে গেছে। চোখে জল ভরো-ভরো। কিন্তু পড়ছে না।

গান শেষ হলে ওরা বললে, 'বাইজী, একটু সরবত পানি খাও। ওঠ (ঠোঁট) শুকিয়ে গেছে। কি গান কি ভজনই শোনালে। আহা, কুলদীপ থাকলে কি তোমায় ছাড়ত এখনি! আরো গান শুনতাম। আবার এসো বাইজী। এখন কিছু খাও। বিয়েবাড়ি।' ('বাই' হল কন্যা) । সে শুকনো শুকনো রাঙা ঠোঁটে আবার হাসল। বললে, 'তা নিয়ে এসো সামান্য কিছু। শীগ্‌গির দাও কিন্তু। আমি অনেক দূরে যাব। অন্য গাঁয়ে।' যে কয়েকজন ছিল সবাই উঠে গেল রান্নাঘরের দিকে। সিদ্ধি ঠাণ্ডাই আনবে। নয়ত লাড্ডু, কচুরি, পুরি যা আছে আনবে দেখে-শুনে।

আমার মুখটা তখনও খোলা। ঘোমটা দিতে মনে নেই। সবাই চলে গেল, ও তাই চাচ্ছিল যেন। চলে গেলেই সে চট্ করে উঠে দাঁড়াল। আমার কাছে এসে নিজের গলার 'বলেওড়া'টা (হাঁসুলী) খুলে আমার কোলে ফেলে দিয়ে বললে, 'কারুকে বোলো না। এ তোমায় দিলাম। তোমাকে দিতেই এসেছিলাম। আমি এবার চলে যাই।'

অত ভারী গয়না! আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে কি? আমি কেন এ নেব? তুমি কে? তোমার কি নাম বল?'

সে বললে, 'পাহুনার আবার নাম কি? এ তুমি নাও। আমি তোমাদের আপনার লোকই ছিলাম।'

দাদীরা এসে পড়ল। একথালা লাড্ডু কচুরি, এক ঘটি সিদ্ধি নিয়ে এলো। সে সিদ্ধিটা মাথায় ঠেকালো। আর দু হাতে করে থালাটা ধরল। তারপর একটু হেসে একজনের হাতে থালাটা দিয়ে মাথাটি নীচু করে নমস্কার করে বললে, 'এবার আমি যাই।'

দাদীরা অবাক হয়ে বললে, 'খেলে না কিছু? চলে যাচ্ছ? নামও জানলাম না। কুলদীপকে কি বলব কে এসেছিল?'

সে হাসলে, বললে, 'ঐ তো হাতে করে নিলাম, ওতেই খাওয়া হল মাজী। (ও দেশে ছুঁলেই নেওয়া হয়, সম্মান রাখা হয়)। আর নাম? অচেনা পথের মানুষের আবার নাম কি। কিছু বলবার দরকার নেই কুলদীপজীকে।'

বলতে বলতে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে ছোট জরির জুতোটি পায়ে দিয়ে আবার ঢোক (নমস্কার) জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

চলে গেলে ওরা বললে, 'ও ভালোঘরের মেয়ে নয়। দেখলে না জুতোটাও পায়ের গোড়ালি তোলা। ভক্তনদের মত।'

আমি অবাক হয়ে শুনছি। বললাম, 'তারপর? কে সে? না সত্যি কেউ তোদের? তোর বর চিনলে তাকে? গোড়ালি তোলা জুতো আবার কি দোষের হল?'

মাঙ্গী বললে, 'না। কেউ হয় না।' আর বললে, 'ভদ্রমেয়েরা জুতোর গোড়ালির দিকটা তো উঁচু রাখে না।'

আমি। সে কিরে? তারপর গয়নাটা ওদের দেখালি? বর দেখল?

'গয়নাটার কথা দাদীদের কারুকে তো বলিইনি। তখন তো ছোট, ভয়ই পেয়েছিলাম। অত ভারী সোনার জিনিস দেখে। দেখাইনি কারুকে।'

তারপর সেদিন তো পাড়ার গিন্নীরা নিজেদের বাড়ি ফিরে গেল বর এলে পরে। মেয়েটার গল্প করলে। গানের কথা বললে। কেমন সুন্দর দেখতে তাও বললে। আর বললে, 'যাই হোক, সে মেয়েটা কিন্তু 'ভালো' মেয়ে নয়। কোনো ভক্তিনী (ভক্তন) হবে।'

বর শুনল চুপচাপ। ওদেরও কিছু বললে না। আর আমি তো কনে বৌ, আমাকেও কিছু বললে না।

শুধু ওদের বলল, আমি একটু গাঁয়ে ঘুরে-ফিরে আসি। তোরা কেউ থাক্ একটু আরো বিন্দনীর (কনে বৌ) কাছে।'

অনেক রাত্রে সে ঘুরে-ফিরে এলো। মনে হল গাঁয়ের কলালের (মদের দোকান) দোকানেও গিয়েছিল।

কিন্তু আমি গয়নাটার কথা মা-বাবাকেও বলিনি। পাছে বাবা চেয়ে নেয়। আর বরকেও বলতে সাহস হয়নি। যদি বকে। প্রথমেই কেন বলিনি বলে। আমার খুব ভয় হয়েছিল। বয়সে অনেক ছোট ছিলাম তো। বরকে খুব ভয় হত, সে অনেক বড় বয়সে। এখানে ওখানে লুকিয়ে রাখি। আমাদের ঘরেতে চাবি দেওয়া বাক্স, আলমারী থাকে না। হাঁড়ি-কুড়িতে পয়সা রাখে গাঁয়ে ঘরে। মাটিতে পুঁতে রাখে হাঁড়িটা। বাক্স থাকলেও রাখে না, মন্দ লোকের চোরের চোখ আগে বাক্স দেখতে পায়।'

আমি তো তখন পনেরো-ষোল বছরের মেয়ে। আমার তো গৌনা করার (দ্বিরাগমন) আর দরকার হ'ল না। এই বাড়িতেই আছি। সাবধানে রাখি গয়নাটা।

তারপর আমার বড় ছেলে হল। ছেলে হবার আগে বরকে একদিন হাঁসুলীটা দেখালাম। আর বললাম সেই মেয়েটির কথা। সাহস করে বললাম, সে তোমাদের কেউ হয়? মেয়েটা আমাকে গয়না দিয়ে বলেছিল আপনার লোক হই। বর চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে, 'রেখে দে, তোর ছেলে হলে তাকে দোব। আমার তো মনে পড়ছে না কোনো আপনার লোক ওরকম আছে।'

একে আমার চেয়ে ও অনেক বড়, তাতে গাঁয়ের লোক (মোট্যার) পুরুষ। আমি ভয়ে বেশী কথা জিজ্ঞাসা করতে পারতাম না। যদি বকে, ধমক দেয়। একটু হেসে বললে, 'গাঁয়ের লোক তো থাপ্পড়ও মারে-টারে! জান তো!'

আমিও হাসলাম তার কথাতে।

'তারপর কুড়ি বছর গেল। এবারে আমরা একবার জগদীশ (পুরী জগন্নাথ) যাব ভাবলাম। অনেক লোক যাচ্ছিল। ও দেখল, একজন গেলে ভাড়া কুলিয়ে যায়। দু'জনে গেলে টাকা কম পড়ে। আমারো যাবার ইচ্ছা। তখন আমি বললাম, 'এবারে দ্বারকাজী আর বৃন্দাবনজী চল।' এখন আমি আর অত ভয় করি না। মেয়েছেলেরা বড় হয়েছে, মেয়ের বিয়ে দিয়েছি।

গেলাম বৃন্দাবনজী। মন্দিরে মন্দিরে নাম শুনি। ভজন শুনি। পুণ্য কুণ্ড দর্শন করি। বনে নিধুবনে যাই। বন পরিক্রমাও করলাম পঞ্চক্রোশী। হঠাৎ একদিন দলের লোকেরা সব বঙ্কবিহারীজীর শয়ন আরতি দেখতে গেল। আমরাও গেলাম।

তখন ঝুলন এসে পড়েছে। দেশ-বিদেশের লোক আসছে দর্শন করতে। ভক্তরা আসছে গান শোনাতে, ঠাকুরকে ভজন শোনাতে। লোকে বললে, দেশ-বিদেশের ভক্তনও (গায়িকা ভক্তিনী) আসে, খুব ভাল নাচে আর গায় ঠাকুরের শয়নারতির সময়—দেবদাসীদের মত।

আমরা গিয়ে বসেছি। কিছু ভক্ত গান গেয়ে চলে গেছে। কিছু গাইবে বলে বসে আছে। হঠাৎ কানে এল, 'হে গোবিন্দ রাখু শরণ অবত জীবন হারে'....হে গোবিন্দ, হে গোপাল, 'পানি বিনা মীন প্যাসী (পিয়াসী) সিন্ধুকে কিনারে'।—সেই গান! যেন কাঠের পুতুলের মতন হয়ে গেলাম। যেন মনে হচ্ছে আমি নড়লেই বুঝি গান থেমে যাবে। কুড়ি বছর আগের শোনা সেই গলা। প্রায় সেই চেহারা। শুধু আর ঘাগরা লুগড়ী গহনার জৌলুস নেই। খালি হাত পা গলা। বৃন্দাবনী ছাপার শাড়ি কাঁচুলি সদরি জামা পরা। খালি হাতে হাততালিতে তাল দিচ্ছে।

একটি মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে।

অনেকক্ষণ গান হল। নটা বাজল। শয়নের যোগাড় হবে এবার।

গায়িকা গুন্‌গুন্‌ করতে করতে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করল। আরো অনেকের সঙ্গে—

'শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি গোবর্ধন।
মধুর মধুর বংশী বাজে ঐ বৃন্দাবন।'

গাইতে গাইতে পরিক্রমা করতে লাগল। গাইল, 'মেরি লগন লগী হরি আওয়ন কি। 'উমড় ঘুমড়' বর্ষা নামছে, অভিসারে যেতে হবে।

এবারে আমি চুপি চুপি বরকে বললাম, 'ঐ সেই মেয়েটি! সেই আমার বিয়ের সময়ে যে হাঁসুলী দিয়েছিল।' বরও চুপ করে বসেছিল। কিছু বললে না। আমার ইচ্ছে এগিয়ে যাই। কথা কই। কিন্তু কথা কইবার উপায়ও নেই অত ভিড়ের মাঝে। আবার ভরসাও নেই যদি সে না হয়, কিম্বা চিনতে না পারে।

ধর্মশালায় ফিরে এলাম। ঠিক করলাম আবার কাল যাব গান শুনতে একটু আগে, তাহলে কথা কইলে কথা কইতে পারব। বরকে বললাম।

পরদিন সন্ধ্যার সময় গেলাম। সেদিন আর সে গায়িকা এলো না। অন্য আরো কার কার গান হল। আমার বর কাকে জিজ্ঞাসা করলে তার কথা। তারা বললে সে বর্ষাণা-গ্রামের মন্দিরে আজ লাডলীজী (রাধিকাজী)-কে গান শোনাতে গেছে। তারপর দ্বারকা চলে যাবে।

আমরা বর্ষাণায় গেলাম। শুনলাম সে চলে গেছে মথুরায়। মথুরায়ও গেলাম তীর্থদর্শন করতে। ভাবলাম তাকে দেখতে পাব। কিন্তু সে তখন দ্বারকায় চলে গেছে।'

আমি বললাম, 'আর দেখতে পেলিনি?'

সে বললে, 'না। তারপর এই বাড়ি ফিরেছি ক'মাস হল।'

'ও এসে খুব অসুখে পড়ল। অনেকদিন পড়ে রইল বিছানায়। খুব ভাবত সব সময়। তারপর একদিন বললে, "ওই মেয়েটির কথা তখন তোমায় বলিনি। আমি ওকে চিনি। ওর নাম হল, যমুনাবাঈ। ও হল ভক্তনদের মেয়ে। অর্থাৎ কীর্তনীদের মেয়ে। ওর মার খুব টাকা পয়সা ছিল। খুব ভালো নাম-করা গায়িকাও ছিল ওর মা। খুব বিখ্যাত। নাম ছিল চন্দ্রভাগাবাঈ। এমন গান গাইত যে রাত্তিরে বেহাগ ধরে না থেমেই ভোরে ভৈরবীতে শেষ করত গান। লোকে পুতুলের মতন বসে থাকত। আমি ছোট থেকে ওদের বাড়িতে যেতাম। ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। তারপর ওর মা মরে গেলে আমিই দেখাশোনা

করতাম। সেপাইর কাজের মাঝেই।

"তারপর আমারো মা-বাপ মরে গেল। আমার বিয়ে দিতে পারল না। বিয়ে করতে চাইলাম না। ক্রমে লোকে আমাদের খুব নিন্দে করতে লাগল। ওরও নিন্দে হল গাঁয়ে খুব।

"শেষকালে ও-ই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক করে দেয়, অন্য লোক দিয়ে কথা কয়ে। তোমায় দেখেছিল আগেই।

"আমি বিয়ে করতে চাইনি। বলেছিলাম, 'তোমার তো টাকা আছে। আর আমারো কাজ চাকরি টাকা আছে. আমরা এইরকমই থাকব দুজনে। লোকে নিন্দে করে করুক।'

ও বলেছি: 'তুমি বুড়ো হবে। তোমার দেখাশোনা সেবাযত্ন তো আমাকে দিয়ে হবে না। আমি অন্য াত। ভজ্জন। আমরা 'ভালো' লোক নই।...বিয়ে করলে তুমি ঘর পাবে। স্ত্রী পাবে। ছেলেমেয়ে পাবে। অসুখে-বিসুখে সেবা পাবে। মৃত্যুকালে মুখে গঙ্গাজল পাবে। তোমার বাপ দাদা পিণ্ড পাবে। আমার কাছে তো তুমি এসব কিছুই পাবে না। শুধু ভালবাসাই পাবে। আর আমিও চিরদিন এইভাবে হয়ত থাকব না। আমি তীর্থে তীর্থে মন্দিরে ভজন শুনিয়ে বেড়াব। তুমি বিয়ে কর।'

"আমার খুব কষ্ট হল। ও শুনল না। বিয়ে হয়ে গেল। ওই বলেওড়া দিতে এসেছিল তোমাকে। তারপর তোমরা বললে ওর কথা। আমি ওকে খুঁজতে তখনি ওর গাঁয়ে গেলাম। ওকে দেখতে পেলাম না। তখনো তুমি হাঁসুলীর কথা বলনি। তারপর আর ওকে দেখতে পাইনি। ও বিয়ের আগেই বলেছিল, 'তোমার বিয়ের লগ্ন পূজা হয়ে গেলে আর আমাকে দেখতে পাবে না কোনোদিন।' আমি ভেবেছিলাম ঠাট্টা করছে। বাড়ি ঘর ফেলে যাবে কোথা। কিন্তু সে চলেই গিয়েছিল। বর এবারে আমার হাতটা ধরে বললে, 'সে ঠিকই বলেছিল, সব কথাই সত্যি হয়েছে তার।"

তারপর তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বললে, 'হ্যাঁ। তোর হাতের রুটি পানি পেলাম। তোকে লুগাই (স্ত্রী) পেলাম। তোর পেটের বালবাচ্চাও পেলাম। সেবাও পাচ্ছি। মরবও সেবা পেতে পেতেই। সে কিন্তু কিছুই পেল না।'

কিন্তু সে কিছুই না পেয়েও ভজ্জনদের মেয়ে হয়েও যেন ভগবানকেই পেয়ে গেল।

সেই বলেওড়া পাবার কথা শুনে আরো কত খুঁজেছি। গাঁয়ে সে এসেছে খবর পেলেই তখনি তাকে দেখতে গিয়েছি। কিন্তু দেখতে পাইনি। শুনেছি সে চলে গেছে। তার মোহ চলে গিয়েছিল নিশ্চয়। বোধ হয় সে ভজন গেয়েই ভগবান পেয়ে গেছে। কিন্তু আমি এত পেয়েও তাকে ভুলতে পারলাম না। আর একবার তাকে দেখতেও পেলাম না। বললে, 'বৃন্দাবনেও তাকে চিনেছিলাম। কিন্তু তার ঐ ভজনের সামনে যেতে ভরসা হয়নি।'

মাঙ্গী চুপ করল। আমি অবাক হয়ে গল্প শুনছিলাম। শুধু বললাম, 'ঠিক কথা। সে ভগবানকেই পেয়েছে। তার মোহ আর ছিল না।'

মাঙ্গীর চোখেও জল এসেছিল। সে বললে, 'ঠিক বাঈজী। তার কথা শুধু ভগবানই জানেন। আর কে জানে। কিন্তু আমার বর ওকে এখনো ভালবাসে।'

দুজনেই এতক্ষণে দেখলাম ঘরের বাইরে সন্ধ্যা ঘোর হয়ে ঘনিয়ে এসেছে। টিয়াপাখীরা ক্ষেত থেকে ঘরে ফিরছে। ময়ূরগুলো উঠে গাছে বসেছে। ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। কুয়ো বন্ধ করেছে কুয়োচালক হালীরা। বাড়ির অন্য পরিজন কাজে নেমেছে সন্ধ্যায়। ছোট ছেলেমেয়েরা সব বাইরে বেরিয়ে গেছে।

সে তটস্থ হয়ে উঠে পড়ল। 'স্যাম (সায়াহ্ন) হয়ে গেছে। যাই ওদের রুটি পানির ব্যবস্থা করি।'

বললাম, 'আবার আসিস।' সে ঘাড় নাড়ল।

মালতী পাটপুর

শ্রাবণ মাসের শেষের দিক। রথের মেলা শেষ হয়েছে মাসখানেক, ফলে পুরীর ভিড় ভেঙেছে। তবু ভিড় কম নেই, জনতা অবশ্য নেই। আমরা চলেছি পুরী।

ট্রেন এসে থামল একটি স্টেশনে। বেলা শেষ হয়ে এসেছে। মেঘে নিঝুম সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

লম্বা থার্ড ক্লাস গাড়ির জানলা থেকে স্টেশনের নামটি পড়বার চেষ্টা করতে লাগলাম। ঘোর ঘোর সন্ধ্যায় আলোর গায়ে লেখা নামটি চোখে পড়ল, "মালতী পাটপুর"।

রেলপথে স্টেশনের নানারকম নামই চোখে পড়ে। কিন্তু এমন মিষ্টি একটি নাম কখনো চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না। তাতে আবার 'কঁড় যাওছি' 'কি মিতি করিব'র দেশে। এমন ছোট মধুর নাম তাও আবার বাংলা অক্ষরে লেখা, বড় ভাল লাগল। ওড়িয়া অক্ষর হলে বুঝতে পারতাম না। ইংরাজী অক্ষর হলে এমন মিষ্টি লাগত না।

আসন্ন সন্ধ্যা, চারিদিকে ঘন নীলাভ কালো নীলাভ মেঘ, নীচে পৃথিবীর মাটিতে ঘন গাছপালা। ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আসছে। স্টেশনে লোকজন বড় নেই। তারি মাঝে মালতী পাটপুর নাম লেখা। গ্রাম নিশ্চয় দূরে আছে। মানুষ? কেমন মানুষ তারা যাদের গ্রামের এমন নাম। ভাবছি—

সহসা গাড়ির দরজা ঠেলে টগর, বকুল ও কেয়াফুল ভরা মস্ত একটি ডালা ভিতরে ঠেলে দিয়ে দুটি অল্পবয়সী মেয়ে গাড়িতে উঠল।

একটি শ্যামা, অন্যটি উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, কারুকেই কালো মনে হল না। মাথায় মস্ত খোঁপায় বকুলের মালা জড়ানো, দু'নাকে উড়িষ্যার মেয়েদের মত নাকছাবি, পরিধানে মোটা হলদে রংয়ের ও দেশী কট্‌কী শাড়ি, গায়ে চোলী ছোট হাতের, হাতে রূপার কাঁকন, পায়ে কাঁসার মল, কোমরে রূপার গোট ও চন্দ্রহার। উপর হাতে বাজু, গলায় মুড়কি মাদুলি হার। কপালে উল্কি ও টিকা, ঠোঁটে মিষ্টি তরল হাসি ঝলমল করছে।

ঝুড়িটি পাশে রেখে তারা দুজনে বসল। দেখলাম সাজটা উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গীরই বেশী। অন্যটির বসনভূষণ আছে। এর যেন সাজের ঘটাটা বেশি। কিম্বা রূপের জৌলুষে তাই মনে হচ্ছে।

ফুলের ঝুড়িটিতে আরো চেনা অচেনা ফুল রয়েছে। কিন্তু মালতীফুল কেমন দেখতে হয়? মল্লিকাই বা কেমন? এত যাদের নাম তাদের তো দেখিনি মনে হচ্ছে। জুঁই, বেল, টগর, রজনীগন্ধারই তো ছড়াছড়ি সর্বত্র। ওদের ঝুড়িতেও পাঁচরকম ফুল রয়েছে, দূর থেকে মেঘ ও সন্ধ্যার অন্ধকারে ভাল বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু মধুর মদির তীব্র গন্ধে গাড়িটা যেন ভরে গেছে। কিন্তু ওদের গ্রামের নাম যখন মালতী পাটপুর, নিশ্চয় মালতী মল্লিকায় সে গ্রামের বন অরণ্য বাড়ির আঙ্গিনা ভরে থাকে। নইলে এমন নামের কোনো মানে হয় না।

মনে হল, এমন মিষ্টি যে গ্রামের নাম, যদি একবার নেমে দেখে আসা যেত। জিজ্ঞাসা

করব ওদের? ওদের গ্রামের কথা, মালতীফুলের কথা? ওরা এত সেজে চলেছে কোথায়? কেনই বা সাজার ঘটা?

কিন্তু ভাষা, তা তো জানি না!

একবার কথা কইতে গেলাম, তারা আবার মধুর সুরে বয়সোচিত তরলভাবে লঘু হেসে আকুল হল।

আবার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করি নাম, 'কঁড় যাওছি?'

এবারে নিজেদের ভাষা শুনে বলে, 'জগড়নাথ দরশন করিবি।'

ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত সেজেছ কেন?'

একটু হেসে বললে, 'অজ (আজ) নাচিতে হব।'

কৌতুক ও বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, 'কোথায় নাচিবে—মন্দিরে?'

বললে, 'হ'। শ্যামাঙ্গী বললে, 'ও নাচিব। আজ মন্দিরে নাচিব। কল (কাল) কনারক যিব, ললিতা সপ্তমী সূরয সপ্তমী অছি। সেথা নাচিব।' মনে হল মন্দিরে নাচবে, কোনারকে নাচবে। আহা, রূপ ও গড়ন নাচেরই মত। আর ওড়িয়া ভাষায় বিদ্যায় কুলোয় না! শুধু শুনতে লাগলাম কলহাস্য, কথা, আর মাঝে মাঝে 'মালতী' ডাক। আর তারি মাঝে মৃদু স্বরে গায় কি এক গান। যেন মায়া গান। ভাবি ওদের মাঝে কোনটি মালতী, সুন্দরী না শ্যামাঙ্গী? গ্রামের মত মেয়েদের নামও এমন মিষ্টি?

ওদের সঙ্গ নিয়ে মন্দিরে নাচ দেখবার চেষ্টা করব? আর কোনারক গেলে আরো চমৎকার হয়। কোনারক দেখেছি। সেই নিকষ রূপসী পাষাণীর কঠিন কষ্টি কালো কোলের কাছে এই সুকোমলাঙ্গী তরুণী সুন্দরীর নাচ না জানি কি সুন্দর হবে! কিন্তু কেমন করে ওদের সঙ্গে যাব। আসন্ন সন্ধ্যা, ট্রেনেও আলো জ্বলেনি। ফুলের ঝুড়ির কেয়া বকুলের গন্ধ আর তরুণী মেয়ে এবং অজানা ভাষায় মধুর মিষ্টি গলায় তাদের হাসি ও কথা যেন কিসের ঘোর লাগিয়ে দিলে মনে ও চোখে। চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে ওদের কথা শুনতে লাগলাম। যদি বুঝতে পারতাম। কিন্তু না বোঝাতেই যেন বেশী ভাল লাগছে। গাড়িতে আর কেউ নেই। মনে ভাবছি নিতে আসবে পাণ্ডার লোক। আসুক, যাই হোক, এদের সঙ্গ ছাড়া হবে না। এদের সঙ্গেই তাদের বলেকয়ে যাব।

কেমন করে স্টেশনে নামলাম, কি করে শ্রীমন্দিরে এলাম, আমার পাণ্ডারা কোথায় ছিলেন, তা জানি না।

সহসা দেখি মহাপ্রভুর শয়নারতির যোগাড় হচ্ছে, আমি গরুড়স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। আর সেই মেয়েদুটি জগন্নাথের বিগ্রহের দুদিকে দুজন মুখোমুখিভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রদীপের মৃদু আলোয় জগন্নাথের মূর্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট মনে হল যেন কিসের প্রতীক্ষায় চেয়ে আছেন তাঁরা সুমুখে। মেয়েদুটিরও মুখে পড়েছে মন্দিরের বড় বড় পিলসুজের প্রদীপের আলো। সহসা তারা পায়ের নূপুরে ঝঙ্কার দিলে। তখনি তাদের হাতের বাজুর ঝুমকো, গলার হার, কোমরে চন্দ্রহার একসঙ্গে যেন ঝঙ্কৃত হয়ে শব্দময়ী হয়ে উঠল। গলায় ও মাথায় ফুলের মালা দুলে উঠল। নূপুরে আর ঝঙ্কার থামল না। নৃত্য আরম্ভ হয়ে গেল। সেকি অপূর্ব নাচ, চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। স্নিগ্ধ আলো শুধু মন্দিরের বিগ্রহের কাছে, আর সব দিক অন্ধকার। সামনে তারা নাচছে। তনু দেহ দুটি তালে তালে পা ফেলছে। আন্দোলিত হচ্ছে হাত দুখানি। আঁটসাঁট

কটীবন্ধ আঁচলের নিচে কোমরের গোট ও চন্দ্রহার ঝিকমিক করে উঠেছে। কোনখানে একসঙ্গে মৃদঙ্গে ও করতালে নাচের বোল বাজছে। কি নাচ? কি বোল?

অকস্মাৎ তারা থামল। এবারে মৃদু মধুর কণ্ঠে অপূর্ব মিষ্ট সুরে তারা জয়দেবের পদাবলী গাইতে আরম্ভ করল, যেন ঘুম পাড়ানো সুরে।

'ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী।'

সঙ্গে সঙ্গে মৃদু তালে অঙ্গভঙ্গীতে নৃত্য, দ্রুততালে নয়।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আর এক কলি কানে এলো 'মা কুরু নিতম্বিনি গমন বিলম্বনমনুসর ত্বং হৃদয়েশম্'। ওগো রাধা, দেরি করো না, বিলম্ব করো না, অনুসরণ কর হরির, তিনি অধীর হয়েছেন।

আলো মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে এলো। গান মৃদু থেকে মধুর মৃদুতর হয়ে এলো। মন্দির জনশূন্য, পাণ্ডা পুরোহিতকে দেখা যাচ্ছে না, নাচও যেন দেখতে পাচ্ছি না। আর গান বা মৃদঙ্গের তবলায় বা অন্য বাজনার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এবারে কি বিগ্রহের শয়ন হবে?

সহসা গাড়ি থেমে গেল। চেয়ে দেখি, মেয়েদুটি ফুলের ঝাঁকা নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ঝকঝকে সুন্দর দাঁতগুলি টুকটুকে ঠোঁটের মাঝে হাসছে।

বললে, 'উঠ মা, নাবিব না, পুরী অসি গেল।'

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? কতক্ষণ হল?

পাণ্ডা এসে দাঁড়ালেন, 'মা এসেছেন? আর তোরাও এই গাড়িতে আসিলি? রায়-বাড়ির মায়ের সঙ্গে চেনা হইল?'

তারা হাসলে, বললে, 'আসিলি তো! চিনিলাম মায়েরে। ঘুমাছিল, জাগাইলি!'

ওরা নেমে গেল। আমিও নামলাম। পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওরা কে?'

পাণ্ডা বললেন, 'ওরা দেবদাসী আছে। আজ মন্দিরে নাচিবে। কাল সারারাত্রি কোণারকে সূর্যমন্দিরে নাচিবার কথা।' ওদের নাচের সঙ্গে শ্রাবণের মেঘের আড়াল থেকে এই সূর্যোদয় হবে। আগে লোকে বলত মালতী পাটপুরের ঐ মেয়েরা নাচলে শ্রাবণ মাসে ললিতা সপ্তমীতে মেঘ কেটে যায়। আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। খানিকক্ষণের মত। বছরে চারটি সূর্য সপ্তমী। আগে চারবারই ওরা জগন্নাথকে নাচ দেখিয়ে কোণারকে নাচত। এখন সব আর আসে না, পারেও না। সেরকম মেলাও বসে না। এক মাঘ ছাড়া। তাছাড়া 'নিয়াখিয়া' নদী শ্রাবণ মাসের জলে ভরাভরি। পার হতে নৌকা বানচালের ভয় আছে। এইজন্য লোকে কোণারক বর্ষায় যায় না।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাহলে নাচ হবে না সেখানে? আর মন্দিরে?'

পাণ্ডা বললেন, 'সেখানে হবে না। তবে মন্দিরে আর সে নাচ হয় না, আগে যা হত জয়দেবের পদাবলী নিয়ে।'

বল্লাম, 'পদাবলী নিয়ে? ধীরে সমীরে যমুনাতীরে গেয়ে?'

সবিস্ময়ে পাণ্ডা বললেন, 'আপনি কোথায় শুনলেন ও গান, বৃন্দাবনে? এখানে এখন তো আর নিয়ম করে দেবদাসীরা নাচে না। তবে মাঝে মাঝে নাচে। বৈশাখ মাসে নরেন্দ্র সরোবরে অক্ষয় তৃতীয়ায় মেলা হয়। চন্দনযাত্রা হয়। তখন নাচ হয়।'

আমি অন্যমনে ভাবতে লাগলাম, যেমন স্বপ্ন দেখলাম, অমনিই কি নাচে গায় ওরা? জিজ্ঞাসা করলাম, অন্য গানও গায় পদাবলী থেকে? পাণ্ডার সঙ্গে যেতে যেতে স্বপ্নের কথা বললাম।

তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'ঐরকমই সব গান কয়েক বছর আগেও হত। এখন ওসব প্রায় উঠে যাচ্ছে। দেবদাসীর নিয়মও উঠে যাচ্ছে কিনা।'

আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ হবে? ওরা বললে যে?'

পাণ্ডা হাসলেন, বললেন, 'সে জগবন্ধুর ইচ্ছায় তো আপনার কৃপা দর্শন হয়ে গেছে। আজ বোধ হয় হবে না। যা মেঘ করেছে। আজ এখন বাড়ি চলুন। দেখুন ওরাও ভিজে যাবার ভয়ে গাড়িতে উঠল।' দেখি মেয়েদুটি রিকসায় উঠেছে, কোলে ফুলের ডালাটি।

আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম। ঘন কালো মেঘেরা অতি ব্যস্ত হয়ে আকাশের চারিদিকে আনাগোনা করছে। সন্ধ্যার লেশটুকুও দেখা যাচ্ছে না।

পাণ্ডা বললেন, এই গানটার একটা কিম্বদন্তী বা কাহিনী আছে জগন্নাথের লীলায়। ভক্তমালে পাওয়া যায়, এক মালিনী মেয়ের এই কাহিনীটি...লোকেরা বলে ওরা সেই মালিনী মেয়ের বংশের মেয়ে। জগবন্ধুর অতি প্রিয় গান এটি।

অকস্মাৎ একটা তীব্র বিদ্যুৎ চমক ও গর্জনের সঙ্গে তুমুল ধারায় এমন বৃষ্টি নেমে এলো, আর কিছু শোনা গেল না। তারি মাঝে বাড়ি এসে পড়লাম।

অভিযাত্রী, শারদীয়া ১৩৬২

বাজীকরের ছেলে

জ্যৈষ্ঠের দুপুর। সুকুমার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। মা বকেছেন—হঠাৎ হাসি হৈ হৈ করে সে ছোটভাইটির ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে।

মা তাই কয়েকটা চড়-চাপড় দিয়ে বারান্দায় বার করে দিয়েছেন। মার বা বাবার কাছে এমন চড়-চাপড় খাওয়া সুকুমারের অভ্যাস আছে। তাই তখন চোখে যে জল এসেছিল, তার দাগটা গালে যদিও রয়েছে, কিন্তু সুকুমার সব ভুলে গিয়ে রাস্তার দিকে চেয়েছিল। বউবাজারের রাস্তা। লোক, রিক্সা-গাড়ি, মোটর, ফিরিওয়ালা, গরু, কুকুর কিছুরই অভাব নেই। রাস্তার ছেলেরাও আছে। খেলা করছে। তাদের কী মজা! রাস্তায় খেললে কেউ বকে না।

বাঃ! কিন্তু এসবের চেয়ে ঢের ভালো জিনিসও তো আছে। পথের কোন একদিকে সহসা ডুগডুগ করে বেজে উঠল বাঁদর না ভালুক নাচের ডুগডুগি। আর রাস্তার একদিকে দেখা গেল, লালচে রংয়ের মুখ, লম্বা-চওড়া একজন পাঠানকে। সাদা রং রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে লাল হয়ে গেছে। গায়ে মস্ত লম্বা কামিজ, ফুলো পাজামা বা 'সেলাওয়ার', তার ওপর এক মখমলের লাল রংয়ের ওয়েস্টকোট, মাথায় পাগড়ি, পায়ে বিরাট নাগরা। আর একহাতে ডমরু, অন্য হাতে বাঁদরের আর ভালুকের শিকল বা দড়ি!

ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্, ডমরু বাজছে। আর লোকটা চারদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসছে। ভরা দুপুর। তার মতে এইটাই কতকটা প্রশস্ত সময় বাঁদর-ভালুকনাচ দেখানোর। কেননা বাড়ির পুরুষরা বকেঝকে ভাগিয়ে দেবেন না। তাঁরা সব আপিসে বা কর্মক্ষেত্রে। জননীরা কৌতূহলী হয়ে দেখতেও পারেন, ঘুমোতেও পারেন। ঘুমের অসুবিধার ভয়ে পয়সা দু-চারটা দিয়েও দেবেন ছেলেদের।

আস্তে আস্তে সব বাড়ির বন্ধ দরজা জানালাগুলো খুলে যেতে লাগল। আর ছেলেমেয়েরা বারান্দায় বেরিয়ে এল কতজন। কতজন বারান্দায় জানালায় দাঁড়াল।

বাজীওয়ালা বলে,—'কী খোখালোগ্ খেল দেখবে? বড়া মজাদার খেল আছে।' বাজীওয়ালার বাংলা বলার চেষ্টা মন্দ সফল হয় না। ছেলেমেয়েরা জ্বলজ্বলে উৎসুক চোখে তার বাঁদর-ভালুক, কাঁধের ঝোলা, হাতের ডমরু দেখে। তার পোশাকটাও বেশ দেখতে ভালো লাগে। অন্য বাঁদরনাচের লোকেদের চেয়ে ভালো। তারা বাজীওয়ালার প্রস্তাবে ঘাড় নাড়ে। সে বলে,—'আচ্ছা খেল আছে, দেখো সব। লেকিন পইসা বহুত লাগবে। পইসা দাও খোখা লোগ।'

ছোট্ট ছোট্ট লাল টুক্‌টুকে মুঠোগুলি খুলে শিশু বালক বালিকারা যে যা পয়সা পেয়েছে দেখাল। কেউ বা ছুটে বাড়ি গেল আরও পয়সা আনতে।

পয়সাগুলি আন্দাজে গুনে বাজীকর বললে,—'বহুত থোড়া আছে। কেইসে ইলোগকে পেট ভরবে!' (ভালুক আর বাঁদরদের দেখিয়ে)

উজ্জ্বল চোখে ছেলেরা বললে,—'আরো আনি?'

বেশীরভাগই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বারান্দার ওপরেও ছেলেমেয়ে অনেক দাঁড়িয়েছিল। লোকের অনুপাতে পয়সা কত হবে বাজীকর আন্দাজ করতে লাগল। সে জানে, অনেকেই অমনি দেখে পালিয়ে যায়। ভিড় করে দাঁড়ায় বটে, পয়সা আনে না। তবু

লোক অনেক জমেছে। আবার ডুগডুগি বাজা শুরু হলে আরও আসবে, শেষ অবধি পয়সা কিছু হবে।

সে আবার বললে,—'ও লোগ চানা খাবে, কেলা খাবে। হামি রোটি খাবে। পয়সা এত্না লাগবে। ভারি ভালো খেল্ আছে, দেখো না। বান্দরকে সাদি হবে, বান্দরী সাদি করবে না। ঔর বান্দর রোতে লাগবে। ভালুকের জ্বোর হবে, ধুঁকতে লাগবে।'

আবার ডুগডুগি বাজায়। লোভনীয় খেলা! তার বক্তৃতাতে কাজ হল।

এবারে বারান্দার ওপরের শিশু বাহিনীও নেমে নীচের রকে রাস্তার পাশে দাঁড়াতে লাগল। বারান্দার ওপরে দু-একজন মা বোনের দেখাও পাওয়া গেল।

খেলা শুরু হল। প্রথমেই বাঁদরের বিয়ে হবে। বাজীকরের ঝুলির ভেতর থেকে বাঁদরীর জন্য লাল ঘাগরা (কারুর ফ্রকের ছেঁড়া তলাটা), জরি দেওয়া সবুজ জামা বেরুল। দুটা কাঁসার সরু ময়লা চুড়ি বা বালা বেরুল। পায়ের ঘুঙুরও বেরুল। 'কনে'র সাজসজ্জা করে দিয়ে বাঁদরকে সাজাবার পালা এল। সাজের মাঝে মাঝে উচ্চ সঙ্গীত হয়। বাজীকরের মাতৃভাষা—পস্তু এবং পাঞ্জাবী হিন্দী মিশিয়ে সে গান। গানের অনুবাদও সে করে দিতে লাগল। কিন্তু ঝুলি ঝেড়ে খুঁজে নানা চেষ্টাতেও বাঁদরের সাজাবার উপকরণ পাওয়া গেল না। না জরির জামা, না লম্বা চুড়িদার পাজামা, না বিয়ের বরোচিত পাগড়ি!

বাজীকরের কি ইঙ্গিতে বাঁদরী বরের বর্বর বেশ, একেবারে আদিম বন্য বেশ দেখে বেঁকে বসল। সে বিয়ে করবে না, ওরকম জংলী বরকে।

বাজীকরের ডুগডুগি দ্রুত বাজে, গানও চমৎকার হয়—আরে বাঁদরি রোষ না করিস্। মরদ বাচ্ছার ভেসের (বেশ) কি কাম আছে। সাদী করে একদফে দেখ, কেতো ভেস (বেশ) তোকে ওহি পেহ্নাবে (পরাবে)। আয় চলে যায়। এবারে গানের কথা পসতু নয়—স্বরচিত বাংলায় সঙ্গীত হতে থাকে। ভবিষ্যৎ ভেসের আশায় খুশি বাঁদরী একপাশে বসে রইল। এবারে বাঁদরের আগমন। বেশভূষাহীন বাঁদর—ডুগডুগির তালে তালে পা ফেলতে ফেলতে বাজীকরকে ঘুরে ঘুরে—যেন বহুদূর পথ পার হয়ে বাঁদরীর বাড়ি বিয়ে করতে এল। এল তো, তারপর—কিসে বসে?

বাজীকর উত্তাল সঙ্গীতে বরকে আহ্বান করে ডুগডুগিটি পেতে দিল, 'আরে এহি কুর্সি আছে। বইঠ যা বেটা। খুশি হো যা। আভি খুবসুরৎ বিটি মিল যায়গী।'

এবারে ডুগডুগিহীন কণ্ঠসঙ্গীতে বিবাহের বর্ণনা, আসর বর্ণনা চলতে লাগল। তারপর ভোজ ও বর-কনের বাড়ি যাওয়া। ছেলেদের আনা কলা ও ছোলাভাজায় ভাল্লুকসুদ্ধ সবান্ধবে ভোজ হল।

গান চলতে থাকে,—আরে গাড়ি নেই, ঘোড়া নেই কেইসে বিবি রাগ করিয়েসে। ডুগডুগ ডুগডুগ বাঁদর উঠে দাঁড়িয়েছে।—ডুগডুগি বাজে বাজীকরের হাতে আবার।

সত্যই বাঁদরী রাগ করে বিমুখ হয়ে বসেছে। এবং বাঁদর বিমর্ষভাবে ছেলেদের হাতের বাকী কলা ও ছোলার সম্ভারের দিকে চেয়ে রইল। তার ভাবটা যেন, আরে, আর কতক্ষণ ধরে বিয়ে করব! আর রাগই কত করবি বাঁদরী....। এত কলা ছোলাভাজা দিক্ না ছড়িয়ে দুটি আরও, বড়ই ক্ষিদে পেয়েছে।

শেষ অবধি যুগ্ম কন্যাকর্তা ও বরকর্তা বাজীকর মিটমাট করে দিল।—'আরে, ঘোড়ী ভি মিল গিয়া। সওয়ার হো যা বেটা, আও রে বেটী, রোও মত্। কালী ঘোড়ীমে সওয়ার হোকে শুশরাল চল। বড়া ভারী কোঠা আছে। বহুত আসবাব আছে। কুর্সি টেবুল আয়না আছে ঘোরে। দিনরাত মুখ দেখবি। দেখ বান্দর, কেইসে সুন্দর বিবি তেরা...।'

কালো ঘোড়া-রূপী ভাল্লুক এগিয়ে এল। জাম্বুবানের পিঠে সওয়ার হন বাঁদর বাঁদরী...। বারকতক বাজীকরকে ঘুরে, অনেক পথে ঘুরে তারা বাড়ি এল। এবারে বাজীকরের ঝুলি থেকে বাড়ির আসবাব বেরুল একটা পিঁড়ি, ডুগডুগি ছিলই, আর একখানি আরসি। সেই টেবিল চেয়ার ও আরসির আসবাব পেয়ে তারা খুশি মনে বসল।

আরসিটি নিয়ে বাঁদরীর মুখ দেখার আর শেষ হয় না। ভেঙ্চি কেটে, দাঁত বার করে খিঁচিয়ে,—বিরস গম্ভীর মুখে কতরকম করে যে মুখ দেখে তার ঠিক নেই। বাঁদর আর আরসি পিঁড়ি কিছুই পায় না।

বাজীকর সুর করে বলে, 'আরে বিবি, একবার থোড়া তো আয়না মিঞাকো দে। ওভি সুরত দেখেগা। তু তো বহুত দেখ লিয়া।'

আরসি বাঁদর পেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর আবার বাঁদরী কেড়ে নিল। বাজীকর হাসে, স্ত্রীজাতির ওপর তার প্রশ্রয় বেশি বোঝা যায়। তারপর ভাল্লুকের কম্প জ্বর এল। —'বোখার' হুয়া। 'জ্বোর' হুয়া খোখালোগ। আওরো পয়সা চাহি, নেহি তো দবা কিনবে কেইসে? ওষুধ চাহি!

মাথার ওপর রোদ্দুর জ্যৈষ্ঠমাসের—জানালা থেকে গুরুজনের আহ্বানে তৃষ্ণার্ত বালকদলের খেলা দেখার শখ শেষ হয়ে এল। অনেকে পয়সা দিল। বেশিরভাগই ভূয়ো দর্শক, যে যার ফিরল।

বাজীকর হাতের পয়সা ঝোলায় ফেলে অন্য পথে অগ্রসর হল।

বহুবাজার শেষ করে ড্যালহাউসী স্কোয়ার বেয়ে ময়দানে তার আস্তানা। বিবি আছে, মেয়ে আছে। আরও ভাই-বেরাদর আছে কেউ কেউ। দুপুরবেলা বাস, ট্রাম, মোটর, রিক্সা সব একটু কম চলছে। দু'হাতে বাঁদর ভাল্লুক ও ডুগডুগি।

সহসা কে ডাকল কচি কথায় একটু দূর থেকে—'ও বাজীওয়ালা।' আপিসপাড়া। এখানে আর বাজী বাঁদরনাচ কে দেখবে?

আবার ডাক আসে। পিছন ফিরে দেখল, একটি ছোট ছেলে রোদে মুখ লাল হয়ে গেছে। বাঁদরের ভয়ে একটু দূরে দূরে আসছে।

'কি খোখাবাবু? ইহাঁ তো খেল্ দেখাবে না। ফের কাল দেখো। আজ ঘর যাও।' বাজীকর এগুলো।

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। একটু দূরে দূরে থেকেই বললে, 'ও বাজীওয়ালা, শোনো একটা কথা। আমি তোমার সাথে যায়েগা।'

বাজীকর ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর, তার জন্তুদেরও সেই অবস্থা। তবু ছোট ছেলের কথায় একটু হাসলে, 'আচ্ছা আও, কোই ছায়ামে ময়দানে ফের খেল দেখনা।'

গরু চরানোর মাঠে ময়দানে একটা জায়গায় কয়েকটা নিচু নিচু ময়লা তাঁবু পড়েছে। কাছাকাছি একটা বড় গাছ রাস্তার দিকে ঘেঁষে আছে, আর সব ফাঁকা ময়দান।

চুড়িদার পাজামা আর লাল রঙের জামা পরা বাজীকরের একটি ছোট মেয়ে আর ময়লা সালোয়ার কামিজ পরা বৌ বেরিয়ে এল। পয়সার থলিটি মেয়ে নিয়ে তাঁবুতে ঢুকল। বৌ জন্তুগুলিকে নিল মিঞার হাত থেকে। জল ছোলা আর রুটি ভেঙে খেতে দিল তাদের।

বাজীকরের গলার রঙীন রুমাল খুলে নিয়ে বাতাস খেতে খেতে চোখ পড়ল ছেলেটির ওপর।

—'আরে তুম হিঁয়া আ গিয়া! ঘর কাঁহা? আভি তো ঘর যাও।' বাঁদর ভাল্লুক সব দূরে বাঁধা রয়েছে। মিঞার বিবি আর কন্যা এসে বাইরে দাঁড়িয়েছে। মিঞার জন্য

রুটি আর লস্‌সি নিয়ে।

মেয়ে বলে, 'ও কোন্‌ হ্যায় বাপজান?'

বাপ বললে, 'একঠো লেড়কা হ্যায়। খোখাবাবু, ঘর কাঁহা? ঘর যাও, আজ খেল ঔর হোবে না।'

বাঁদররা বাঁধা আছে। খোখাবাবুর আর বাঁদরের ভয় নেই, এগিয়ে এল। বললে,—'হাম বাঁদরনাচ শিখেগা।'

বাজীকর হেসে উঠল। মেয়ে আর মাও কিছু বুঝতে না পেরেও সকৌতুকে চেয়ে রইল।

বাজীকর বললে তার ভাঙ্গা বাংলায়, 'ভদ্রলোক কি বাঁদরনাচ করে। তুমি বাড়ি যাও। কোথায় ঘর?'

ছেলেটি হাসিতে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। বিমনাভাবে ভাঙা হিন্দীতে বললে, 'বহুবাজারে বাড়ি। আমি বাড়ি যাব না আর। আমি তোমার কাছে বাঁদরনাচ শিখব।'

'আরে বাচ্চা! পাগল হো গিয়া।' বাজীকর আবার হাসে। 'আচ্ছা, খানা খা'কে তুমকো ঘর পৌঁছা দেগা। নেহি তো গাড়িকে রাস্তা। একলা মত্‌ যাও। ঘরকে কি নম্বর আছে?'

খোকা ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের নম্বর সে জানে না। বাড়ি চেনে, কিন্তু রাস্তা চেনে না।

শুধু বললে,—'বাড়ি হাম ফিরে নেহি জায়েগা।'

বাজীকরের খাওয়া শেষ হয়েছিল, বললে—'কুছু খাবে খোখাবাবু, ফল? মুসলমানকে রোটি তো খাবে না? খাকে ঘর চলো।'

খোকা কিছুই খাবে না। পকেট থেকে একটি সিকি বের করে বললে, 'তোমায় কত পয়সা দিলে তুমি আমাকে বাঁদরনাচ শেখাবে?'

বাজীকর অট্টহাস্যে ভেঙে পড়ল। তার জীবনে এমন মজার ঘটনা কখনও ঘটেনি। —'দেও খোখাবাবু। কি নাম তুমার আছে? চলো ঘর যাই।'

খোকা মিঞার হাসিতে অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করেছিল। এবারে সহসা কেঁদে ফেললে। বললে, 'বাড়ি যাব না, এখানে থাকব।'

এবারে বাজীকরের বৌ আর মেয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। বাজীকরও তার হাত ধরে কাছে ছেঁড়া চাটাইয়ে বসালে। বললে—'রোও মত্‌। কাঁদো মত্‌। কাহে ঘর যাবে না? কি নাম? ভুখ লগা? রোটি খাবে? জোল পিবে।' মেয়েকে বললে—'জেরা লস্‌সি লা।'

বাজীকরের মেয়ে এক গ্লাস ঘোল এনে বললে—'পিয়ো।'

একচুমুকে ঘোলটা খেয়ে চোখ মুছে সে চুপ করে বসে রইল।

বাজীকর আবার জিজ্ঞাসা করলে নাম, ঘরের ঠিকানা।

সে বললে, বাড়ি সে যাবে না। সেখানে মা মারে। তার মা নয় সে, তার ভাইয়ের মা। আর বাবাকে বলে তাকে মার খাওয়ায়। তার নাম সুকুমার মৈত্র। সকলেই ভাইকে ভালোবাসে। তাকে মারে বকে। ঠাকুমা আছে। সে একটু ভালোবাসে, আর কেউ নেই। তার নিজের মা হাসপাতালে গেছে সবাই বলে। আজও আসেনি।

বাজীকর সব বুঝল মোটামুটি। একটু চুপ করে রইল, মাতৃহীনের কচি মুখটা দেখে তার মায়া হচ্ছিল। ভাঙা বাংলায় বাজীকর বললে,—'বাপের নাম কী? কী করেন?

কাল তোমাকে পৌঁছে দেব, নইলে পুলিস আমাকে ধরবে।'

'বাপের নাম তারাদাস মৈত্র।' কিন্তু সে আর ফিরবে না বাড়ি। বাজীকর হাসল। —যা'হোক কাল পৌঁছে দেবে।—কিন্তু গলিকে নাম? রাস্তাকে নাম?

নম্বর তো খোকা বলতে পারলে না। রাস্তার নাম বললে শ্রীমন্ত দে'র লেন। বাবাকে উকীলবাবু বলে সবাই।

বাজীকর চিন্তিতভাবে বললে—'তুমি বাড়ি পহচান লিবে তো?'

খোকা বললে, 'সে বাড়ি যাবেই না। বাঁদরনাচ শিখবে ওর কাছে। এই চার আনায় বাঁদরনাচ শেখা হবে না?' আবার মিনতির সুরে বলে, 'আর তো পয়সা নেই বাজীওয়ালা, এতেই তুমি শিখিয়ে দাও।'

তার পিঠে হাত দিয়ে বাজীকর হাসতে লাগল, 'আরে বাচ্চা, ভদ্দরলোক এ কাম করে না।'

'কাল বাড়ি পৌঁছে দেব। তুমি কেত্না লিখনা পড়না শিখবে, বড়া আদমি হোবে!' হাসতে হাসতে তার মেয়ে ও বৌকে সুকুমারের বাঁদরনাচ শেখার ইচ্ছার কথা বললে।

ছয় বছরের কালো টানা সুরমা পরা চোখ, পিঠে রুক্ষ চুলের বিনুনী ঝোলানো, বাপের মতো মুখ চোখ নাক, সুন্দর মেয়েটি এসে বাপের কাছে বসল। বৌ ঘরে গেল বিকালের রুটি করতে। শুধু বললে, 'বাচ্চা, রোটি খানা?'

বাজীকর জিজ্ঞাসু চোখে সুকুমারের দিকে চাইল। তারপর বললে—'রোটি বানা। খাবে।'

কুড়ি বছর কেটে গেছে। পেশোয়ারের কাছে কাদা মাটির তৈরী একটা কুঁড়ের সামনে বাজীকর একটা খাট পেতে শুয়েছিল সন্ধ্যেবেলা। দারিদ্র্য তাকে খানিকটা বুড়ো করে ফেলেছে। যদিও চুল বেশি পাকেনি, দাঁতও পড়েনি, কিন্তু শরীর যেন ভেঙেছে। কদিন ধরে খুব জ্বর তার। বৌ কাছে বসে আছে খাটের পাশে একটা ছোট্ট খাটুলীতে।

সেদিনের সেই ছ'বছরের মেয়েটি আজ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের হয়েছে। সে ঘরে বসে রুটি করছে।

বাজীকর বললে—'সৌকত ক্ষেতের কাজ করে ফেরেনি?'

বৌ বললে—'না।'

বাজীকর বললে—'তোর হাতে কত পয়সা টাকা আছে, দেখ দেখি ঝুলি ঝোলা বাকস ঝেড়ে।'

বৌ ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে—'বেশি নেই। কেন? ওষুধ কিনতে দেবে?'

বাজীকর বললে—'না, ওষুধ আর খাব না। খোদা ভালো করে তো এমনিতেই ভালো হবে। পয়সা খরচ করতে পারব না। আমার পয়সা দরকার অন্য কাজের জন্য।'

'কী কাজ?'

'তুই পয়সা গুনে দেখ না কত আছে?'

দু'-তিন জায়গা ঝেড়ে খুঁজে সে টাকা পয়সা মিশিয়ে আঁচলে করে নিয়ে এল। সে গুনতে জানে না। আনি দুয়ানি সিকি আধুলি, কাগজের টাকা, বড় তামার পয়সা, নানা দেশীয় রাজ্যের মোটা পয়সা, ফুটো পয়সা এক কোঁচড় অর্থাৎ তার ওড়না বা চুন্নীর আঁচলে ভরে নিয়ে এসে বাজীকরের সামনে ধরল।

বাজীকর গলার ছেঁড়া রঙীন রুমালখানা ছড়িয়ে সেগুলো নিল। পয়সা, আনি, দুআনি, সিকি, টাকা করে বাছতে বাছতে সূর্য ঢলে পড়ল পশ্চিম দিকচক্রবালের কাছে।

আষাঢ় শ্রাবণ বা জুলাই মাস, তবু আকাশের দিনের আলোয় গ্রামের মাঠ ঘাট পথ ভরে আছে।

গোনা শেষ হল না। বারকয়েক গুনে গুনে বাজীকর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল মাথার কাছে মোটা রঙীন চাদরের তলায় সেগুলো রেখে।

সৌকত এসে দাঁড়াল মাঠ ফেরত। মাথায় একরাশ ভুট্টার গাছ গরু মহিষের খাবার জন্য। আঙিনার একপাশে সেগুলো ফেলে বললে—'আম্মা, খানা দে।' তারপর বললে—'মুন্নি, রুটি হয়েছে? আমি মুখ হাত ধুয়ে আসছি।'

হঠাৎ কি ভেবে বাজীকরের খাটের পাশে দাঁড়িয়ে বললে—'চাচাজী, কেমন আছ? জ্বর আছে?'

বাজীকর জ্বর-আরক্ত চোখ খুলে তার দিকে চাইলে ক্লান্তভাবে। তারপর বললে—'আও বেটা। রোটি খা লে আগে। থক্ গিয়া, ফির আনা।'

পাঞ্জাবের সন্ধ্যা অনেকক্ষণ থাকে। গ্রামে সন্ধ্যার শেষেই সকলের রুটি খাওয়া হয়। আলো জ্বালার দরকার থাকে না। কোথায় আলোর তেল পাবে! পয়সা কোথা?

বাজীকরের খাটের পাশে এসে বসল সৌকত। বাজীকরের মতো তার রংটা খুব ফর্সা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নাক মুখ চোখও অন্যরকম। অত লম্বা চেহারাও নয়। বাজীকর ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ।

তারপর বললে—'সৌকত, এই আমার মাথার কাছে রুমালে যে পয়সা আছে, ওগুলো বের কর তো।'

রুমালে জড়ানো পয়সার পুঁটুলিটি সে বের করে মাটিতে রাখলে। আশ্চর্য হয়ে বললে—'আরে এত টাকা পয়সা! কি হবে এত পয়সা এত রাত্রে চাচাজী?'

ততক্ষণে মেয়ে সেখানে এসে দাঁড়াল। বাজীকর মেয়েকে বললে—'একটা আলোর ডিবিয়া নিয়ে আয় জ্বেলে।'

আলো এলে বললে—'সৌকত, গুনে বল, কত টাকার পয়সা আছে?'

বাজীকর চোখ বুজে শুয়ে রইল, পয়সা গোনা হতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে আলাদা আলাদা ভাগে সবগুলি সাজিয়ে গুনে গুনে রাখল সৌকত। তারপর বললে—'কাগজের রূপেয়া আছে বত্রিশটা চাচাজী, আর সব মিলিয়ে তেরা রূপেয়া আর দশ আনা হল।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বিড়বিড় করে আপন মনে বাজীকর বললে—'কলকাত্তা যানে কা ভাড়া হবে কেতনা? বেটা জানো, কত হবে?'

সৌকত বললে—না, সে জানে না।

বাজীকর বললে—'আমি তো দশ বছর আগে কলকাতা গেছি, তখন বিশ-পঁচিশ এইসা হবে মনে আছে। তারপর বান্দর-বান্দরী মরে যাওয়ার পর আর খেলা দেখাতে যাইনি। দেশেই রয়ে গেছি।...'

মেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—'আবার যাবে বাপজান? আমি যাব।'

বাজীকর একটু হাসলে, অন্ধকারে সাদা দাঁতগুলো ঝক্‌মক্ করে উঠল। বললে—'আর কি করতে যাব আমি? আমার তো আর খেল্ দেখাবার চীজ নেই। দুনিয়াকে খেল্ ভি খতম হো গিয়া মেরা। এবারে সৌকত যাবে।'

'সৌকত? সৌকত কি করতে যাবে?' বাজীকরের বৌ, মেয়ে আর সৌকতও অবাক হয়ে রইল।

বাজীকর বললে—'যাবে সৌকত?'

সৌকত বললে—'আমি তো কলকাত্তা চিনি না। আর খেলাও দেখাতে জানি না, খেলার জানোয়ারও তো নেই আর।'

বাজীকর বললে—'খেলার জন্য নয়। অন্য কাম আছে তোমার। তোমার কি তোমার 'সকুমার' নাম ইয়াদ আছে? তোমার নাম ছিল আগে সকুমার মাইতর। বাপকে নাম ছিল তারাদাস মাইতর। তোমার মনে নেই?'

আশ্চর্যভাবে সৌকত চুপ করে বাজীকরের দিকে চেয়ে রইল, সুকুমার নাম তার ছিল মনে ছিল যেন, বাজীকরের কথাতে এবার মনে পড়ল ভালো করে।

বাজীকর বললে—'তোমার কলকাতার ঘর আমি দেখে এসেছিলাম। মস্ত ঘরবাড়ি তোমাদের ফাটকওয়ালা। মোটরগাড়িও ছিল একটা। তোমার মনে নেই?'

সৌকতের মনে অস্পষ্ট স্মৃতির ছবি জেগে উঠতে লাগল। সে চুপ করে রইল।

এবার বাজীকর বললে—'শোনো, তুমি একদিন খেলা দেখতে দেখতে আমার সঙ্গে চলে এসেছিলে, আর ফিরে গেলে না। বললে, তারা তোমাকে মারে—সতেলি মা দেখতে পারে না। তুমি বাঁদরনাচ শিখবে...। কিছুতেই আমি তোমাকে তোমাদের বাড়ির রাস্তায় নিয়ে যেতে পারলাম না। এদিকে তুমি বাঙালীর ছেলে, পুলিস যদি ছেলে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি বলে ধরে তো আমার সব যাবে, আর জেল হয়ে যাবে। খুবই মুস্কিল হল। তোমাকে তাঁবুতে রেখে আমি বৌবাজারে শ্রীমন্ত দের লেন রাস্তা খুঁজে বেড়াতে লাগলাম বাঁদরনাচ করাতে করাতে। খুঁজে খুঁজে একদিন রাস্তাটা পেয়ে গেলাম। তোমার বাপের বাড়িও দেখলাম। তোমার ভাইকেও দেখলাম। খেলা দেখতে দাঁড়িয়েছিল। পয়সা নেবার সময় তাকে পুছলাম তার ভাইবোনের কথা। সে বললে—সুকুমার তার দাদা একজন ছিল। কোথায় চলে গেছে একদিন। পাওয়া যায়নি।

'বেশী কথা বলতে সাহস হল না। আর কারুকে জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হল না। তাঁবুতে ফিরে এসে তোমাকে ঘরে পৌঁছে দি। তুমি বহুত কাঁদলে, বললে—গেলে বাবা খুব মারবে, আর মাও মারবে। তুমি মরে যাবে। তোমার কান্নাতে আমার মেয়ে মেহেরবানুও কাঁদতে লাগল। বললে বাপজান, ওকে ছেড়ে দিও না। ও থাক আমাদের কাছেই। সেখানে তারা জান নিয়ে নেবে। আর পাঠিও না। মেহেরের মাও বললে, ও যদি না যেতে চায় থাকুক। খালি ওর কাপড়চোপড় আমাদের মতো করে নাও, নইলে পুলিসের হাতে পড়বে। ওর তো নিজের মা নেই, 'সতেলি' মা তো মারবেই। চলুক আমাদের সঙ্গে।

'তারপর আরও বড় বড় জায়গায় খেলা দেখাতে গেছি। কলকাতায় একবার গিয়েছি। সব জায়গায় তোমাদের নিয়ে গিয়েছি। কিন্তু কলকাতায় আর ভরসা হয়নি তোমাদের নিয়ে যাবার। নাম বদলে দিলাম। সৌকত মিঞা নাম দিলাম, কিন্তু এখন তুমি বড় হয়েছ। আর আমারও বয়স হয়েছে, খোদার কাছে আমার গুনাহ রয়ে যাবে, তোমাকে তোমার ছেলেবেলার কথা, মা-বাপের কথা, ধর্মের কথা না বলে দিলে। তুমি ফিরে যাও।—তখন তুমি ছোট ছিলে। মার খাবার ভয় ছিল। এখন ফিরে গিয়ে আপনার ঘরে থাক...। এই টাকাতে তোমার ভাড়া পুরো হয়ে কিছু বাঁচবে, আর আমার বাক্সে একটা কাগজে উর্দুতে তোমার আর তোমার বাপের নাম তোমার বাড়ির রাস্তার নাম লেখা আছে। আর যদি বাপ জিন্দা থাকে, মাফি চেয়ে নেবে। জোয়ান লেড়কাকে সে ছেড়ে দেবে না। আর আমি তোমাকে মুসলমান করিনি। তুমি হিন্দুই আছ। ছোট বাচ্চার জাত আমি নষ্ট করিনি। পাঠানদের ইমান আছে। খোদার কাছে আমি দোষ করিনি।

তুমি কাল পরশু যেদিন হোক চলে যাও। এসব টাকা তোমার। তুমি আমার কাছে অনেক কাজ করেছ, আমার ছেলের মতো ছিলে।'

বাজীকরের শুকনো চোখে জল এল। সে চোখটা মুছে সৌকতের পিঠে হাত রাখলে। সৌকত, মেহের আর মেহেরের মা অবাক অভিভূত হয়ে বসে রইল।

দুদিন ধরে বাজীকর আরও অনেক কথা বলল। কলকাতা শহরের পথঘাট, কোথায় থাকবে কি করবে। তার তো জানা কেউ নেই। তবু যদি কোনও পাঠানকে দেখতে পাও তো তাকে জিজ্ঞাসা করো—সে তোমাকে নিশ্চয় সাহায্য করবে। তবে এ কাপড়ে তোমার বাবা কি তোমাকে চিনবেন, না নেবেন? বাজীকর ভাবতে থাকে।

মেহেরবানু রুটি করে আর চোখ মোছে। মেহেরের মা চুপ করে বিমর্ষভাবে থাকে।

সৌকতও বিমনাভাবে ঘোরে ফেরে। বাংলা কথা তার মনেই নেই। কারুকে চেনে না। কে বেঁচে আছে! সঙ্গীদের নাম-ধাম মনে পড়ে না। মনে পড়লেই বা কি, কে তাকে চিনবে! তারাও বড় হয়ে গেছে। বিমনাভাবে বলে—'হাম নেহি জায়গা চাচাজী।'

চাচা বললে—'একবার যাও, নইলে আমার গুনাহ্ হবে।'

গ্রাম থেকে স্টেশন অনেক দূর। সৌকত সালোয়ার কামিজ, মখমলের ওয়েস্টকোট, পাগড়ি ও জুতা পরল। চোখে ওদের মতোই কাজল টেনে দিল। গলায় একটা রঙিন রুমাল পরল। কোমরের গেঁজেতে টাকাপয়সাগুলি ভরে দিলে মেহেরবানু বাপের কথানুসারে।

বাজীকরের পাশে এসে দাঁড়াল কদমবুসি অর্থাৎ প্রণাম করতে। বাজীকর স্নেহভরে কাছে বসিয়ে বললে—'আমার ঘরে আবার ফিরে এসো, যদি তাদের খুঁজে না পাও।' তার চোখে জল এল। বলতে পারলে না, যদি তারা না নেয়। সে তো হিন্দুদের জানে।

মেহের বললে—'ভাইজান, ফিরেই এসো।'

সৌকত কারুর কথার জবাব দিতে পারল না। চোখ নীচু করে রইল। জ্ঞানে সে ওদের কাছছাড়া হয়নি। আজ কোথায় যাচ্ছে!

কোন অজানা আপন জনের সন্ধানে! তারা কি এদের চেয়ে আপন হবে?...সৌকত পথে নেমে গেল।

প্রতিষ্ঠাবান উকিলের বসবার ঘর। —আইনের বইভরা আলমারি বুককেস। চেয়ার, টেবিল, ইজিচেয়ার সোফা আদি দিয়ে সাজানো। দালানে মুহুরীদের ও বাজে লোকের জন্য বেঞ্চি ও টুল। দু-তিনটি সুন্দর শিশু সামনের ছোট ঘেরা বাগানে খেলা করছে।

সৌকত মিঞা অভিভূত, সঙ্কুচিত ভীতভাবে এসে গেটের সামনে দাঁড়াল। আবার ফিরে গেল। ঠিক এই বাড়ি তো? কাকে জিজ্ঞাসা করবে? ভদ্র বাঙ্গালীকে জিজ্ঞাসা করার মতো বাংলা আর মনে নেই। অনেক লোক রাস্তা দিয়ে চলে গেল। হিন্দুস্থানী কেউ তেমন জানা নেই। কোনও পাঞ্জাবী বা পেশোয়ারীও সামনে নেই। আর থাকলেই বা কি, তারা উকিলবাবুর কি খবর রাখে!

মোড়ের কাছে পানের দোকান, মুদির দোকান, খাবারের দোকান রয়েছে। পানওয়ালার কাছে যাওয়াই সোজা। গিয়ে পান কিনলে, বিড়ি কিনলে, দড়ির আগুনে বিড়ি ধরিয়ে নিলে : পানওয়ালার ভিড় একটু হালকা হল।

জিজ্ঞাসা করল—'ভাইসাব, তারাদাসজী কা মোকাম কোন্ তরফ হ্যায়?' মৈত্র তার উচ্চারণ করতে সুবিধা হল না।

পানওয়ালা আঙ্গুল দিয়ে বাড়িটা দেখিয়ে বললে—'কি মিঞাসাহেব, মুক্দমা আছে? ওই বাড়ি, বড়া ভারী উকিল আছে। যাও, মোলাকাত হবে আভি।'

এবারে দ্বিধাভরে সে পৈতৃক বাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকল। চেনা কিছু ছিল কিনা, কোনও কথা মনে করবার চেষ্টার আগেই তার মন অভিভূত হয়ে উঠল। শুধু মনে হল, বাজীকর বলেছিল সেই কবে একদিন দুপুরে সে বাড়ি থেকে নেমে বেরিয়ে গিয়েছিল। সে কবে? সে কি এই বাড়ি? বাবা বেঁচে আছেন? ঠাকুমা? সৎমা? ভাই?

সহসা দেখল, কে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়, আর মুহুরী জিজ্ঞাসা করছে,—'কি মিঞা-সাহেব, উকিলবাবুর সাথ দেখা করবেন?'

আর দ্বিধা করবার সময় নেই, সে মাথা নাড়লে, কিছু বলতে পারলে না। ঘরে নিয়ে গেল মুহুরী।

কর্মব্যস্ত প্রৌঢ় উকিল একবার মুখ তুলে চাইলেন। কাজ সেরে জিজ্ঞাসা করলেন, —'ক্যা মিঞাসাব, কি কাম?'

কি কাজ, কি বলবে? সৌকত চুপ করে রইল। এই বাড়িই তাদের? এই বাবা তার?

কেন চলে গিয়েছিল? কেন ফিরে এল?

উকিলবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন—'ক্যা জী, কেয়া কাম, বোলো। সব ঠিক হো যায়গা, ডর নেহি।'

ডর নেই? ভয় নেই? সব ঠিক হয়ে যাবে? সরল যুবক আশ্বস্ত হল যেন। সে উঠে দাঁড়াল। তারপর আভূমি হয়ে সেলাম করল পিতাকে।

তারপর বললে—'হামি সুকুমার আছে।'

উকিলবাবু বললেন—'কেয়া? সেখ কামাল? আচ্ছা, ঔর বোলো মামলাকে বাত্।'

সৌকত হতবুদ্ধির মতো চেয়ে রইল। বুঝলে তার কথা ও পরিচয় পিতা বোঝেন-নি। সে এবার হিন্দীতেই বললে—'মেরা নাম সুকুমার হ্যায়। আপকো লেড়কা, বেটা, সুকুমার। সেখ কামাল নেহি। আপকা নাম ঔর পতা হামকো মালুম হ্যায়—তারাদাস মৈতর।'

স্তম্ভিত আশ্চর্য হয়ে উকিলবাবু তার মুখের দিকে খানিক চেয়ে রইলেন। তারপর অবাক হয়ে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে মুহুরীকে ডাকলেন, বললেন—'যোগীন, একটা পাগল ধরে এনেছ! যাও যাও, বাহার যাও। নিয়ে যাও একে। হিঁয়া বাউরাকে কাম নেহি হ্যায়।'

সৌকতের তরুণ মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। সে বললে—'হাম বাউরা নেহি—আপকা বেটা সুকুমার মৈতর।'

পাশের পড়ার ঘর থেকে একটি ছেলে উঠে এল, 'কে বাবা? কি বলে?'

উকিলবাবু সৌকতের মুখের দিকে চেয়েছিলেন বিব্রত আশ্চর্যভাবে। বললেন—'কে জানে একটা পাগল ঢুকে পড়েছে চেম্বারে, বলে, আমি সুকুমার মৈত্র, তোমার ছেলে। আচ্ছা বিপদ! আমার কাছারীর দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ছেলে সকৌতুকে তার মুখের দিকে চাইল।

তারপর বাবাকে বললে,—'বলতে চায় সেই হারানো দাদা সুকুমার? বেটা পাঠান!

জোচ্চোর! বেটা ভাওয়াল সন্ন্যাসী হবে ভেবেছ? যাও যাও, ভাগো। নেহি তো পুলিসমে ভেজেগা। নিকালো অভি।'

সৌকত অবাক হয়ে বাপ ও ভাইয়ের দিকে চেয়ে ছিল। উকিলবাবু তার দিকে চেয়েছিলেন।...কার মতো? সে কি কারও মতো দেখতে? সুকুমারের মতো? তার মার মতো? তার মার তো কোন চিহ্ন আর বাড়িতে নেই....।

ছেলে বললে—'যোগীনবাবু, বের করে দিন ব্যাটাকে বাড়ি থেকে। জুচ্চুরির জায়গা পায়নি!'

অন্তঃপুরের দিকের যবনিকার পেছনে থেকে জননী বেরিয়ে এলেন। সহসা সুকুমারের মনে পড়ে গেল চেহারা। সেইরকম কঠিন নিষ্ঠুর মুখের চেহারা। বদলায়নি...। বললেন,—'কে গা? কি হয়েছে? পাগল না চোর? মেরে বিদায় কর খোকা।'

মুহুরী সুকুমারের হাত ধরে গেটের বাইরে পথে নামিয়ে দিল।

ক্ষোভে বেদনায় অপমানে আহত হয়ে সৌকত হাওড়া স্টেশনের মুসলমান সরাইখানায় ফিরে এল।

তাকে ওরা জোচ্চোর ঠক্‌ ভেবেছে, বলেছে। বাপ তবু শুধু পাগল ভেবেছিলেন! তিক্ত দুঃখে সে ভাবতে লাগল, কেন সে এল? কেন তাকে বাজীকর পাঠাল?...কেন সে ছেলেবেলায় চলে গিয়েছিল? ওই বিমাতার ভয়ে, না মারের ভয়ে, না শিশুকালের অল্প বুদ্ধির বশে?...এই বাড়ি ঘর পিতা তার ছিল? কেন গেল? কেন আবার এল? শুকনো চোখে সে সরাইখানার জনতার দিকে চেয়ে থাকে, তার দেশ, তার দেশেরই লোক এরা!

সন্ধ্যা হয়ে এল, পাঞ্জাব মেলের সময় হয়ে এল। ফিরে যাবে কি? না, আবার একবার কাল পিতার কাছে যাবে। না পিতার কাছে নয়, মুহুরীর কাছে যাবে। মিথ্যাবাদী হয়ে ফিরে যাবে না।

সৌকত পরদিন সন্ধ্যার পর অন্ধকারে গেটের বাইরে দাঁড়াল। মুহুরী ভেতরে কাজ করছিলেন। ভেতরে ঢুকতে সাহস নেই। পিতাকে ডাকতেও সাহস হল না।

মোটরে করে পিতা কোথায় চলে গেলেন বিমাতা ও অন্য ছেলেদের নিয়ে। মুহুরী কাগজপত্র বগলে করে চাদর গায়ে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল। সৌকতকে দেখে থমকে দাঁড়াল সংশয়ে ভয়ে।

বললে—'কেয়া মিঞাসাব? চলা যাও, কোই দেখেগা তো থানামে ভেজেগা।'

—'বাবু, হাম সুকুমার হ্যায়। আপকো ইয়াদ হ্যায়? আপনি আমার কথা শুনুন দয়া করে একটু।'

মুহুরী পথে নেমে এল। বললে—'বলো তোমার বাত।'

সুকুমার বাজীকরের কাহিনী তাকে সব বললে। তারপর বললে,—সে কালই ফিরে যেতো, কিন্তু তাকে ঠক্‌ জোচ্চোর ভেবেছে, বলেছে ওরা। তাই সে আর একবার বলতে এসেছে সে মিছে কথা বলেনি।

মুহুরী বহুদিনের লোক—তারাদাসবাবুর বাড়ির সব ঘটনাই জানে। তার পানে চেয়েছিল। কথা শুনে সে সুকুমারের হাতটা ধরে বললে,—কিছু নিশানা আছে তোমার?

সৌকত বললে—'না, শুধু ইমান আছে। আর খোদা আছেন।'

মুহুরী বললে—'ভাইসাব, কোই নেহি মানেগা তোমারা বাত।' তারপর হাতটা মুঠো করে ধরে বললে—'তুমি ফিরে যাও সেখানেই। এরা তোমাকে তাড়িয়ে দেবে। আমার

মনে হচ্ছে তুমি সুকুমার। তোমার ছেলেবেলার মুখটা আমি ভুলিনি। এখনো তোমাকে পাঠান মনে হয় না। ফিরে যাবে, খরচা আছে? কিছু খাবে সুকুমার? কিছু খাও না?'

সৌকতের চোখে জল এল। সে ঘাড় নাড়লে। খাবে না। শুধু বললে,—'শুধু উকিল-সাহেবকে বলবেন আমি সুকুমার, তার লেড়কা, ঠক্ বদমাস নয়।'

মুহুরী তার হাতের মুঠোয় দুখানা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিলে। তার সেদিনের রোজগার। বললে,—'কিছু মিঠাই খেয়ো। আমিও তোমার চাচা হই।'

ফ্রনটিয়ার মেল বিকালের দিকে এসে পেশোয়ারে থামল। ট্রেনের শব্দ ঘুরে ঘুরে গ্রামের লোকের কানে পৌঁছয়। বহুদূর থেকে বাঁশি শোনা যায়। মেহের ও বাজীকর শব্দ শোনে উৎকর্ণভাবে। আসার সময়ও শোনে, যাবার সময়ও শোনে।

আটদিন আগে সৌকত গেছে। বাজীকরের জ্বর সেরেছে, কিন্তু সে বিছানা ছেড়ে ওঠে না, ভালো করে খায়ও না। মেহের আর মেহেরের মা সারাদিন ঘরের কাজ করে, গরু মহিষকে জাব দেয়। জাবনা কাটে। ভুট্টার জনারের বোঝা নিয়ে আসে। কে আনবে? এখন তো আর সৌকত নেই। মেহের জোয়ান মেয়ে, একলা যায় না। মা মেয়ে দু'জনে যায় ক্ষেতে। মাথায় করে বোঝা নিয়ে ফিরে আসে।

বেলা পড়ে এসেছে। রৌদ্রের দীপ্তি আছে, দাহ কমেছে। মা ও মেয়ে ওরা ক্ষেতে গেছে। সহসা মেহেরের মার মাথা থেকে কে বোঝা নামিয়ে নিলে।

—'কে রে!' বলে বিস্মিতা মেহেরের মা পিছন ফিরে চাইল। ততক্ষণে মেহেরের চোখ অবধি ঝুলে পড়া ভুট্টার গাছের বোঝা মাথা থেকে নেমে গেছে। সব একত্র করে বাঁধা হচ্ছে। নিচু মুখে কে বাঁধছে।

—'কে কে, কোন্ হ্যায়?'

—'আরে ভাইজান? মেরা ভাইজান। আম্মা, ভাইজান আ গিয়া।' অবাক আনন্দে মা ও মেয়ে উজ্জ্বল হাসিমুখে সজল চোখে কয়েকদিন আগে চিরকালের মতো হারানো সৌকতের মুখের দিকে চাইল। সত্যি সৌকত? সত্যি সে ফিরে এসেছে?

বোঝা মাথায় নিয়ে সৌকত বললে,—'চল্, ঘরে চল্।'

মেহের হরিণের মতো ছুটে কোন্ পথ দিয়ে কেমন করে ঘরে পৌঁছল, পিতার খাটিয়ায় বিছানার কাছে। চোখে জল, মুখে হাসি। বললে,—'বাপজান, ভাইজান ফিরে এসেছে।'

বাজীকরের অনাসক্ত রুগ্ন মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল।

সৌকত এসে বোঝা নামাল। বৃদ্ধ বাজীকর উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বললে—'বেটা, এসেই আমার ঘরের বোঝা তুলে নিয়েছ! খোদা মেহেরবান্।'

সৌকত কপালে হাত দিয়ে সেলাম করে বললে—'জী চাচাজান্, খোদা মেহেরবান্। তোমার কাছেই আমাকে ফিরিয়ে দিলেন...।'

একবার সহসা অট্টালিকাবাসী পিতার বিব্রত দ্বিধাময় মুখ, বিমাতার কঠিন নিষ্ঠুর মূর্তি, ভাইয়ের তীক্ষ্ণ শ্লেষময় হাসি আর মুহুরীর করুণাভরা চোখ মুহূর্তের জন্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

পরক্ষণেই কালো অনতি-উষর ভুট্টা-গমের ক্ষেতভরা শস্য, বাজীকরের মাটির ঘর আর রুগ্ন করুণ স্নেহময় দৃষ্টির কাছে তারা নিষ্প্রভ হয়ে মিলিয়ে গেল।

সংহতি, বৈশাখ ১৩৬৫

ধান

ধানক্ষেত একেবারে ভরে গেছে। কালু শেখের ছ-সাত বিঘা ক্ষেত্রের শ্যামা জননীর পীত অঞ্চলে যেন আর ধান ধরে না। কালু শেখের সাত বিঘে, তার ভাই মণি শেখের তিন বিঘে। তারপর গ্রামের আর সকলের, কারু বেশি, কারু কম। সিধু মোড়লের ধান-জমি কালুর সীমানার পাশেই।

কালু এসে দাঁড়াল ক্ষেতের পাশে। তারপর চলতে চলতে তার ঘরের সামনে গ্রামের মাঝে এসে পড়ল।

ঘরের দুয়ারে শিকল দড়ি দিয়ে বেশ শক্ত করে বাঁধা, যেমন করে বেঁধে রেখে চলে গিয়েছিল। কালু উন্মনভাবে এদিক ওদিক তাকাল। তার ভাইয়ের ঘরও সেইভাবেই শিকল টানা আর কাঠি দিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা। কালু ক্লান্তভাবে দাওয়ার ওপর বসল। তাহলে কি তারা আসেনি? মাথাটা যেন কেমন হয়ে গেছে। মনে হল, বিষম তৃষ্ণা পেয়েছে।

খানিক বসে থাকার পর তার হঠাৎ মনে হল, হয়তো বাড়ির সবাই এসেছে, অন্য জায়গায় কিছু কাজে গিয়ে থাকবে। কিন্তু ঘরের দাওয়ার ধুলোর ওপর পায়ের দাগ একটিও পড়েনি। কয়েক মাসের মধ্যে মানুষের গতিবিধি হয়েছে সেখানে এমন মনে হয় না। কিন্তু মন সে কথা ভাবতে চায় না। কালু উঠে দাঁড়াল। যদি ঘরে কলসি থাকে জলের, তা হলে একটু জল এনে খাবে, তারপর জল ভরে রেখে তাদের ওপাড়া থেকে ডেকে আনবে। একটু রান্নার যোগাড় করতে পারে যদি কারুর কাছে দুমুঠো চালের যোগাড় করে। ক্ষেতের দিকে চেয়ে তার চোখে জল এল। কি দুর্দিনই গেছে, দীর্ঘ চার মাস ধরে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, জোয়ান ছেলে হবিব, তাদের মা, হবিবের বউ— আট-নজন পথে পথে ঘুরে— তারপর ছোট ছোট তিনটি শিশুর মৃত্যু ; হবিবের বউয়ের একটি মৃত সন্তান হয়ে জ্বরে ভুগে খেতে না পেয়ে অর্ধমৃত অবস্থা। তারপর হঠাৎ তারা কোন্‌দিকে কিভাবে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেল, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, বুড়ো কালু শেখ তো জানে না। কালুর বিবির কাছেই ছিল দুটি ছেলে—জমির আর ফকির। হঠাৎ দেখলে, তার সঙ্গে যেন তারা নেই। কলকাতার পথে পথে কদিন ধরে খুঁজে তাদের পায়নি। লরী ভর্তি করে লোক নিয়ে গেছে, লোকে বললে। কোথায়, তা কেউ বলে না। কালু ভাবলে, হয়তো তারা দেশেই সকলে এসেছে। কথা তো তাই ছিল, ধান পাকলে দেশে ফিরবে। তারা এলেই কালুও দেশে ফিরবে। কথাই ছিল, এই কটা মাস কোনক্রমে ভিক্ষে করে প্রাণটা বাঁচালে আল্লা আর কোন অভাব রাখবে না।

কালুর চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। ক্ষেতের দিকে চেয়ে সে চোখ মুছতে লাগল। উন্মনভাবে বিড়বিড় করে মুখে বলে, 'বাবা-মায়েরা, বহুত ধান হয়েছে। তোরা একমুঠো ভাত চোখে দেখতি পেলি না বাপ। আজ ভরপেট ভাত খেতে দিতাম বাপ।' কালুর ঝাপসা চোখের সামনে সমস্ত ক্ষেত মিলিয়ে গেল, কেবলই ছোট ছোট তিনটি বালকবালিকার শীর্ণ কঙ্কাল তনু ভেসে ভেসে আসতে লাগল। শহরে এত ভিক্ষান্ন মেলেনি, এবং অন্ন তো দৈবাৎই মিলেছে, তাদের সকলের তো প্রায়ই, শিশুগুলিরও পেট ভরেনি। শিশুগুলিকে বহু আশ্বাস দিয়ে নিজেরা বহু আশা করে দিনের পর দিন ওঁরা পথে পথে বেড়িয়েছে, যদি কোনরকমে এই কটা মাস বাঁচিয়ে রাখা যায় তা হলে আবার সব হবে। তারপর—

কালু ঘরের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো। না, তারা কেউ এখানে আসেনি। জলের কলসি, ধান-চালের জালা, হাঁড়িকুড়ি ধূলায় ধূসরিত। মেঝেতে বহু ইঁদুরের গর্ত।

মাটি কুরে কুরে ঘরখানা ক্ষতবিক্ষত করেছে তারা। কালু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কলসিটা নিয়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে গেল।

চৌধুরীদের বড় পুকুরে জল নিয়ে ফিরবে, আর দেখবে, যদি ওইদিকে কোথাও হবিব তার মাকে বউকে নিয়ে এসে থাকে। তা হলে কদিনের জন্যে চারটি চাল যোগাড় করুক। তারপর? আর এবারে অন্নের দুঃখ খোদা রাখেননি।

চৌধুরী-পুকুরের আশপাশে ঘাটে আঘাটায় কয়েকজন জল নিতে, স্নান করতে এসেছিল।

কালু কলসি নিয়ে নিজেদের ঘাটের দিকে গেল।

অন্য ঘাট থেকে পতিত রুইদাস জিজ্ঞাসা করলে, 'কালু শেখ আইলে নাকি? ভাল সব?'

কালু কলসি রেখে বললে, 'হাঁ ভাই, আলাম তো। হবিবরে দেখেছ নাকি?'

পতিত স্নান করছিল, সে বললে, 'না ভাই। সবাই এসেছ তো? তোমার ক্ষেতে খুব ফসল হয়েছে ভাই। আর দেখ না, সব ক্ষেতেই কি ফলন ফলেছে!' একটু নিঃশ্বাস ফেলে তারপর বললে, 'শুধু দেশে আর মানুষ নাই।'

পতিত স্নান করে চলে গেল।

কালু মাথায় মুখে খানিক জল দিয়ে চুপ করে বসে রইল। তা হলে এরা হবিবদের দেখেনি!

খানিকটা জল খেয়ে কলসিটা ভরে কালু ঘাটের ওপর একটু ছায়া দেখে বসল।

আশেপাশে এঘাটে ওঘাটে প্রায় জনহীন গ্রামের কয়েকটি লোক স্নান করতে এল। কেউ তারা কালুকে চেনে, কেউ চেনে না ভাল করে। অনাথ আতুরের মত কালুর চেহারা হয়েছে, চেনাও শক্ত। কালু ভাবতে লাগল, একবার সিধু মোড়লের বাড়িতে খোঁজ করবে, সে হয়তো জানে হবিবের খবর। বেলা পড়তে আরম্ভ করে। কালু ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়াল।

সিধু মোড়লের ঘরখানা কালুর ঘরের খানিকটা পেছনের দিকে। তার ঘরের দুয়ার খোলা। আঙিনায় একটা শীর্ণকায় গরু, তার বাছুরটা নেই কোথাও। সিধুর একটা কুকুর ছিল, সেটা এখন যেমন হ্যাংলা তেমনি খেঁকি। কালুকে দেখে ঘেউঘেউ করে এল। আঙিনায় জঙ্গল ভরে গেছে। দাওয়ার ওপর বহুকাল লেপা পড়েনি।

কালু ডাকলে, 'সিধুভাই, ঘরে আছ?'

ঘরের মধ্যে থেকে অতি ক্লান্ত স্বরে জবাব এল, 'আছি, কে তুমি? উঠে এস, আমার জ্বর।'

কালু ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, 'আমি কালু শেখ, ভাই। তুমি জ্বরে পড়ে আছ? ভাই, হবিবের মারে—ওদের দেখেছ? এখানে আইল নাকি? তোমার কাছে এখানে কেউ নেই? সবাই কোথায়? খুব ধান হয়েছে তোমার ক্ষেতেও দেখলাম।'

কঙ্কালসার সিধু একবার উঠে বসবার চেষ্টা করলে, পারলে না। কোটরে বসা চোখ-দুটোয় জল চকচক ক'রে উঠল। একটু পরে শান্তভাবে ধীরে ধীরে বললে, 'হ্যাঁ ভাই, ধান হয়েছে। রামের খুব অসুখ করল—জ্বর পেটের অসুখ, তার মায়েরও জ্বর হল। তারপর তারা দুজনেই আমায় ফেলে চলে গেল।' সিধুর চোখের কোলের জল দু'ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল। 'ভাই, পাকা হাড়ে খুব সয়, তাই আমি জ্বরে ভুগেও, না খেতে পেয়েও টিকে আছি। ওরা সইতে পারলে না।'

কালুরও চোখে জল পড়ছিল। সে বললে, 'হ্যাঁ ভাই, আমারও তিনটা বাচ্চারে কলকাতাতে রেখে আলাম—ফতি, আয়েষা, সোনা। তারা খিদেতে শুকিয়ে গেল ভাই—

ভাতের জন্যি। আর এত ধান—'

দুজনেই নীরব হয়ে গেল। ঘরের সামনে থেকে দেখা যায় সিধু মোড়লের ধানের ক্ষেত ফসলের ভারে নুয়ে পড়েছে। সিধু জিজ্ঞাসা করলে, 'আর সবাইরে নিয়ে এসেছ?'

কালু শেখ উঠে দাঁড়াল, বললে, 'গেরামে তাদের দেখতি পাব মনে ভেবে আলাম তো। তারা যে কমনে গেল! খুঁজে দেখি। তোমাদের দিকে আসে নাই?'

সিধু বললে, 'না তো। তোমার বিবিরে কি ছাওয়ালদের তো এদিকে দেখি নাই, তা আমি তো জ্বরে শুয়ে পড়ে, দেখি মেয়েটা ছেলেটাকে ফিরলে শুধুব, তারা জানবে হয়তো।'

কালু শেখ উন্মনভাবে সারা বেলা অনাহারে তাদের গ্রামে হবিবদের আর তার মাকে খুঁজে বেড়াল। না, তারা এ গ্রামে আসেনি। দুমুঠো চাল এনে সন্ধ্যাবেলা সিধু মোড়লের মেয়ে বললে, 'কালুকাকা, দুটো রেঁধে খাও আজ। এক মুঠো খেয়ে কাল আবার ভিন্ গাঁয়ে দেখো, হয়তো আসতেছে। পথ চিনতে দেরী নাগে তো।'

পতিত রুইদাসও তাই বললে। গ্রামের ঘর বেশিরভাগই শূন্য, কোঠা-বাড়িতেও লোক যেন নেই, চেনা পথের মাটিতে পায়ের দাগ যেন গুনে নেওয়া যায়—এত কম। গরু বাছুর বলদও নেই, লোকে বেচে দিয়ে চলে গেছে। যারা কিছু ধান রাখতে পেরেছিল লুকিয়ে চুরিয়ে, তারাই পড়ে আছে, হয়তো বেঁচেও আছে। বাকি সব পালিয়ে গেছে, চলে। বেঁচে আছে? কেউ জানে না! আর ফেরেনি।

কালু কোনক্রমে দুটো রাঁধে। মুখে গ্রাস ভাল করে ওঠে না। মনে হয়, হয়তো তারও কবিলা নেই, আর জমির ফকির—কচি ছেলেদুটো? সিধু মোড়লের কথা মনে হয়, পাকা হাড়ে খুব সয়। তার মন হুহু করে ওঠে, চোখে উচ্ছ্বসিত হয়ে জল আসে। অবশিষ্ট ভাতগুলি সিধুর গরুর কাছে কুকুরের কাছে ঢেলে দিয়ে ওদেরই দাওয়ার পাশে শুয়ে পড়ে। বললে, 'লক্ষ্মী, শূন্যি ঘরে যেতে মন সরছে না মা, আজ তোদের ঘরকে হেথায় পড়ে থাকি।'

লক্ষ্মী ম্লানভাবে হেসে বলে, 'শোও তাই, একখানা মাদুর দিই।' কার্তিকের রাত্রের মাঠের কনকনে হিম ছেঁড়া কাপড়ে বাধা মানে না। কালুর ঘুম শীতেও আসে না, ভাবনাতেও আসে না।

রাত্রি শেষ হবার আগেই মন আশান্বিত হয়ে ওঠে। সত্যি ভিন্ গাঁয়ে—ওই পাশের গাঁয়ে হয়তো এসে জিরুচ্ছে তারা। খাওয়া নেই কতকাল, হয়তো জ্বরে পড়েছে, হয়তো কমজোর হয়ে গেছে। কালু ছেঁড়া কাপড়টা টেনেটুনে গায়ে দিয়ে প্রভাতের আগেই পাশের গ্রামের দিকে যায়।

সে গ্রামের প্রায় সকলেই অচেনা মানুষ, সেখানেও যেন নেই। কাকে জিজ্ঞেস করবে, কে তাদের চেনে, কেবা ওকে চেনে, কিছুই যেন বোঝা যায় না।

অখাদ্য আহারে কঙ্কালসার রোগা জীর্ণকায় এক-একজনকে দেখে কালু জিজ্ঞেস করতে যায়, কি জিজ্ঞাসা করবে যোগায় না। হতবুদ্ধির মত গ্রামের পথে পথে খুঁজে খুঁজে ঘুরে বেড়ায়। তারা পাঁচজন—হবিব, তার মা, বউ, ছেলে দুজন। যদি একজনকেও দেখতে পায়!

গ্রামে কোঠাবাড়ি নেই বললেই হয়, কাঁচা ঘর প্রায় খালি, যারা আছে তাদের দেখলে মনে হয় আর অল্প কয়েকদিনের জন্যেই আছে। গ্রামের আশপাশের ক্ষেতে কিন্তু ফসলের ভারে হেলে পড়ছে। কিন্তু এখনও যারা বেঁচে আছে, পথে উঠে বসেছে, তাদের কারও দৃষ্টি উদাসীন, কারু বা হতবুদ্ধি, আতঙ্ক-অভিভূত। ফসল? ফসল কার? তাদের লোকেরা কি ছিনিয়ে নিতে আসবে না আর? আর ফসল কে খাবে? কে কাটবে? খাবার লোক,

অতিপ্রিয়তম যারা, তারা অনেকেই যে নেই! কাটবার জন্যে যারা আছে তাদের শক্তিও নেই, আর প্রয়োজনবোধও নেই ; শোকে রোগে ভয়ে ভাবনায় জড়ের মত হয়ে আছে। সকালে একবার শুধু গ্রামে পথে উঠে আসে। তারপর ফিরে গিয়ে জীর্ণ খড়-ছাওয়া কুটিরখানিতে গিয়ে বসে থাকে। বিকালের দিকে হয়তো জ্বর আসে, ছেঁড়া কাঁথাখানা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে।

কালু এ-গ্রাম ও-গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। ভদ্রলোক কারুকে দেখলে কাছে গিয়ে সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়ায়। সকলে ভয় পায়, পাছে ভাত চায়, খেতে চায়। কালু বলে, 'না বাবুমশায়, খেতে চাচ্ছি না, মোর কবিলারে ছাওয়ালদেরকে খুঁজতে আলাম এধার পানে, মোরা মোছলমান।' সে অন্ন চায় না, আশ্রয়ও চায় না, শুধু ছত্রভঙ্গ সঙ্গীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। আজ আর অন্ন আশ্রয়ের অভাব তার খোদা রাখেননি। কেউ সহৃদয়ভাবে বলেন, 'না বাপু, মোছলমান দেখিনি কারুকে এ গাঁয়ে।' কেউ বিরক্ত হয়ে বলে, 'শোন কথা ব্যাটার, ওর কবিলা কোথায় আমরা তার হিসেব রাখি যেন।'

কোনদিন আশপাশের গ্রামেই পড়ো ঘরের দাওয়ায় শুয়ে পড়ে, কোনদিন গ্রামে ফিরে আসে। এমনই করে দশ-বারো দিন গেল। পাশাপাশি কলুদের ক্ষেতের, সিধু মোড়লের ক্ষেতের, পতিতের ক্ষেতের সকলের ক্ষেতেরই ধান পেকে উঠল। সিধুর ছেলে নিতাই দু-একজন আপনজন ডেকে জড়ো করে ধান কাটতে আরম্ভ করলে।

কালু উদাসীন নির্বোধের মত ওদের দাওয়ার একপাশে বসে থাকে নিজের ক্ষেতের দিকে পিছন ফিরে।

এখন সিধু কোনক্রমে শরীর টেনে নিয়ে তার পাশে এসে বসতে পারে। বলে, 'ভাই, তামুক খাও।' কলিকাটি হুঁকা থেকে নামিয়ে দেয়।

কালু কলিকাটি হাতে নিয়ে বসে থাকে। তারপর ফুঁ দিয়ে টানতে গিয়ে তার চোখ জলে ভরে যায়। কলিকা নাবিয়ে রাখে।

সিধু বললে, 'কি হল ভাই, বিষম খালে?'

কালু চোখ মুছে বলে, 'কি জানি।'

কালু বসে বসে দেখে। লক্ষ্মী খুঁজে-আনা সঙ্গিনী জড়ো করে ধান মাপে, ঝাড়ে-তোলে। নিতাইয়ের ক্ষেতের কাজ শেষ হয়ে এল। এবার একদিন সন্ধ্যাবেলা নিতাই বললে, 'কালুকাকা, আমার কাজ হয়ে এল। এবারে তোমার খ্যাতে নাগব সবাই, কাল বাদে পরশু নাগাত।'

কালু অবুঝের মত নিতাইয়ের পানে চাইলে।

সিধু ঘর থেকে বললে, 'হ্যাঁ, দশে মিলে কাজ করলে, তোমারও কাজ উঠে যাবে ভাই, ভাবছ কেনে?'

কালু এবারে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললে।

ধান কাটা হয়ে উঠবে কি না, তার কাজ উঠবে কি না, কালু ভাবেনি। সে ক্ষেতের দিকে আর চাইতেই পারেনি। কালু কিছু ভাবতেই আর পারেনি।

দুটি কিশোর তরুণ-বয়স্কের, তাদের বাপেরও চোখ শুকনো রইল না। কালুর কান্না সিধুর শোক জাগিয়ে তুলল। কিন্তু সিধুর ঘরে এখনও নিতাই আছে, লক্ষ্মী আছে। আবার ধীরে ধীরে তার সমস্ত দুঃখের ক্ষতে প্রলেপ পড়বে, আবার হয়তো এই আঙিনা ভরে নিতাইয়ের লক্ষ্মীর কোলের শিশুদেবতার পায়ের চিহ্ন পড়বে। নিতাইয়ের জননীর কথা, রামের কথা তারা জানবে না, সিধুও হয়তো তাদের মধুর হাসি-কাকলির কলশব্দে আজকের গ্রামের জনহীন এই নিস্তব্ধ ভয়াবহ দুর্দিনকে ভুলে যাবে।

চোখ মুছে লক্ষ্মী বললে, 'কালুকাকা, কেঁদো না। কাকী বুড়ো হয়েছে, হয়তো হাঁটতে

পারে না তেমন। আর হবিবভাই তো সঙ্গে আছে। তুমি আজ দুটি রেঁধে খাও, কাল আবার খুঁজতে বেরিও। ওরাও তো জানে ধান কাটার সময়। ওরা আসবেই ফিরে।'

নিতাই বললে, 'হ্যাঁ, তাই কর। তুমি ফিরে এলে আমি তোমার ধান কাটতে শুরু করব।'

সিধু বললে, 'তখন যদি গাঁ ছেড়ে না যেতে ভাই। তা হলে আর এমন হত না।' কালু চোখ মুছে নীরবে বসে রইল।

নিতাই বললে, 'ঘরে যদি খাবার চাল থাকত, তা হলে কি আর লোকে যেত বাবা! এমন করে গাঁ লক্ষ্মীশূন্যি করে দিলে যে—'

নিতাই চুপ করে গেল। চোখের সামনে যেন ভেসে এল উর্দি-চাপরাস-পরা সরকারী লোকের শোভাযাত্রা। লোক সভয়ে আঙিনায় গোলার পাশ থেকে সরে দাঁড়াল, বীজধানের জালা খুলে দেখিয়ে দিলে। কেউ বা কয়েকটা টাকা পেলে, কেউ বা পেলে না। কি জন্যে কি নীতিতে গ্রাম লক্ষ্মীশূন্য অন্নহীন হয়ে গেল একদিনের মধ্যে, তা আজও নিতাই জানে না। দু-এক ঘর গৃহস্থ শুধু ধান চাল রাখতে পেরেছিল। তারা নিসপেকটার সাহেবের কাছে সেলাম করতে গিয়েছিল। নিতাইরা তাদের কাছেই ধার চেয়ে ক্ষেত বাঁধা দিয়ে আজও মরেনি। নইলে ওরাও গাঁ ছেড়ে যেত না কি? তবু তো মা গেল, ভাই গেল।

দুখানি ইট দিয়ে উনান করে লক্ষ্মী বললে, 'কালুকাকা, এইখানেই দুটি ভাতে-ভাত করে নাও।' কালু হতবুদ্ধির মত লক্ষ্মীর নির্দেশমত ভাতে-ভাত বসিয়ে দিলে ওদেরই গোয়ালে। লক্ষ্মীদের ঘরে সকলের খাওয়া হল। কালুর ভাতে-ভাত সিদ্ধ হয়ে গেল। রাত্রি গভীর হয়ে আসতে লাগল। সিধু রোগা মানুষ, তার ঘরের আগল বন্ধ করে লক্ষ্মী বললে, 'কালুকাকা, খেয়ে এসে আজ ওই পাশের ভাঙা ঘরখানায় শোও। বাইরে বড় ঠাণ্ডা। আর রাত করো না।'

দেয়ালে ঠেস দিয়ে কালু মূঢ়ের মত চুপ করে বসেছিল। শুধু বললে, 'আচ্ছা, তুমি শোও গা মা।'

রাত্রি গভীরতর হল। রাত্রি কত প্রহর হল ওরা বোঝে ঘড়ি না দেখেই। কালু নিদ্রাহীন দৃষ্টিহীন চোখে আকাশের সীমান্তে চেয়ে রইল। মনে আসে তিনটি শিশু বালক-বালিকার কথা। গত বছরের কথা, তারপর হবিবের মা, হবিব, ফকির, জমির, বউ, ভাইদের বাড়ির সকলের কথা ; সকলেই ছিল তারা। ধান কাটা, ঝাড়া, তোলা, তাদের কত কাজ, কত আনন্দ! চৌধুরী-বাড়ি 'লবান্নর' (নবান্ন) জন্যে নতুন ধান কুটে চাল দিয়ে আসে হবিবের মা। তেনারাও তারে নবান্ন দেয়—কাঁচা চাল দুধ গুড় ফল সন্দেশ, তারা খেয়েছে সকলে। আর এবারে তারা কেউ নেই। ধান? ওরা কাটবে বলেছে। কিন্তু কি করবে কালু ও ধান নিয়ে? কে খাবে? কাদের খাওয়ার জন্যে ও ধান কাটবে? কোন সময় খেঁকিটা কালুর ভাত কটি উনান ঠাণ্ডা হলে খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সেইখানেই ঘুমিয়েছে।

অকস্মাৎ পূর্বদিক রাঙা হয়ে উঠল। কালু সোজা হয়ে বসল। তারপর আস্তে আস্তে দাওয়া থেকে নেমে গেল। সরু পথের দুধারে ওদেরই ক্ষেতের ফলন্ত ভারী ধানের শিষ নুয়ে এসে তার গায়ে লাগে—যেন সাপের স্পর্শের মত তার সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। চোখে আকুল হয়ে জল আসে। সে অভিভূতের মত দ্রুতপায়ে ক্ষেতের সীমানা, গ্রামের সীমানা অতিক্রম করে যেতে চায়। কিন্তু কোথায় খুঁজতে যাবে? মহানগরীর মানুষের অরণ্যেই কি কোথায় তারা হারিয়ে গেল? অথবা—? অথবার কথা কালু ভাবতে পারে না। দূরে বহুদূরে মানুষ দেখে। মনে হয়, ওরা কি জানে তাদের কথা, হোক অচেনা, হয়তো জানে। হয়তো ওদের মাঝেই হবিবকে, জমিরকে —একজনকেও দেখতে পাওয়া

যাবে।

সরকারী খাদ্য-বিভাগের কর্মচারীরা এসে দেখছিল, কোন গ্রামে কত ধান হয়েছে।

গাছে ঠেস দিয়ে সাইকেল রেখে খাকি সুট পরা দু-তিনটি লোক পতিত রুইদাসের ক্ষেতের পাশে এসে দাঁড়াল। এই নতুন ধানের শিষের মত নধর হৃষ্টপুষ্ট গোল সবল চেহারা, পরস্পরের মধ্যে বললে, 'বাঃ, চমৎকার ফসল হয়েছে তো।'

পতিত ধান ঝাড়ছিল, আতঙ্কে তার হাতের কাজ থেমে গেল।

খাকি-পরা একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'এ ক্ষেত কার, তোমার?'

সভয়ে পতিত বললে, 'আজ্ঞে ।'

'ওটা?' সামনে সিধু মোড়লের ক্ষেতের সামান্য ধান মাপা বাকি ছিল।

ওটা সিদ্ধেশ্বর মোড়লের।

এবারে পতিতের আশেপাশে কয়েকজন জড়ো হল—নিতাই, লক্ষ্মী, পতিতের ভাই, তার লোকজন।

'আর ওটা? ওটা যে কাটাই হয়নি, কার?'—ঠিক নাকের নীচে কাঁঠালে মাছির মত করে গোঁফ ছাঁটা একজন জিজ্ঞাসা করলে।

নিতাই বললে, 'ওটা কালু শেখদের।'

'কাটেনি যে?'

'তারা হেথায় নেই। তারা চলে গিয়েছিল মন্বন্তরের সময়—', পতিত বললে।

'মস্ত ক্ষেত যে, কতজন তারা?' একজন পকেট থেকে নোটবই পেন্সিল নিয়ে লিখে নিচ্ছিল কি সব।

'তা উনিশ-কুড়িজন হবে। কালু শেখ, তার বউ, তার চার ছেলে দুই মেয়ে, এক ছেলের বউ, তার ভাই মণি শেখের দুটো পরিবার, তাদের সাত-আটটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।'—নিতাই বললে।

আশ্চর্য হয়ে মাছি-গোঁফওয়ালা বললেন, 'কেউ নেই তারা? কেউ ফেরেনি? এত ধান হয়েছে, কাটবে না?'

নিতাই বললে, 'কালু শেখ এসেছিল, চারদিন হল তাকে আর দেখছি না। মণি শেখের মোরা কোন খবর জানি না। বর্ষার সময় গাঁ ছেড়ে চলে গিছল তারা।'

অন্নাভাবে পলাতক মারীতে উজাড় জনহীন গ্রামে তাঁদেরই হাতে রোপণ করা শস্যভারানত ক্ষেত্রের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই লোকেরা কি সব লিখে লিখে নিতে লাগল।

কালু শেখের সাত বিঘে, মণি শেখের তিন বিঘে, পীতাম্বর কুমোরের দু বিঘে, সরস্বতী মাইতির খানিকটা ক্ষেত, সোনা বাউরীর আর কার সঙ্গে ভাগের ধান-জমি, আরও কার কার সব নাম লেখা হয়ে গেল। শুধু তারা যে কোথায় গেছে বা আছে লেখা গেল না।

খাকি-পরা তারা জিজ্ঞাসা করলে, 'এদের তোমরা চেন?'

পতিত নিতাই হাতজোড় করে বললে, 'হাঁ বাবু, এক গেরামে বাস ছোট-কাল থেকে। চিনি বইকি।'

'বেশ।'

তারপর তারা সাইকেল চড়ে পাশের গ্রামের দিকে চলে গেল। সুরু সুঁড়িপথের আশেপাশে তাদের সামনে পিছনে প্রায় জনশূন্য গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাবার পথে সোনার শিষে ভরা ধান নুয়ে নুয়ে পড়তে লাগল। যেন কাদের জন্য তাদের আর মিনতির শেষ নেই।

শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৫১

ভাত

ভাত ফুটছিল টগবগ করে। আর উনুনে জ্বাল ঠেলে দিচ্ছিল খোকার মা। বনজঙ্গল থেকে সংগ্রহ-করা কাটকুটো, শুকনো পাতা নারকেল পাতার বালদো—যা কুড়িয়েবাড়িয়ে ছেলেমেয়েরা ঘরে এনে রেখেছে।

ঝি চারদিন কামাই করেছে। মা পাঠালেন, যা আজ ডেকে সঙ্গে করে নিয়ে আয়। বাড়ি কাছেই। কাজেই কলেজ থেকে ফিরেই যেতে হল।

খোকার মা আমাকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বললে, 'দিদিমণি, পেরথমে হল আমার জ্বর। তারপর খোকাটার জ্বর হল। আজ এই কোলের কচিটার পেট খারাপ হয়েছে—যেতে আর পারিনি। কাল সকালেই যাব।'

আমি বললাম, 'না, আজই একবার চল। সঙ্গে করে নিয়ে যেতে মা বলেছেন। মা আর পারছেন না।'

'তাহলে ভাত কটা নামিয়ে ওদের একমুঠো করে দিয়ে যাই। সকাল থেকে হাঁ করে বসে আছে কখন খাবে বলে।'

জিজ্ঞাসা করি, 'কেন, সকালে রাঁধনি?'

সে বললে, 'সকালে আর কই রাঁধতে পারি। বাসি পান্তা দুটো খায়।'

কথা কইতে কইতে জ্বাল-ঠেলা ভাল করে হয়নি। ভাতের ফুটটা কমে গিয়েছিল। এবারে আবার সে একরাশ শুকনো পাতা কুটো ঠেলে দিলে উনানে। লালরঙের ভাতগুলি আবার টগবগ করে ফুটতে লাগলো।

সে বললে, 'আচ্ছা, তুমি বাড়ি যাও দিদিমণি। আমি যাব'খন ঠিক।'

'না, মা বলেছেন, সঙ্গে করে নিয়ে আসিস। অনেক বাসন পড়ে আছে। কদিনের জমে আছে।'

দাওয়ার ওপর পিঁড়িতে বসে আমি দেখছি ওর ঘর ও ওর রান্না।

ঘরের এককোণে একটা মাটির তেলকো, তাতে একটা কেরোসিনের কুপি বসানো। তার পাশে পা-ভাঙা একটা ছোট চৌকি ইঁটের ঠেকো দিয়ে পা-টা সোজা করে দেওয়া হয়েছে। তার পাশে একটা জীর্ণ কাঠের সিন্দুক। তার ওপর ছেঁড়া কাঁথা কয়েকটা পাট করে রাখা আছে—একপাশে একখানা মাদুর দাঁড় করানো রয়েছে। তার ওপর একটা দড়ির আলনায় রয়েছে গুটি তিন ছেঁড়া ময়লা জামা—একখানি ছোট ডুরে শাড়ি—ওর মেয়ে সোনার। আর একটি ছেঁড়া হাফ প্যান্ট, একখানি ময়লা জীর্ণ শাড়ি, নেকড়া কানি ঝুলছে।

ঘর দেখা হয়ে গেল। ভাবছি কি দিয়ে খাবে। তরকারি তো কুটল না। মাছও নেই। ডালও রাঁধা হয়েছে কিনা দেখতে পাচ্ছি না। আর সব রাঁধতে গেলে তো আরো দেরি হবে। কতক্ষণ বসে থাকব? চলে গেলে হয়তো যাবেই না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর সব কি রেঁধে রেখেছ—ভাত হলেই হবে?'

খোকার মা বললে, 'এই যে, এই শাক কটা ভেজে দোব—তাই দিয়েই খাবে।'

'কই শাক? শুধু শাক দিয়ে খাবে? কেন ডাল করনি? মাছ নেই?'

খোকার মা হাসলে, 'মাছ ডাল কোথায় পাব মা। এ শাক কটা উঠোনে দিয়েছি,

দুটি করে ঐ দিয়েই যা হোক করি। কচুও হয়। ওখানে আছে। ওলও ওঠে মাঝে মাঝে।'

বলি, 'তা হলে দুটি আলু-ভাতে দিলে না কেন?'

খোকার মা আবার হাসলে, 'আলু কি করে কিনব মা।'

ভাবি, কেন, আলু তো আট আনা সের, এখন তো তত মাগগি নেই মার মুখে শুনি। মাছ না হয় দু-তিন-চার টাকা। চুপ করে রইলাম। ডাল? ডাল কত দর জানি না ঠিক। মা-ই তো সব করেন।

ভাত হয়ে এলো। ছেলেরা সবাই কাছাকাছি বসে আছে বড় বড় কচুপাতা পেতে। দু-একখানা এনামেলের কাঁসিও রয়েছে উনুনের কাছে। একপাশে একটা মাটির কড়া আর তার পাশে খানিকটা শাক রয়েছে একটি কচুপাতায়। বড়ছেলে খোকা একটা গামছা প'রে নিয়েছিল আমাকে দেখে। বড় মেয়েটি একটি ছেঁড়া শাড়ির টুকরো পরেছিল। আর তিনটি শিশু একেবারে উলঙ্গ।

ভাত নামল। শাকটা চড়াল মাটির কড়ার ওপর খোকার মা। শীতের বেলা পড়ে আসছে। সাড়ে তিনটে প্রায়। ফেন গালা হল। এক গামলা ফেন।

তাদের মা বললে, 'বোস তোরা, আয় এগিয়ে। ঠাণ্ডা হোক ভাতটা।'

একটা লোহার হাতা করে সে ভাত দিল চারখানা পাতায়। কোলেরটিকে ভাত দেবে না, বললে, জ্বর রয়েছে। কিন্তু সে কাঁদতে লাগল। দু'বছরের ছেলে, সে ভাত খায় রোজ, আজো খাবে।

মা বললে, 'কলাই-করা বাটি দুটো পাত—আগে একটু করে গরম ফেন নুন দিয়ে খেয়ে নে। তারপর শাক-ভাজা দিয়ে ভাত খাস।'

আমি বললাম, 'ফেন কেন দিচ্ছ?'

খোকার মা হাসলে, বললে, 'ফেলে দেব মা অত ফেন? আগে ফেনটা খেয়ে নিলে পেটটা ভরবে। ভাতদুটি সকালের জন্যে রাখতে পারব পান্তা করে। আঠার টাকা মণ চাল কিনি তিরিশ সের মাসে। ঘর ভাড়া দিই তিন টাকা। আর নুনটি তেলটি কখনো চুনোমাছ মসলা ডাল আনাজ কিছু কিনি। তোমাদের বাড়িতে পাই ১০ টাকা, আর দু' জায়গায় কাজ করি, পাঁচ-পাঁচ দশ পাই। তাতে ভাতই হয় না, কাপড় জামা কানি তো হয়ই না। পুজোর কাপড় তিনখানাতে আমার হয়, ওদেরটা চেয়েচিন্তে হয়।'

ছেলেদের ভাত ঠাণ্ডা হয়েছে। ফেনটা তারা বিলিতী বইতে পড়া সুপ খাওয়ার মত চুমুক দিয়ে খেয়ে নিলে, একটু নুন দিয়ে, এখন তারা তাকিয়ে আছে কড়ার দিকে, মার শাক ভাজা হল কিনা!

হ্যাঁ, শাক সেদ্ধ হয়েছে। উঠোন থেকে দুটো লঙ্কাপাতা এনে একটু তেল ছড়িয়ে দিয়ে মা শাকটা নাড়াচাড়া করে নামাল।

মেজ ছেলেটা বললে, 'মা, শুধু শাক বিচ্ছিরি!'

'না বাবা, বিচ্ছিরি কেন? দেখ্ না কেমন ভাল শাক। ঐ দেখ্ লাল টুকটুকে রঙ হয়ে গেল দিদির ভাতের। কেমন লাল রঙ দেখ্ না মেখে। সব ভাতগুলি মাখ একেবারে—সব কেমন লাল হয়ে গেল ঐ!'

খোকার মা আমাকে বলল, 'কালকে পুকুরে নাইতে গিয়ে একটা লেটামাছ কেমন করে খোকা ধরেছিল, তাই কাল একটু রান্না করে দিয়েছিলাম। রোজ কোথায় পাব। যাদের পুকুর তারা মাছ ধরতে দেখলে বকবে। পানু সেই মাছ মনে করে রেখেছে। আজও ভাবছে আছে।'

কলেজে পড়ি। কলেজে ম্যাগাজিনে গল্প কবিতা সবাই লেখে, আমিও লিখি। দুঃখ দারিদ্র্যের কল্পনা করি। পরিকল্পনায় বিলাসও করি। ডিবেটিং ক্লাবে তর্ক করি।

বড় মেয়ে সোনা বললে, 'মা, আর দু'টি ভাত দেবে?'

খোকার মা হাঁড়িটার ভেতর দেখলে। তারপর একমুঠো তুলে দিলে। এবারে খোকা বললে, 'মা, আমাকে দুটি দেবে?'

মা একটু ভেবে বললে, 'আর দোব না, তা হলে সকালে কি খাবি?'

খোকা আর বড় মেয়ে দুজনেই বললে, 'দুটিখানি দাও মা। মোটে পেট ভরেনি।'

আমি বললাম, শুধু ভাতই তো খাচ্ছে—তা দাও না আর দু'টি।'

দ্বিধাভরে মা দু'টি করে ভাত আরও দিলে।

ছেলেদের খাওয়া হয়ে গেল। বেলাও পড়ে আসছে।

'চল দিদিমণি, এবারে যাই, ওদের বিছানাটা করে দিই, শুয়ে পড়ুক। আমার তো কাজ সেরে আসতে রাত হবে।'

কচুপাতা থেকে চেটেপুটে ভাত খেয়ে সতৃষ্ণভাবে হাঁড়ির দিকে চেয়ে ছেলেমেয়েরা আঁচাতে গেল।

খোকার মা খুব ছেঁড়া কাপড়টি ছেড়ে আলনা থেকে অন্য কাপড়টি নিয়ে পরল। বুঝলাম ওটা তার রাজবেশ।

তারপর ঘরের অন্যদিকে মা গুটানো জীর্ণ মাদুরখানা পাতলে, তার ওপর ছেঁড়া ময়লা দু'খানি কাঁথা পাতলে। তেলচিটে নেকড়ায় বালিসদুটো মাথার কাছে দিলে।

ছেলেমেয়েরা এলো। মা বললে, 'সবাই শুয়ে পড়। এবারে আমি কাজে যাই।'

ছোটরা শুলো। বড়রা বললে, 'মা, একটু ছবি দেখি—পরে শোব—এখুনি অন্ধকার হলেই শোব। দেখলাম, আমাদের বাড়ি থেকে পুরোনো ক্যালেণ্ডার আর কয়েকটি ছবির ক্যাটালগ কুড়িয়ে এনেছে ওর মা। ছবি আছে এঞ্জিনের, মেক্যানিকাল কলের সব।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কোথায় শোবে? ঐ দুটো বালিসে সবারই হবে?

খোকার মা একমুখ হেসে বললে, 'হ্যাঁ দিদিমণি, ওখানেই আমার জন্যে একটু জায়গা হবে ছোটখোকার পাশে। আর বালিশ কোথায় পাব, আর নেই!'

তারপর বেরিয়ে আসতে আসতে তাদের বললে, 'শীত লাগে তো কেঁথাখানা ছোটখোকার গায়ে দিস।' আমাকে বললে, 'বালিস ছিল আর দুটো দিদি। তা একটা শাউড়ির মাথায় ছিল মরণকালে, গেল। আর একটি গেল ওদের বাপের সঙ্গে। তা আমাদের ওতেই হয়ে যায় দিদিমণি।' আর কিছু বলতে বা ভাবতে কিন্তু আমিও পারছিলাম না। গল্প পড়ি, লিখি, কাব্য করি দরিদ্রকে নিয়ে। কিন্তু কেমন হতবুদ্ধির মত মনে হল নিজেকে এখন।

শুধু মনে হয়, ওর অভাববোধ। দারিদ্র্যবোধ। তার জন্য ক্ষোভ কিছুই নেই। সামনে দিয়ে একটা রিক্সাওয়ালা চলে গেল। তার জামার একটা হাতা আর পিঠটা নেই দেখলাম। একটা কয়লাওয়ালা গেল, তার পরিধানে শুধু গামছা। তা হলে এই অনুভূতি বা অভাববোধ কি ওদের কারুরই নেই? জীবনে আজই যেন প্রথম ওদের দেখলাম।

বাড়ি এসে পড়েছি। মা বকবার জন্যে মুখিয়ে ছিলেন। বললেন, 'এত দেরি করলি? কি করছিলি ওর বাড়িতে বসে? আর খোকার মা, কি কাণ্ড বাছা, এমনি করেই কামাই করে? বোস্, বোস্ বাসনে। আমার প্রাণ গেল চারদিন ধরে। ওকে জল খেতে না দিয়েই তোর কাছে পাঠিয়েছি।'

খোকার মা অপ্রস্তুত মুখে, হেসে বাসনে বসল।

মা আমাকে বললেন, 'খাবারও খেয়ে যাসনি, এত দেরি করলি। খাবি আয়।'

লুচি, তরকারি, মিষ্টি—বিকেলের খাবার সাজানো রয়েছে। সব ভাইবোন খেয়ে চলে গেছে।

বললাম, 'সন্ধ্যে তো হয়ে গেছে, এখন খাবার খেলে আর রাত্তিরে ভাত খেতে পারব না, একেবারেই ভাত খাব।'

মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'না হয় রাত করে খাবি।'

'না, কাপড় ছেড়ে আসি। ভাত-খাবার একসঙ্গেই খাব। সন্ধ্যের পরেই খেয়ে পড়তে বসব।'

খোকার মার তখন সন্ধ্যের পরেই বাসন মাজা ধোয়া হয়ে গেছে। রান্নাঘর মুছে দিয়ে কাপড় ছেড়ে বাটনা বাটতে আসবে।

আমি খেতে এলাম। বিকালের খাবার লুচি তরকারি এলো। রাত্রির জন্য রান্না ভাত ডাল মাছের তরকারি ভাজা চচ্চড়িও পাতে মা দিলেন সাজিয়ে।

খোকার মা বাটনা বাটছে মাথা নিচু করে।

খেতে খেতে মাকে বললাম,'কত তরকারি, না মা?'

মা বললেন, 'কই আর বেশি? ওঁর তো এতেও কম হবে।'

আমি অন্যমনে তখনকার কথার জবাব দিলাম। বললাম, 'খোকার মা রান্না করছিল তখন, ছেলেদের খাইয়ে শুইয়ে এলো।'

মা করলেন মেয়েলী প্রশ্ন চিরকালের, 'কি রাঁধলি খোকার মা?'

খোকার মা বাটনাই বাটছিল। আমাদের দিকে চাইল। একটু হেসে বললে, 'ঐ তো দিদিমণি দেখে এলো—শাকভাজা আর ভাত।'

আমার পাতের ডাল তরকারি মাছভাজা লুচি, কি তার চোখে পড়ল? নাঃ। সে আবার বাটনার নোড়ায় মনঃসংযোগ করেছে।

আমি বললাম, 'শুধু লাল শাক আর ভাত করল। ছেলেরা তাই দিয়েই খেলো।'

মা বললেন 'তা আর কি করবে!' (অর্থাৎ ওর ভাগ্য! ওরা ঐরকমই খায়।) তারপর তাকে বললেন, 'রাত্তিরের রান্না সেরে নিলি বুঝি? তাই এত দেরি হল?'

খোকার মা আবার নোড়া রেখে মুখ ফেরালে। 'আমাদের আর রাত্তির আর দিন মা। ঐ একবারই দুটো সেদ্ধ করি। কয়লা কিনতে পারি না। কোথায় কাঠ কোথায় কুটো, দুবার উনুন কি জ্বালতে পারি মা?'

'তা হলে রাত্তিরে কি খাবে ওরা?'

একমুখ হেসে খোকার মা বললে, 'রাত্তিরে আর ওরা খায় না মা।'

মা বললেন, 'সে কি রে? কাঁদে না? ক্ষিদে পায় না—ঐ চারটে বেলায় খেয়ে?'

খোকার মা তেমনি হেসেই বললে, 'ওরা জানে, 'নোকে' একবারই খায়। রাত্তিরে খেতে হয় ওরা জানে না মা।'

ওর সরল হাসিতে মা যেন বিব্রত হয়ে উঠলেন। খোকার মা আবার হলুদ থেঁতো করতে আরম্ভ করল। আমি অন্যমনস্ক হয়ে ভাত খাচ্ছিলাম। আমার পাতের দিকে চেয়ে মা হঠাৎ বললেন, 'ভালো করে খা, ও কি খাওয়া হচ্ছে? ওতে শরীর স্বাস্থ্য থাকে? একটু দুধ দিয়ে খা না ভাতগুলো, ফেলিসনি অত ভাত।'

আমি চচ্চড়ি দিয়ে ভাত মেখে খাচ্ছিলাম। মনে পড়ল ওদের শাক দিয়ে মাখা লাল

ভাতগুলি খাওয়ার কথা। তারপর মনে পড়ল ওরা আর দুটি ভাত চাইল, খোকার মা দিতে পারল না। আমি বললাম, দাও না—ওদের পেট ভরেনি। খোকার মা বললে, না দিদি, পেট ভরেছে ওতেই। ওদের 'আহিক্কে' পেট ভরলেও চাইবে।

মাকে বললাম, 'না, খাচ্ছি। ফেলছি না।'

কিন্তু পেট ভ'রে গেছে, আর পারছি না খেতে। ভাবি, কিন্তু খোকার মার ছেলেরা কি করে পেট ভরলেও খেতে পারে? মাকে জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা, 'আহিক্কে' কাকে বলে মা?'

মার অত কথা যেন আর ভাল লাগছিল না। বললেন, 'কী আবার, খেয়ে নে না শিগ্‌গির করে।' মার মনে পড়ছিল কি, ওদের একবারই খাওয়া শুধু শাক দিয়ে। আর আমার এত প্রাচুর্যের খাওয়া—খোকার মা দেখতে পাচ্ছে কি? মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যেন। যদি খোকার মা মুখ তুলে তাকায় আমার থালার দিকে, ভাবলেন কি? খোকার মা কিন্তু দেখতে পায়ইনি। বাটনাই বাটছিল।

মৃদুস্বরে ভয়ে মার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, 'মা, একদিন ওর ছেলেদের ডাল তরকারি দিয়ে ভাত খেতে বলবে?'

'আচ্ছা থাম তো', বলে মা এমন ভুরু কুঁচকে চাইলেন, উঠে পড়লাম তাড়াতাড়ি।

কথাবার্তা, ফাল্গুন ১৩৬৫

নীল চোখে

মহাকালের মহা নাটকের গর্ভাঙ্কের দৃশ্যপট পরিবর্তন হয়েছে।

হ্যারিসন রোডের ওপর কর্পোরেশনের একটা লরি এসে দাঁড়াল। পথের দুধারে ফুটপাথের ওপর নরনারী শিশু বালক-বালিকাতে ভরা। পাশে ছেঁড়া কাঁথা নেকড়া, হাতে মাটির সরা টিনের মগ এনামেলের বাসন দু-একখানি করে নিয়ে সব বসে আছে। ফ্রী কিচেন, লঙ্গরখানা—গৃহস্থবাড়িতে অনেকেই খিচুড়ি ভাত ফেন পেয়েছে। কেউবা পায়নি, সন্ধ্যাবেলা পাবে সেই আশায় আছে। মাথার ওপর মধ্যাহ্ন রৌদ্র, রাস্তায় নানারকম যানবাহন—রিকশা গাড়ি ট্রাম মোটর। ওরা বসে আছে ফুটপাথের ওপর। সংক্ষেপে ওরা ফুটপাথকে বলে 'ফুট'।

'ওরে, নরি আসছে, নরি আসছে'—একটা গোল উঠল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যে যে পারলে লোকের বাড়ির দেউড়ির মধ্যে, পানের দোকানের নীচের খুপরিতে, সরু গলির মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

বহু বাকি রয়ে গেল, হতবুদ্ধির মত। লরি থেকে দুটো লালপাগড়ী নেবে এলো, দু-তিনজন এ. আর. পি-র লোকও। তারা হাত ধরে একে একে পথবাসী-পথবাসিনীদের লরিতে তুলতে লাগল।

বালক-বালিকারা উৎফুল্ল হয়ে উঠল, ডাকাডাকি করে, 'ওরে নরিতে চাপবি আয়, আয় শিগগির।'

বিমূঢ় হতবুদ্ধি পুরুষেরা ; দু-একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ মোদের? জেলখানায়?'

কেউ উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলে না। ভয়ে শঙ্কায় আতঙ্কে তারা নির্বাক হয়ে বসে রইল। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করবার ভরসা তাদের নেই। লরি বোঝাই হয়ে গেল নিরন্ন মানুষে। চলতে আরম্ভ করল। দেখতে দেখতে মহানগরীর পথ শেষ হয়ে গেল। শহরতলীও শেষ হল। লরি থামল।

লাল সৈন্য, কালো সেপাই, তাদের কালো কেরানী কর্মচারী বৈকালিক অবসরটুকু উপভোগ করবার জন্যে বেরিয়েছে। বহুদিন সঙ্গে সঙ্গে থেকে লাল-কালোতে খানিকটা সহৃদয়তা এসে গেছে। আরও এক যাত্রায় যে পৃথক ফল হবে না, তা তো জানেই।

কেউবা গেছে ময়দানে হাওয়া খেতে ; কতক বা ময়দানের সামনের হোটেলে খানা খেতে। কতক যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াবার জন্যে শহরতলীর সীমানা ছাড়িয়ে প্রায় জনহীন নিস্তব্ধ গ্রামের উপকণ্ঠে চলে এসেছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হয়ে এসেছে। তিনজন লাল আর দুইজন কালো আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎ একজন সাদা বললে, 'এই, দেখ দেখ, ওই ঝোপের তলায় কি একটা নড়ছে।'

বিদেশী মানুষের অজানা ভাষার সাড়া পেয়ে যে নড়ছিল, সে একেবারে স্থির হয়ে

গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, তার কোলের শিশুটি চেঁচিয়ে উঠল।

দেশী দুইজন এগিয়ে এল। শিখ বললে, 'কোন্ হ্যায় তুম? বাহার আও।' বাঙালী কেরানী চুপ করে রইল।

যে নড়ছিল, সে বেরিয়ে এল। কোলে অতি শীর্ণকায় একটি শিশু, ছ মাসেরও মনে করা যায়, দু বছরেরও মনে হতে পারে। পাশে একটি বালক জননীর অঞ্চল দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরে।

সকলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রশ্ন করবার মত নানা কথা মনে আসতে লাগল সকলের। কোথায় বাড়ি, কেন এই ঝোপের তলায় বসে আছে, রাত্রি একটু গভীর হলেই শেয়াল কুকুর ছিঁড়ে খেতে আসবে শিশুটিকে।

শীর্ণ জননী সভয়ে সকলের মুখের দিকে চাইছিল।

এবারে বাঙালী জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথা থেকে এসেছ তুমি? এই ঝোপের মধ্যে রাত্রি কাটাবে কি করে? শেয়ালে যে ছিঁড়ে খাবে তোমার ছেলেদের। গাঁয়ে যাচ্ছ না কেন?'

বাংলা কথা বোধহয় তার মনে ভরসা এনে দিয়েছিল। সে বললে, 'গাঁ তো আমাদের এখানে নয় বাবু, অনেক দূরে। পাঁশকুড়ো ইষ্টিশন থেকেও আরও খানিক গিয়ে।'

'তা অতদূর থেকে এখানে কেন? সেই দেশেই কাছাকাছি কোথাও থাকলে পারতে।'—কেরানী বললে।

'খেতে পেলাম না বাবু। ঘরে যা ধান ছিল, তা সরকারী লোকেরা নিয়ে গেল, যে ট্যাকা ধরে দিলে তা মহাজনে নিয়ে নিলে। ভাবলাম, আউশ ধান হলে ঘরে দুটো খেতে পাব। তাও ভেসে গেল, হেজে গেল।'

'তুমি একলাই এসেছ?'—আশ্চর্য হয়ে কেরানী জিজ্ঞাসা করলে।

'না বাবু, ভাই ছিল, সোয়ামী ছিল, গেরামের লোক আরও সব ছিল। তাদের সবাইকে নিয়ে ওই হোগলা কুঁড়েয় তুলেছিল।—' হঠাৎ সন্দিগ্ধভাবে সে চুপ করে গেল।

কেরানী জিজ্ঞাসা করলে, 'তারপর? তারা গেল কোথা?'

এবার মেয়েটি কেঁদে ফেললে। বললে, 'ভাইয়ের পেটের অসুখ করল জোয়ারি সেদ্ধ খেয়ে, তারপর পা ফুলে উঠল। সোয়ামী জ্বরে পড়েছিল। তা তেনাদের ডাক্তার এসেছিল। সোয়ামী বললে, মোদের দুটি ভাত দিতে বলুন না মশাই, এমন বাজরা-জোয়ারি খেলে ছেলেগুলানও বাঁচবে না, মোরাও মরে যাব। তা তেনার পাশে যাঁরা দাঁড়িয়েছিল, তেনারা বললে, ভাত কোথায় পাব? আর মরবিই তো আজ নয় কাল। বাঁচবি নাকি?'

মেয়েটি চোখ মুছতে লাগল। শিখও উৎসুকভাবে শুনছিল, বিশেষ বুঝতে পারেনি কিছু।

কেরানী চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। গোরারা জিজ্ঞাসা করলে, 'ব্যাপার কি?' কেরানী সংক্ষেপে কাহিনীটা বিবৃত করলে।

গোরাগুলো নীল চোখে জীর্ণবাসাবৃত কঙ্কালসার-দেহ কালো জননী ও তার শিশুদের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর হঠাৎ একজন পকেট খুঁজে চারখানা বিস্কুট বের করলে, অন্যেরাও কেউ চকোলেট কেউ বিস্কুট যা ছিল বের করে হাত বাড়িয়ে দিলে।

বালকটি এগিয়ে এসে নিলে। ক্ষুধার্ত জননী তার হাত থেকে দুখানা ছিনিয়ে একটি কোলের শিশুর হাতে দিলে, একটি নিজের মুখে পুরলে।

পশ্চিম আকাশে শেষ লাল আভাটুকুও মিলিয়ে এল। প্রহর-ঘোষণাকারীর প্রথম প্রহর

ঘোষণার সময় হয়ে এল।

কেরানী বললে, 'তা তোমার ভাই আর সোয়ামী গেল কোথায়? রাত্রে এই বনের মধ্যে থাকবে কি করে?'

মেয়েটি বললে, 'তেনাদের কথা শুনে সোয়ামী বললে, বাতাসী, তুই পেলিয়ে গিয়ে ভিক্ষে-শিক্ষে করে ফেন খাইয়ে ভাত খাইয়ে ছেলে দুডারে বাঁচা। এখানে থাকলে ওরা মরে যাবে! বেঁচে থাকি, আবার দেখা হবে। আমি পেলিয়ে এলাম। কিন্তুক ওদের নরি মোদের দেখতে পেলেই তুলে নিচ্ছে। তাই নুকিয়ে নুকিয়ে থাকছি।'

করবার কিছু ছিল না আর। গোরারা চিন্তিত মুখে শিস দিতে দিতে ক্যাম্পের দিকে ফিরল। বাঙালী আর শিখ নীরবে আসতে লাগল।

এরা পাঁচজন প্রায় একসঙ্গেই ঘোরে।

কয়েকদিন পরে সেই বনের পথে তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল একটি বুভুক্ষু বালক। সঙ্কোচে ভয়ে সাহসে দ্বিধা ভাবে সে সুমুখে এসে দাঁড়াল তাদের। বললে, 'সায়েব, একটা বিস্কুট দেবে?'

ভাষা না বুঝে সকলেই তার পানে অবাক হয়ে চাইল।

শুধু বাঙালী কেরানী তার পকেট থেকে কি একটু বের করে দিলে। দেখা-দেখি অন্য সকলেও যা ছিল বার করলে।

বাঙালী একটু দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোর মা আর ভাই কোথায়? তুই একলা ঘুরছিস?'

বালক কেঁদে ফেললে। বললে, 'পরশু ভাইডারে শেয়ালে টেনে নিয়ে গেছে। মার জ্বর হয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপরে মা শেয়ালের পেছনে ছুটল। মোকে বললে, ফেলা, তুই শহরে পেলিয়ে যা, আমি খোকাডারে নিয়ে আসতেছি।'

ছটি নীল চোখ আর দু জোড়া কালো চোখ তার দিকে চেয়েছিল। আন্দাজে যেন সব বোঝা গিয়েছিল। তবু তারা উৎসুকভাবে বাঙালীর দিকে চাইলে। কেরানী শুধু বললে, 'ওর ভাইকে শেয়ালে নিয়ে গেছে, মা খুঁজতে গিয়ে আর ফেরেনি। তোমরা ক্যাম্পে যাও, আমি একে কোথাও রেখে আসছি।'

সারি সারি খাট পাতা। এক এক করে সব শুয়ে পড়বার যোগাড় করছে। কেরানী ফিরে এল।

একজন নীলচোখ জিজ্ঞাসা করলে, 'রেখে এসেছ?' কেরানী ঘাড় নাড়লে।

শিখটি বললে, 'আমরা হলে এমন করে মরতুম না। যেমন করে হোক বাঁচবার চেষ্টা করতাম।'

ওরা সরকারের সমাদৃত সৈন্যের জাত ; মারবার ভরসাও রাখে, হাতিয়ারও রাখে, তাই মেজাজও রাখে।

আর একজন নীলচোখ শিস দিচ্ছিল নিজের মনে, সে বললে, 'ঠিক বলেছ। এ রকম ইঁদুরের মত মৃত্যু,—আমাদের দেশ হলে গবর্মেণ্ট উল্টে যেত। বিপ্লব হয়ে যেত। তোমরা কি?'

কেরানী জামা-কাপড় ছাড়ল, ফিরে দাঁড়াল, ক্যাম্পের আলো পড়ল মুখে, তার কালো চোখ জ্বলে উঠল যেন।

তারপর সে আবার পিছন ফিরলে। র‍্যাকের ওপর কোট টাঙাতে টাঙাতে শুধু বললে, 'দেশ তো আমাদের নয়. তাই ওরা পোকা-মাকড়ের মত মরছে।'

তাঁবুর সমস্ত নীলচোখ-কালোচোখের দৃষ্টি এবারে নত হয়ে গেল। স্বাধীন দেশের বিপ্লবী সৈনিক-মন পরাধীন শিখের বাহুবল-আস্ফালন অপ্রতিভ হয়ে গেল যেন কেরানীর ওই কথাতে।

খুন লুট বিপ্লব কিছুই হয়নি কোনখানে।

কিন্তু মহানগরীর পথে আর বুভুক্ষিতেরা নেই। আদিম একান্ত প্রথমতম প্রয়োজন— শুধু বেঁচে থাকবার জন্যে ফেন চেয়ে, ভাত চেয়ে, কখনো ছেঁড়া কানি নেকড়া চেয়ে, স্বচ্ছন্দ চাকুরেদের, ধনী অধিবাসীদের, গৃহস্থদের, প্রবাসী আগন্তুকদের, বিদেশী পর্যটকদের, বিভিন্ন দেশের দর্শকদের আর তারা শান্তি ভঙ্গ করে না, চোখের সুমুখে দাঁড়ায় না। সরকারী ব্যবস্থায় নগরপ্রত্যন্তসীমায় লঙ্গরখানায় তারা বিনামূল্যে জোয়ার-বাজরার খাদ্যাখাদ্য খাচ্ছে। দু-চারদিন সহ্য হচ্ছে, তারপর পেটের অসুখে ভুগে ভুগে হাত-পা ফুলে উঠছে। তারপর?

বিজ্ঞজনেরা বলছেন, মৃত্যু ওদের অনিবার্য, আজ নয় কাল হবেই।

শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫০

টিনের মাংস

এ গাড়িখানা প্যাসেঞ্জার ও যাতে থার্ড ক্লাস থেকে সকল ক্লাসেই অনুচিত ও যথোচিত যাত্রী ঠাসা ও ভরা। এখানা অতি সসম্ভ্রমে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের সোজা পাশের লাইনটা ছেড়ে দিয়ে একটা সাইডিঙের লাইনে সঙ্কুচিতভাবে বহুক্ষণ থেকে দাঁড়িয়েছিল।

অনেকক্ষণ পরে একখানা গাড়ি আসার আভাস দেখা গেল, সিগন্যালটা পড়ল। 'পাখা পড়েছে' বলে জন তিন-চার কুলি একটু নড়ে-চড়ে বেড়াল।

দেখতে দেখতে একখানা প্রকাণ্ড লম্বা মিলিটারি গাড়ি এসে পড়ল। লাল্‌চে চুল নীল চোখওয়ালা সাদা সাদা অসংখ্য মুখ, আর জানলাভরে সুন্দর সুস্থ সামঞ্জস্যময় শরীর দেখা যেতে লাগল।

ক্রমে রুগ্ন সৈন্য, বিকলাঙ্গ সেনা, সবল সহজ সেপাইয়ের গাড়ি একে একে দাঁড়াল। প্যাসেঞ্জারের যাত্রীদের দৃষ্টির পথ পার হয়ে গেল। তারপর আসতে লাগল রেশনের গাড়ি অর্থাৎ ভাঁড়ারের গাড়ি, রান্নার গাড়ি, তারপর রন্ধনকারী কালো সেবকদের গাড়ি, তারপর কয়লার গাড়ি ইত্যাদি। গাড়ি যেন আর শেষ হয় না।

বহুক্ষণ নির্বিকার বসে থেকে থেকে প্যাসেঞ্জার গাড়িখানার ঘুম এসে গেল যেন। হঠাৎ বহু সমবেত গলায় চেঁচামেচি হৈ হৈ শুনে সে-গাড়ির সকলে সচকিত হয়ে মুখ বাড়াল জানলা থেকে। দেখা গেল মিলিটারি গাড়ির দুধারে অসংখ্য কণ্ঠের গোলমাল। কালোকালো জীর্ণশীর্ণ-তনু যত ভিখারী নিরন্ন যেখানে যা ছিল, সকলে এসে দাঁড়িয়েছে— ঐ গাড়িটার জানলার পাশে পাশে। খানিক আগেও এই গাড়িটার পাশে ওদের দেখা গিয়েছিল। কিন্তু অতজন ওরা কোথায় ছিল, আর কেমন করে বা এখনি এসে জুটল। আর নির্ভয়ে চীৎকার করছে গোরাদের জানলার পাশে। লাল মুখকে ভয় নেই, গাড়ির তলায় পড়বার আতঙ্ক নেই, পিছনের লাইনে অন্য গাড়ি এসে পড়বার কথাও ভাবছে না। কিসের ভিড়, কি জন্য ওরা দাঁড়িয়ে, দেখবার জন্য এ গাড়ির সকলেই ঝুঁকে ঝুঁকে দেখতে লাগল।

বেশি ঝুঁকতে হল না, গোরাদের জানলা থেকে রুটি, বিস্কুট, কাগজে মোড়া ভুক্তাবশিষ্ট মাংস, কলা, কমলালেবু, নানারকম খাদ্যের ছোট ছোট টিন ঝুপ্‌-ঝুপ্‌ করে তাদের দিকে পড়তে লাগল, দেখতে পাওয়া গেল।

কুখাদ্য ভোজন, অনশন ও আসন্ন মৃত্যুর শেষ ধাপে পৌঁছে আর আজ তাদের গোরাদের সঙ্কোচ বা সৈন্যদের কোনো ভয় নেই। অনায়াসে বিশীর্ণমুখে ভিক্ষা চাইছে, গোলমাল করছে। আর গাড়িভরা নীল চোখেরা অদ্ভুত কৌতূহলের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সমবেদনাভরে তাদের দিকে চেয়ে আছে। হয়ত তারা ভাবছিল, এই ঊষর মাটির মত বিবর্ণ রঙের কঙ্কালসার দেহের জীবদের কি মানুষ বলা হয়? অথবা এরা মানুষ নয়। ভারতবর্ষের অসংখ্য প্রকার জীবজন্তুদের মত এরাও একরকম জীব। হয়ত তেমনি ধারাই কারুর বা এরা খাদ্য! কিন্তু ওই শীর্ণ কঙ্কালরা কারুর খাদক কি না কে জানে।

কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে এল কয়েকজন। দুজনের হাতে দুটি টিন। প্যাসেঞ্জার গাড়িখানার বিসর্পিত ছায়ায় কয়েকজন এসে তারা বসল।

একজন টিনের ভেতরে দেখে বললে, 'ভাই এডা কি?'

অপরজন নিজের হাতের টিনের সবটুকু মুখটা খোলবার চেষ্টায় ছিল। সে বললে, 'খায়ে দ্যাখ না, মুই কি জানি?'

অপরজন মুখ দিয়ে বললে, 'মনে লাগে মাংস ঝ্যানো।'

'ওনারা তো মাংসই খায়—গোরা সিপুইরা।'

যে মাংস খেয়েছিল, সে টিনটা হাত থেকে মাটিতে রাখল, তারপর বললে, 'ভাই, কিসের মাংস হবি?'

অন্যজন নিজের টিনের ভিতরের খাদ্য নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সে বিরক্তভাবে বললে, 'তা কে জানে?'

যে মাংস খেয়েছিল সে চুপ করে শুয়ে পড়ল ক্লান্তভাবে, আর খেল না! এ নিজের টিন থেকে খেতে আরম্ভ করেছিল, বললে, 'শুলি যে, খায়ে ফ্যাল? কুকুরে নিয়ে যাবে, ওই দেখ্ কুকুর।'

যে শুয়েছিল সে বললে, 'নিক।'

অন্যজন বললে, 'ক্যানো, কুকুরকে দিবি ক্যানো? খা-না, দে—মোরে, খাই।'

সে নির্লিপ্তভাবে দিয়ে দিল টিনটা, বললে, 'খা।'

এ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হল তোর, ক' না কেনে?'

এবারে এর চোখ থেকে জল পড়তে লাগল, বললে, 'ভাই, মাংসটা কিসের বটে! সাহেবরা তো সব মাংসই খায়।'

অন্যজন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'তুই হিঁদু?'

এ চোখ বুজেই বললে, 'হ্যাঁ।'

এবারে অন্যজন একটু দূরে সরে বসল, তারপর একটু পরে বললে, 'বাই, আমি তো মোছলমান।'

এ আশ্চর্য হয়ে উঠে বসল, তারপর আবার শুয়ে পড়ল। কিছুই বললে না।

কিন্তু মুসলমানটিও আর খেল না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'বাই, ওরা ত হারামও খায়। মুইও তো খ্যায়েছি ওদের টিনের মাংস।'

মিলিটারি গাড়ি চলে গেছে। লাইন খালি হয়ে গেছে। এবারে প্যাসেঞ্জারখানাও তার দীর্ঘ বিসর্পিল দেহ নিয়ে এক লাইনে এগিয়ে এল। ভিখারীরা যে যেখানে পারে চলে গেছে। প্যাসেঞ্জার গাড়ির ছায়াতলে আশ্রিত হিন্দু-মুসলমান দুজনেরই গায়ে অপরাহ্ন রোদের সমস্তটা এসে পড়ল।

রৌদ্রের তাপে তারা এবারে সচকিত হয়ে উঠে বসল। দেখলে মাংসের টিনদুটো তাদের পাশে নেই। কুকুরে নিয়ে গেছে বোধহয়।

দু'জনেই উঠে দাঁড়াল। কিছু দূরে একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে বসল। বহুক্ষণ পরে সহসা হিন্দুটি বললে, 'ভাই, ভিখিরীর আর জাতধর্ম কোথা? মোরা তো ভিখিরীই হয়েছি বটে।'

ক্ষুধিত ক্লান্ত মুসলমান নীরবে তার দিকে চেয়ে রইল শুধু। হয়ত বহুদূর-স্থিত নিজেদের দেশ, স্বজন ও গ্রামের কথা তার মনে পড়ল। কিন্তু গ্রামে কি আর কেউই বেঁচে আছে? অথবা সে আর কোনোদিন ফিরে যেতে পারবে?

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫১

রক্তের ফোঁটা

স্থান স্বর্গ।

স্বর্গে এখনো যেতে পারিনি সুতরাং সে যে কিরকম জায়গা বলতে পারা শক্ত।

তবু দেখতে পাচ্ছি অপূর্ব স্বর্গতোরণের ভিতর দিকে মর্তভূমির মতই একখানি ছোট দড়ির খাটিয়া পাতা রয়েছে। মহাত্মা গান্ধী সেই খাটিয়ার ওপর বসে নবজীবনের প্রুফ দেখছেন। সেটা মর্তে আসবে কি স্বর্গের প্রচারের জন্য তা আমরা জানি না, পাশে তক্‌লীটি রাখা আছে। তাঁর সামনে স্বর্গীয় তালপাতার তৈরী চাটাই বিছানো। তাতে বসে আছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব, রফি আমেদ কিদওয়াই সাহেব, প্যাটেলজীরা দু'ভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং সরোজিনী নাইডু, আরো অনেকে।

সামনে স্বর্গীয় আলোয় বিভাসিত বৃক্ষলতা বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। আঙিনার একদিকে দুটি দুগ্ধবতী ছাগী বাঁধা রয়েছে। তার কাছাকাছি এক জায়গায় কস্তুরবা গান্ধীর বৈকালিক জলযোগের খেজুর মনাক্কা বেছে ভিজিয়ে সাজিয়ে রাখছেন।

সহসা তোরণদ্বারের শিখরে দুন্দুভি বেজে উঠল।

সকলে চকিত দৃষ্টিতে তোরণপথে চাইলেন। কে এলো? কে আসছেন? বিশিষ্ট মানুষ কার মৃত্যু হল?

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এসে দাঁড়ালেন। গান্ধীজীকে নমস্তে জানালেন। হাসিমুখে গান্ধীজী চোখ তুললেন, 'ও তুমি! তুমিও চলে এলে?'

নেহরু বললেন, 'হ্যাঁ, আসতে হল।'

গান্ধীজী। 'তা বেশ। তা সব খবর ভালো তো? বোসো।'

পণ্ডিতজী। 'হ্যাঁ, তা ভালোই সব একরকম। তবে—', একটু চুপ করে রইলেন।

গান্ধীজী। 'তবে কি? কোনো গোলমাল নেই তো দেশে? কোনো কষ্ট নেই তো?'

নেহরু অপ্রস্তুতভাবে বললেন, 'না, তা কিছু নয়। এই বড় ধার-দেনা করে ফেলেছি।'

গান্ধীজী এবারে তক্‌লীতে সুতা কাটছেন।

পৃথিবীর সতেরো বছরের মাস দিন বছরের হিসাব স্বর্গের হিসাবে অন্যরকম। মর্তের সব খবরও সেখানে কেউ মরে গেলে পৌঁছয় তখন। খবরের কাগজের স্তূপও সেখানে পৌঁছয় না।

গান্ধীজী তাঁকে বললেন, 'বোসো, তা ধার? ধার করতে গেলে কেন? ব্রিটিশ আমলে তো ধার ছিল না এত!'

বিব্রতভাবে জহরলাল বললেন, 'এইসব বড় বড় প্ল্যানিং পরিকল্পনা নিয়ে বড় বড় বাড়ি প্রাসাদ অট্টালিকা আর অনেক কারখানা বাঁধ করে বড় ধার হয়ে গেছে। এখনো হচ্ছে।'

গান্ধীজী স্মিতমুখে তাঁর পরম প্রিয় শিষ্যের বিব্রত মুখের দিকে একটু চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'তা ধার হোক হয়েছে। তা মানুষের অন্ন-বস্ত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছ তো? স্বাধীন ভারতের কামনা আমাদের।'

পণ্ডিতজী অপ্রস্তুতভাবে বললেন, 'না, সেটা ঠিক পেরে উঠিনি এখনো। দেশকে উন্নত করতে গেলে বড় খরচ তো। অন্য সব ধনী সমৃদ্ধ দেশের সঙ্গে সমানভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা আগে করছিলাম। তাই—'

গান্ধীজি বললেন, 'তা বেশ। তা ওরা খেতে-পরতে পাচ্ছে তো?'

পণ্ডিতজী। 'তা ঠিক আমি জানি না। খাদ্যমন্ত্রীরা জানেন।'

চারিদিকে তাকালেন। খাদ্যমন্ত্রীরা কেউ স্বর্গে আসেননি। এখনো মর্তেই রয়েছেন। অবশ্য রফি আমেদ কিদওয়াই সাহেব ছিলেন।

পণ্ডিতজী বললেন, 'আর মন্ত্রী অনেক হয়ে গেছে। রাজ্যও অনেক হয়েছে, বড় খরচ সেজন্যেও হচ্ছে তাদের পিছনে। আর আপনিও তো বলেছিলেন মন্ত্রীদের ঠাট মর্যাদা বজায় রাখার জন্য মাইনে বাড়ানো হোক, সেই ইংরাজ আমলের পাঁচশ' টাকায় আর কেউ কাজ করতে চায় না। স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং বেড়েছে তো!'

গান্ধীজী নীরব, ভাবলেন কি সেটা ব্রিটিশকে ধাপ্পা দেওয়া হয়েছিল ত্যাগ স্বীকারের? না সত্য ছিল সেটা?

মাথা নীচু করে গান্ধীজী অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। চোখে একটু জল এলো বুঝি।

তারপর বললেন, 'তাহলে তোমরা গরিবদের জন্য কিছুই করতে পারনি? আর শিক্ষা? তা প্যাটেল রাজেন্দ্রপ্রসাদ তোমরা তো উঁচু পদে ছিলে—তোমরাও আমার মত ভাবনি? আগে তো গরিবদের কথা ভাবতে? সত্যাগ্রহী ছিলে যখন? বারদৌলী চম্পারণে?—'

শিক্ষা-অন্ন প্রশ্নে সকলেই নীরব রইলেন। তবু প্যাটেলজীরা নড়েচড়ে বসলেন। বল্লভভাই প্যাটেল বললেন, 'আমি তো দেশীয় রাজ্যগুলো রিপাব্লিক করেই স্বর্গে চলে এলাম। মানে মরে গেলাম। রাজেন্দ্রপ্রসাদ অনেকদিন ছিল বটে।' পণ্ডিতজীর নাম করলেন না।

গান্ধীজী। 'তা দেশীয় রাজ্যের প্রজারা জমি-জায়গা পেল তো? না এখনো কিছু হয়নি?'

সকলেই নতশির নীরব।

অতঃপর রাজেন্দ্রপ্রসাদ অপ্রতিভভাবে বললেন, 'বাপুজী, ভেবেছিলাম কিছু করব। কিন্তু বড়লাট হলে কিম্বা রাষ্ট্রপতি, বড্ড বক্তৃতা, বিদেশ যাওয়া, স্যালিউট নেওয়া এই-সব করতে হয়! বড় ঝামেলা। এসব করা তো কম কাজ নয়। বহু অতিথিও আসেন। তারপর নিজের ছেলেমেয়েদের জন্যও কিছু করতে হল। বুড়ো বয়সের সে ভাবনা। ওদের দাঁড় করিয়ে দিতে হল।...কত সেবককে...'

গান্ধীজী। আর জহর তুমি?

জহরলাল বিব্রতভাবে নীরব।

'কত কোটি ধার করেছ? কারা শোধ করবে? কবে করবে? এই নিরন্ন গরিব দেশে!'

'সেটা অর্থমন্ত্রী ঠিক বলতে পারবেন। তা তিনি তো মর্ত্যেই রয়েছেন এখন।'

সহসা দেখা গেল গান্ধিজীর বুকের গুলির সেই ক্ষতের দাগ থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে রক্ত পড়ছে।

জহরলাল এগিয়ে এলেন, 'বাপুজী, একি? আপনার বন্দুকের গুলির সেই আঘাত সতের বছরেও শুকোয়নি? ধন্বন্তরীজী কি দেখেননি?'

গান্ধীজী একটু চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন, 'ও ঘা সেই গুলির নয় '৪৮ সালের।'

সকলে অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি? ও ক্ষত তবে কি করে হল?'

গান্ধীজী এবার কোন কথা বললেন না। ওঁরা সকলে নীরব হয়ে রইলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র খবর পেয়ে ধন্বন্তরীকে আর অশ্বিনীকুমারদের পাঠালেন।

গান্ধীজী হাতের তক্‌লী রাখলেন। ছোট খাটিয়াটিতে শুলেন।

ধন্বন্তরী আর অশ্বিনীকুমারদ্বয় ক্ষত পরীক্ষা করলেন। বিশল্যকরণীর, অস্থিসঞ্চারিণীর ব্যবস্থা করে দিলেন অশ্বিনীকুমাররা।

ধন্বন্তরী বললেন, 'এ-ক্ষত দুটি অনেক ভিতরের। গডসের গুলির ক্ষত নয়। আমি ওষুধ পাঠাচ্ছি এখনি।'

বৈদ্যরাজরা চলে গেলেন।

সকলে চিন্তিত ও নীরব। জহরলাল আবার বললেন, 'কিসের ক্ষত এ বাপুজী?'

এবারে গান্ধীজী কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'এ-ক্ষত একটি দেশ বিভাগের। আর একটি আমি চিরকালের জন্য দেশবাসীর কাছে মিথ্যাবাদী হয়ে গেলাম। তাদের "রামরাজ্য" হবে বলেছিলাম। সেই মিথ্যার আঘাতের ক্ষত!'

সকলে নতশির স্তব্ধ। রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে লাগল। কস্তুরবা মুছিয়ে দেন। তবু আবার ফুটে ওঠে।

কালো মেম

১২৬১/৬২ সাল। কলকাতা শহর লোকবিরল। পাড়ায় পাড়ায় ছড়ানো ছোটবড় বাড়ি। পাড়ার নামও স্ট্রীট রোড লেন নামে খুব চালু হয়নি। নম্বর ছিল কিনা জানিনে। পাড়াগুলোও পটলডাঙা, উল্টোডাঙা, ঘুঘুডাঙা, বাদুড়বাগান, হাতিবাগান, শিকদারবাগান, বকুলবাগান ধরনের নামে অভিহিত ছিল। এখনও কোথাও কোথাও সে-সংজ্ঞা আছে। আবার বদলেছে। বদলাচ্ছে। নিত্য নব নামে।

বহুবাজার (বউবাজার)-টা ছিল। কাছেই তালতলা। সেখানে একটা ভাঙাচোরা বনেদি বাড়ির দুয়ার-দালানে একটি মেয়েদের স্কুল। পাঠশালা বলাই ঠিক। মিশনারী মেমেদের চেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে।

কিছু একটা নাম হয়ত ছিল। কিন্তু নামটা চলেনি।

স্কুলের পথে সকালে দুপুরে প্রায়ই দেখা যেত একটি শ্যামবর্ণা বা কালো রংয়ের অল্পবয়সী নারী একটা সস্তা ছিটের গাউন পরা, মাথায় পালক গোঁজা, বেতের খেলো টুপি পরা, পায়ে চিনেবাড়ির জুতো, আড়ষ্ট পায়ে পথে চলেছেন। আর তাঁর পাশে ধবধবে সাদা রংয়ের প্রায়-বৃদ্ধা সুশ্রী বেশবাস চেহারা একটি মেমসাহেবও চলেছেন। মাথায় সুশ্রী সুন্দর টুপি। হাতে ছাতি।

এবং তাঁরা স্কুলের পথে বেরুলেই রাস্তায় রাস্তায় পাড়ার অর্ধনগ্ন ছেলেরা, একেবারে উলঙ্গ শিশুরা দাঁড়িয়ে পড়ত। নয়ত সঙ্গে সঙ্গে চলত।

আর বলত, 'ঐ রে, ঐ যে কালো মেম। আর ঐ দেখ, একটা সাদা মেম। ঐ যে পালক দেওয়া টুপি দেখ্। কোন্ পাখির পালক ভাই। কেমন রং দেখ্।'

আর খোলা খাপরার ঘর থেকে তাদের ময়লা কাপড় পরা খালি-গা মায়েরা, ডুরে শাড়ি পরা ছোট বড় বোনেরা, জলের ঘড়া কাঁখে মলিন ঠেঁটি পরা, হয়ত গোবরের ঝুড়ি হাতে বৃদ্ধা গৃহিণীরাও বেরিয়ে এসে উঁকি দিত। আর বড় বড় বাড়ির বন্ধ দরজা-জানালার পিছন থেকে দেখা যেত পর্দানশীন সুশ্রী কোমলমুখী রূপবতী, রূপহীনা, একবস্ত্রা, গহনাগাঁটি পরা, নোলক নথ পরা, সিঁদুর পরা বালিকা যুবতী বধূ কন্যাদের।

বস্তিবাড়ির রকে ও দাওয়ায় দেখা যেত কিছু বর্ষীয়ান পুরুষ তামাক খাচ্ছেন অথবা গল্প করছেন। মাঝারি বয়সীরা কাজে বেরিয়েছে।

কালো মেম তাকিয়ে তাকিয়ে সবাইকে দেখতেন।

কোন কোন জায়গায় একটু দাঁড়াতেন, কি যেন ভেবে। সঙ্গে সঙ্গে সাদা মেমও দাঁড়াতেন। আর চারদিকে ছোট বড় মাঝারি বালক বালিকা শিশুর দলও দাঁড়িয়ে পড়ত।

সাদা মেম হেসে হেসে ভাঙা বাংলা আর ইংরাজিতে মেয়েদের দিকে চেয়ে বলতেন, 'টোমারা আমার ইস্কুলে পড়িবে?'

তারা অবাক হয়ে তাকাত। জবাব দিত না, রকে বসা লোকেদের দিকে চাইত। হয়ত

গুরুজন তাদের।

সাদা মেমও সেদিকে তাকিয়ে বলতেন, 'ইয়েস, হামার ইস্কুল ভাল আছে।'

কালো মেমের দিকে চাইতেন। যেন তুমি ভাল করে বুঝিয়ে বল।

তখন কালো মেম রকের ওপরের পুরুষদের দিকে চেয়ে বলতেন, 'আমরা একটু ভেতরে দেখা করব কি? আপনাদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে? আমরা বিনা বেতনে মেয়ে-স্কুল করেছি। এই মেমসাহেবরা করেছেন।'

অনেকেই তাঁরা দ্বিধাভরে চেয়ে থাকতেন। ম্লেচ্ছ। কিরিস্তান (খ্রীষ্টান)। মেমসাহেব কোথায় বসবে। যদি কিছু ছোঁয়া যায়! সবই তো আছে, রান্না, ভাঁড়ার, ঠাকুর, বিছানা, মাদুর, কাচা কাপড়, বিধবা, বামুন!

কেউবা সাদা মুখের সম্মান রেখে বলতেন, 'আসুন।' এই সামনের ঘরের একটু ছোট বসবার জায়গায় বসতে দিতেন।

সাদা মেমসাহেবের মুখে সব দাঁত নেই। তিনি একটি 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে স্বল্পদন্ত স্নিগ্ধ হাসিমুখে ঘরের তক্তপোশের ওপর বসে বসে চারদিকে দেখতেন আর শুধু হাসতেন।

মাঝে মাঝে 'কালো মেমে'-র কথার সঙ্গে একটা দুটো 'ইয়েস' 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলতেন। কালো মেমই কন্যা সংগ্রহ করে। কথা বলে, লেখাপড়া শেখার গুণাবলী বলে। প্রাইজের পুতুলের লোভ দেখায়।

কালো মেমের দেশী নাম ছিল 'সোনামণি'। ধর্মান্তরিত হওয়ার পরের নাম হল মার্থা। মেমসাহেব রাখেন।

বাইবেলের বিখ্যাত কর্মশীলা মার্থার নামে।

যাহোক, কালো মেমের আর সাদা মেমের অন্যবারের মতো এবারও কন্যা-সংগ্রহ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ হল।

তিনটি মেয়ে তাঁরা পেলেন। ছ-সাত বছরের বেশী বয়স নয়। আট-ন বছরেই বিয়ে দিতে হবে। তা ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থই হোক বা নবশাখ সম্প্রদায়ই হোক।

প্রথমেই পেলেন এক দরিদ্র গৃহস্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে, নাম ক্ষীরোদবাসিনী।

আর আস্তে আস্তে ডুরে শাড়ি নাকে নোলক হাতে আইবুড়ো লোহা রূপার চুড়ি গলায় সোনা ও পলা মেশানো কণ্ঠমালা পরা আরও কয়েকটি মেয়ে এসে ক্ষীরোদবাসিনীর পাশে দাঁড়াল।

মেমের ইস্কুল। ওই মাথার টুপিতে সুন্দর সুন্দর পালক গোঁজা মেমসাহেবরা। কালো মেম আর সাদা মেম। আরও কত মেমসাহেবদের দেখতে পাবার কৌতূহলে তাদের মন ভরে উঠেছে। যারা কাপড় পরে না, ঘাগরা পরে। দুধের মতো সাদা রং।

সবাই চুপিচুপি গুরুজনদের বলে, 'ওই তো ক্ষীরোদিদি ইস্কুলে যাবে। আমাদেরও ভর্তি করে দাও।'

এবারে দ্বিধান্বিত পরিজনদের কাছ থেকে দেখাদেখি আরও দুটি মেয়ে এল, নিস্তারিণী ও কালীতারা।

গুনে-গেঁথে ছয় থেকে আট বছর অবধি দিনের ক্লাসে আসা ছাত্রী এপাড়া-ওপাড়া

খুঁজে—মলঙ্গা লেন তালতলা লেনের গলিঘুঁজি থেকে জড়ো হয়েছে সবসুদ্ধ সতেরটি। আর আছে অনাথ ক্রিশ্চান মেয়ে চারটি। সেগুলি হারিয়ে যাওয়া কুড়িয়ে পাওয়া সরকারী অনাথ বালিকা।

তারা সব কালো মেমের হেফাজতে।

ঘরের কাজ করে। ঝাড়ে মোছে রান্না করে তরকারি কোটে। বাসন মাজে। আগুন দেয় উনানে। নাম তাদেরও মেমসাহেবের দেওয়া। মেরী, রুথ, রেবেকা, অ্যান।

পড়ে তারা সবাই একসঙ্গে। পরনে ডুরে শাড়ি। কারও গায়ে একটা জামা, কারও গা খালি।

বাজারে তখন বিদ্যাসাগরের 'প্রথম-দ্বিতীয় ভাগ' বেরিয়েছে। পড়ানো হয়।

নাঃ, রামায়ণ, মহাভারত, শিশুবোধক নয়।

বাইবেল পড়ানো হয়। স্কুল বসার আগে 'সদাপ্রভু' পরমপ্রভুর নাম করে হাঁটু গেড়ে। (নীলডাউন) উপাসনা করানো হয়।

কিন্তু ক্ষীরোদবাসিনীরা উপাসনা করে না। যদিও বাইবেল পড়ে, উপাসনা চুপ করে শোনে শুধু। কিন্তু বাড়িতে সবাই জানেন না ওদের বাইবেল ও 'সদাপ্রভু'র কথা পড়তে হয়।

সেকালের মেয়েরা পাকা ছিল বটে। কিন্তু কি ভেবে বাড়িতে সব বলত না। স্কুলের সঙ্গিনী সঙ্গ বন্ধুত্ব ছেড়ে যেতে হয় যদি।

তবু মাঝে মাঝে কোন কোন পাড়ায় রটে যায়, 'ওরে, ওরা কিরিস্তান হয়ে যাবে রে। গাউন পরবে। গরু খাবে।'

কেউবা বলত '"সদাপ্রভু" কি রে বাবা! "সদাপ্রভু" কাকে বলে?'

'সদাপ্রভু' উপাসনা হয় শুনে দেখতে দেখতে নিস্তারিণী কালীতারা মঙ্গলা শিবানী নামে কটি এ-পাড়া ও-পাড়ার মেয়ে স্কুল ছেড়ে চলে যায়।

বাবা-কাকারা এসে বলে, 'বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে মেমসাহেব।' সাদা মেম, 'ও ইয়েস' 'খুব খুশীর কথা', বলে ফোকলা মুখে হাসেন। আর সাত-আট বছরের ছোট্ট ছোট্ট ডুরে কাপড় পরা মেয়েগুলি গহনা পরে নোলক-নথ সিঁদুর-আলতা পরে কোন এক শ্বশুরবাড়িতে চলে যায়।

তবে কালো মেম জানেন বিয়ের ঠিক হয়েছে সবসময়ে সেসব কথা সত্য নয়। ক্রিশ্চান স্কুল আর মেমসাহেবদের ভজন গান উপাসনায় জাত যাবার ভয়ে, বিয়েতে 'ভাঙচি' হবার ভয়ে তাদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়।

তবু কয়েকটি উচ্চবর্ণ ক্ষীরোদবাসিনী, কামিনী, তারিণী, শ্যামা, বামা, সুন্দরীরা স্কুল ছাড়ে না।

দিনে দিনে অনাথ মেয়েও দুটি-একটি করে আসে। নিম্নবর্ণরা 'যিশু'র কৃপা এবং ক্রিশ্চানিটির আশ্রয়ে ভাল কাজ পাবার জন্য আসে। ধর্মান্তরিত হয়। সাঁওতাল বুনো হাড়িরা আসে।

সহসা সাদা মেমের বিলাত যাওয়ার একটি কথা উঠল। বয়স হয়েছে, কোনো

কমবয়সের মিশনারী মেয়েকে কর্মভার দিয়ে তিনি স্বদেশে—য়ুরোপে ফিরে যাবেন। তাঁদের মিশনের প্রথামতো।

আর কালো মেম কেঁদে আকুল হতে লাগলেন। প্রকাশ্যে এবং লুকিয়ে। কোথা থেকে কোন এক সাদা মেম আসবেন। কেমন হবেন তিনি। এমন মধুর মিষ্টভাষিণী হাসিমুখ সহৃদয় হবেন কিনা...!

...আরও কত কথা...! বিপন্নদের আশ্রয়দান! অনাথকে প্রতিপালন! হোক ধর্মান্তর করা! ...এবং কালো মেম চুপি চুপি কাঁদেন আর চোখ মোছেন।

বলতে ইচ্ছে হয়, 'মাদার, (তিনি মাদারই বলেন), আমাকে তোমার ঝি করে নিয়ে চল।' কিন্তু দেশ ঘর আর ঐ লালনপালন করা অনাথ মেয়েগুলির কথা মনে হয়।

শুধু চোখ মোছেন। সাহস করে বলতে ইচ্ছে হয়, 'মাদার, তুমি যেও না। তুমি থাক। এখানে সব অন্ধকার হয়ে যাবে।' বললেন একদিন সেকথা। বললেন, 'সেখানে কে আছে মাদার তোমার?'

মাদার হাসেন, ভাঙা বাংলায় ইংরাজী মিশিয়ে হেসে বলেন, 'ওঃ, আমার সিস্টার আর ব্রাদার আছে। তাদের ছেলেমেয়েরা আছে। শিশু এবং বড় বড়। আর আমার দেশ। আমাদের হোমকান্ট্রি।' আর বলেন, 'আমাদের তো প্রভুর কাজ শেষ করে ফিরে যাবার নিয়ম। অন্যজন আবার আসবেন তাঁর কাজই করতে মিশনের নিয়মে।'

'তবু আর কিছুদিন থাক না মাদার।' কালো মেমের কান্না আসে। ভয় করে যেন কোন অজানা সাদা মেমকে মনে করে। কে জানে কেমন হবে সে।

তখনকার দিনে বিলাত যাওয়া অনেক সময় লাগত। প্রায় ছ'মাস। তবু ছ'মাস দেরি আছে এখনও যেতে তাঁর।

সাদা মেম জিনিসপত্র কিনছেন। ইণ্ডিয়ার সব কৌতূহল ও কৌতুক-উৎপাদক বাসন, গহনা, গালিচা, হাতির দাঁত, মাটির গালার পাথরের কাঠের খেলনা পুতুল। 'ওঃ, মাই সিস্টার, ব্রাদার অ্যাণ্ড চিলড্রেন সব কটো খুশি হবে।' গোছান আর বলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহায্যকারিণী কালো মেম সোনামণির মুখ ম্লান হয়ে যায়।

মেম বুঝতে পারেন। 'ও সোনামণি, মাই মার্থা, তুমি এটো দুঃখিত হয়ো না। প্রভু তোমাদের দেখবেন।' বলে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেন।

এবং যত পুরনো সাদা কাপড় গাউন ইণ্ডিয়ার মতো কাপড়জামা, সব কালো মেমের জন্য গুছিয়ে রাখেন। বলেন, 'এগুলি টোমার। তুমি পরিবে।' সোনামণি চোখ মোছে দ্বিগুণ দুঃখে।

আর তিন মাস মাত্র বাকি। বর্ষাকাল। শরতে মেমসাহেব যাবেন।

সোনামণি স্কুলের মেয়ে খোঁজে পাড়া-বেপাড়ায়। বউবাজার থেকে ঠনঠনে। ঠনঠনে থেকে শ্যামবাজার। রোদ্দুর বর্ষা মাথায় নিয়ে।

স্কুল যেন মেমসাহেব চলে যাবার পর কানা পড়ে না যায়। নতুন মেম আসবার আগে পুরনো মেয়েদের ভজিয়ে ভুলিয়ে যত্ন করে রাখা—প্রাইজে পুতুল খেলনা দিয়ে, ছবির বই দিয়ে। সে ছাড়া নতুন মেয়ে আনা, সংগ্রহ করা।

ওদিকে শ্যামবাজারে নাকি বেথুন সাহেব একটি ইস্কুল খুলেছেন। হিন্দু মেয়েদের জন্য।

সাদা মেমদের, কালো মেমের সেজন্যেও ভাবনার শেষ নেই।

কি হবে তাঁদের এই ছোট স্কুলটির! 'সদাপ্রভু'র দয়াতে টিকে থাকবে তো। কালো মেমের মতো অনন্য কর্মদক্ষতা কারুর নেই।

হঠাৎ কালো মেম জ্বরে পড়লেন।

সেকালের কলকাতা। মলঙ্গা লেনের এক গলিতে একটি বড়লোকের ঠাকুলদালানে স্কুল।

সাদা মেম ওরই মাঝে একটু কাছাকাছি ভাল বাড়িতে থাকেন, সেখানেই দু-একটা ঘরে কালো মেম ও অনাথ মেয়ে ক'টিকে নিয়ে। কালো মেমের দেখা-শোনার ভারও তাঁর। তাঁর ঘরখানির পাশে তাঁর স্থান। আর তাঁরই জ্বর। আর মেমও বিলাতে যাবেন সব ঠিকঠাক। অন্য মেমসাহেব এখনও জাহাজে। এবং সেকালের মশামাছিভরা লোনালাগা কলকাতার জ্বর।

কে জানে সে কি জ্বর। একাজ্বরী কি ম্যালেরিয়া, কি কবিরাজী মতে জ্বর বিকার, জানে না কেউ।

সেকালের মতো ডাক্তার ও বৈদ্য এলেন। ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা হল। আর কালো মেম একাজ্বরীতে ভুগতে লাগলেন।

সোনামণি বা স্বর্ণময়ী শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে কী-সব ভাবেন। কলকাতার কাছে গ্রাম-দেশ। একটি শীতের সন্ধ্যারাত্রি। পুকুরঘাটে গেছেন বাসন ধুতে।

কারা বা কে যেন এল—কোন গাছের আড়াল থেকে।

হঠাৎ চোখ মুখ বেঁধে ফেলল। আর মনে নেই।

কোথায় নিয়ে গেল, কি বিপর্যয় দেহে মনে জীবনে ঘটে গেল তা আর বলবার দরকার করে না।

অর্থাৎ যা হবার তা হয়ে গেল। সে স্বজন গৃহ ধর্ম সমাজের বাইরে এসে পড়ল। এই ত্রিশ বছর পরেও সোনামণির চোখে জল এল সেই বিভীষিকাময় রাত্রির কথা মনে পড়ে।

মা, বাবা, ভাই, বোন। একটি দু'বছরের মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়ে সে পিত্রালয়ে ছিল।...

যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল তারা তো অর্ধমৃত অবস্থায় কোন্ এক পথের ধারে এক জায়গায় ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

সে কেমন করে সেই দেহখানি বহন করে শিয়ালদার কাছে ঐ গির্জাটার ধারে এসে শুয়ে পড়েছিল, সে জানে না। গায়ে শুধু মলিন ছেঁড়া কাপড়খানি। সায়া সেমিজ কাকে বলে সেই সেকালে তাদের জানা ছিল না।

বিকেল থেকেই আকাশ অন্ধকার। সন্ধ্যার দিকে ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি এল।

সে গায়ের কাপড়খানা টেনে খুলে মুড়ি দিল। বৃষ্টি তাতে বাধা মানে না।

পথে লোকজন সেকালে কম। পথিক যারা দেখছে, কেউ দাঁড়াচ্ছে। কেউ বলছে, 'ভিজে যাবি যে। বাড়ি চলে যা।' ভিখারিনী মনে করে কেউ পয়সাও দু-একটি দিয়েছে।

হেনকালে গির্জার গেট খুলে কয়েকজন বেরিয়ে এলেন। ক' জন ছিলেন সে জানে না।

শুধু শুনেছিল একটি বিদেশী কণ্ঠে দুটি কথা, 'কে তুমি এখানে ভিজিটেছ? বাড়ি চলিয়া যাও।'

আর একজন বললে খরখরে বাংলায়, 'কে রে এখানে? ভিক্ষে দেবার কেউ নেই। অন্য জায়গায় যা।'

সে উঠে বসেছিল। গায়ের কাপড় ভিজে গেছে।

উনিশ-কুড়ি বছরের কোমল একখানি ভীতদৃষ্টি মুখ তুলে সে রেলিং ধরে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

কিন্তু বাড়ি? বাড়ি যাবে? বাড়ি কোথায় তার?

চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে এল।

বিদেশিনী তার দিকে চেয়েছিলেন। বললেন, 'কোটায় তোমার বাড়ি?'

সে সভয়ে চুপ করে রইল। সেই বিদেশিনী এই মেমের সঙ্গিনী—জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় ঘর তোর? ভিজে যাচ্ছিস যে। জ্বরে পড়বি যে।'

চোখ মুছে সে বললে, ঘর নেই তার। তারপর আবার বসল। আর আস্তে আস্তে ভিজে মাটিতে শুয়ে পড়ল। গায়ে কাঁপুনি ধরেছে। অত্যাচার লাঞ্ছনা অনাহার শীত বৃষ্টিতে তার গায়ে সত্যিই জ্বর এসেছে মনে হচ্ছিল।

মেমসাহেব এদের ভাষা সবটা বোঝেন না। সকরুণ চোখে ঐ অজানা অসহায় শ্যামবর্ণ তরুণী নারীর দিকে চেয়ে রইলেন একটু। ভাঙা বাংলায় তারপর নিজের সঙ্গিনীকে বললেন, 'লক্ষী, সত্য এখানে পড়ে থাকলে শীতে জ্বরে মরিয়া যাবে। আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব? জিজ্ঞাসা কর তো যাবে কি?'

লক্ষী দ্বিধাভরে বললে, 'মাদার, ও কি জাত! যাবে কি, হিন্দু তো।'

মাদার বললেন, 'প্রভুর দয়ার কাছে হিন্দু ক্রিশ্চান জাতি নেই। দেখছ না ও একলা বসে কাঁপছে! নাও আমাডের গাড়িটে ওকে টুলিয়া নাও।

লক্ষীমণি স্বর্ণময়ীর হাত ধরে উঠিয়ে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাদের সঙ্গে যাবি?'

সে বিহ্বল চোখে বলেছিল, 'কোথায়?'

এই সেই সাদা মেম। তিনি তখন বলেছিলেন, 'প্রভুর আশ্রয়ে। এস বালিকা।' লক্ষ্মী তার হাত ধরে ঘোড়ারগাড়িটায় তুলল। পাশে বসল তার।

তারপর অসুখ, জ্বর। আশ্রয়। তারপর লিখতে পড়তে শেখা। সাদা মেমের কন্যাস্নেহে করুণায় মমতায় স্কুলের কাজ শেখানো। ক্রমে ধর্মান্তকরণ।

সেই আশ্রয়দাত্রী। এখন সেই সাদা মেম বিলাত চলে যাবেন। নতুন কে আসবেন। কেমন লোক হবেন...! ভাবে।

তার পরিচয় এরা নামমাত্র জানত। কোন্ এক চক্রবর্তীবাড়ির মেয়ে। বেহালায় বাড়ি। বিধবা। একটি মেয়ে ছিল। অপহৃতা নারী। নামধাম বলেনি। ভাল জানতও না। এঁরাও জিজ্ঞাসা করেননি আর।

অসুখ বাড়ে। আর সে আচ্ছন্ন হয়ে, কত কি ভাবে।

ভাবে, নিজের মেয়েটির কথা।

সাদা মেম এলেন। লক্ষ্মীদিদির সঙ্গে।

বলেন. 'কেমন আছ, সারিয়া ওঠো। শীঘ্র।' যদিও জানেন সারবার আশা কমে আসছে।

কালো মেম চোখ খুলে দুজনের দিকে চাইল।

তারপর বলল, 'আর তো ভাল হব না মাদার। প্রভু আমাকে ডেকেছেন...। শুধু...'

লক্ষ্মী বললে, 'হ্যাঁ, প্রভু ডেকেছেন তোকে! থাম্। তা শুধু কি বলছিস?'

সাদা মেম বিছানার পাশে একটা চৌকিতে বসে তার হাত ধরে নাড়ী দেখছেন। কালো মেম আস্তে আস্তে বললে, 'লক্ষ্মীদিদি, আমার মেয়েটিকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে।'

লক্ষ্মী অবাক। 'তোর মেয়ে! সেই মেয়ে!'

সাদা মেম অবাক, 'টোমার মেয়ে! বেঁচে আছে? কোথায় আছে?'

কালো মেম বললেন, 'ইয়েস মাদার। আমার সেই মেয়ে। এই মলঙ্গা লেনের কাছে একটি বাড়িতে তার শ্বশুরবাড়ি। আমি একটি দেশের লোকের কাছে ঠিকানা নাম জেনেছিলাম। একবার যদি দেখতে পেতাম। ওখানে তার বিয়ে দিয়েছিলেন আমার বাবা।'

সাদা মেমের নাড়ী দেখা হয়ে গিয়েছিল। তার হাত ধরে বসেছিলেন।

সে চোখ বোজে। খুব দুর্বল।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের অন্যদিকে গিয়ে লক্ষ্মীমণিকে কি যেন জিজ্ঞাসা করলেন।

ডাক্তারও এলেন। দেখে চলে গেলেন।

সন্ধ্যা হল। আবার সাদা মেম লক্ষ্মীমণিকে নিয়ে এলেন।

ঘরের দেওয়ালে সোনামণির ক্রসখানি সুতোতে বাঁধা টাঙানো ছিল।

সোনামণির চোখ বোজা।

সাদা মেম তার বুকে মাথায় মুখে ক্রসখানি ঠেকিয়ে দিয়ে বললেন, 'সোনামণি, প্রভুর কৃপাক্রস চুম্বক কর। তিনি তোমার কন্যা পিতা মাতা সব হয়ে রয়েছেন। এখন তিনিই তোমার বন্ধু। সব। তোমার সেই কন্যাকে আমরা কি করে বলব তার মার কথা। সে জানে তার মা মরে গিয়েছিল। লক্ষ্মী বলছে, ফাদার বলছেন, এখন তোমার কোন পরিচয় তার জীবনে তার শ্বশুরবাড়িতে নিন্দা কলঙ্ক ও তার বিপদের সৃষ্টি করতে পারে। সে তার স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে থাকুক। এবং সেই হিন্দুঘরের বৌকে এখানে আসতেও দিবে না। তুমি আর তার কথা ভেবো না। এখন প্রভুর কথাই মনে কর। তিনি ত্রাণকর্তা, করুণাময়। সকলের পিতা প্রভু। তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন তিনি সেই দুর্দিনে।'

মেমসাহেব সোনামণির হাতে ক্রসটি দিলেন। কম্পিত হাতে সে ক্রসটা মাথায় ঠোঁটে ঠেকালো চোখ বুজেই।

শুধু আস্তে আস্তে ফোঁটায় ফোঁটায় জল চোখ থেকে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

রচনাকাল, ১৩২৭